দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

দুই দিগন্ত
জন্মভূমি
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বদ্ধ
শ্রেষ্ঠ গল্প
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
একাকী অরণ্যে
আমাকে দেখুন (১ম পর্ব)
আমাকে দেখুন (২য় পর্ব)
আমাকে দেখুন (৩য় পর্ব)
আমাকে দেখুন (৪র্থ পর্ব)
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোয় ফেরা
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া (১ম)
মহাযুদ্ধের ঘোড়া (২য়)
সিন্ধুপারের পাখি
নোনা জল মিঠে মাটি
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
ইস্পাতের ফলা

এই উপন্যাসটি নিয়ে দেড় বছর আমি প্রায় নাস্তানাবুদ হ'য়ে গেছি। আমার লেখক জীবনে অন্য কোনো গ্রন্থ নিয়ে এমন নাকাল আগে আর কখনও হই নি।

উপন্যাসটির একটি পর্ব বছর তিনেক আগে কোনো এক পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি অংশের খানিকটা লিখে ছাপতে দিয়েছিলাম। কয়েক ফর্মা ছাপার পর হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে তিন চার মাস শয্যাশায়ী থাকি। সুস্থ হওয়ার পর আবার যখন লেখা শুরু করি, ছাপাখানায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এইভাবে দেড়টি বছর কেটে যায়।

একটানা ছাপা না হওয়ার কারণে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে। ফলে কোথাও কোথাও কিছু ভুল থেকে গেছে। যেমন দু-এক ক্ষেত্রে সঞ্জয় হ'য়েছে মণীশ, হেমবতীনন্দন—হিমগিরিনন্দন। এ জাতীয় আরো কিছু ত্রুটি ধরা পড়তে পারে। পাঠক চিরদিনই লেখকের সহস্র অপরাধ ক্ষমা ক'রে থাকেন। সেই ভরসায় এই কৈফিয়তটি পেশ করলাম।

গ্রন্থকার

চৈত্রের গনগনে রোদে পুড়তে পুড়তে হাইওয়ের একপাশে এসে বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। এটা আসছে সাহারসা থেকে, যাবে পূর্ণিয়া টাউনে।

বাসটার আগাপাশতলা মানুষে বোঝাই। ভেতরে এমন গাদাগাদি ভিড় যে একদানা সরষে গলাবার জায়গা নেই। পা-দানিতে, বনেটের মাথায়, এমন কি মাডগার্ডেও মানুষ ঝুলছে। তা ছাড়া ছাদের মাথায় তো আছেই। ছাদে শুধু মানুষই না—মুরগি, পোষা কুকুর, বকনা বাছুর থেকে শুরু করে ঢাউস ঢাউস টিনের বাক্স, আলু পেঁয়াজ চিনি আর ভেলিগুড়ের বস্তা, আনাজের টুকরি—এমন হাজার রকমের লটবহর। এরই মধ্যে এক মাদারি খেলোয়াড় তার দুই বকরি এবং একজোড়া বাঁদর নিয়ে একধারে বসে তরিবত করে বিড়ি ফুঁকছে। বিহারের এই অঞ্চলের বাসে এমন দৃশ্য আকছার চোখে পড়ে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে বাসের পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন রাকেশ—রাকেশ সহায়। তাঁর ডান হাতে প্রকাণ্ড স্যুটকেশ, আর বাঁ কাঁধ থেকে একটা মোটা চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে।

রাকেশের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। টান টান, ঝকঝকে চেহারা। প্রায় ছ' ফুটের মতো হাইট। গায়ের রং বাদামি। লম্বাটে মুখ তাঁর, চওড়া কপাল, ব্যাক ব্রাশ-করা ঘন চুল। পুরু ঠোঁট রাকেশের, দৃঢ় চোয়াল, ধারাল নাক, জোড়া ভুরু। উজ্জ্বল দুই চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তাকানো মাত্রই টের পাওয়া যায়, ত্রিশ বছরের এই যুবকটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

এই মুহূর্তে রাকেশের পরনে চকোলেট রঙের ট্রাউজার্স আর ক্রিম কালারের বুশ শার্ট, পায়ে ভারী চপ্পল। বাঁ হাতে স্টিল ব্যাণ্ডে একটা ঢাউস চৌকো ঘড়ি বাঁধা।

রাকেশের সঙ্গে আরো ক'টি যাত্রী নেমেছে। জামা কাপড়ের হাল, চুলের ছাঁট, টিকির গোছা এবং লাবণ্যহীন কর্কশ চেহারা, ফাটা ফাটা পা, খইওড়া চামড়া ইত্যাদি নির্ভুল চিনিয়ে দেয় লোকগুলো আকাট দেহাতী। ওরা রাস্তা পেরিয়ে ওধারে ধানকাটা ধু ধু মাঠের দিকে চলে যায়। বাসটাও আর দাঁড়ায় না, চৈত্রের হাওয়ায় এয়ার হর্নের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নতুন করে দৌড় শুরু করে। পলকে সমস্ত জায়গাটা একেবারে সুনসান এবং নিঝুম হয়ে যায়।

দু-এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন রাকেশ। তাঁকে আপাতত দুধলিগঞ্জের পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় যেতে হবে।

এই হাইওয়ে দিয়ে সরকারী জিপে বা প্রাইভেট কারে অনেক বার সাহারসা বা পূর্ণিয়া গেছেন রাকেশ। কিন্তু ঠাসাঠাসি ভিড়ের বাসে এভাবে কখনও তিনি ওঠেননি বা দুধলিগঞ্জে যাবার জন্য মাঝ রাস্তায় নেমেও পড়েননি। তেমন প্রয়োজন আগে আদৌ আর কখনও হয়নি।

দুধলিগঞ্জ কোথায়, মোটামুটি একটা ধারণা আছে রাকেশের। জায়গাটা তাঁকে খুঁজে বার করে নিতে হবে। অবশ্য দুধলিগঞ্জ তাঁর সঠিক গন্তব্য নয়। ওখানকার পি. ডব্লু. ডি. বাংলো থেকে পাঁচ মাইল দূরে ক'টা গ্রামেই তাঁর আসল কাজ। দু-চারদিনে ওখানকার ব্যাপারটা মিটবে বলে মনে হয় না। কতদিন লাগবে, রাকেশ জানেন না। তাই কাছাকাছি থাকার মতো একটা আস্তানার দরকার ছিল। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি রাকেশের ছেলেবেলার বন্ধু, একসঙ্গে স্কুল কলেজে পড়েছেন। তিনিই বাংলোটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যতদিন ইচ্ছা রাকেশ ওখানে থাকতে পারেন। সেজন্য বন্ধুর কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

দুধলিগঞ্জ রাস্তার এপারে না ওপারে, রাকেশ জানেন না। হাইওয়েতে লোকজনও নেই যে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। এপাশে ওপাশে তাকাতেই ডান দিকে খানিক দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছের তলায় চায়ের দোকান চোখে পড়ল।

শস্যহীন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হাইওয়ের পাশে চায়ের দোকানগুলো যেমন হয় ওটার চেহারাও তেমনি হতচ্ছাড়া ধরনের। হেলে-পড়া কোমর-বাঁকা নীচু একটা ঘর, মাথায় টুটাফাটা টিন এবং ভাঙাচোরা অ্যাসবেস্টস জোড়াতাড়া দিয়ে ছাউনি। তিন দিকে ঘুণে-ধরা বাঁশের বেড়া। সামনে রাস্তার দিকটা হাট করে খোলা। সেখানে একধারে উঁচু উনুনে দিনরাত চা সেদ্ধ হয়। আরেক ধারে ইটের ওপর চওড়া তক্তা পেতে খদ্দেরদের বসার জন্য বেঞ্চ।

রাকেশ পায়ে পায়ে পিপর গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'চায়কা দুকানে'র মালিক একটা মধ্যবয়সী গেঁয়ো লোক। তার খালি গা, হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত ময়লা চিটচিটে কাপড় গোটানো। চামড়া ঘেঁষে ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, মাথার পেছন দিকে একগোছা মোটা টিকি। জ্বলন্ত উনুনের পাশে একটা নড়বড়ে তক্তপোষে পা মুড়ে থেবড়ে বসে আছে সে।

দু'জন চিমড়ে চেহারার খদ্দের অথবা মালিকের দোস্ত বেঞ্চে বসে 'গপসপ' করছিল। তাদের কোমরের তলায় ময়লা গোটানো টেনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনটে লোকই এত ঘামছে, মনে হয়, সারা গায়ে চটচটে রস মেখে বসে আছে।

রাকেশকে দেখে তার দুই সঙ্গী তটস্থ হয়ে পড়ে। তাঁর মতো মানুষেরা এরকম চায়ের দোকানে থুতু ফেলতেও ঢোকেন না। তিনজনই শশব্যস্ত হয়ে হাঁটুর তলা পর্যন্ত কাপড় টেনে দিয়ে যতটা সম্ভব ভব্য হয়ে দাঁড়াল। তারপর একসঙ্গে বলে উঠল, 'হুজৌর—'

রাকেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'দুধলিগঞ্জ পি. ডব্লু. ডি. বাংলোটা তোমরা চেনো?'

দোকানদার বলল, 'জি হুজৌর—'

'এখান থেকে কতদূর?'

'নজদিগ। লগভগ দো রশি।'

'কোন দিক দিয়ে যেতে হবে?'

'উধরসে—' দোকানদার ডানদিকে আঙুল বাড়িয়ে একটা কাচ্চী বা মেঠো রাস্তা দেখিয়ে দিল।

রাকেশ লক্ষ্য করলেন, ট্যারাবাঁকা অগুনতি সীসম গাছ এবং ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কাঁচা সড়কটা উধাও হয়ে গেছে।

দোকানদার বলছে বটে দু' রশি পথ, রাকেশ জানেন, এই সব দেহাতীদের দূরত্ব সম্পর্কে ধারণার কোনো মা-বাপ নেই। হয়তো দেখা যাবে, পাক্কা আড়াই মাইল হাঁটার পরও কোনো দিকে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোর ছাদের ডগাটুকু পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

একে চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ রোদ, তার ওপর সঙ্গে রয়েছে বিরাট সুটকেশ এবং ব্যাগ। এই গরমে লটবহর টেনে নিয়ে যাওয়া মুশকিল। রাকেশ বললেন, 'তোমাদের এখানে কুলি পাওয়া যাবে?'

দোকানদার বলল, 'এই দেহাতে কুলি কোথায় পাওয়া যাবে হুজৌর?'

দোকানদার এবং তার সঙ্গীদের মালপত্র পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় বয়ে নিয়ে যাবার কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা, একটু ভেবে নিলেন রাকেশ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলতেই হ'ল, 'তোমরা কেউ কষ্ট করে আমার সুটকেশ আর ব্যাগটা পোঁছে দেবে? পাঁচ টাকা মজুরি পাবে।'

'জরুর হুজৌর—' প্রায় ছোঁ মেরেই রাকেশের হাত থেকে সুটকেশ এবং ব্যাগ টেনে নিল দোকানদার। তার দোকানের যা হাল এবং ভারী ভারী টাউন থেকে অনেক দূরে এই সব দেহাতের লোকজনের যা অবস্থা তাতে সারা দিন চা বেচেও পাঁচ টাকা লাভ হওয়া অসম্ভব। পনের বিশ মিনিট মোট বয়ে যদি এতগুলো টাকা পাওয়া যায়, সেই দাঁওটা ছাড়ে কে?

নগদ নগদ পাঁচটা টাকার গন্ধে তার দুই সঙ্গীও এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু

সবান্ধবে যাওয়া মানেই টাকাটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে। তাতে একেবারেই রাজী নয় দোকানদার। কিছুক্ষণের জন্য দোকান দেখাশোনার দায়িত্ব দুই দোস্তের ওপর চাপিয়ে এবং তাদের গাঁইগুঁই করার কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে তড়িঘড়ি সে বেরিয়ে পড়ে, 'আইয়ে হুজৌর—'

একটু পরে হাইওয়ে থেকে তারা ডানদিকের সেই কাচ্চীতে নেমে পড়ে। কাঁচা মেটে রাস্তায় গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ চলার পর হঠাৎ দোকানদার সসম্ভ্রমে জানতে চায়, হুজৌর অর্থাৎ রাকেশ এখানে পঞ্ছী শিকারের জন্য এসেছেন কিনা।

রাকেশ রীতিমত অবাকই হন, 'পঞ্ছী!'

দোকানদার এবার যা বলে তা এইরকম। এখান থেকে তিন চার মাইল পুবে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল একটা বিল হয়েছে। শীতের শুরুতেই সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র পাখি এসে নামে—সিল্লি, মাণিক পাখি, টিল, বুনো হাঁস, ইত্যাদি ইত্যাদি। চৈত্রের শেষাশেষি পর্যন্ত এই পাখিরা এখানে থাকে, তারপর গরম যেই জাঁকিয়ে পড়ে ওরা ফের ঝাঁক বেঁধে দিগন্তের ওপারে উধাও হয়ে যায়।

ক'বছর ধরে ভারী ভারী টৌন অর্থাৎ বিরাট বিরাট শহর, যেমন রাঁচী ধানবাদ পাটনা বা কলকাতা থেকে বড়ো বড়ো সাহেবরা গুলি-বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে আসছেন। দোকানদার ভেবেছে সেই উদ্দেশ্যেই রাকেশের এখানে আসা।

রাকেশ বললেন, 'না। আমি অন্য কাজে এসেছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে দোকানদার। তারপর আচমকা কী যেন মনে পড়ে যায় তার। বলে, 'আজ সুবে সুবে টৌনসে এক মেমসাব ভি আয়ী হ্যায়। তাঁকেও 'গরমিন' বাংলোয় পৌঁছে দিয়েছি।'

'গরমিন' বাংলো বলতে পি. ডব্লু. ডি. বাংলো। নিছক সাদামাটা বিবরণ দেবার মতো করে মেমসাহেবের কথাটা বলছে দোকানদার। যাক, বাংলোতে তা' হলে একজন সঙ্গিনী পাওয়া যাবে। পরক্ষণেই সামান্য উদ্বেগ বোধ করেন রাকেশ। বড়ো বড়ো শহর থেকে ইদানীং কিছু কিছু পুরুষ এবং মহিলা দলবল নিয়ে প্রকৃতির মাঝখানে ক'টা দিন হৈ-হল্লোড় করতে আসেন। দোকানদার যে মেমসাহেবের কথা বলছে, তিনি যদি গুচ্ছের লোকজন জুটিয়ে এখানে এসে থাকেন তা' হলে শান্তিটি তো গেলই। তা ছাড়া যে কারণে তাঁর এখানে আসা তাতেও যথেষ্ট অসুবিধা হবার সম্ভাবনা।

মহিলাটি একাই এসেছেন, না সদলে, এটা জানার জন্য কৌতূহল হয় রাকেশের। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁরা ক'জন এসেছেন?'

দোকানদার জানায়, সঙ্গে আর কেউ নেই, স্রেফ একলাই এসেছেন মেমসাহেব।

এবার বিস্মিতই হ'ন রাকেশ। বড়ো বড়ো মেট্রোপলিস থেকে অনেক, অনেক দূরে বিহারের এই নিঝুম প্রান্তরে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের এক বাংলোয় একা এক মহিলা হঠাৎ কেন এলেন কে জানে। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য ভেতরে ভেতরে ব্যগ্রতা বোধ করেন রাকেশ। কিন্তু তাঁর যা পদমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাতে কোনো অপরিচিতা মহিলা সম্পর্কে এক দেহাতী চায়ের দোকানদারের কাছে ঔৎসুক্য দেখানো যায় না। তা' ছাড়া, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো বাংলোতে মহিলার সঙ্গে দেখাই হয়ে যাচ্ছে। রাকেশ এ-নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

নিঃশব্দে আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর মেমসাহেবের ভাবনাটা আপাতত মাথা থেকে বার করে দেন রাকেশ। দুধলিগঞ্জে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোর পাঁচ ছ' মাইল দূরে ক'টা গ্রামের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। ওই গ্রামগুলোতে যাবার জন্যই তাঁর এতদূরে ছুটে আসা।

রাকেশ এক সময় বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তো এখানকার লোক—'

'জি—' দোকানদার ঘাড় হেলিয়ে দেয়।

'ধারাবনী বারহৌলি আর মণিপুরা, এই দেহাতগুলোতে কীভাবে যাওয়া যায়? রিকশা মেলে?'

গ্রামগুলোর নাম শুনে আঁতকে ওঠে দোকানদার, 'হুজৌর, আপনি ওই সব গাঁওয়ে যাবেন?'

তার বলার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যান রাকেশ। বলেন, 'যেতেও পারি, না-ও যেতে পারি। বললে না তো, রিকশা-টিকশা মেলে কিনা—'

চোখের কোণ দিয়ে রাকেশকে দেখতে দেখতে ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট গলায় দোকানদার বলে, 'রিকশা মেলে না, পায়দল যেতে হয়। এই ধুপে (রোদে) ওখানে না যাওয়াই ভালো।' একটু থেমে ফের বলে, 'বহোত তখলিফ হোগা।'

রাকেশ বুঝতে পারলেন, দোকানদার কিছুতেই তাঁকে ধারাবনী বারহৌলি ইত্যাদি গ্রামগুলোতে যেতে দিতে চায় না। কারণটা তিনি মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন। যাতে কোনোভাবেই ওদিকে পা না বাড়ান, সেজন্য লোকটা গ্রামগুলোর একটা নিদারুণ এবং নৈরাশ্যজনক ছবি তুলে ধরে। একনাগাড়ে সে বলে যায়, 'কুছ নেহী হ্যায় উধার। সিরিফ ভুখা নাঙ্গা আদমী, টুটাফুটা জমিন, মচ্ছর, সাঁপ আউর বুখার।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'আঁখকা আরাম হোগা, দেখনেকো অ্যায়সা কোঈ চীজ উধর নেহী হ্যায় হুজৌর—'

অর্থাৎ দু' চোখ আরাম এবং তৃপ্তি পায় এমন দৃশ্যাবলী এই গ্রামগুলোতে একেবারেই অলভ্য। ওখানে শুধু ক্ষুধা, খরায় ফেটে যাওয়া মাটি, রোগ, মাছি, সাপ এবং অনন্ত দারিদ্র্য। রাকেশের রীতিমত চমকই লাগে। তাঁর সঙ্গী এবং গাইড, এই দেহাতী চায়ের দোকানদারটাকে একজন কবি বলে মনে হয়। কিন্তু লোকটা যতই তাঁর কৌতূহল নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করুক না, সে তো জানে না ওই গ্রামগুলোতে যাবার জন্যই বিরাট ঝুঁকি নিয়ে রাকেশ এখানে এসেছেন, সুন্দর সুন্দর চোখ জুড়ানো প্রাণ মাতানো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য নয়।

রাকেশ হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, ওখানে মাসখানেক আগে দুটো গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—না? অনেক লোককে খুনও করা হয়েছে?'

দোকানদার চমকে ওঠে। ভয়ার্ত চোখে দ্রুত রাকেশের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কী বলে, বোঝা যায় না।

রাকেশ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'পুলিশ বলেছে আঠারো জন লোককে মারা হয়েছে। আমি খবর পেয়েছি আরো বেশি মানুষ খুন হয়েছে। কম করে তিরিশ জন।' চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে কোনাকুনি দোকানদারের দিকে তাকান রাকেশ। বলতে থাকেন, 'তুমি এখানকার লোক। ঠিক কতজনকে মারা হয়েছে, তুমি হয়তো জানো।'

'নেহী, নেহী—' শ্বাসটানার মতো শব্দ করে দোকানদার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামনি কুছ নেহী জানতা হুজৌর—'

'কিছু শোনোও নি?'

'নেহী হুজৌর। হামনি বহোত গরীব আদমী।'

রাকেশ বলেন, 'গরীব আদমীদেরও চোখ-কান থাকে। তারা দেখতেও পায়, শুনতেও পায়।'

দোকানদার রাকেশের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়, সে কিছু দেখেনি, এমন কি কিছু শোনেও নি।

রাকেশ একটু চিন্তা করে বললেন, 'তাজ্জবকা বাত। তোমার চায়ের দোকান থেকে এই দেহাতগুলো কত দূরে?'

'হোগা লগভগ পাঁচ ছে মিল।'

'পাঁচ ছ' মাইল দূরে এমন সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটল, তোমার কানে কিছুই এলো না! কেউ তোমাকে কিছু বলেও নি?'

'নেহী হুজৌর। কেউ কিছু বলেনি। আমি গরীব আদমী।'

রাকেশ বুঝতে পারেন, লোকটা ডাহা মিথ্যে বলছে। মাত্র পাঁচ ছ' মাইল

দূরত্বে থেকেও সে কিছুই জানে না, কিছুই শোনেনি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। অথচ এই মারাত্মক গণহত্যার খবর অনেক, অনেক দূরে কলকাতা বম্বে দিল্লী পাটনা, এমন কি আরো দূরে সাউথ ইণ্ডিয়ার কাগজগুলোতেও প্রথম পাতার অনেকটা জায়গা জুড়ে, বড়ো বড়ো হেড লাইন দিয়ে ছাপা হয়েছে। সারা দেশ এমন একটা ভয়াবহ ঘটনায় বিচলিত, অভিভূত এবং ক্রুদ্ধ। নানা শহরে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অগুনতি মিছিল বেরিয়েছে। এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়েছে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর সেই ধিক্কারের কিছুটা এসে লেগেছে রাকেশের গায়েও। কেননা তিনিও এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সে কথা পরে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে যেখানে সংবিধানে প্রতিটি মানুষের সমানাধিকার সেখানে এভাবে মানুষ খুন হয়ে যায়, এটা প্রায় অভাবনীয়। যতই অবিশ্বাস্য হোক, তবু নিষ্ঠুর সত্য। বলা যায়, দেশজোড়া অসংখ্য ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত মানুষের ধিক্কারই রাকেশকে প্রায় তাড়া করে এখানে নিয়ে এসেছে।

রাকেশ বলেন, 'ত্রিলোকী সিংয়ের নাম শুনেছ?'

শ্বাসরুদ্ধের মতো দোকানদার বলে, 'নেহী জি। হোগা কোঈ—' বলতে বলতে থেমে যায়।

'তোমাদের এদিকের এম. এল. এ.।'

'এয়ে! অত বড়ে আদমীর খবর আমি কী করে জানবো হুজৌর? হামনি বহোত গরীব।'

বোঝা যাচ্ছে, এই দেহাতী 'চায়কা দুকানে'র মালিক এতই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে যে তার গলা দিয়ে একটা দরকারী কথাও বার করা যাবে না। তবু ফের জিজ্ঞেস করেন, 'গিরিলাল ঝাকে চেনো?'

দোকানদারের একই জবাব, 'নেহী হুজৌর—'

'মৈথিলী ব্রাহ্মণ। এখানকার সব চেয়ে বড়ো জমিমালিক। ভালো করে ভেবে দেখ।'

'নেহী হুজৌর।'

'ঠিক আছে।' রাকেশের উদ্যম বিন্দুমাত্র কমে না। এ অঞ্চলের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে যে এরকম নেগেটিভ উত্তরই পাওয়া যাবে, এটা তাঁর অজানা ছিল না। রাকেশ এবার বলেন, 'পাসোয়ান চৌধারী, বৈজনাথ, বজরঙ্গী—এদের নাম শুনেছ?'

দোকানদার তার প্রতিজ্ঞায় অনড় থাকে। সে বলে, 'নেহী হুজৌর, শুনা নেহী কভ্‌ভি।' বলতে বলতে জোরে জোরে পা চালাতে থাকে।

লোকটার মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না রাকেশের। পাঁচ টাকার লোভে মালপত্র পৌঁছে দিতে এসে সে এক মারাত্মক ফাঁদেই পা ঢুকিয়ে বসেছে যেন। 'ভারি টৌন' থেকে আসা এই সাহেব জাতীয় মানুষটির সঙ্গ খুবই বিপজ্জনক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাগ এবং স্যুটকেশ 'গরমিন' বাংলোয় নামিয়ে টাকাটা বাগিয়ে চম্পট দেওয়াই এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ।

রাকেশও দোকানদারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিলেন। তবে তাকে আর বিপন্ন করতে চাইলেন না। পাঁচ ছ' মাইল দূরের সেই সব দেহাত, এম. এল. এ., জমিমালিক, গণহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন করে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

এক সময় দু'জনে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পৌঁছে যান।

পাছে আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়, সেজন্য দোকানদার আর ভেতরে ঢোকে না। গেটের বাইরে ব্যাগ এবং স্যুটকেশ নামিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে, কাঁচুমাচু মুখে হাত পাতে। চায়ের দোকান দুই দোস্তের দায়িত্বে রেখে এসেছে, তুরন্ত তাকে ফিরে যেতে হবে, এই সব জানিয়ে বলে, 'হামনিকা রুপাইয়া—'

বোঝাই যাচ্ছে, গেট থেকে স্যুটকেশ-টুটকেশ রাকেশকেই টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। তিনি পকেট থেকে পার্স বার করতে করতে বললেন, 'আমার এত উপকার করলে, তোমার নামটাই জানা হ'ল না।'

'রামবহাল হুজৌর।'

পার্স থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বের করে দোকানদারের হাতে দেন রাকেশ। টাকাটা পাওয়ামাত্র এক সেকেণ্ডও দাঁড়ায় না লোকটা, উর্ধ্বশ্বাসে প্রায় ছুটতেই শুরু করে।

দুই

পি. ডব্লু. ডি. গেস্ট হাউসটা এক কথায় চমৎকার। প্রায় একর খানেক জায়গা জুড়ে ছড়ানো কমপাউণ্ড। চারিদিক রং-করা উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। বাইরে প্রচুর গাছপালা। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, অর্জুন সিমার পরাস পিপর, এমনি অজস্র গাছের ছড়াছড়ি। গোটা বিহার জুড়ে যখন চৈত্রের গরম লু-বাতাস হা হা করে উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে তখন এই জায়গাটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন এবং তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা।

গেটের পাশ থেকে ব্যাগ এবং স্যুটকেশটা তুলবার জন্য রাকেশ যেই ঝুঁকেছেন অমনি হাঁ হাঁ করতে করতে শশব্যস্তে মধ্যবয়সী একটি লোক এবং তার পেছন পেছন নীল উর্দি-পরা একটা ছোকরা ছুটতে ছুটতে কাছে চলে এলো। দ্রুত গেট খুলে বাইরে এসে মধ্যবয়সী লোকটা অতীব সসম্ভ্রমে বলল, 'স্যার, আপনি কি সহায় সাহেব ?'

স্যুটকেশ না তুলে আস্তে আস্তে ফের সোজা হয়ে দাঁড়ালেন রাকেশ। লক্ষ্য করলেন, লোকটার মুখ লম্বাটে। নারকেলের খোলের মতো মাথাটায় ছোটো ছোটো করে একেবারে চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা ছোটো ছোটো চুল। পেছন দিকে মোটা একগোছা টিকি। মুখ ভর্তি বসন্তের দাগ। ভারী থলথলে চেহারা তার, চোখ দুটি কিন্তু খুবই সরল। চোখ থেকে যদি স্বভাবের হদিশ পাওয়া যায় তা' হলে বলতে হবে লোকটি ভালোমানুষ ধরনের। তার পরনে ঢলঢলে ফুল-প্যাণ্ট এবং ঢোলা বুশ সার্ট, পায়ে ভারী চপ্পল।

রাকেশ বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি ?'

ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে লোকটা বলল, 'নমস্তে স্যার। আমি অবোধ-নারায়ণ চতুর্বেদী—এখানকার কেয়ারটেকার। ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেব পাটনা থেকে 'তার' করেছেন, আপনি আজ এখানে আসবেন। আমরা 'সুবেসে' আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।' বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গের ছোকরাটাকে তাড়া লাগায় অবোধনারায়ণ, 'সাবকা সামান লে যা—'

ছোকরা যান্ত্রিক তৎপরতায় স্যুটকেশ এবং ব্যাগ কাঁধে তুলে ভেতরে চলে যায়।

অবোধনারায়ণ সবিনয়ে বলে, 'আইয়ে স্যার।'

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাদামী নুড়ির রাস্তা। কেয়ারটেকার অবোধ-নারায়ণের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চারিদিক দেখে নেন রাকেশ। বিরাট কমপাউণ্ডের ঠিক মাঝখানে বড়ো মাপের একতলা বাংলো। ইটের চওড়া দেওয়াল, পালিশ-করা ঝকঝকে দরজা জানালা। ছাদে সিমেণ্ট জমিয়ে তার ওপর লাল টালি বসানো। সামনের দিকে ঢালা লাউঞ্জ। সেখানে গদি-মোড়া অনেকগুলো বেতের চেয়ার আর সেণ্টার টেবল সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

নুড়ির রাস্তাটার দু'ধারে ফুলের বাগান, ফাঁকে ফাঁকে সবুজ 'লন' আর গাছ-গাছালি। এই সব গাছের বেশির ভাগই ইউক্যালিপটাস অর্জুন ঝাউ এবং দেবদারু। বাংলোর পেছন দিকেও বাগান চোখে পড়ছে। এই গাছপালা আর বাগানের পেছনে যত্ন এবং পরিশ্রমের ছাপ রয়েছে। রীতিমত পরিকল্পনা করে মালী দিয়ে এ-সব করা হয়েছে।

অবোধনারায়ণ গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল, 'স্যার, আপনার জন্যে দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে বড়ো রুমটা ঠিক করে রেখেছি। ওটাই এখানকার বেস্ট রুম। প্রচুর আলো-হাওয়া খেলে। তা' ছাড়া অ্যাটাচড বাথও রয়েছে।'

'ধন্যবাদ।' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন রাকেশ।

'ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেব 'মেসেজ' পাঠিয়েছেন, আপনার যেন কোনোরকম অসুবিধা না হয়।'

'আপনার মতো দায়িত্বশীল একজন অফিসার থাকতে অসুবিধা হবে কেন? কোনো কারণ নেই।' রাকেশ হাসলেন।

অবোধনারায়ণ এবার যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে উঠল। বিগলিত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি যে ক'দিন এখানে থাকবেন, যখন যা দরকার হবে, দয়া করে একবার হুকুম করবেন। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস স্যার।'

রাকেশ অল্প হাসলেন, 'আপনি যখন আছেন তখন হুকুম করার প্রয়োজন হবে না। আমার যা যা দরকার, বলবার আগেই পেয়ে যাব।'

হাত কচলাতে কচলাতে এবার অবোধনারায়ণ বলে, 'এখান থেকে যাবার পর কৃপা করে ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেবের কাছে আমার কথা যদি একটু বলেন—'

লোকটা কী চাইছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না রাকেশের। তাঁর বন্ধু জগন্নাথ ত্রিবেদীর কাছে প্রশংসা করলে হয়তো অবোধনারায়ণের প্রমোশন-ট্রমোশনের দিক থেকে কিছু উপকার হবে। রাকেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই বলব।'

অবোধনারায়ণ প্রায় নুয়ে পড়ে। বলে, 'আপকা বহোত কৃপা।'

কিছুক্ষণ আগে চায়ের দোকানের মালিক রামবহাল জানিয়েছিল, এক মেম-সাহেব আজ সকালে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় এসেছে। দোকানদার-বর্ণিত সেই মহিলার বয়স খুব বেশি নয়। তার বিবরণ থেকে বোঝা গেছে মহিলাটি তরুণী। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যায় রাকেশের। কিন্তু সরাসরি একটি অচেনা মহিলা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করাটা খুবই খারাপ দেখায়। ঘুরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের এই বাংলোতে আর কে কে আছেন?'

'আজ সকালে কলকাতা থেকে একজন মহিলা এসেছেন। তিনি আর আপনি, এই দু'জন ছাড়া আপাতত এই উইকে অন্য কোনো গেস্ট নেই। সাত দিন পর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন অফিসারের আসার কথা আছে।'

এক সপ্তাহ পর কারা আসবে, তাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই রাকেশের। মহিলাটি হঠাৎ কেন এই নির্জন নিঝুম বাংলোতে একা একা এসে হাজির হয়েছেন, দোকানদার তা জানাতে পারেনি। অবশ্য দু-একদিন থাকলে নিশ্চয়ই সেটা জেনে

যাবেন রাকেশ। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি তীব্র আগ্রহ বোধ করছিলেন। বললেন, 'মহিলাটি কি কোনো কাজে এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। উনি একজন জার্নালিস্ট—পত্রকার।'

রীতিমত চমকই লাগে রাকেশের। একজন মহিলা সাংবাদিককে তিনি এখানে আশা করেননি। পরক্ষণেই আচমকা তাঁর মনে হয়, যে উদ্দেশ্যে তিনি দুধলিগঞ্জে এসেছেন, মহিলার আসার কারণটা কি সেই একই? এ-বিষয়ে আর কোনো প্রশ্নের সুযোগ পাওয়া যায় না। ততক্ষণে তাঁরা নুড়ির রাস্তা থেকে বিশাল লাউঞ্জে উঠে পড়েছেন।

অবোধনারায়ণ বলল, 'এদিকে আসুন স্যার।'

একটু পর দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তের বিশাল ঘরটিতে রাকেশকে নিয়ে আসে অবোধনারায়ণ। সেখানে বাংলোর সেই ছোকরা এমপ্লয়ীটি রাকেশের সুটকেশ এবং ব্যাগ নামিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ঘরখানা চমৎকার সাজানো। মেঝে জুড়ে পুরু দামী কার্পেট। বিরাট বিরাট জানালার একটা করে পাল্লা খড়খড়ির, একটা করে কাচের। দরজা-জানালায় দামী পর্দা। পালিশ-করা ঝকঝকে খাটে এক ফুট পুরু ফোমের গদির ওপর ধবধবে নিভাঁজ বিছানা। এক ধারে ক'টি সুদৃশ্য সোফা। আরেক ধারে ড্রেসিং টেবল, ওয়ার্ডরোব, লেখার জন্য রাইটিং টেবল, পেন এবং পেন্সিল স্ট্যাণ্ড আর চেয়ার। তা' ছাড়া মাথার ওপর দুটো সীলিং ফ্যান, দেয়ালে বাহারি ল্যাম্প শেড।

অবোধনারায়ণ বলল, 'এই আপনার কামরা স্যার। আপনি আসবেন বলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ফিটফাট করে রেখেছি।'

'ধন্যবাদ।'

রাকেশ শুনেছেন, এই অঞ্চলে এখনও বিজলী বাতি আসেনি। ফ্যান এবং ল্যাম্পের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'এদিকে ইলেকট্রিসিটি নেই। তা হলে এই সব?'

অবোধনারায়ণ জানায় বিজলী না এলেও এই বাংলোতে জেনারেটর আছে। পাটনা থেকে মিনিস্টার, এম. এল. এ. এবং বড়ো বড়ো অফিসার আর ভি. আই. পি.'রা আসেন। তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বলতে বলতে নিজের হাতে সুইচ টিপে ফ্যান চালিয়ে দেয়।

রাকেশ একটা সোফায় বসে জুতো খুলতে খুলতে বললেন, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ স্যার।' অবোধনারায়ণ বলল, 'দয়া করে আপনার সুটকেশ আর ব্যাগ যদি খুলে দেন, লছমন তা হলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে পারে।'

লছমন যে উর্দি-পরা আর্দালিটার নাম, বুঝতে পারলেন রাকেশ। বললেন, 'না না, তার দরকার নেই। আমি জামা-টামা পরে বার করে রাখব।'

'আপনার যেমন ইচ্ছে। স্যার—একটা কথা জানবার আছে।'

'কী?'

'আপনার খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা করব—ভেজিটেরিয়ান না নন-ভেজ?'

'ভেজ, নন-ভেজ, কোনোটাতেই আমার আপত্তি নেই।'

'ক'টায় খাবার দেব?'

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে রাকেশ বললেন, 'এখন বারোটা কুড়ি। একটায় দেবেন।'

'আচ্ছা স্যার, এখন তা হলে আমরা যেতে পারি?' বশংবদ ভঙ্গিতে জানতে চায় অবোধনারায়ণ।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

লছমন এবং অবোধনারায়ণ চলে যায়।

আর রাকেশ জামা-টামা খুলে বেশ কিছুক্ষণ ফ্যানের নিচে বসে রইলেন। প্রথমত, প্রচণ্ড ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে সত্তর আশি কিলোমিটার আসতে হয়েছে রাকেশকে। তারপর চৈত্রের লু-বাতাস এবং ঝাঁ ঝাঁ রোদের ভেতর দিয়ে হাইওয়ে থেকে বাংলোয় এসেছেন। সারা শরীর ঝলসে গেছে যেন।

ফ্যানের হাওয়ায় গা জুড়িয়ে নিয়ে সুটকেশ খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি তোয়ালে সাবান-টাবান বের করে সোজা বাথরুমে চলে গেলেন রাকেশ। স্নানটান সেরে সবে চুল আঁচড়ানো শেষ করেছেন, সেই সময় লছমন বিরাট ট্রে-তে অনেকগুলো প্লেট-টেট সাজিয়ে এ-ঘরে এলো। তার পেছন পেছন অবোধনারায়ণও এসেছে।

অবোধনারায়ণ বলল, 'খেয়ে নিন স্যার।'

এই নির্জন জায়গায় খাবার-টাবার এতটা ভালো পাওয়া যাবে, ভাবা যায়নি। সরু বাসমতী চালের ভাত, পাতলা নরম চাপাটি, স্যালাড, ডাল, মাছভাজা, চিকেন কারি, দই, সেঁকা পাঁপড়। অবোধনারায়ণ নিজে কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রাকেশকে খাওয়াল। ডেপুটি সেক্রেটারির বন্ধু হওয়ার কারণেই হয়তো মেনুটা এত চমৎকার, এবং কেয়ারটেকার ব্যক্তিগতভাবে এ-রকম যত্ন নিচ্ছে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। লছমন এঁটো গেলাস প্লেট নিয়ে চলে গেল। আর রাকেশ মুখ-টুখ ধুয়ে আসতেই অবোধনারায়ণ অন্য একটা প্লেট তাঁর সামনে ধরল। তাতে রয়েছে দু' খিলি পান, ভাজা ধনে আর মৌরী এবং টুথপিকস। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই অবোধনারায়ণের।
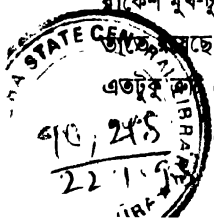
রাকেশ পান খান না। দুটো টুথপিক আর একটু ধনে-মৌরী তুলে নিলেন।
অবোধনারায়ণ জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, বিকেলে আপনি ক'টায় চা খান?'
রাকেশ বললেন, 'সাড়ে চারটে নাগাদ পেলেই হবে।'
'রাতের ডিনার ক'টায় দেব?'
'ন'টা দশটা যখন হোক পাঠিয়ে দিলেই হবে।'
'এখন আপনি রেস্ট নেবেন তো?'
'হ্যাঁ। খুব টায়ার্ড লাগছে। একটু শুয়ে নেব। বিকেলে চা খাবার সময় যদি একবার আসতে পারেন, ভালো নয়। কয়েকটা ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন চাই।'
'নিশ্চয়ই আসব স্যার।'
অবোধনারায়ণ চলে গেলে শুয়ে পড়লেন রাকেশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ বুজে এলো। তারপর গাঢ় ঘুমে চেতনার শেষ অন্তরীপটুকু ডুবে যেতে সময় লাগল মোটে দু' মিনিট।

তিন

দিবানিদ্রার অভ্যাস কোনোকালেই নেই রাকেশের। শরীর ভীষণ ক্লান্ত ছিল বলে আজ শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ না, চারটে বাজার আগেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

জানালা দিয়ে বাইরের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। রোদের ঝাঁঝ খানিকটা কমে এলেও, এখনও তাত রয়েছে। অবশ্য দুপুরের সেই উত্তপ্ত লু-হাওয়া আর বইছে না, বাতাস জুড়িয়ে এসেছে। সবুজ গাছপালার মাথায় অজস্র পাখি উড়ছিল। তাদের অশ্রান্ত চেঁচামেচি ছাড়া চারপাশ একেবারে নিঝুম। অবশ্য থেকে থেকে কোথায় যেন একটা কাঠঠোকরা গাছের গায়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যাচ্ছে। তার ঠক ঠক আওয়াজও কানে আসছে।

খানিকক্ষণ গাছপালা দেখে এবং পাখির ডাক শুনে আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন রাকেশ। তারপর মুখ-টুখ ধুয়ে বাইরের লাউঞ্জে চলে এলেন। এখানে যে বেতের চেয়ারগুলো রয়েছে তার একটায় বসে পড়লেন।

সামনের বাগানে একটা মালী বড়ো কাঁচি দিয়ে ঝাউগাছের মরা পাতা আর ডাল ছাঁটছে। আগে লক্ষ্য করেননি রাকেশ, এবার তাঁর চোখে পড়ল উত্তরদিকের

বাউণ্ডারি ঘেঁষে সাত-আটটা টালির পাকা ঘর। খুব সম্ভব ওগুলো এখানকার মালী চৌকিদার আর্দালি এবং অন্যান্য এমপ্লয়ীদের জন্য। ঘরগুলোর সামনে ক'টা বাচ্চা হুটোপুটি করছে। তাদের মায়েরা কাছাকাছি বসে গল্পে মশগুল। তবে অবোধনারায়ণ বা লছমনকে কোথাও দেখা গেল না।

সাহারসা থেকে সকালে যখন রাকেশ বাসে উঠেছিলেন তখনই ঠিক করেছিলেন, একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করবেন না, দুধলিগঞ্জে পৌঁছেই কাজ শুরু করে দেবেন। এখানে আসার পর ঘণ্টা চারেক কেটে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, আজ আর কিছু করা যাবে না। জায়গাটা যা নির্জন তাতে এখানে রিকশা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এ ব্যাপারে অবোধনারায়ণের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যদি নেহাতই পায়ে হেঁটে ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরা ইত্যাদি গ্রামগুলোতে যেতে হয়, দিনের আলো থাকতে থাকতে কিছুতেই পৌঁছুতে পারবেন না। চায়ের দোকানের রামবহাল তাঁকে বলেছিল, এখান থেকে ওই সব দেহাতের দূরত্ব পাঁচ-ছ' মাইলের মতো হবে। দূরত্ব সম্পর্কে গেঁয়ো মানুষদের ধারণাটা দারুণ গোলমেলে। এ-ব্যাপারে রাকেশের আদৌ কোনোরকম আস্থা নেই। হয়তো দেখা যাবে পাঁচ-ছ' মাইলের জায়গায় ওটা দশ-বারো মাইলে গিয়ে ঠেকেছে।

যদি পাঁচ-ছ' মাইলও হয়, ওই গ্রামগুলোতে যেতে যেতে সন্ধে নেমে যাবে। এদিকে বিজলী বাতি নেই। অন্ধকারে অচেনা জায়গায় গিয়ে কাজ কখন শুরু করবেন আর কখনই বা বাংলোয় ফিরে আসবেন! এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট কেমন কে জানে। রাকেশ শুনেছেন ওদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল রয়েছে। সেখানে মারাত্মক জন্তু-জানোয়ার থাকার সম্ভাবনা। যদি জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা গিয়ে থাকে, বাঘ ভালুক বা দাঁতাল শুয়োর-টুয়োরের মুখে পড়ে যেতে পারেন। তার চেয়ে রাতটা কাটিয়ে একেবারে কাল ভোরেই ধারাবনী বারহৌলির দিকে রওনা হবেন।

এই লাউঞ্জে আসার পর মিনিট পনের কুড়ি কেটে গেছে। কিন্তু বাংলোর কমপাউণ্ডে ক'টা বাচ্চা, তাদের মায়ের দল বা মালী ছাড়া বাইরের রাস্তার একটা মানুষও এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সারা দেশ জুড়ে যখন জন-বিস্ফোরণ বা পপুলেশন এক্সপ্লোসান চলছে তখন এই জায়গাটা জুড়ে অসীম নির্জনতা। পৃথিবীর হট্টগোল থেকে অনেক দূরে এই পি. ডব্লু. ডি. বাংলো এবং তার চারপাশ যেন অফুরন্ত ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

চারিদিকের এই স্তব্ধ নির্জনতা রাকেশের স্নায়ুর ওপর কোনোরকম ছাপই ফেলতে পারছে না। ভেতরে ভেতরে দারুণ টেনসান চলছে তাঁর। নিজের পদ-

মর্যাদা, ভবিষ্যৎ এবং উজ্জ্বল কেরিয়ারকে বাজি ধরে অত্যন্ত বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েই তিনি এখানে এসেছেন। কাজটা কীভাবে শুরু করা যায়, তার একটা ছকও করে নিয়েছেন মনে মনে। কিন্তু সেটা কতটা কার্যকর হবে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে। গ্রামগুলোতে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝে তাঁকে এগুতে হবে। দরকার হলে পুরনো ছক পাল্টেও ফেলতে হতে পারে।

হঠাৎ রাকেশের চোখে পড়ে, বাইরের রাস্তা থেকে কে একজন লোহার গেট খুলে কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়েছে। প্রথমটা ভালো করে লক্ষ্য করেননি। নুড়ির রাস্তা দিয়ে কাছাকাছি আসতেই নিজের অজান্তে তাঁর শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়।

যে আসছে সে একটি তরুণী। পরনে জীনস এবং বয়েজ কাট চুলের জন্য দূর থেকে তাকে যুবক মনে হয়েছিল। অবশ্য এই মুহূর্তে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, অর্থাৎ এখন তার মধ্য যৌবন। গায়ের রং টকটকে। শরীরে এক ফোঁটা বাজে চর্বি নেই। কাটা কাটা মুখ তার, বাদামী চুল, নতুন ছুরির ধারাল ফলার মতো ঝকঝকে চেহারা। মোটা ফ্রেমের চশমা তার, পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে যে উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে তাতে বুদ্ধির ধার। বাঁ হাতের কব্জিতে পুরু স্টিল ব্যাণ্ডে চৌকো একটি ঘড়ি ছাড়া গয়না-টয়না কিছু নেই। ডান কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের গোল ভারী ব্যাগ ঝুলছে।

এই মুহূর্তে তার রুক্ষ চুল থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত আধ সেণ্টিমিটার ধুলোয় মোড়া। মুখ টকটকে লাল, শরীরের খোলা জায়গাগুলো রোদে একেবারে ঝলসে গেছে যেন। ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। বোঝাই যায়, অনেক দূর থেকে আসছে সে।

অন্যমনস্কর মতো হেঁটে আসছিল মেয়েটি। সিঁড়ি দিয়ে লাউঞ্জে উঠে, রাকেশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ব্যাগসুদ্ধ হাত তুলে কনভেন্টে-পড়া মেয়েদের মতো নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'নমস্কার। আমার নাম দেবারতি সেন।' নমস্কারটা অবশ্য ভারতীয় রীতি মেনেই বলেছে।

রাকেশের মনে হয়, এই মেয়েটিই আজ সকালে এখানে এসেছে। কেননা রামবহাল যে বর্ণনা দিয়েছিল তার সঙ্গে এর চেহারা এবং পোশাক মিলে যায়। কিন্তু সে ধুলো মেখে রোদে পুড়ে এখন এলো কোথেকে? রাকেশ এখানে এসেছেন বারোটা নাগাদ। তারপর থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় একবারও একে দেখেননি। মেয়েটি কি এতক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরছিল?

রাকেশ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে নিজের নামটি

বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাই এনি চান্স আর য়ু আ রোভিং জার্নালিস্ট ফ্রম ক্যালকাটা ?'

দেবারতি এতটুকু অবাক হ'ল না। অল্প হেসে বলল, 'রাইট। নিশ্চয়ই কেয়ারটেকারের কাছে শুনেছেন।'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়লেন রাকেশ।

'আসুন, বসা যাক।' বলতে বলতে বসে পড়ে দেবারতি। তারপর গলা তুলে ডাকতে থাকে, 'লছমন, লছমন—'

লছমন কাছাকাছি কোথাও ছিল। ছুটতে ছুটতে চলে এলো। রাকেশ চা খাবেন কিনা, তাঁকে- জিজ্ঞেস না করেই দেবারতি বলল, 'ভীষণ টায়ার্ড, যত তাড়াতাড়ি পার দু'জনের মতো চা নিয়ে এস।' রাকেশের দিকে ফিরে বলল, 'আশা করি চায়ে আপত্তি হবে না।'

রাকেশ মাথা নেড়ে জানালেন, আপত্তি নেই।

এদিকে 'জি মেমসাব' বলে লছমন যেভাবে এসেছিল অবিকল সেইভাবেই চলে গেল।

রাকেশ দেবারতির মুখোমুখি বসে পড়েছিলেন। সোজাসুজি তার দিকে তাকালেন। এমন স্মার্ট এবং সাবলীল মেয়ে আগে আর কখনও দেখেননি। দেবারতির মধ্যে এক ফোঁটা সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা নেই। তা' ছাড়া একা একা এই নির্জন জায়গায় চলে এসেছে। মেয়েটা অসম্ভব সাহসীও। রাকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কলকাতার কোন নিউজপেপারে আছেন ?'

দেবারতি বলল, 'মর্ণিং সান।'

'ভেরি ফেমাস ডেইলি।' রাকেশ হেসে হেসে বললেন, 'আপনাদের পেপার তো জায়েন্ট কিলার।'

'জায়েন্ট কিলার—' এই মন্তব্যটির পেছনে একটা মারাত্মক ইঙ্গিত আছে। সম্প্রতি 'মর্ণিং সান' কয়েকজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, ডিপ্লোম্যাট, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিগ বিজনেসম্যান ইত্যাদি ভি. আই. পি.'দের ব্যক্তিগত জীবনে বেপরোয়া তদন্ত চালিয়ে এমন সব ভয়ঙ্কর এবং গোপন খবর যোগাড় করে ছেপেছে যাতে সারা দেশ তোলপাড় হয়ে গেছে। ডিপ্লোম্যাট এবং বিজনেসম্যানদের কেউ কেউ প্রতিরক্ষার নানা টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকায় বিদেশে বেচে দিয়েছে। বিভিন্ন কৌশলে কোনো কোনো বিজনেসম্যান ব্যাঙ্ক এবং মনেটারি ইনষ্টিটিউশানগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা বের করে সেই টাকা নিজেদের নামে সরিয়ে কোম্পানি তুলে নিয়েছে। তার নীট রেজাণ্ট হ'ল এই রকম। এক, সরকারি

টাকা তো নয়ছয় হয়েছেই। দুই, কোম্পানিগুলো উঠে যাওয়ায় হাজার হাজার এমপ্লয়ী বেকার হয়ে একেবারে পথে বসেছে। তার সবচেয়ে বিরাট এবং চাঞ্চল্যকর খবর হল সেক্স স্ক্যাণ্ডাল। কয়েকজন মন্ত্রী সরকারি ক্ষমতায় জোরে এমন সব যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে তাতে সারা দেশ জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। তাঁদের জীবনের নোংরা অন্ধকার দিকের বিবরণ পড়ে মানুষ যেমন স্তম্ভিত তেমনই আতঙ্কিত। এঁরা গণতন্ত্র, দেশের সুনাম, সরকারি উচ্চপদ, সব কিছুর মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে। অথচ বাইরে এঁদের অতি পবিত্র এবং উজ্জ্বল ইমেজ। কিন্তু এঁদের গোপন কাবার্ডে অজস্র নর-কঙ্কাল এবং জামার তলায় নরকের চটচটে দুর্গন্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মদানের ফলে দুশো বছরের পরাধীনতা ঘুচেছে। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও ভয়ার্ত বিপন্ন মানুষকে ভাবতে হচ্ছে পাঁচ বছর পর পর ভোট দিয়ে কাদের হাতে তারা ভারতবর্ষকে তুলে দিয়েছে। অবশ্য কালো মেঘের গায়ে রুপোলি রেখার মতো সামান্য আশা এটুকুই, 'মর্নিং সান'-এ এ-সব খবর বেরুবার পর চারিদিকে এত হৈচৈ হুলুস্থুল মিটিং মিছিল হয়েছে যে রাজনৈতিক জগতে যে-কোনো মুহূর্তে ভলক্যানিক ইরাপসান ঘটে যেতে পারে। হয়তো এই সব দাগী মন্ত্রী-টন্ত্রীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে হবে।

মারাত্মক মারাত্মক ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের কারণে 'মর্নিং সান'-এর সার্কুলেসন ইদানীং দারুণ বেড়ে গেছে। সারা দেশের চোখ এখন এই পত্রিকাটির দিকে। বিজনেস কমিউনিটি, রাজনৈতিক পাওয়ার ব্রোকার, মন্ত্রী, বিভিন্ন মিনিস্ট্রির বড়ো বড়ো অফিসার, ডিপ্লোম্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের মানুষ একেবারে তটস্থ হয়ে আছে—কখন কার দিকে 'মর্নিং সান'-এর নজর এসে পড়ে এবং তার সম্মান মর্যাদা ক্ষমতা এবং কেরিয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

দেবারতি হাসল, 'আমাদের রীডাররা তা-ই বলে। আপনি কি আমাদের কাগজ দেখেন?'

'রেগুলারলি।' রাকেশ বলতে লাগলেন, 'তবে ক্যালকাটা এডিসান তো পাই না। আমাদের এখানে আসে ডাক এডিসান।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় রাকেশের। সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে গভীর আগ্রহে এবার বলেন, 'আপনার নামটা কিন্তু আমার খুব চেনা। আচ্ছা, মাস দুয়েক আগে একটা রায়ট বাধার যে উপক্রম হয়েছিল তার পেছনে নাকি একজন এম. পি. ছিলেন। আপনি সেই ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংটা করেছিলেন না?'

দেবারতি স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, 'দু মাস আগের কথা আপনার মনে আছে?'

'মনে থাকবে না! এই নিয়ে পার্লামেন্টে কত রকম কোশ্চেন উঠেছিল। এম. পি.টিকে তাঁর পার্টি বের করে দিতে চেয়েছিল। খুব সম্ভব এক্সপালসানটা শেষ পর্যন্ত ঘটেছে—তাই না?'

দেবারতি হেসে ফেলল, 'না, ঘটেনি। এম. পি.টিকে তাঁর পার্টি কড়া ওয়ার্নিং দিয়ে এবারের মতো ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'কী?'

'আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর।'

রাকেশ হাসলেন। দেবারতির কথার উত্তর না দিয়ে মজা করে বললেন, 'আপনি খুবই বিপজ্জনক মহিলা। একটি রিপোর্টে পার্লামেন্টের একজন মহামান্য মেম্বারকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিলেন।'

দেবারতি হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রাকেশ এবার বললেন, 'অনিল পারেখ, উর্মিলা পদ্মনাভন, মধুরা ভিমানি, উত্তম মিত্র, নির্মল জানা—এঁরা তো আপনাদের কাগজের স্টাফ—'

'হ্যাঁ।'

'দে আর ব্রিলিয়ান্ট জার্নালিস্টস। আপনারা সবাই মিলে সারা দেশের নার্ভ ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন। ইনটেলিজেন্স আর সি. বি. আই.-এর লোকেরা অনেক সময় যা পারে না, আপনারা তা-ই করছেন। ইট'স আ গ্রেট সারভিস টু দা নেশান। আপনি আমার অভিনন্দন নেবেন, আমার হয়ে আপনার কলীগদেরও জানিয়ে দেবেন।'

অচেনা এই ভদ্রলোকটিকে বেশ ভালো লাগছিল দেবারতির। সে বলল, 'নিশ্চয়ই জানাবো। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আজকাল অনেক বিজনেসম্যান আর পলিটিক্যাল লীডারেরই প্রাইভেট গুণ্ডা-বাহিনী রয়েছে। তাদের কাউকে কাউকে যেভাবে আপনারা এক্সপোজ করছেন তাতে ভীষণ ঝুঁকি থাকে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। আমার এক কলীগ নির্মল জানা কয়েক মাস আগে আননোন ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে এমন মার খেয়েছিল যে, অনেক দিন তাকে বেড-রিডন হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে।'

'কী করেছিলেন মিস্টার জানা?'

'পোর্টের স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করেছিল। নির্মল দেখিয়েছিল এর পেছনে একজন অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লীডার রয়েছেন। ওটা বেরুবার পরই অফিস থেকে রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পথে ও প্রচণ্ড মার খায়।'

রাকেশকে খুবই চিন্তিত এবং বিষণ্ণ দেখায়। তিনি বলেন, 'অনেস্টলি আর সীরিয়াসলি আজকাল কিছু করতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। দেশ কোন দিকে চলেছে ভাবতে গেলে আতঙ্ক হয়।'

আস্তে মাথা নাড়ে দেবারতি। এক কাপ করে চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'আমি আরেকটু চা খাব। আপনাকেও দিই?'

এই স্মার্ট ঝকঝকে মেয়েটার সঙ্গ, তার অসঙ্কোচ ব্যবহার এবং কথা বলার সাবলীল ভঙ্গি রাকেশকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বললেন, 'আমার আপত্তি নেই।'

রোদের রং ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ডানায় বাতাস চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। হাওয়াটা এখন অনেক বেশি ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক। দিন যত ফুরিয়ে আসছে ততই এখানকার নির্জনতা আরো গাঢ় হচ্ছে।

এর মধ্যে একবার এসে অবোধনারায়ণ রাকেশকে জিজ্ঞেস করে গেল, তাঁর কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে কী না। দেবারতি কাছে থাকায় তাকেও একই প্রশ্ন করল। দু'জনেই জানালো তাদের অসুবিধার কোনো কারণ ঘটেনি। বরং এখানকার, বিশেষ করে অবোধনারায়ণের আদর-যত্নে তারা যথেষ্ট আরামেই আছে।

অবোধনারায়ণের মুখ খুশিতে তেলতেলে দেখায়। তোষামুদির ঢঙে আরো কিছুক্ষণ বকর বকর করে একসময় সে চলে যায়।

দু'জনের দ্বিতীয় কাপটিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। হঠাৎ রাকেশ বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন না? অবশ্য উত্তর দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে।'

দেবারতি সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, আপনার মতো ভদ্রলোক এমন কিছু বলবেন না যা আপত্তিকর। কী জানতে চান বলুন-না—'

মেয়েটি যে অসাধারণ বুদ্ধিমতী, সে ব্যাপারে রাকেশের এতটুকু সংশয় নেই। তাঁর কোনোরকম ক্ষোভের কারণ না ঘটিয়ে দেবারতি বুঝিয়ে দিয়েছে, ভদ্রতার মাত্রা বজায় রেখে তিনি যতদূর খুশি এগুতে পারেন।

রাকেশ একটু ভেবে বললেন, 'আপনি কি এখানে কোনো অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় দেবারতি, 'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, এখান থেকে পাঁচ ছ' মাইল দূরে ক'টা গ্রামে মাস-কীলিং হয়েছে। পুলিশ-রিপোর্ট বলছে সবসুদ্ধ আঠার জনকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে এই রিপোর্টটা অনেক কিছু চেপে গেছে। আসলে মারা গেছে মিনিমাম সত্তর-আশি

জন। পুলিশও নাকি এই হত্যাকারীদের দলে রয়েছে, সরাসরি না থাকলেও তাদের এ ব্যাপারে পরিষ্কার মদত রয়েছে। আমি সেই ব্যাপারেই একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করতে এসেছি। দেশের মানুষকে জানানো দরকার একটা স্বাধীন কান্ট্রিতে এরকম মীডিয়াভেল বর্বরতার কারণটা কী, কারা এর পেছনে আছে, কী তাদের মোটিভ।'

রাকেশ চমকে ওঠেন। তিনিও প্রায় একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। হাতে চায়ের কাপ ছিল। সামনের টেবলে সেটা নামিয়ে দেবারতিকে এমনভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন যাতে সে টের না পায়। হঠাৎ এই মেয়েটি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় অনেকখানি বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে গভীর উৎকণ্ঠাও বোধ করতে থাকেন। কেননা ধারাবনী বারহৌলি বা মধিপুরায় যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার পেছনে কারা আছে অথবা থাকতে পারে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আছে রাকেশের। এই লোকগুলো অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, প্রচুর তাদের জনবল এবং অর্থবল। স্বাধীনতার আটত্রিশ বছর পরেও তারা এখানে মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের কোনো ধারাকেই তারা তোয়াক্কা করে না। এখানে তাদের নিজস্ব কানুন, নিজস্ব জঙ্গলের রাজত্ব। এদের পায়ের তলায় চুরমার হয়ে গেছে দেশের আইন, প্রশাসন, লোকসভা, বিধানসভা—সমস্ত কিছু।

হিংস্র বন্য জন্তুদের চেয়েও মারাত্মক মানুষগুলোর আসল চেহারা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিতে হলে চাই দুর্জয় সাহস। সেটা অবশ্য দেবারতির আছে। কিন্তু হাজার হোক, সে একটি মেয়ে। যেখানে প্রশাসন-ট্রশাসন বলে প্রায় কিছুই নেই সেখানে একটি সুন্দরী তরুণীর নিরাপত্তা কোথায়? গায়ে আঁচড় পড়লে ওরা কিছুতেই দেবারতিকে ছেড়ে দেবে না। তা' ছাড়া যুবতী বলে তার বিপদটা পুরুষদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।

রাকেশ উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'কিন্তু একা একা, আই মীন—যারা ওভাবে মানুষ খুন করতে পারে তারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—সেখানে এভাবে যাওয়াটা একেবারেই সেফ নয়। খুব কাছাকাছি থানা-টানাও নেই যে—'

'থাকলেও বিশেষ লাভ হ'ত না।' দেবারতি বলতে লাগল, 'আমি একা এসেছি বলে ভাবছেন? এসব ব্যাপারে খানিকটা রিস্ক তো থেকেই যায়। সমস্ত জেনেশুনেই আমি এসেছি। আমি ওই লোকগুলোকে জেলখানার দিকে ঠেলে দেব আর ওরা আমার গায়ে টোকাটি মারবে না, তা-ই কখনও হয়?'

মেয়েটির আদৌ ভয়টয় আছে বলে মনে হয় না। নিজের কাজের পরিণতি কী হতে পারে সে সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, হাজার বার সাবধান করে দিলেও সে শুনবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে হয়তো

জানে না, ওই লোকগুলো না পারে এমন কাজ নেই। খুন, জখম, দাঙ্গা, ঘরে আগুন লাগানো থেকে লাশ গুম করা এবং ধর্ষণ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যাপারেই তাদের হাত এতটুকু কাঁপে না। তেমন বুঝলে দেবারতিকে শেষ করে দিয়ে মাটির তলায় এমনভাবে পুঁতে ফেলবে যে পৃথিবীর সেরা গোয়েন্দার দলও তার চুলের একটা টুকরোর খোঁজও কোনো দিন পাবে না।

দেবারতি আবার বলল, 'আই নো হাউ টু প্রোটেক্ট মাইসেলফ। তা' ছাড়া যতটা ট্যাক্টফুল আর কেয়ারফুল থাকা দরকার আমি তা থাকব। তারপর দেখা যাক।'

রাকেশ উত্তর দিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে কখন যে পশ্চিম আকাশের ঢালু গা বেয়ে সূর্য ওদিকের নিবিড় গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে, কেউ লক্ষ্য করেনি। সমস্ত চরাচর জুড়ে ঝাপসা অন্ধকার নেমে আসছে। লছমন বা অন্য কেউ জেনারেটর চালিয়ে ঘরে ঘরে, লাউঞ্জে এবং বাগানের রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে আলোর তেজ খুবই কম, টিম টিম করে বাল্‌বগুলো জ্বলছে।

দেবারতি বলল, 'আজ সকালে এখানে এসে স্যুটকেশ-টুটকেশ রেখে, চা খেয়ে ধারাবনীতে গিয়েছিলাম। অবশ্য অন্য গ্রামগুলোতে যাওয়া হয়নি।'

রাকেশ চমকে উঠলেন, 'আই সী। কিছুক্ষণ আগে তা হলে সেখান থেকেই ফিরে এলেন?'

'হ্যাঁ।'

প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল রাকেশের। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে গিয়ে কিছু কাজ হ'ল?'

দেবারতি বলল, 'না। কাজের জন্যে যাইনি। আজ শুধু গ্রামটা দেখেই ফিরে এসেছি। কাল সমস্ত রাত ট্রেন জার্নি করে পূর্ণিয়া এসেছি, সেখান থেকে আজ সকালে এখানে পৌঁছেছি। আই ওয়াজ অ-ফুলি টায়ার্ড। আজ রাতটা ভালো করে ঘুমিয়ে একেবারে কাল থেকে শুরু করব। ভাবছি কাল ভোরে উঠেই ওই গ্রামগুলোতে চলে যাব।' বলতে বলতে একটু থামে দেবারতি। পরক্ষণেই ফের শুরু করে, 'আমার কথা তো বললাম। আপনি কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেননি।' বলে সামান্য হাসল।

ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে গেলেন রাকেশ। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন সেটা জানাজানি হোক, কোনোমতেই তিনি তা চান না। সাংবাদিকের কানে কোনো কিছু যাওয়া মানেই মুহূর্তে সারা দেশ তা জেনে যাবে। এই প্রচারটা

রাকেশের পক্ষে একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি এক-রকম লুকিয়ে এখানে চলে এসেছেন। গোপনে নিজের কাজটি চুকিয়ে ফিরে যেতে চান। এর মধ্যে খবরের কাগজে যদি তাঁর কথা বেরিয়ে পড়ে, চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে। সেটা তাঁর কেরিয়ারের পক্ষে মোটেই ভালো না, বরং ক্ষতিকর। এবং যে-কারণে তাঁর এখানে আসা তারও কোনো সুরাহা হবে না।

রাকেশ বললেন, 'আমি গভর্নমেণ্ট এমপ্লয়ী।'

তাঁর সম্পর্কেও দেবারতির ঔৎসুক্য রয়েছে। সে সরাসরি কিছু না বলে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বোধ হয় সরকারি কাজে এখানে এসেছেন।'

মিথ্যে বলার অভ্যাস একেবারেই নেই রাকেশের। আবার স্পষ্ট করে সত্যটাও বলা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 'তা একরকম বলতে পারেন। তবে আমার ব্যক্তিগত কিছু দরকারও এখানে রয়েছে।'

এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করল না দেবারতি। এলোমেলো আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ এক সময় উঠে পড়ল সে। 'ঘামে-ধুলোয় শরীর চটচট করছে। এখন স্নান করতে না পারলে মরে যাব। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগল। আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে।'

দেবারতি উত্তর দিকের একটা ঘরে চলে গেল। তারপরও একা একা আরো খানিকক্ষণ লাউঞ্জে বসে রইলেন রাকেশ। একসময় উঠে লাউঞ্জের আরেক ধারে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'লছমন—লছমন—'

লছমন কাছাকাছি কোথাও ছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এলো, 'জি সাহাব—'

রাকেশ বললেন, 'আমি আমার কামরায় যাচ্ছি। অবোধনারায়ণজিকে একবার আসতে বল।'

'জি।'

রাকেশ তাঁর ঘরে গিয়ে বসতে না বসতেই অবোধনারায়ণ চৌবে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এলো। বলল, 'আমাকে ডেকেছেন স্যার?'

'হ্যাঁ। বসুন—' রাকেশ একটা সোফা দেখিয়ে দিলেন।

অবোধনারায়ণ কিছুতেই রাকেশের সামনে বসবে না। শেষ পর্যন্ত অনেক বলার পর সোফার কোণে জড়সড় হয়ে বসল।

রাকেশ বললেন, 'আমার একটা উপকার করতে হবে চৌবেজি।'

শশব্যস্তে অবোধনারায়ণ বলে উঠল, 'উপকার কী বলছেন স্যার, হুকুম কীজিয়ে—'

লোকটার অতিরিক্ত বিনয়ে সামান্য হাসেন রাকেশ। বলেন, 'আমি কাল ভোরে ধারাবনী যাব। একটা রিকশার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

রাকেশের কথার শেষাংশটা শোনার আগেই অবোধনারায়ণ চাপা গলায় বলল, 'কহাঁ !' তার কানে ধারাবনীর নামটা প্রায় অবিশ্বাস্যই ঠেকেছে।

রাকেশ দ্বিতীয় বার বললেন, 'ধারাবনী। কেন ?'

বিস্ময়ে এবং অদ্ভুত ভয়ে চোখ দুটো একেবারে গোলাকার হয়ে যায় অবোধনারায়ণের। দু-দু'বার শোনার পরও ব্যাপারটা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অভাবনীয় মনে হয়। অবোধনারায়ণ বলে, 'আপ কহাঁ যায়েঙ্গে ?'

রাকেশ মনে মনে একটু বিরক্ত হন। তবে বাইরে তা ফুটে উঠতে দেন না। বলেন, 'বললাম তো, ধারাবনী যাব।'

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে অবোধনারায়ণ। তাদের ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারির বন্ধু এই মান্যগণ্য বিশিষ্ট মানুষটি যে ধারাবনী যাবার সঙ্কল্প নিয়েই এখানে এসেছেন এটা তার কাছে অকল্পনীয়। কিছুক্ষণ পর ঢোক গিলে অবোধনারায়ণ বলল, 'লেকেন স্যার—'

'বলুন—'

'ধারাবনীতে যাবার মতো রিকশা পাওয়া যাবে না। তা' ছাড়া—'

'তা' ছাড়া ?'

'আপনার মতো বড়ে আদমীরা ওখানে যান না।'

'কেন ?'

চায়ের দোকানদার যে সব কারণ খাড়া করে ধারাবনীতে রাকেশের যাওয়া ঠেকাতে চেয়েছিল, হুবহু সেই কথাগুলিই বলে যায় অবোধনারায়ণ। অর্থাৎ তারও একেবারেই ইচ্ছে নয়, রাকেশ ওখানে যান।

রাকেশ বললেন, 'ধারাবনী বারহৌলি আর মধিপুরায় যাবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি।'

অবোধনারায়ণ প্রথমটা উত্তর দিল না, স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কী মনে পড়তে বলল, 'দেবারতিজিও ওই গাঁওগুলোতে যাবার জন্যে এখানে এসেছেন।'

খবরটা রাকেশের কাছে নতুন নয়। খানিকটা আগেই দেবারতির সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি শুধু বললেন, 'ও।' তারপর একটু ভেবে এভাবে শুরু করলেন, 'অবোধনারায়ণজি, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন ধারাবনী বারহৌলি আর মধিপুরাতে অনেক লোক খুন হয়েছে।'

মুখচোখ দেখে মনে হ'ল, হঠাৎ ভীষণ ঘাবড়ে গেছে অবোধনারায়ণ। গল গল করে ঘামতে ঘামতে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলল, 'শুনেছি। কারা যেন বলছিল—'

এরপর অবধারিত নিয়মে যে প্রশ্নগুলো উঠবে তা এড়াবার জন্যই হঠাৎ দ্রুত উঠে দাঁড়ায় অবোধনারায়ণ। বলে, 'স্যার, হরিণের মাংস পাওয়া গেছে। চৌকিদারটা রসুই করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে। যাই, একটু দেখিয়ে দিই।'

অবোধনারায়ণ যে একজন ঝানু রসোইয়া বা রঁাধিয়ে, কে জানত। তার সরে পড়ার কারণ বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগে না। রাকেশ বললেন, 'হরিণের মাংস এক ঘণ্টা পর রসুই করলেও চলবে। আপনি বসুন।'

নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ফের বসে পড়তে হয় অবোধনারায়ণকে।

রাকেশ বললেন, 'কারা খুনগুলো করেছে বা করিয়েছে, আপনার ধারণা আছে?'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল অবোধনারায়ণের। কোনো রকমে বলল, 'না স্যার, আমি কী করে জানব? ঐ গাঁওগুলো এখান থেকে কমসে কম পাঁচ-সাত মাইল দূরে। তিন সাল এই বাংলোর চার্জে এসেছি। এর ভেতর একবারও ওদিকে যাইনি। লোকে কিছু বললে শুনি, না হলে আমার পক্ষে কিছু জানা সম্ভব না। আর লোকে যা বলে তার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তা-ই বা বুঝব কী করে? আমি তো বাংলো ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। নিজের চাকরি ফেলে ওসব ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার মানে হয়?'

অবোধনারায়ণ শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে এরপর যা বলে তা এইরকম। তার কাজ হ'ল, বড়ো বড়ো শহর থেকে রাকেশের মতো ভি. আই. পি.'রা এলে তাঁদের হুকুম তামিল করা, তাঁদের খাতিরদারিতে যাতে কোনোরকম ত্রুটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অন্য কোনো দিকে নজর দিয়ে সে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না।

রাকেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই খুনীদের সম্পর্কে আপনার কানে কিছু আসেনি?'

অবোধনারায়ণ হকচকিয়ে গেল। মুখ নামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড কী ভাবল। তারপর বলল, 'না। তেমন কিছু তো—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

রাকেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, লোকটা ডাহা মিথ্যে বলছে। ওর পেট থেকে জরুরি কোনো কথাই হয়তো বার করা যাবে না। রাকেশ তবু বললেন, 'এম. এল. এ. ত্রিলোকী সিংকে নিশ্চয়ই চেনেন—'

চকিতে মুখ তুলে আবার নামিয়ে নিল অবোধনারায়ণ। মিনমিনে গলায় বলল, 'না, তেমন করে ঠিক চিনি না। মনে হচ্ছে দু-একবার দেখেছি।'

'আমার কাছে খবর আছে ত্রিলোকী সিং প্রায়ই এই বাংলোতে দলবল নিয়ে আসেন। দু-একবার না, অনেক বারই তাঁকে দেখেছেন—তাই না?'

অবোধনারায়ণ চমকে ওঠে। হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে বলে, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। লেকেন সিংজি বহুত বড়ে আদমী। আমাদের মতো ছোটো সরকারি নৌকরের সঙ্গে কথাই বলেন না।'

রাকেশ আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ত্রিলোকী সিংয়ের কথা থাক। বড়ো জমিমালিক গিরিলাল ঝাকে কখনো দেখেছেন?'

'নেহী তো।'

লোকটা এবারও যে সত্যি বলছে না তা তার মুখ দেখে টের পাওয়া যায়। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা করেছে গলার ভেতর থেকে মিথ্যে ছাড়া আর কিছু বের করবে না, তার ওপর জোর করে লাভ নেই। দেখতে হবে কৌশলে কিছু জানা যায় কিনা।

রাকেশ বললেন, 'ওঁর নামও শোনেননি!'

'হাঁ হাঁ, শুনা তো হ্যায়।' অবোধনারায়ণ বলতে লাগল, 'এখানকার এত বড়ো আদমী গিরিলালজি, এত জমি তাঁর! লগভগ চার-পাঁচ শো একর খেতিউতি তো আছেই। তাঁর নাম শুনব না?'

'ওঁর বাড়িটা কোথায়?'

'বারহৌলি গাঁওয়ে।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। কাল ভোরে আমি বেরুব। আমার জন্যে যদি কিছু শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করে দেন, ভালো হয়। সঙ্গে নিয়ে যাব। ওই গাঁগুলোতে কী জুটবে না জুটবে, কে জানে।'

'কোঈ ভরোসা নেহী উঁহা।' অবোধনারায়ণ বলতে থাকে, 'খাবার রেডি থাকবে স্যার। এখন হুকুম হলে যেতে পারি।'

রাকেশ বলেন, 'আসুন।'

অবোধনারায়ণ এক মুহূর্তও আর বসে না, স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠেই দ্রুত রাকেশের কামরা থেকে পালিয়ে যায়। আসলে ধারাবনী বারহৌলি ইত্যাদি গাঁ, বড়ো জমিমালিক গিরিলাল ঝা বা এম. এল. এ. ত্রিলোকী সিং সম্পর্কে মুখ খুলতে সে রাজী না। কিন্তু রাকেশের কাছে বসে থাকলে এই সব প্রসঙ্গ ক্রমাগত উঠবে বলেই তার ধারণা। সেটা অবোধনারায়ণের পক্ষে ভীষণ অস্বস্তিকর। কাজেই পালাতে পেরে সে বেঁচে যায়।

চার

পরদিন রাত থাকতে থাকতেই উঠে পড়েন রাকেশ। বাইরে এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে।

একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দ্রুত মুখটুখ ধুয়ে নিয়ে শস্তা কটনের ট্রাউজার্স, শার্ট আর কেডস পরে নেন রাকেশ। এই নিতান্ত সাদামাটা পোশাকে গ্রামগুলোতে যাওয়ার কারণটা এইরকম। এখানকার মানুষজন যেন না ভাবে ওঁর সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা ভয়ানক রকমের বেশি। পোশাক-আশাক এবং চালচলনে তফাত বেশি হলে ওরা শামুকের মতো শক্ত খোলার ভেতর নিজেদের গুটিয়ে রাখবে, কিছুতেই প্রাণ খুলে কথা বলবে না। যে উদ্দেশ্যে রাকেশের এতদূরে ছুটে আসা তা পুরো-পুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রাকেশ এবার স্যুটকেশ খুলে একটা মোটা কাপড়ের হ্যাট এবং একটা নোটবই বের করলেন। বিহারের এই অঞ্চলে চৈত্র মাসের দুপুরে যখন আকাশ থেকে গনগনে আগুন ঝরতে থাকে সেই সময় মাথা বাঁচাবার জন্য হ্যাটটা খুবই জরুরি।

এরপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাকেশ সবে চিরুনি দিয়ে চুলটা ঠিক করে নিচ্ছেন, বন্ধ দরজার বাইরে থেকে অবোধনারায়ণের গলা ভেসে এলো, 'স্যার, চা এনেছি।'

নাঃ, লোকটা দেখা যাচ্ছে বেশ করিৎকর্মা, এবং কর্তব্যপরায়ণও। সব দিকে তার নজর আছে। অন্তত তাঁর ব্যাপারে। রাকেশ মোটামুটি খুশিই হলেন। বললেন, 'এক মিনিট।' দ্রুত চুল আঁচড়ানো শেষ করে দরজা খুলে দিলেন, 'আসুন।'

একা অবোধনারায়ণই না, তার সঙ্গে চায়ের ট্রে হাতে লছমনও ভেতরে ঢুকে পড়ল। ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম ছাড়াও প্লেটে দামী নোনতা বিস্কুট এবং ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা মাঝারি প্যাকেট রয়েছে।

রাকেশ একটু অবাক হয়েই বললেন, 'এর ভেতর চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন!'

নিজের হাতে টেবলে চায়ের কাপ এবং বিস্কুটের প্লেটটা সাজিয়ে দিতে দিতে অবোধনারায়ণ বলে, 'স্যার, আপনি অতদূর যাবেন, একটু চা যদি না খাইয়ে দিতে পারি বড়ো খারাপ লাগবে। তাই রাত্তিরে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। আপনার কামরায় যেই বিজলী জ্বলল, লছমনের ঘুম ভাঙিয়ে চা করতে বললাম।'

'মেনি থ্যাঙ্কস।'

অবোধনারায়ণ বিগলিত একটু হেসে ট্রেতে ব্রাউন পেপারের প্যাকেটটা দেখিয়ে এবার বলে, 'এটাতে পরোটা, ভাজি আর কয়েকটা প্যাঁড়া আছে স্যার। এই ভোরে এর বেশি আর কিছু দিতে পারলাম না।' তার মুখটা কাচুমাচু দেখায়।

'যথেষ্ট।'

চা খেয়ে একটা কাপড়ের ব্যাগে নোটবই, পেন আর খাবারের প্যাকেটটা পুরে কামরার বাইরে বিরাট লাউঞ্জটায় চলে এলেন রাকেশ এবং নিজের অজান্তেই যেন কোনো স্বয়ংক্রিয় নিয়মে তাঁর চোখ ওধারের আরেকটি কামরায় গিয়ে পড়ল।

পাশাপাশি আসতে আসতে অবোধনারায়ণ লক্ষ্য করেছিল। সে তাঁর মনোভাবটা আন্দাজ করে বলে, 'দেবারতিজি অনেক আগেই চলে গেছেন।'

চমকে মুখ ফেরান রাকেশ, 'কোথায়?'

'ওই দেহাতগুলোতে, যেখানে আপনি যাচ্ছেন।'

দেবারতি যে তাঁরও আগে উঠে ধারাবনী বারহৌলির দিকে চলে যাবে, এটা ভাবতে পারেননি রাকেশ। তিনি এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে এগিয়ে যান।

চলতে চলতে অবোধনারায়ণ বলে, 'ভোর চারটের সময় দেবারতিজি চলে গেছেন। ওঁকে চা খাইয়ে তারপর আপনার চা নিয়ে গিয়েছিলাম।'

আধফোটা গলায় রাকেশ বলেন, 'ও।'

একটু ভেবে অবোধনারায়ণ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'কখন ফিরবেন স্যার?'

'বলতে পারছি না। কতক্ষণে ওখানকার কাজ মিটবে, তার ওপর ফেরাটা নির্ভর করছে।'

'দুপুরে ভোজনের ব্যওস্থা করে রাখব?'

'রাখতে পারেন।'

কথায় কথায় ওঁরা গেট পর্যন্ত চলে এসেছিলেন। অবোধনারায়ণ নিজের হাতে গেটটা খুলে দিল। রাকেশ বাইরের রাস্তায় চলে গেলেন, তারপর সোজা হাঁটতে শুরু করলেন।

অবোধনারায়ণ আস্তে আস্তে গেটটা বন্ধ করে বাংলোর দিকে ফিরে চলল।

এবার রাকেশ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। অবশ্য রাকেশের কথা উঠলে অনিবার্য নিয়মে যাঁদের কথা এসে পড়বে তাঁরা তাঁর বাবা রাজেশ্বর সহায় এবং মা চন্দ্রলেখা সহায়। এই দু'জনকে না জানলে রাকেশকে বুঝতে অসুবিধা হবে।

রাজেশ্বর ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অসমসাহসী যোদ্ধা। অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে বেয়াল্লিশের 'আগস্ট আন্দোলন' পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলে

বিহারের পূর্ণিয়া সাহারসা অঞ্চলে যা যা ঘটেছে, সব কিছুর নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজেশ্বর। জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ তাঁর জেলের মধ্যেই কেটে গেছে।

আগস্ট আন্দোলনের সময় রাজেশ্বরকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, মুক্তি পান স্বাধীনতার পর। কিন্তু কারাগারের বাইরে স্বাধীন ভারতবর্ষে দু'বছর কাটতে না কাটতেই তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে যায়। যাঁরা একদিন দেশের মুক্তির জন্য জীবনকে বাজি ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, প্রতিদিন ঘোষণা করেছে শুদ্ধ গ্লানিহীন নতুন ভারতবর্ষ তৈরির শপথ, সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের পর তারাই ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। আদর্শবাদ নামে বস্তুটা বহুদূরের অলীক স্বপ্নের মতো ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে থাকে।

আইডিয়ালিস্ট ত্যাগব্রতী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের যুগ শেষ হয়ে যেতে শুরু করে। তাদের জায়গায় দেখা দিল পোস্ট-ইণ্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী কালের দেশপ্রেমিকরা—যাদের দেশ সম্পর্কে স্পষ্ট বা ব্যাপক কোনো ধারণাই নেই, স্বাধীনতার জন্য এক কানাকড়ি দামও এরা দেয়নি, একটা দিনও জেল খাটেনি, এদের চামড়ায় লাগেনি এতটুকু আঁচ। এই নতুন ক্লাসের পেট্রিয়ট-দের হাত ধরে উঠে এলো কনট্রাক্টররা, কালোবাজারীরা এবং ঘুষখোরের পাল। কনট্রাক্ট, টেণ্ডার, কালো টাকা, ঘুষ—সব মিলিয়ে দেশের বাতাস দূষিত হয়ে যেতে লাগল। তৈরি হ'ল রাজনীতিকদের সঙ্গে কনট্রাক্টর, ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার এবং অসৎ বিজনেসম্যানের আনহোলি অ্যালায়েন্স, খবরের কাগজের ভাষায় অশুভ আঁতাত। সততা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে দেশের সীমানার বাইরে বের করে দেওয়া হ'ল।

স্বাধীনতার পর পার্লামেন্টে কত কিছুই তো ঘটে গেল। পাশ করা হল জমিদারি অ্যাবোলিশন বিল, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষগুলিকে রক্ষা করার জন্য বানানো হ'ল গণ্ডা গণ্ডা আইন। কিন্তু সে-সব শুধু কথার কথা। পার্লামেণ্ট থেকে দেশের গ্রামগুলোর দূরত্ব মাইল বা কিলোমিটারের মাপে তেমন কিছু না, কিন্তু মানসিকতায় কয়েক কোটি মাইল তফাতে। জমিদারি বিলোপের পরও সেখানে ফিউডাল সিস্টেম জাঁকিয়ে রাজত্ব করছে। আইনের চোখে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার কিন্তু আসল চিত্রটা একেবারে আলাদা। একটার পর একটা পাঁচ-সালা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা অস্বাভাবিক বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে জাতপাতের সমস্যা। ভূমিহীন মানুষ এবং বেগার খাটিয়েরা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে।

এই আবহাওয়ায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল রাজেশ্বরের। ধীরে ধীরে রাজনীতি

থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে লাগলেন তিনি। রাজেশ্বর একাই নন, তাঁর মতো আরো অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা হতাশায় ক্লান্তিতে এবং অপরিসীম কষ্টে ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষ হয়ে গেলেন। সুদূর অতীতের বিলুপ্ত বিশাল ডাইনোসরদের মতো তাঁরা শুধু ইতিহাসের পাতাতেই কোনোরকমে টিকে থাকবেন। এই একগুঁয়ে সৎ নির্যাতিত আদর্শবাদী মানুষগুলোর জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষে মাথা তুলে বেঁচে থাকার মতো এক ইঞ্চি জায়গা বোধহয় কোথাও নেই।

রাজেশ্বর এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর বয়স সত্তর-বাহাত্তর। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য পেনসনের যে ব্যবস্থা আছে সেটা তাঁকে দেবার প্রস্তাব এসেছিল, এসেছিল তাম্রপত্র গ্রহণ করার অনুরোধ। এতে তিনি খুবই উত্তেজিত হন। বলেন, 'শেষ বয়েসে মাসোহারা পাবার জন্যে ইংরেজদের জেল খাটিনি।'

বেশ কয়েক বছর বাড়ি থেকে বেরোন না রাজেশ্বর। খবরের কাগজ এবং বই ছাড়া তাঁর সঙ্গী বলতে মনিহারিতে তাঁদের বাড়ির বাগানের ফুল এবং ফলের গাছগুলি, কিছু পাখি আর তাঁদের পাড়ার কিছু কিছু শিশু। বিকেলে এই বাচ্চা-গুলো রাজেশ্বরের কাছে আসে, ঘণ্টা দুয়েক সময় নিষ্পাপ আনন্দে এবং মাধুর্যে ভরে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে যায়।

রাকেশের মা চন্দ্রলেখা তাঁর স্বামীর হুবহু কার্বন কপি। শক্ত গড়নের এই মানুষটির চোখেমুখে স্বর্গের সারল্য। সর্বক্ষণ তাঁর ঠোঁটে চোখে চিবুকে স্নিগ্ধ একটু হাসি লেগেই আছে। কখনও কোনো কারণেই তিনি উত্তেজিত হন না, উঁচু গলায় কারো সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেন না। তাঁর এই স্নিগ্ধতা এবং মৃদু স্বভাবের মধ্যেও রয়েছে অনমনীয় এক ব্যক্তিত্ব।

রাজেশ্বরের সঙ্গে কখনও কোনো ব্যাপারেই তাঁর মতের অমিল ঘটেনি। স্বামীর প্রতিটি কথায় এবং কাজে চন্দ্রলেখার নিঃশর্ত সায়। দেশের শৃঙ্খল মুক্তির কারণে রাজেশ্বর যে আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন সে জন্য তিনি অত্যন্ত গর্বিত। স্বামী যখন জেলে গেছেন তখন একা ঘর সংসার সামলেছেন চন্দ্রলেখা, ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন, জেলে গিয়ে নিয়মিত রাজেশ্বরের সঙ্গে দেখা করেছেন। এরই মধ্যে চাকরিবাকরি নিয়ে রোজগারও করতে হয়েছে তাঁকে।

স্বাধীনতার আগে সেই অস্থির উত্তাল সময়ে তাঁদের সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা বলতে আদৌ কিছু ছিল না। দেহাতে কয়েক বিঘে পৈতৃক জমির ফসলের ওপর নির্ভর করে থাকতে হ'ত রাকেশদের। রাজেশ্বর যৌবনের প্রথম দিকে ছোটোখাটো কিছু কাজ করেছেন, তারপর জীবনের সেরা অংশটা তো জেলের মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছেন। শুধু জমির ফসল দিয়েই দিন কাটে না, কিছু নগদ টাকারও দরকার

হয়। চন্দ্রলেখা সে-আমলের ম্যাট্রিকুলেট। একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ানোর কাজ নিতে হয়েছিল তাঁকে।

দেশের জন্য লড়াই করেছেন রাজেশ্বর, আর সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে চন্দ্রলেখাকে। দুই ফ্রন্টে সমান্তরাল রেখায় চলেছে দু'জনের আজীবন সংগ্রাম। সকল দিক থেকেই চন্দ্রলেখা তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী।

এই সৎ নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী মা-বাবাই রাকেশের জীবনের মডেল। এঁদের আদর্শেই আশৈশব নিজের সমস্ত কিছু গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তিনি।

দারুণ ছাত্র ছিলেন রাকেশ। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম. এ. পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই তাঁর রেজাল্ট চমৎকার। এম. এ.-র পর প্রভিন্সিয়াল সিভিল সারভিসের পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়ে নানা ডিপার্টমেণ্টে কাজ করার পর এখন তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি চাকরি পেয়েই মাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। এখন আর্থিক দিক থেকে তাঁদের সংসারে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

রাকেশরা এক বোন, এক ভাই। বোন সরযূ তাঁর চেয়ে বছর তিনেকের ছোটো। ইকনমিকসে এম. এ.-তে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল সরযূ। তারপর রীসার্চ করতে করতে বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী মণীশও দুর্দান্ত স্কলার। সরযূরা এখন রয়েছে দিল্লীতে। দু'জনেই ওখানকার ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। ওদের আড়াই বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে।

রাকেশ এখনও অবিবাহিত। মা-বাবা অনবরত তাড়া দিচ্ছেন কিন্তু 'এ বছর না ও বছর, যাক না আর কিছুদিন'—এই করে করে বিয়েটা এখনও হয়ে ওঠেনি।

রাকেশ ম্যাজিস্ট্রেট হবার পর রাজেশ্বর তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। দেশ জুড়ে সব দিকেই শুরু হয়ে গেছে ভ্যালুজ বা মূল্যবোধের ক্ষয়। যে দিকে তাকানো যাক সেখানেই ভ্রষ্টাচার। এক দল পলিটিসিয়ান জুডিসিয়ারিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। আজকাল নাকি টাকার জোরে কিংবা নিছক ভয় দেখিয়ে আদালতে অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া যায়। বিচার বিভাগের পবিত্রতা যাতে অটুট থাকে সেদিকে ছেলেকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন রাজেশ্বর। কোনো কারণেই রাকেশ যেন অন্যায়ের কাছে মাথা নুইয়ে না দেন। এখন পর্যন্ত বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছেন রাকেশ। কড়া বিচারক হিসাবে একদিকে তাঁর সুনাম যেমন বেড়েছে তেমনি তাঁর জন্য অনেকের চোখ থেকে রাতের ঘুম ছুটে গেছে। এর মধ্যেই প্রচুর শত্রু তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। এরা যথেষ্টই প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান। তবে রাকেশ তাঁর বাবার মতোই প্রচণ্ড জেদী সাহসী এবং অনমনীয়। কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন না।

মাসখানেক আগে তাঁর কোর্টে একটা গণহত্যার কেস এসেছে। ধারাবনী বারহৌলি ইত্যাদি গ্রামে আঠারোটি মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছে। এরা সবাই অচ্ছুৎ, ভূমিহীন, বেগার খাটিয়ে। গরীবের চাইতে গরীব এই মানুষগুলো পৃথিবীর সব চাইতে নীচু স্তরে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর পাঁচটা লোককে ধরে হাজতে পোরা হয়েছে। তাদের জামিনের জন্য বড়ো জমিমালিক গিরিলাল ঝা'য়ের পক্ষ থেকে একজন বাঘা উকিলকে লাগানো হয়েছে। রাকেশ এখনও তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি। তবে বেশিদিন এদের আটকে রাখা যাবে না, জামিন দিতেই হবে।

এই কেসের চমকপ্রদ দিক হ'ল, কোনো সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রকাশ্য দিবালোকে স্বাধীন ভারতবর্ষে এত বিরাট একটা গণহত্যা ঘটে গেল, কিন্তু একটি মানুষও সাক্ষী দেবার জন্য এগিয়ে এলো না। অপরাধই যদি প্রমাণ করা না যায়, খুনীদের হাজতে আটকে রাখা অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত তারা বেকসুর খালাসও পেয়ে যাবে। কিন্তু বিচারক এবং দেশের বিবেকবান নাগরিক হিসেবে এটা তিনি কোনোভাবেই হতে দিতে পারেন না। পুলিশকে তিনি বার বার সাক্ষী যোগাড় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ প্রতি বারই সময় চেয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। বিনা বিচারে কতদিন আর জামিন নাকচ করা যায়! দিনদুপুরে এত বড়ো একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল অথচ কেউ তা দেখেনি তা তো আর হয় না। অথচ পুলিশ জানাচ্ছে সাক্ষী নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবিশ্বাস্য অসম্ভব কথা রাকেশ আগে কখনও শোনেননি। তিনি খবর পাচ্ছিলেন, ধারাবনী বারহৌলি ইত্যাদি গ্রামগুলোতে রেইন অফ টেরর অর্থাৎ সন্ত্রাসের রাজত্ব নাকি চলছে। বেশির ভাগ লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বাকি যারা আছে তারা ভয়ে মুখ খুলতে চাইছে না। তা' ছাড়া এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে, পুলিশ সাক্ষী প্রমাণের জন্য তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

রাকেশ এই অবস্থায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। একটা স্বাধীন দেশে এভাবে নির্বিচার হত্যা চলতে পারে এবং প্রাণের ভয়ে একজন লোকও সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবে না, এটা যতই ভাবছিলেন ততই দেশ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন।

অস্থির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাকেশ ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না, কী করা যায়। শেষ পর্যন্ত এক ছুটির দিনে মনিহারিতে গিয়ে রাজেশ্বরকে ধারাবনীর ঘটনাটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি আমাকে কী করতে বল?'

রাজেশ্বর বলেছেন, 'খুনীরা যাতে শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করবে। বিচারক

হিসেবে এটা তোমার একমাত্র ডিউটি। এত বড়ো জঘন্য অপরাধ করে কেউ পার পেয়ে যাবে তা হতে পারে না।'

'কিন্তু কোনো দিক থেকেই তো সাহায্য পাচ্ছি না। পুলিশ উইটনেস বা সলিড এভিডেন্স কিছুই এখন পর্যন্ত যোগাড় করে দেয়নি। তারা ইচ্ছে করেই মনে হয় ঢিলেমি দিচ্ছে। এভাবে চললে ক্রিমিনালরা সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলবে।'

'পুলিশের সাহায্য যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন তুমি নিজে ঐ গ্রামগুলোতে গিয়ে একবার দেখে এস।'

একজন বিচারকের পক্ষে এভাবে খুনের সাক্ষী এবং প্রমাণের খোঁজে বেরিয়ে পড়া অভাবনীয় ব্যাপার। অবধারিত নিয়মে এতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠবে। কিন্তু মা-বাবার কাছ থেকে সততা এবং আদর্শবাদের যে উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছেন তাতে মনে হয়েছে হত্যাকারীদের কোনোভাবেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত রাকেশ মনস্থির করে ফেলেছিলেন, ওই গ্রামগুলোতে নিশ্চয়ই যাবেন। এর ফলাফল যা-ই ঘটুক, তিনি পিছিয়ে যাবেন না। তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু এখন পি. ডব্লু. ডি.'র ডেপুটি সেক্রেটারি। তাঁকে পাটনায় ফোন করে দুধলিগঞ্জের বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। আসার সময় কাউকে কিছু জানাননি। সবার চোখের আড়ালে তাঁর এই গোপন অভিযান।

পাঁচ

পি. ডব্লু. ডি. বাংলো থেকে রাকেশ যখন বেরিয়েছিলেন, সমস্ত চরাচর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। কয়েক দিন আগে পূর্ণিমা গেছে। রুপোর থালার মতো গোল চাঁদটা ক্ষয়ে এখন ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। যে মলিন জ্যোৎস্নাটুকু চাঁদের গা থেকে চুঁইয়ে আসছে, অসীম বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবী পর্যন্ত তা পৌঁছুতে পারে নি। তবে আকাশে সফেদিয়া ফুলের মতো ফুটে আছে লক্ষকোটি তারা।

কাল বিকেলে দেবারতির সঙ্গে কথা বলে ধারাবনীর দিকের রাস্তা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়েছিল রাকেশের। তা' ছাড়া অবোধনারায়ণের কাছ থেকেও জানা গেছে কীভাবে, কোন দিক দিয়ে গেলে ওই গ্রামগুলোতে পৌঁছনো যাবে।

এধারে পাকা সড়ক বলতে কিছু নেই, সবই কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা মেঠো রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে চাঁদ ডুবে গেছে আর পুবের আকাশ যেখানে পিঠ

নুইয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানে বিরাট সোনালি বলের মতো সূর্য উঠতে শুরু করেছে, খেয়াল ছিল না।

কাচ্চীর দু'পাশেই এখন পড়তি কাঁকুড়ে জমি। এই সব জমিতে প্রচুর ঝোপ-ঝাড়, ফাঁকে ফাঁকে ট্যারাবাঁকা চেহারার অজস্র সিসম গাছ। দূরে দূরে ফাঁকা ফসলের খেত। রবিশস্য উঠে যাবার পর কোথাও কিছু নেই, শুধুই অন্তহীন শূন্যতা। খেতগুলোর গা ঘেঁসে মাঝে-মধ্যে দু-একটা করে হতচ্ছাড়া চেহারার গ্রাম চোখে পড়ে। গ্রাম আর কি, ফুটিফাটা টিন বা টালির চালের খানকতক ঘর গা জড়াজড়ি করে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো খানিকটা যাবার পর ডান দিকে মাইল খানেক জায়গা জুড়ে জঙ্গল, তার পাশ দিয়ে একটা মজা নহর চলে গেছে। জঙ্গলের মাথায় এই মুহূর্তে প্রচুর পাখি উড়ছে। ওখানে পরাস এবং সিমার গাছের ছড়াছড়ি। থোকা থোকা আগুনের মতো লাল ফুলে গাছগুলো ছেয়ে আছে।

এতটা রাস্তা যে রাকেশ এসেছেন, এখন পর্যন্ত একটা লোকও চোখে পড়েনি। জঙ্গলটা পেরুবার পর প্রথম মানুষজন দেখতে পেলেন। তাও খুব বেশি না, দু-চারজন। দেখেই বোঝা যায়, গরীব চাষাভূষো জাতীয় দেহাতি।

রাকেশ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ধারাবনী এখান থেকে কতদূর ?'

ধারাবনীর নাম শুনে লোকটা চমকে যায়। আগেও চায়ের দোকানদার এবং অবোধনারায়ণের মুখে এরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন রাকেশ।

লোকটা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো রাকেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সসম্ভ্রমে বলে, 'সিধা চলা যাইয়ে। হোগা ইধরসে পাঁচ ছে মিল।'

গেঁয়ো মানুষের দূরত্বের হিসেব যে ভয়ানক গোলমেলে তা অজানা নেই রাকেশের। তিনি আগেই শুনেছেন দুধলিগঞ্জ বাংলো থেকে ধারাবনী বারহৌলি ইত্যাদি গ্রামগুলো মাইল পাঁচেক তফাতে। কিন্তু ভোর রাত থেকে একটানা ঘণ্টা দুই হাঁটার পর জানা গেল, আরো চার পাঁচ মাইল তাঁকে যেতে হবে। হয়তো আরো দু ঘণ্টা পরও একই কথা শুনতে হবে। পাঁচ মাইল পথ যে কখন শেষ হবে এবং আদৌ শেষ হবে কিনা, কে জানে। দেহাতি লোকটাকে আর কোনো প্রশ্ন না করে আবার হাঁটতে শুরু করেন রাকেশ। খানিকটা চলার পর কী ভেবে একবার পেছন ফিরতেই চোখে পড়ে লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকেই লক্ষ্য করছে। তার চোখেমুখে যতটা বিস্ময় ঠিক ততটাই ভয়।

চোখাচোখি হতেই লোকটা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে শশব্যস্তে এগিয়ে যায়। রাকেশও চলার গতি কমিয়ে দেন।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে গেঁয়ো লোকটার মনোভাব বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না রাকেশের। যেখানে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য বাড়িঘর, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে আঠারটি অসহায় মানুষকে, সেখানে ছুট করে কেউ যে যেতে পারে, এটাই তাদের কাছে প্রচণ্ড বিস্ময়কর।

আরও খানিকটা যাবার পর সূর্য পুব আকাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠে আসে। আধ ঘণ্টা আগে তার গা থেকে সোনালি আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, এখন আর তা নেই। এই সকাল সাড়ে সাতটাতেই রোদ গনগনে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বায়ুস্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে তীব্র উত্তাপ।

রাকেশ জানেন; সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর উঠে আসবে, হাওয়া এখনও যতটুকু সহনীয় আছে, সেই জ্বলন্ত ভরদুপুরে তা আর থাকবে না। চারিদিকে উল্টোপাল্টা লু-বাতাস ছুটতে থাকবে। রোদের অসহ্য ঝাঁঝে ঝলসে যেতে থাকবে গাছপালা ঝোপঝাড় খালবিল এবং আদিগন্ত প্রান্তর।

মাথা বাঁচাতে এই সাত সকালেই কাঁধের ব্যাগ থেকে টুপি বের করে পরে নিলেন রাকেশ। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। তিনি যেন স্বপ্নাদিষ্টের মতো এক অচেনা ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে চলেছেন। তাঁর কাছে এ এক আশ্চর্য অলৌকিক অভিযান। ধারাবনী বারহৌলি এবং মধিপুরা যত দূরেই হোক, আজ কোনো একসময় ওই সব জায়গায় তিনি পৌঁছুবেনই। গ্রামগুলোতে গিয়ে তিনি কী দেখবেন কে জানে। যতই এগোন ততই ভেতরে ভেতরে এক ধরনের টেনসান বা উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন রাকেশ।

আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর কাঁকুরে পড়তি জমির সীমা শেষ হয়ে যায়। এখন কাচ্চীর দু'ধারে শুধু টানা ফসলের খেত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ তো পড়েই আছে, এই চৈত্রেই রোদের তাপে যতদূর চোখ যায় জমি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। মাঠ একেবারে শূন্য, তবু পরদেশী শুগারা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এসে মাটি ঠুকরে ঠুকরে দেখছে, কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য একদানা শস্যও ফেলে রেখে যায়নি। অনেক দূরে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে উঁচু তালগাছের মাথায় শকুনেরা ঝিম মেরে বসে আছে। আরও দূরে দিগন্তের কাছাকাছি পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁচড়ের মতো অনেক গ্রাম চোখে পড়ে।

এবার আরও বেশি লোকজন দেখা যাচ্ছে। তাদের অনেকেই মাঠ ভেঙে কোথায় চলেছে, কে বলবে। তবে যারা রাস্তা ধরে আসছিল রাকেশ তাদের বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, ধারাবনী বারহৌলি আর কত দূর?

আগের লোকগুলোর মতোই এরাও চমকে উঠে কেউ জানিয়েছে তিন মিল, কেউ

বলেছে দু মিল, কেউ বলেছে এক মিল। অর্থাৎ দূরত্ব কমতে শুরু করেছে। রাকেশ এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। বুঝতে পারছেন গ্রামগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছেন।

আরও ঘণ্টাখানেক বাদে সূর্য যখন সোজা মাথার ওপর উঠে এসেছে সেই সময় ধারাবনীতে পৌঁছে গেলেন রাকেশ।

ছয়

রাকেশ আগেই জেনেছিলেন ধারাবনী অচ্ছুৎদের গাঁ। এখানে যারা থাকে তারা হ'ল জল-অচল তাতমা, কোয়েরি, চামার, ধাঙড়, এমনি নানা জাতের হাভাতে মানুষ, খানিকটা মৌখিক মর্যাদা দিয়ে যাদের বলা হয় হরিজন। পুরুষানুক্রমে এরা কেউ বেগার খাটিয়ে, কেউ পেটভাতায় বড়ো জমিমালিকের খেতিতে চাষের মরশুমে এবং ফসল কাটার সময় মাস চারেকের মতো কাজ পায়, বাকি আট মাস নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালায়। আবহমান কাল ধরে সোসাইটির একেবারে নিচের স্তরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে এরা। যে ভারতবর্ষে একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হয়, হাজার হাজার কলকারখানায় ছেয়ে যায় চারিদিক, গড়ে ওঠে নতুন নতুন টাউনশিপ, হাউসিং কমপ্লেক্স, অ্যাসফাল্টে-মোড়া তেলের মতো মসৃণ রাস্তায় উড়ে যায় ঝকঝকে ফরেন লিমুজিন, আকাশের দিকে মাথা তুলতে থাকে স্কাইস্ক্রেপার, ফাইভ-স্টার হোটেলে এবং বার-এ বা নাইট ক্লাবে বয়ে যায় দামী হুইস্কির অন্তহীন প্রবাহ, জমতে থাকে সমৃদ্ধির পাহাড়, যে ভারতবর্ষ ছুটে চলেছে একবিংশ শতাব্দীর দিকে, তার বাইরে ধুলো-সরীসৃপ-পোকামাকড়-রোগ-ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ এবং অন্ধকারে-ঘেরা আশাহীন খাদ্যহীন ক্ষুধার্ত লাঞ্ছিত অন্য এক ভারতবর্ষে এই সব ধারাবনী বারহৌলি গ্রাম। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে কত মৃত্তিকা কিন্তু এখানকার মানুষদের জন্য এক ধুর নিজস্ব জমিও নেই। কিন্তু কয়েক বছর আগে আচমকা তারা কিছু খেতি পেয়ে গিয়েছিল, তবে তার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। সে কথা পরে।

যে কাচ্চী ধরে রাকেশ হেঁটে আসছিলেন, ধারাবনী গাঁয়ের পাশ দিয়ে সেটা ঘুরে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। এখন লু-বাতাস বইছে চারিদিকে। রোদের আঁচ এত গনগনে যে গায়ের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। ঘামে জামা এবং ট্রাউজার্স ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। রোদের দিকে তাকানো যায় না, মনে হয় চোখ ঝলসে যাবে।

রুমাল বার করে মুখ হাত-টাত মুছে নিলেন রাকেশ কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শরীরের অগুনতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে গল গল করে ঘামের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল। এভাবে আর খানিকক্ষণ ঘাম বেরুলে শরীরে জলীয় পদার্থ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জিভ শুকনো চামড়ার মতো লাগছে। গলার কাছটায় যেন খরখরে বালি ছড়ানো, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। এখন খাবার জল পাওয়াটা একান্ত জরুরি।

কাচ্চীতে দাঁড়িয়েই গ্রামটাকে দেখতে লাগলেন রাকেশ। যত দূর চোখ যায়, টিন বা টালির চাল এবং মাটির দেয়ালের অসংখ্য বাড়িঘর। বাড়িগুলো গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে নেই, খাপছাড়াভাবে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে প্রচুর গাছ চোখে পড়ছে। বেশির ভাগই পিপর, সিমার এবং পরাস। একটা ঝাঁকড়া-মাথা বটগাছও অনেকটা জায়গা জুড়ে নিজের ডালপালা ছড়িয়ে রেখেছে। গ্রামটার ওধারে, কোণাকুণি দক্ষিণে একটা ছোটোখাটো পাহাড় চোখে পড়ছে।

ধারাবনী গ্রামটা যে বেশ বড়ো. কাচ্চীতে দাঁড়িয়েই তার আভাস পাচ্ছেন রাকেশ। বাড়িঘর গাছপালা, সবই দেখা যাচ্ছে কিন্তু মানুষজন চোখে পড়ছে না।

রোদের যা অসহ্য তেজ তাতে খোলা আকাশের নিচে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কাচ্চী থেকে একটা সরু রাস্তা ধরে গ্রামের ভেতর চলে এলেন রাকেশ।

ধারাবনীর প্রতিটি রাস্তায় কম করে ছ ইঞ্চি ধুলো। ধুলোয় জুতোসুদ্ধ পা ডুবিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন রাকেশ। এই গরমে পোকামাকড় মাছি, কিছুই নেই। এমন-কি গেঁয়ো রাস্তার কুকুরও চোখে পড়ছে না। সব বুঝি তল্লাট ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে।

প্রথম সাত-আটটা বাড়িতে কাউকে পাওয়া গেল না। পলকা কাঠের বা টিনের দরজার কড়া বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। বেঁটে বেঁটে জানালাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

চলতে চলতে রাকেশের মনে হতে লাগল, ধারাবনী যেন গরীব হাভাতে মানুষদের পরিত্যক্ত উপনিবেশ। সেই হত্যাকাণ্ডের পর তবে কি সবাই গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে? কাউকে যদি না পাওয়া যায় সাক্ষী-প্রমাণ কিভাবে যোগাড় করবেন রাকেশ? এত কষ্ট করে এই মারাত্মক রোদে এত দূর ছুটে আসা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? হঠাৎ প্রচণ্ড হতাশায় মন ভরে যায় তাঁর। চৈত্রের খাড়া তীব্র রোদ মাথায় নিয়ে তিনি কি পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় ফিরে যাবেন?

অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দূরে একটা ভাঙাচোরা ঘরের

বারান্দায় রোগা চিমড়ে চেহারার আধবুড়ো একটা লোক আর মাঝবয়সী একটি মেয়েমানুষ চোখে পড়ে।

না, এই গ্রাম একেবারে জনশূন্য নয়। রাকেশ দ্রুত ঘরটার সামনে চলে আসেন।

লোকটা এবং তার সঙ্গিনী ভীষণ হকচকিয়ে যায়। রাকেশের মতো কাউকে তারা এই মুহূর্তে আশা করেনি। দু'জনেই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আপ !'

কথা বলার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না রাকেশের। হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছিল। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে বারান্দার একধারে হুড়মুড় করে বসে পড়তে পড়তে কোনোরকমে বলেন, 'থোড়া পানি।'

লোকটা এবার অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে এবং ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপ ?'

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে রাকেশ তাকান, 'আমি কী ?'

'বামহন, কায়াথ, নহী ত কোঈ উঁচা জাতকা—' বলতে বলতে থেমে যায় লোকটা।

তার মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না রাকেশের। তবু তিনি বলেন, 'উঁচা জাতের হলে কী হবে ?'

'তা হলে পানি দিতে পারব না। আমরা অচ্ছুৎ—কোয়েরি। বামহন-কায়াথকে পানি পিলানো আমাদের কসুর।'

আবহমান কালের সংস্কার এদের রক্তে কতদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে, আগে জানতেন না রাকেশ। বিষাদে তাঁর মন ভরে যায়। বলেন, 'আমার জাতপাত নেই, ওসব আমি মানি না। পানি নিয়ে এসো, তিয়াসে ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

মধ্যবয়সী এবং তার সঙ্গিনী, খুব সম্ভব স্ত্রী-ই হবে, বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। জাতওয়ারি সওয়াল মানে না, এমন মানুষ তারা আগে আর কখনও দেখেনি। দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে লোকটা বলে, 'লেকেন—'

'কী ?'

'আপ উঁচা জাতকা আদমী জরুর হোগা।'

অর্থাৎ রাকেশের চেহারা, মসৃণ ত্বক, নিখুঁত কামানো মুখ, ইত্যাদি থেকে ওরা ধরে নিয়েছে তিনি নিশ্চয়ই উচ্চ বর্ণের মানুষ। যদিও সস্তা সুতী শার্ট আর ট্রাউজার্স পরে এসেছেন, তবু ওরা নিমেষে বুঝে ফেলেছে তিনি অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা। শুধু পোশাক বদলালেই চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। ওদের লেভেলে নেমে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সঠিক পদ্ধতি এখনও তাঁর আয়ত্তে আসেনি।

রাকেশ বললেন, 'উঁচা জাত নীচা জাত এখন রাখো। পানি না দিলে আমি

মরে যাব।' বলে প্রায় হাঁফাতে থাকেন। টের পান, জিভের ডগা থেকে পাকস্থলীর শেষ সীমানা পর্যন্ত জায়গাটা জ্বলে যাচ্ছে।

'কা করে—' মধ্যবয়সিনী এবার ঘর থেকে ঝকঝকে পেতলের লোটায় জল এনে দেয়।

আর লোকটা কাঁচুমাচু মুখে হাতজোড় করে বলে, 'জাতপাতের কথা বললেন না, কোয়েরির হাতের পানি খাচ্ছেন। আপকা বিচার।' একটু থেমে ফের বলে, 'দেখবেন ভগোয়ান রামজি কিষুণজির গুসসা এসে না পড়ে আমাদের ওপর।'

দু'জনকে ভরসা দিয়ে রাকেশ বলেন, 'কিছু হবে না। এ সব নিয়ে একেবারে ভাববে না।'

এক নিঃশ্বাসে জলটা শেষ করে রাকেশ বলেন, 'আরেকটু দাও।'

মেয়েমানুষটি দ্বিতীয় বার লোটা ভরে নিয়ে আসার পর রাকেশ টের পান, শুধু তেষ্টাই না, মারাত্মক খিদেও পেয়েছে। এবার বলেন, 'আমার সঙ্গে খাবার আছে। তোমাদের এখানে বসে খেলে আপত্তি নেই তো?'

'নহী নহী, আপ খাইয়ে না—' বলেই বিমর্ষ হয়ে পড়ে লোকটা। এরপর সে যা জানায় তা এই রকম। রাকেশের মতো বড়ে আদমীদের খাতিরদারি করার সামর্থ্য তাদের নেই। তারা অচ্ছুৎ, গরীবের চাইতেও গরীব, ইত্যাদি।

অচ্ছুৎ কোয়েরির দাওয়ায় বসে খাওয়াটা রাকেশের অছিলা। এই সুযোগে তিনি ধীরে ধীরে আসল প্রসঙ্গে চলে যাবেন। এমনভাবে তাঁকে এগুতে হবে যাতে লোকটা এবং মেয়েমানুষটা যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে।

কাপড়ের ব্যাগ থেকে খাবারের প্যাকেট বের করে খুলে ফেলতেই রাকেশের চোখে পড়ে অবোধনারায়ণ প্রচুর পরোটা এবং ভাজিটাজি দিয়েছে। নিজের জন্য খানিকটা রেখে বাকি পরোটা-টরোটা মেয়েমানুষটিকে দিয়ে দেয়, 'তোমরা খেয়ো।'

ওরা কিছুতেই নেবে না, একরকম জোরজার করেই খাবারগুলো দিতে হ'ল রাকেশকে। খেতে খেতে তিনি লোকটাকে বলেন, 'এই দেখ, এতক্ষণ কথা বলছি, এখনও তোমার নামটাই জানা হয়নি।'

রাকেশ খাওয়া শুরু করলেও ওরা কিন্তু খাচ্ছে না। খাবারগুলো সযত্নে গুছিয়ে রেখে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। একজন ঝকঝকে চেহারার মানুষ হুট করে তাদের বাড়ি এসে এভাবে খেতে খেতে কথা বলবে, তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। এমন অভিজ্ঞতা আগে আর কখনও হয় নি তাদের।

লোকটা বলে, 'আমার নাম গণপৎ হুজৌর—'

শেষ শব্দটা খট করে কানে লাগে রাকেশের। বলেন, 'তুমি আমাকে হুজৌর বলছ কেন ?'

'আপ বড়ে আদমী, উঁচা জাত। হামনিলোগ বহোত গরীব, অচ্ছুৎ—' বলে লোকটা চুপ করে যায়।

অর্থাৎ রাকেশ এবং তাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বোঝাবার জন্যই গণপৎ 'হুজৌর' বলেছে। তাঁর চেহারায় এমন একটা শহুরে পালিশ এবং আভিজাত্য রয়েছে যাতে গণপৎরা তাঁকে আপনজন ভাবতে পারছে না। ঝকমকে শহর থেকে অনেক দূরে অচ্ছুৎদের এই গ্রামে তিনি একেবারেই প্রক্ষিপ্ত। তবু রাকেশ আশা ছাড়েন না। যে উদ্দেশ্যে এতদূর ছুটে আসা সেটা তাঁকে সফল করে তুলতেই হবে। রাকেশ এবার মেয়েমানুষটিকে দেখিয়ে বলেন, 'এ নিশ্চয়ই তোমার ঘরবালী।'

'হাঁ।'

এরপর কথায় কথায় জানা যায়, স্বামী-স্ত্রী দু'জন ছাড়া গণপৎদের সংসারে আর কেউ নেই। একটা মেয়ে হয়েছিল, অল্প বয়সে মরে গেছে। তাদের নিজস্ব জমিজমা বলতেও কিছু নেই।

জমির কথায় মেয়েমানুষটি চাপা গলায় স্বামীকে বলে, 'কা, হামনিকা জমিন নহীঁ থা ? ওহি পাহাড়কে বগলমে—'

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে থামিয়ে দেয় গণপৎ। বলে, 'চুপ হো যা লছিমাকে মাঈ—' সুদূর অতীতে লছিমা নামে একটি মেয়ে হবার গৌরবে এখনও গণপৎ স্ত্রীকে 'লছিমাকে মাঈ' বলে ডেকে থাকে।

রাকেশ বুঝতে পারছিলেন, পাহাড়ের পাশে জমির ব্যাপারে কিছু গোলমাল আছে, সেটা কোনোভাবেই জানাতে দিতে চায় না গণপৎ। তবু তিনি প্রশ্ন করেন, 'পাহাড়ের ধারে কী ?'

চমকে, দু হাত নাড়তে নাড়তে গণপৎ বলে, 'কুছ নহীঁ হুজৌর, কুছ নহীঁ।'

রাকেশ এবার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। বলেন, 'জমি নেই, তা হলে তোমাদের চলে কী করে ?'

গণপৎ বলে, 'আমরা গিরিলাল ঝা'জির খেতিতে কাজ করি।'

গিরিলালের নামটা খুব ভালো করেই জানেন রাকেশ। তবু জিজ্ঞেস করেন, 'গিরিলাল কে ?'

'বহোত বড়ে জমিমালিক।' বলে গণপৎ জানায়, পুব দিকে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে যত উৎকৃষ্ট চাষের জমি, সবই গিরিলালের।

'তোমাদের গাঁওয়ের সব লোকই গিরিলালের খেতিতে কাজ করে ?'

'সকলে করে না। কেউ কেউ এয়ে ত্রিলোকীজির খেতিও চষে, ধান গেঁহু ইখ ফলায়।'

'ত্রিলোকীজির অনেক জমি?'

'বহোত। উত্তর দিকের তামাম খেতি ত্রিলোকীজির।'

একটু চুপচাপ।

খাওয়া শেষ করে কাগজের ফাঁকা প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেন রাকেশ। তারপর জলটল খেয়ে চোখের কোণ দিয়ে গণপৎ এবং লছিমার মাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। প্রথম দিকের আড়ষ্টতা তাদের অনেকটাই কেটে গেছে। এখন মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই তারা কথা বলছে, বিশেষ করে গণপৎ। তবে রাকেশ সম্পর্কে সংশয়টা যে কাটে নি, চোখমুখ দেখে তা টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, একটা কথা শুনেছি, এখানে নাকি ক'দিন আগে আঠার জন লোককে গুলি করে খুন করা হয়েছে, অনেক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—'

রাকেশের কথা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ায় গণপৎ এবং লছিমার মা। সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'আমরা কিছু জানি না হুজৌর—'

রাকেশ তাদের সাহস দেবার জন্য বলেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। কারা গুলি চালিয়েছে তাদের—'

এবারও শেষ করতে পারেন না রাকেশ, তার আগেই দুটি ভীত আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ রুদ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

রাকেশ বলে, 'কী হ'ল তোমাদের?'

ভেতর থেকে গণপৎরা ক্রমাগত বলতে থাকে, 'কুছ নহীঁ জানতা হামনিলোগ, কুছ নহীঁ জানতা—'

যারা প্রতিজ্ঞা করেছে 'জানি না' ছাড়া অন্য কিছু বলবে না তাদের আর কোনো প্রশ্ন করা অর্থহীন। অগত্যা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে উঠে পড়েন রাকেশ। সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ে আরও অনেকগুলো বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। অর্থাৎ সেগুলোতে কেউ নেই।

খানিকটা এগুতেই থমকে দাঁড়িয়ে যান রাকেশ। এখানে প্রায় আধ কিলো-মিটার জায়গা জুড়ে বিরাট এক শ্মশান ছড়িয়ে রয়েছে। যেদিকেই তাকানো যায় অগুনতি পোড়া ঘর, ভাঙাচোরা মাটি বা টিনের দেওয়াল, ছত্রাকার টালি, ভাঙা দরজা, আধপোড়া বাঁশ বা কাঠ, হাঁড়ি-কুড়ি, ছাইয়ের গাদা, সব মিলিয়ে বিপুল ধ্বংসস্তূপ। রাকেশ বুঝতে পারেন, আগুনটা লাগানো হয়েছিল এখানেই। পুলিশ

রিপোর্ট অনুযায়ী গুলি চালিয়ে এখানেই হত্যাকাণ্ডটা চালানো হয়।

পোড়া বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রাকেশ। একসময় তাঁর মনে হয়, যে আঠারটি লোককে খুন করা হয়েছে তারা ছাড়াও এই গ্রামে আরও অনেক মানুষ থাকার কথা। তাদের মধ্যে মোটে দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাকি সবাই গেল কোথায়?

আস্তে আস্তে ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে এগিয়ে যান রাকেশ। পোড়া ঘরগুলোর পর আরও অসংখ্য ঘর চোখে পড়ে। তবে এগুলো অক্ষত, আগুনের হাত থেকে কোনোরকমে বেঁচে গেছে।

চলতে চলতে দু-একটা ঘরে ঘুলঘুলির মতো ছোটো জানলায় মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন রাকেশ। চোখাচোখি হলেই মুখগুলো, চকিতে সরে গিয়ে জানালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

রাকেশ ঘরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। তারপর ডাকতে থাকেন, 'কে আছ, দরজা খোলো—'

বেশির ভাগ ঘর থেকেই সাড়া মেলে না, দরজা বা জানালাও কেউ খোলে না। তবে অনেক ডাকাডাকির পর দু-একজন ভেতর থেকে বলে, 'হামনিলোগ বহোত গরীব আদমী হুজৌর। কুছ নহীঁ জানতা।'

ওরা যেন ধরেই নিয়েছে, আগুন লাগানো এবং হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজ নিতেই রাকেশ এখানে এসেছেন। কিন্তু সেটা তো জানার কথা নয়। তবে কি তাঁর আসার খবর আগেভাগেই রটে গেছে? কে তা রটাতে পারে? রাকেশ কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তবে এটা পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে, ভূগোলের হট্টগোল থেকে অনেক দূরে অচ্ছুৎদের এই গাঁয়ে 'রেইন অফ টেরর' বা সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। এরা যাতে মুখ না খোলে সেজন্য কারা যেন অদৃশ্য থেকে সারাক্ষণ বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু কেউ যদি খুন, আগুন লাগানো বা বীভৎস অত্যাচার সম্পর্কে একটি কথাও না বলে হত্যাকারীদের চুলের ডগাও ছোঁয়া যাবে না। এত বড়ো একটা জঘন্য অপরাধের পর তারা পার পেয়ে যাবে, এটা ভাবতেও রাকেশের মাথায় টগবগ করে রক্ত ফুটতে থাকে।

সাত

ধারাবনী গ্রামটা আগাগোড়া ঘুরতে আড়াই তিন ঘণ্টার মতো সময় লেগে গেল রাকেশের। বেশির ভাগ বাড়িঘরই ফাঁকা, কয়েকটাতে লোকজন যা আছে, তারা এতই আতঙ্কগ্রস্ত যে তাঁকে দেখামাত্রই দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একজনই অবশ্য বলেছে, 'জানতা হ্যায় হুজৌর। লেকেন—'

রাকেশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'লেকেন কী?'

চাপা ভয়ার্ত গলায় লোকটা বলেছে, 'মুহ খুলেগা ত জান চলা যায়েগা। ভগোয়ান রামজি কসম, কুছ নহীঁ পুছিয়েগা।'

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করা চলে না। করলেও উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাকেশ আশা ছাড়েননি। বার বার তিনি ধারাবনীতে আসবেন। এই সন্ত্রস্ত মানুষগুলোর ভয় ঘুচিয়ে আসল সত্যটা তাঁকে বের করে আনতেই হবে। কোনোভাবেই অচ্ছুংদের এই গ্রাম থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবেন না।

এখন প্রায় চারটের মতো বাজে, বেলা পড়ে আসছে। সূর্য পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকটা নেমে এসেছে তবু রোদে এখনও গনগনে আঁচ। লু-বাতাসের উত্তাপ যেটুকু কমেছে তা প্রায় টেরই পাওয়া যায় না।

ঝাঁ ঝাঁ রোদে এবং আগুন-ছড়ানো বাতাসে চারিদিক যখন ঝলসে যাচ্ছে তখন খোলা আকাশের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটার অভ্যাস কোনোদিনই ছিল না রাকেশের। ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন তিনি। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে থাকে।

রাকেশ ঠিক করে ফেলেন, এখন পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় ফিয়ে যাবেন। কাল আবার ধারাবনীতে আসবেন।

প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতেই ফিরে চললেন রাকেশ। চৈত্রের অসহ্য রোদ এবং গরম ভাপে-ভরা বাতাস তাঁর শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। শুধু মনের জোরেই তিনি কোনোরকমে পা ফেলছেন।

সূর্য যখন পশ্চিমের গাছাপালার আড়ালে নামতে শুরু করেছে, সেই সময় রাকেশ সেই চাপ-বাঁধা জঙ্গলটার সামনে এসে পড়েন। অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিলেন তিনি। হঠাৎ কেউ যেন ফিসফিসিয়ে কোথেকে ডেকে ওঠে, 'হুজৌর—'

চমকে রাকেশ ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পান, একটা বুড়ো জঙ্গলের ভেতর

থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। লোকটার গায়ে মাংস বলতে বিশেষ কিছু নেই, ফাটা ফাটা কোঁচকানো চামড়া ঢিলে হয়ে হাড় থেকে ঝুলছে। লম্বা চোঙার মতো মাথায় রুক্ষ তেলহীন চুলগুলো যেন পাটের ফেঁসো। গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। চোখ দু' ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো। হাত এবং পায়ের হাড়গুলো গাঁট-পাকানো। কোমরের কাছে ময়লা তেলচিটে আট-দশ ইঞ্চি চওড়া একটা টেনি ছাড়া বাকি শরীরে আচ্ছাদন বলতে আর কিছু নেই।

এরকম চেহারার একটা লোককে এই জঙ্গলে দেখতে পাবেন, এটা ছিল রাকেশের পক্ষে অভাবনীয়। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কে তুমি ?'

'হামনি আনোখি দুসাদ হুজৌর। ওহী মেমসাব আপকো হামনিকা সাথ যানে বোলা। কিরপা করকে আইয়ে—' অত্যন্ত দীন ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বলে বুড়ো লোকটা।

অবাক বিস্ময়ে রাকেশ বলেন, 'কে মেমসাহেব ?'

'টৌন থেকে এসেছে। বড়ী জবরদস্ত লড়কী।'

বিদ্যুৎচমকের মতো রাকেশের হঠাৎ মনে হয়, দেবারতিই কি তাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য বুড়োটাকে পাঠিয়েছে ? কিন্তু এই জঙ্গলে দেবারতি থাকবে কেন ? তার তো যাবার কথা ধারাবনী, বারহৌলি বা মধিপুরা গাঁয়ে। পরক্ষণে রাকেশের মনে হয়, আনোখির মেমসাব দেবারতি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। আর কোনো মেয়ে শহর থেকে বহু দূরে মশা, মাছি, ধুলোয়-ভরা এই ক্ষুধার্ত হাভাতেদের গ্রামগুলোতে আসবে না। এমন দুঃসাহসী জেদী একবগ্‌গা মেয়ে আগে আর কখনো দেখেননি রাকেশ। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য জিজ্ঞেস করেন, 'কোন টাউন থেকে এসেছে তোমার মেমসাহেব ?'

'মালুম নহীঁ।'

'মেমসাহেব কি পত্রকার ?'

'উয়ো কৌন চীজ ?'

পত্রকার বা সাংবাদিক কাদের বলে সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা নেই আনোখির। থাকার কথাও নয়। এ ব্যাপারে তাকে বোঝাতে গেলে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। রাকেশ বলেন, 'আচ্ছা চলো—'

আনোখির সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েন রাকেশ। এখানে গাছপালা খুব ঘন নয়। যেদিকে তাকানো যাক কেঁদ মহুয়া পরাস সিমার এবং অর্জুন গাছের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়, বুনো ঘাস, আগাছা। অজানা

লতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে ট্যারাবাঁকা সিসম গাছগুলোকে।

চলতে চলতে রাকেশ বলেন, 'মেমসাহেব এই জঙ্গলে এসেছে কেন?'

আনোখি বলে, 'আমাদের খোঁজে।'

রাকেশ শুনেছেন, এই জঙ্গলে বিপজ্জনক কিছু জন্তু-জানোয়ার আছে। তাদের সঙ্গে মানুষও যে বাস করে, এটা ভাবা যায়নি।

রাকেশ ঘাড় ফিরিয়ে আনোখিকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা জঙ্গলে থাকো নাকি?'

'নহী' হুজৌর।'

'তা হলে?'

'ডরে এখানে পালিয়ে এসেছি।'

'কার ডরে? কিসের ডরে?'

আনোখি যা উত্তর দেয় তা এইরকম। পহেলবান, ভূমিসেনা আর পুলিশের ভয়ে তারা গাঁ ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে।

রাকেশ চমকে ওঠেন, 'পুলিশ তো বুঝলাম। পহেলবান আর ভূমিসেনা কারা?'

'ওরা মানুষ না, জানবর। ঝা'জি আর সিংজি ওদের পোষে। ওদের সঙ্গে রয়েছে পুলিশরা।'

রাকেশ হকচকিয়ে যান, 'কোন ঝা'জি? কোন সিংজি?'

আনোখি বলে, 'জমিদার গিরিলাল ঝা ঔর এম্লে তারলোকী সিং।'

তীক্ষ্ণ চোখে আনোখিকে লক্ষ্য করেন রাকেশ, 'তুমি কি ধারাবনী গাঁওয়ের—'

'হাঁ হুজৌর, উহাকা গাঁওবালা—'

আরও অনেক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন রাকেশ। তার আগেই আনোখি বলে ওঠে, 'আ গিয়া—'

রাকেশের চোখে পড়ে, কাছেই একটা মজা নহর। সেটার পাড়ে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে বাঁশ খড় কাঠ দিয়ে পঁচিশ-তিরিশটা চালা বানানো হয়েছে। সেগুলোর সামনে এবং পেছনে আট-দশটা ঘুর (আগুনের কুণ্ড)। ঘুরগুলো এখন জ্বলছে না। খুব সম্ভব সন্ধের পর হিংস্র বুনো জানোয়ারদের ভয় দেখাবার জন্য শুকনো কাঠটাঠ দিয়ে ওগুলো জালিয়ে রাখা হয়।

নহরের পাড়ে ঘাসের জমিতে বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চা যুবক-যুবতী মিলিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন হাভাতে চেহারার দেহাতি বসে আছে। যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই, তাদের মধ্যে দেবারতিকেও দেখা গেল।

দেবারতি হাত তুলে ডাকল, 'আসুন।'

রাকেশ তার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। চারপাশের লোকগুলো চোখমুখে অগাধ বিস্ময় এবং কৌতূহল ফুটিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল।

'খুব অবাক হয়ে গেছেন তো?' বলে হাসল দেবারতি।

'তা একটু হয়েছি। আপনি আমার জন্যে এই বুড়োকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যে ওখান দিয়ে যাব জানলেন কী করে?'

'ওসব কথা পরে হবে। তবে আমার ধারণা—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় দেবারতি, সোজাসুজি রাকেশের চোখের দিকে তাকায়।

রাকেশ বলেন, 'কী?'

'আপনি আর আমি প্রায় একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।'

'তাই নাকি?' রাকেশ বলেন, 'আপনার উদ্দেশ্যটা আমার জানা। আপনি নিজেই তা বলেছেন। কিন্তু আমি কেন এসেছি সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'তবু আমি জানতে পেরেছি।'

'কিভাবে?'

'সেটা পরেই শুনবেন।'

রাকেশ আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

দেবারতি বলে, 'আপনি যে কারণে এখানে এসেছেন তাতে ধারাবনীর লোকজনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাদের স্টেটমেন্ট টেপ করে নিতে পারলে আপনার কাজের সুবিধা হবে। কিন্তু—'

কলকাতার এই তরুণী সাংবাদিকটি কি মুখ দেখে মনের কথা জানতে পারে? রাকেশ প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু কী?'

'ধারাবনীর বেশির ভাগ মানুষই এই জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে। বাকি যারা আছে তারা কিছুদিন আগের মাস-মার্ডার আর আর্সন সম্পর্কে মুখ খুলতে চায় না। অনেক খুঁজে খুঁজে কিছুক্ষণ আগে এই জঙ্গলে এসে এদের পেয়েছি। ভাবলাম আপনিও তো ধারাবনীতে গেছেন। যখন ফিরবেন লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে আসব। তারপর এদের জিজ্ঞেস করে করে দু'জনে যা জানার জেনে নেব।'

কৃতজ্ঞতায় রাকেশের মন ভরে যায়। বলেন, 'ধন্যবাদ।'

দেবারতি সামান্য হাসে।

রাকেশ আবার বলেন, 'এই জঙ্গলের খবর কার কাছে পেলেন?'

দেবারতি বলে, 'জার্নালিস্টরা খবরের সোর্স কাউকে জানায় না।' ব'লে হাসতে থাকে।

রাকেশও হাসেন।

দেবারতি বলে, 'তা হলে কাজ শুরু করা যেতে পারে। আপনার কাছে টেপ-রেকর্ডার আছে?'

'না। আনতে ভুলে গেছি।'

'আমার কাছে একটা আছে। ওটাতে রেকর্ড করে নিই। পরে আমারটা থেকে ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন।'

'গুড আইডিয়া।'

দেবারতির চোখ এবার চারপাশের লোকজনের ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আনোখির মুখের ওপর এসে স্থির হয়। সে বলে, 'তুমি এদের ভেতর বয়েসে সব-চেয়ে বড়ো, সবাই তোমাকে মান্য করে। আগে বলো কারা তোমাদের গাঁয়ের এতগুলো লোককে খুন করেছে? কেন ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে?'

আনোখি বলে, 'নহী নহী, হামনি নহী।'

'কি হ'ল তোমার?'

'যা বলার ধনুয়া বলবে।'

'ধনুয়া কে?'

'আমাদের গাঁওয়ের লেড়কা।'

'কোথায় সে?'

দূরে আঙুল বাড়িয়ে একটা বাঁশের চালা দেখিয়ে আনোখি বলে, 'উধর। ঝোপড়ির ভেতর রয়েছে। তিন রোজ ওর জেনানা বেহোঁশ। তার কাছে বসে আছে ধনুয়া।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে ধনুয়ার জেনানার?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না আনোখি। চারিদিকে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে আসে। একসময় মুখ নামিয়ে চাপা ফিস ফিস গলায় বলে, 'সিংজি আর ঝা'জির পহেল-বানেরা ওকে বিলকুল খতম করে দিয়েছে। দশ বারোগো জানবর একসাথ ওর ইজ্জৎ নিয়েছে হুজৌর।' একটু থেমে বলে, 'তারপর থেকে ধনুয়ার জেনানা আর খাড়া হতে পারে না। সিরেফ শুয়ে শুয়ে এত্তে রোজ কেঁদেছে। এখন ত পুরা বেহোঁশ। নহী বঁচেগী ও লড়কী। হো রামজি—' তার বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

দেবারতি বলে, 'চলো, আমরাই ধনুয়ার কাছে যাই।'

'আইয়ে।'

ধনুয়ার চালার কাছে এসে আনোখি ডাকতে থাকে, 'এ ধনুয়া, বাহার আ—'

ভেতর থেকে নীরস গলা ভেসে আসে, 'কায় ?'

'টৌনসে এক সাহাব ঔর মেমসাব আয়ী।'

'কিস লিয়ে ?'

'বাহার আ না—'

একটু পর অত্যন্ত বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট মুখে একটি যুবক বেরিয়ে আসে। তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। মাথা লম্বাটে নারকেলের মতো। চুলের ছাঁট দেখে বোঝা যায়, চামড়া ঘেঁসে এলোপাথাড়ি কাঁচি চালানো হয়েছে। না কামানো মুখে কয়েক দিনের জমানো দাড়ি। ছোকরার শরীর খুবই মজবুত, চওড়া চওড়া হাড়, ভারী চোয়াল, চোখ দুটি আরক্ত। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সত্যিই সে কয়েক দিন ঘুমোয়নি।

ধনুয়ার পরনে লালের ওপর সবুজ ডোরাকাটা ইজের আর মোটা শালু কাপড়ের তৈরি গেঞ্জি। হাত-পায়ের গোছ এবং পাথরের চাংড়ার মতো বুক বুঝিয়ে দেয় ছোকরার গায়ে অসীম শক্তি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভেতরে ভেতরে বেশ সতর্ক হয়ে গেলেন রাকেশ। ধনুয়ার চেহারায় এক ধরনের বেপরোয়া উগ্রতা রয়েছে, এটা দোসাদ চামার ধাঙড় কোয়েরি বা গাঙ্গোতাদের মধ্যে একান্তই দুর্লভ। যে অচ্ছুৎরা আবহমান কাল ঘাড় নুইয়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে, মাথা তুলে যারা কোনোদিন কথা বলে না, তাদের থেকে ধনুয়া একেবারে আলাদা।

ধনুয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিস লিয়ে আপলোগন ইধর আয়া ?'

এখানে আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে দেবারতি বলে, 'তোমাদের গ্রামের লোক-জনদের কিভাবে খুন করা হয়েছে, নষ্ট করা হয়েছে মেয়েদের ইজ্জৎ, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরবাড়ি, এসব তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'কা জরুরত ?'

'তোমাদের মুখ থেকে শুনে সারা দেশকে জানিয়ে দেব।'

উদ্ধতভাবে ধনুয়া প্রশ্ন করে, 'কা ফায়দা ?'

দেবারতি বলে, 'তোমাদের ওপর জুলুম, অত্যাচার যাতে বন্ধ হয় তার চেষ্টা করব।'

জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়ে ধনুয়া, 'নহী নহী—'

দেবারতি একটু অবাক হয়েই বলে, 'কী ?'

'এই খুন, আগুন, আমাদের ঘরের মেয়েদের বেইজ্জতি কোনো দিন বন্ধ হবে না মেমসাব।'

'চেষ্টা তো করতে হবে।'

তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকে ধনুয়া। বিদ্রূপে তার ঠোঁট বেঁকে যায়। এক-সময় সে বলে, 'আপলোগন এম্লে হ্যায় ?'

এ রকম উদ্ভট প্রশ্নের জন্য রাকেশ বা দেবারতি প্রস্তুত ছিল না। বিমূঢ়ের মতো রাকেশ বলেন, 'না তো।'

'মনিস্টার ?'

'না।'

'তব্ কুছ নহী হোগা।' ধনুয়া বলতে থাকে, 'এম্লে কি মনিস্টার না হলে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

দেবারতি বলে, 'তুমি বলোই-না। তারপর দেখি আমরা কী করতে পারি।'

কিছুতেই বলবে না ধনুয়া। যতই দেবারতিরা চাপ দিতে থাকে ততই সে ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনেক বোঝাবার পর শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজী হয়। আনোখির দিকে তাকিয়ে বলে, 'চাচা, কোঈ লেড়কী উড়কীকে আমার ঝোপড়িতে যেতে বল। কুঁদরীকে দেখবে। আমি সাহাব ঔর মেমসাবকে আমাদের কথা বলি।'

এদিকে যে পঞ্চাশ-ষাট জন খানিকটা দূরে বসে ছিল, তারা কখন উঠে এসেছে, কেউ খেয়াল করেনি।

আনোখি একটি মেয়েকে ধনুয়াদের চালায় পাঠিয়ে দেয়। তারপর সবাই রাকেশ এবং দেবারতিকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে ঘিরে বসে।

দেবারতি ব্যাগ থেকে তার টেপ রেকর্ডার আর ক্যামেরা বার করে নেয়। ব্যাটারি সেটের টেপটা চালু করে বলে, 'এবার শুরু করো ধনুয়া।'

ধনুয়া সন্দিগ্ধভাবে শুধোয়, 'কী ওটা ?'

'মেশিন। তুমি যা বলবে ওটায় ধরা থাকবে।'

'হাঁ !' রীতিমত অবাকই দেখায় ধনুয়াকে।

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ। তোমার বলা শেষ হয়ে গেলে শুনিয়ে দেব।'

'ঠিক হ্যায়।' এবার ক্যামেরাটা দেখিয়ে ধনুয়া বলে, 'হামলোগনকা ফোটোক ভি খিঁচেগি ?'

বোঝা যাচ্ছে, টেপ রেকর্ডার না চিনলেও ক্যামেরাটা চেনে ধনুয়া। দেবারতি বলে, 'হ্যাঁ।'

ধনুয়া বলে, 'ফটোক ত বড়ে বড়ে আদমী—এম্লে, মনিস্টার, অফসরদের তোলা হয়। আমাদের মতো গরীব অচ্ছুতিয়াদের ফটোক দিয়ে কা ফায়দা ?'

ধনুয়া জানে না যে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের জন্য দেবারতি কলকাতা থেকে এত দুরে ছুটে এসেছে, তার সঙ্গে ধনুয়াদের ছবি ছাপতে পারলে লেখাটার বিশ্বাস-যোগ্যতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। সে বলে, 'ফোটোগুলো আমাদের কাছে থাকবে। ওগুলো দেখলে তোমাদের কথা মনে পড়বে।'

ধনুয়া বলে, 'মানুষ ত ঘরে ভগোয়ান রামজি কিষুণজির ফটোক রাখে। ভুখা অচ্ছুতিয়াদের ফটোক কেউ রাখে নাকি ?'

ধনুয়া যে আর দশটা দোসাদ চামার গাঙ্গোতাদের মতো নয়, সেটা আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল ! কিন্তু চারপাশের পৃথিবীকে যে সে অন্য অচ্ছুৎদের থেকে একেবারে আলাদাভাবে দেখেছে, তার দেখার চোখ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, সেটা বোঝা যায়নি। ধনুয়া যা বলেছে তার উত্তর দেবার মতো কিছু জানা ছিল না দেবারতির। সে একটু হাসল শুধু।

রাকেশ বললেন, 'এবার শুরু কর। সন্ধে হয়ে আসছে। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।'

'ঠিক হ্যায়।'

'প্রথমে তোমার নাম বল—'

'ধনুয়া দুসাদ।'

'বাপের নাম।'

'রাম অওতার দুসাদ।'

'বেঁচে আছে ?'

'নহী', দশ পন্দ্র সাল আগে মারা গেছে।'

'মা ?'

'মর গয়ী। তিন সাল আগে।'

'ভাই বোন ?'

'কেউ নেই।'

'তোমার জেনানার নাম ?'

'কুঁদরী দুসাদ।'

'ছেলেমেয়ে আছে ?'

'কোঈ নহী'।'

'এবার সেদিনকার ঘটনার কথা বল।'

একটু চুপ করে থেকে মনে মনে ভেবে নেয় ধনুয়া। তারপর এলোমেলোভাবে যা বলে তা গুছিয়ে নিলে এরকম দাঁড়ায়।

ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরা ইত্যাদি গ্রামগুলোতে যে অচ্ছুতেরা রয়েছে গোটা দুনিয়ায় তাদের এক ধুর জমিও নেই। নানা, নানীর বাবা কিংবা তারও কয়েক পুরুষ আগে হয়তো কিছু জমিজমা এদের ছিল। করজের দায়ে বা নানারকম কূট-কৌশলে ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝায়ের নানা, নানার বাপ এবং নানার বাপের বাপ সে-সব ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন তারা নিছক ভূমিহীন কিষাণ। ঝা'জি এবং সিংজির জমিতে কাজ করে কোনোরকমে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এইভাবেই পুরুষানুক্রমে তাদের চলে যেত। কিন্তু কয়েক বছর আগে সর্বোদয় নেতা বিনোবাজি বিহারের এই হতদরিদ্র গাঁগুলোতে পদযাত্রায় আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ—ভূদান যজ্ঞ।

বিনোবাজি চেয়েছিলেন, বড়ো বড়ো জমিমালিকদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটুক। তাদের দখলে স্বনামে বেনামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে বিপুল জমিজমা রয়েছে তার কিছুটা অন্তত ভূমিহীনদের বিলিয়ে দিক। পায়ে হেঁটে সারা ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে তিনি ভূ-দানের মহিমা প্রচার করছিলেন। অন্নদান বস্ত্রদান জলদানের তুলনায় ভূমিদান যে অনেক বড়ো এবং স্থায়ী পুণ্যকর্ম, সেটাই জমিমালিকদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

এ দেশের পক্ষে ভূ-দান একটা নতুন ধরনের আন্দোলন। জোর জুলুম করে, রক্তারক্তি ঘটিয়ে জমিমালিকের বাড়তি খেতি ছিনিয়ে নেওয়া নয়, শুধুমাত্র হৃদয়ের শুভ পরিবর্তন ঘটিয়ে, স্বেচ্ছায় হাসিমুখে গরীব হাভাতেদের হাতে জমির দানপত্র তুলে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু নতুন অসাধারণ এক আন্দোলনে তখন চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। এই ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরা অঞ্চলের দুই জমিমালিক গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং (ত্রিলোকী সিং তখনও এম. এল. এ. হননি) অভিভূত। তাঁরা বিনোবাজিকে প্রণাম করে শপথ করলেন, বাড়তি জমিজমা অচ্ছুৎদের বিলিয়ে দেবেন। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা শপথই না, বারহৌলি গাঁয়ে শামিয়ানা খাটিয়ে, বিশাল জনসভা করে, সেই সভার মাঝখানে প্রকাণ্ড ভেলভেটের সিংহাসনে বিনোবাজিকে বসিয়ে, তাঁর সামনে অচ্ছুৎদের হাতে দুই বড়ো জমিমালিক দানপত্র তুলে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকী এবং গিরিলালের নিজস্ব লোকজনেরা স্লোগান দিতে শুরু করেছিল। কৃতজ্ঞ অচ্ছুতেরাও তাদের সঙ্গে সমস্বরে গলা ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

'বিনোবাজি—'

'অমর রহে।'

'তারলোকীজি—'

'অমর রহে।'

'গিরিলালজি—'

'অমর রহে।'

'চান্দা-সূরয যেত্তে রোজ—'

'বিনোবা ভাবে উতনা রোজ।'

'চান্দা-সূরয যেত্তে রোজ—'

'গিরিলালজি উতনা রোজ।'

'চান্দা-সূরয যেত্তে রোজ—'

'তারলোকীজি উতনা রোজ।'

সেই মুহূর্তে অত্যাচারী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দুই বড়ো জমিমালিক মহত্ত্বে এবং মর্যাদায় বিনোবা ভাবের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। চিরকালের বঞ্চিত, ভূমিহীন অচ্ছুৎদের কাছে চন্দ্র-সূর্যের মতো অমরত্ব লাভ করেছিল।

বিনোবাজি চলে যাবার পর দেখা গেল, দানপত্র করে যা তাদের দেওয়া হয়েছে সেগুলো অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে রুক্ষ কর্কশ পাথুরে পড়তি জমি। সেখানে কাঁটায়-ভরা কিছু আগাছা আর কণ্টিকারির ঝাড় ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না।

হোক পড়তি, হোক অনুর্বর, তবু তো নিজস্ব এক টুকরো করে জমি। ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'র খেতিতে এবং খামারে উদয়াস্ত খাটার পর ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরা ইত্যাদি গাঁয়ে অচ্ছুতেরা ওই সব কাঁকুরে ডাঙাতে গিয়ে লাঙল দিয়েছে। কিন্তু যে জমির দু-আড়াই ফুট গভীর পর্যন্ত ভাঙাচোরা পাথরের স্তর তা দু-চার মাস কেন, দু-চার বছরে চাষের যোগ্য করে তোলা মুখের কথা নয়।

কিন্তু ধারাবনী অঞ্চলের অচ্ছুতেরা নাছোড়বান্দা। নেহাত অযাচিতভাবে যখন জমিটা হাতে এসেই গেছে তখন হার মেনে পিছু হটার মানে হয় না। এক-গুঁয়ে জেদে তারা বছরের পর বছর লাঙল চালিয়ে, কর্কশ পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো করে, গোবর এবং পচা পাতার সার দিয়ে জমিটাকে উর্বর করে তুলেছে। গত বছর থেকে ওই জমিগুলোতে ফসল ফলতে শুরু করেছে।

ধনুয়া বলতে থাকে, 'এত্তে রোজ কোনো ঝামেলা ছিল না। লেকেন যেই ধান-গেঁহু ফলল, মুসিবতও শুরু হয়ে গেল।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'পড়তি জমিনের এক পাইসা দাম ছিল না, ফুটা কড়ি ভি নহী। লেকেন যে খেতিতে ধান গেঁহু ফলে তার দাম সোনাচাঁদির চেয়েও বেশি।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মুসিবতটা বাধল কী করে?'

'গিরিলাল ঝা ঔর তারলোকী সিংয়ের পহেলবান ঔর ভূমিসেনারা আচানক এসে আমাদের জমিনের ফসল কাটতে থাকে।'

রাকেশ জানেন বিহারের প্রায় সব জমিমালিকই তাদের স্বার্থরক্ষা বা বিরুদ্ধ পক্ষকে ঢিট করার জন্য পহেলবান পুষে থাকে। জমিমালিকদের হুকুমে খুন করে লাশ গুম করা থেকে শুরু করে ঘরে আগুন দেওয়া পর্যন্ত এমন কাজ নেই যা ওরা পারে না। কিন্তু ভূমিসেনার কথাটা এখানে এসে প্রথম শুনছেন রাকেশ। ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুব পরিষ্কার নয়। বললেন, 'ভূমিসেনা কী?'

ধনুয়া জানালো, ভূমিসেনা হ'ল জমিমালিকদের বন্দুকবাজ এক বাহিনী। আজকাল বিহারের অনেক জায়গায় ভূমিহীন মানুষেরা তাদের বাপ, নানা কি নানার বাপেদের কাছ থেকে গায়ের জোরে বা নানা কূট কৌশলে ছিনিয়ে নেওয়া জমি উদ্ধার করার জন্য জমিমালিকদের সঙ্গে লড়ছে। তাদের ধ্বংস করতেই ভূমিসেনার বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। এদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দিশী এবং বিলাইতী বন্দুক। ভূমিসেনারা পহেলবানদের চেয়েও খতারনাক। কথায় কথায় গুলি চালাতে এদের হাত এতটুকু কাঁপে না।

দেবারতি জিজ্ঞেস করল, 'তারপর।'

'আমরা বললাম, আমাদের জমিন থেকে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ভূমি-সেনারা বলল, হট ভূচ্চরের ছৌয়ারা। তোদের বাপের খেতি পেয়েছিস? আমরা বললাম, বড়ে সরকার গিরিলালজি ঔর তারলোকীজি আমাদের দানপত্র করে ওই খেতি দিয়েছে। ওরা কোনো কথাই শুনলে না। আমাদের মাথায় বন্দুক তাক করে ভূমিসেনারা দাঁড়িয়ে রইল। বছরের পর বছর খুন-পসিনা ঝরিয়ে যে ধান ফলিয়েছিলাম, জবরদস্তি করে পহেলবানেরা সেগুলো কেটে বয়েলগাড়ি বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল।'

'তারপর?'

'আমাদের বুক চুর চুর হয়ে গেল। সবাই জমিনে মাথা ঠুকে আর বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। লেকেন আমি কাঁদলাম না। আমার মাথায় আচানক খুন চড়ে গেল। আমি পাগলের মতো ছুটলাম গিরিলাল ঝা'র কোঠিতে। আমাকে দৌড়ুতে দেখে ধারাবনী বারহৌলি ঔর মধিপুরা গাঁওয়ের আরো অনেকেই পিছু পিছু ছুটল।' প্রায় এক দমে এই পর্যন্ত বলে ধনুয়া থামে। জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে।

দেবারতি এবং রাকেশ উদগ্রীব তাকিয়ে ছিলেন। দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'গিরিলাল ঝা কী বলল ?'

বিষণ্ণ হাসে ধনুয়া। বলে, 'গিরিলালজির সঙ্গে দেখা হ'লে ত বলবে।'

'দেখা হ'ল না কেন ?'

'গিরিলালজির কোঠিতে বন্দুকবালা যে দারবানেরা আছে তারা দেখা করতে দিল না। আমরা ওদের হাতে-পায়ে ধরলাম, লেকেন ওরা লাথ মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল। ভূচ্চরগুলো বলল, ভাগ কুত্তার পাল। না গেলে গোলি মেরে শির উড়িয়ে দেব। কী করি, জানের ভয়ে পালিয়ে এলাম।'

'তারপর ?'

'পরের দিন আবার গেলাম গিরিলালজির কোঠিতে। যারা তারলোকীজির জমিন পেয়েছিল তারা গেল তাঁর কোঠিতে। লেকেন ঝা'জি ঔর সিংজি, কারো সঙ্গেই দেখা করা গেল না।'

'কেন ?'

'দারবানেরা পরের দিনও ভাগিয়ে দিল। লেকেন এটা আমাদের বাঁচা-মরার সওয়াল। আমরা রোজ রোজ যেতে লাগলাম, যদি মালিকদের কিরপা হয়। লেকেন রোজ ফিরে আসতে হ'ল। এদিকে রোজ জমিমালিকদের পহেলবান ঔর ভূমিসেনারা বয়েল গাড়ি ভরে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমার খুনে আগুন ধরে গেল।'

এরপর ধনুয়া কখনও উত্তেজিত, কখনও বিষণ্ণ ভঙ্গিতে একটানা যা বলে যায় তা এইরকম। এমনিতে তো তারা পুরুষানুক্রমে মরেই আছে। বিনোবাজির ভূ-দান যজ্ঞের দৌলতে জমি যখন খানিকটা পাওয়াই গেছে তখন তার দখল কিছুতেই ছাড়া হবে না। ধনুয়া মরিয়া হয়ে বারহৌলি মধিপুরার অচ্ছুৎদের ধারাবনীতে ডেকে এনে বোঝায়, ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা'র ভূমি-সেনাদের পরদিন থেকে ফসল তো কাটতে দেওয়া হবেই না, রক্ত ঘাম এবং বছরের পর বছর বিপুল পরিশ্রমে চাষের উপযুক্ত করে তোলা ভূখণ্ডের দখলও কোনোভাবেই ছাড়া হবে না। এ-জন্য সবাইকে এককাট্টা হয়ে লড়তে হবে। শুনে অচ্ছুতেরা ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। প্রথমত, আবহমান কাল ধরে লাঞ্ছনা অপমান এবং অত্যাচার সয়ে সয়ে তাদের ধারণা হয়ে গেছে এ সবই অনিবার্য নিয়তি। কোনোদিন জমিমালিক তো অনেক দূরের কথা, কারো বিরুদ্ধেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা এরা ভাবতেই পারে না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রক্তের ভেতর অসীম ভীরুতা প্রায় সংস্কারের মতো ঢুকে গেছে। তার হাত থেকে এই

অচ্ছুৎদের সহজে মুক্তি নেই। প্রথম দিন তারা ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু বেপরোয়া একরোখা ধনুয়া একেবারে নাছোড়বান্দা। আবার তাদের ধরে নিয়ে আসে। বার বার বোঝায়, যে জমিটুকু তারা পেয়েছে সেটা একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে জীবনে আর নিজস্ব খেতির আশা নেই। তারা তো বটেই, তাদের ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়েদের ঘরে যারা জন্মাবে তাদেরও প্রজন্মের পর প্রজন্ম, অনন্তকাল ধরে ভুখা নাঙ্গা ভূমিহীন কিষাণ হয়েই থাকতে হবে।

অনেক বোঝাবার পর কাজ হয়েছিল। দোসাদ চামার ধাঙড় কোয়েরি এবং গাঙ্গোতারা ঠিক করেছিল, প্রথমে তারা তাদের জমির ধানকাটা রুখবে। একদিন সকালে চারপাশের গ্রামের অচ্ছুতেরা ধারাবনীতে এসে জড়ো হবে। সেখান থেকে দল বেঁধে যাবে পুবের পাহাড়ের নিচে তাদের সেই ফসলের খেতগুলোতে। ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলালের লোকেরা সহজে ছেড়ে দেবে না, লাঠি বন্দুক নিশ্চয়ই চালাবে। তবু আজন্মের ভয় অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তারা। সত্যিই তো প্রাণের ভয়ে জমির দখল ছেড়ে দিলে নতুন করে বিনোবা ভাবের মতো কেউ এই অজ দেহাতে এসে তাদের জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করবেন না। রোগ শোক মহামারী ভুখ মাছি মচ্ছড় এবং অসীম কষ্ট নিয়ে এই সব গাঁয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে।

কথামতো সেদিন ভোর থেকে ধারাবনীর গাঁওবালারা তো বটেই, বারহৌলি এবং মধিপুরা থেকেও অগুনতি মেয়ে-পুরুষ এসে জমা হতে লাগল। রোদ উঠলে তারা পাহাড়ের তলায় ধানকাটা রুখতে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমিতে যাওয়া হ'ল না। হাওয়ায় হাওয়ায় ধনুয়াদের খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা-ও তা জেনে গেছেন। তখন বিহারের এই অখ্যাত নগণ্য অঞ্চল ঘিরে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

ধনুয়ারা যখন বেরুতে যাবে সেইসময় গিরিলালদের ভূমিসেনা এবং পহেল-বানেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের সঙ্গে শান্তিরক্ষার জন্য এসেছিল পুলিশ। অচ্ছুংরা মারমুখী হয়ে শান্তিভঙ্গ করবে, এই খবরটা পুলিশকে আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছিল গিরিলালেরা।

পুলিশ অবশ্য কিছুই বলেনি বা করেনি। নিরাসক্ত দার্শনিকের মতো বন্দুক হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এদিকে অকথ্য গালগাল দিতে দিতে পহেলবানেরা নিরীহ নিরস্ত্র মেয়েপুরুষের ওপর লাঠি চালাতে শুরু করেছিল। কাচ্চাবাচ্চা বুড়োবুড়ি কাউকেই রেহাই দিচ্ছিল না তারা।

'কুত্তার পাল জমিন নিবি? ফসল কাটতে দিবি না?'

'নে ফসল, নে খেতি—' বলে আর লাঠি চালায় পহেলবানেরা। ভূমিসেনারা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দু-চারটে গুঁতো দিলেও তখনও তেমন করে হামলা চালায়নি।

এধারে কান্নাকাটি চিৎকার শুরু হয়ে যায়। ভয়ে আতঙ্কে বুড়োবুড়ি বাচ্চা-কাচ্চারা যে যেদিকে পারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়তে থাকে।

একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো লক্ষ্য করছিল ধনুয়া। পুলিশের নাকের ডগায় এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। হঠাৎ সে ছুটে পুলিশগুলোর কাছে চলে যায়। বলে, 'দেখিয়ে দেখিয়ে, পহেলবানেরা কীভাবে মারছে। ওদের মার থামাতে বলুন—'

পুলিশের দল দাঁত খিঁচিয়ে খিস্তি দিতে দিতে বলে, 'মারেগা নহীঁ তো ক্ষীর খিলায়েগা। শালে গিদ্ধড়—'

ধনুয়া হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করতে থাকে। পাহাড়ের নিচের জমি তাদের হকের জমি, খুন-পসিনা করিয়ে তারা তাতে ফসল ফলিয়েছে। এখন তাদের ন্যায্য ধান কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে গিরিলালদের লোকেরা। বে-কানুনি কাজ তারা কিছুই করেনি, শুধু নিজেদের দাবি ছাড়তে চায় না। এই অপরাধে তাদের এভাবে মারধোর করা হচ্ছে। ধনুয়া থানাদারের পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'বঁচাইয়ে সাহাব, হামলোগোনকো বঁচাইয়ে—'

থানাদার অর্থাৎ পুলিশের দারোগা একটি লাথি হাঁকিয়ে ধনুয়াকে দশ হাত দূরে ফেলে দেয়। বলে, 'শুয়ারকা বচ্চে, তোদের বাপের জমি! বাপের ফসল!' গিরিলালদের পহেলবানেরা যা বলেছিল, দারোগা সেই একই ভঙ্গিতে একই সুরে কথাগুলো বলেছে। অর্থাৎ ধনুয়া বুঝতে পেরেছিল, পুলিশের কাছ থেকে তাদের কোনো আশা নেই।

মোটা ভারী বুটের লাথিতে ধনুয়ার মুখ ফেটে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ তার মাথায় কী এক অনিবার্য পদ্ধতিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। সে লাফিয়ে উঠেই ফের পহেলবানদের দিকে ছুটতে থাকে, নিজের অজান্তেই তার হাত মুঠো পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যায়। তিনটে গ্রামের তাবত অচ্ছুৎকে সে-ই ডেকে এনেছে। তাদের প্রতি তার কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো গলার শির ছিঁড়ে ধনুয়া চিৎকার করে ওঠে, 'রুখ যা, রুখ যা। হোঁশিয়ার।'

লাঠি চালাতে চালাতে থমকে যায় পহেলবানেরা। চিরকাল তারা নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে আর অচ্ছুতেরা মুখ বুজে মার খেয়েছে—এটাই ছিল নিয়ম। কিন্তু এই প্রথম গরীবের চাইতেও গরীব, ভীরু নিরুপায় মানুষগুলোর ভেতর থেকে একজন

অন্তত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ধনুয়াকে ওভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে দেখে অচ্ছুৎদের মধ্যে সেই মুহূর্তে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়, তাদের রক্তের ভেতর বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটতে থাকে। আজন্মের ভীরুতাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাদের মধ্য থেকে সাহসী বেপরোয়া পরাক্রান্ত যোদ্ধার দল যেন বেরিয়ে আসে। পালাতে গিয়েও তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ধনুয়া যেভাবে গর্জে উঠেছে, এমন দৃশ্য পহেলবান এবং ভূমিসেনারা আগে আর কখনও দেখেনি। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের কাছে একেবারেই অভাবনীয়। প্রথমটা তারা হকচকিয়ে যায়। তারপরেই কদর্য খিস্তি করতে করতে ধনুয়ার দিকে তেড়ে আসে।

অচ্ছুতেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে না। ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সে সব না ভেবেই উন্মাদের মতো হাতের সামনে যে যা পায় তুলে নেয় এবং ধনুয়াকে বাঁচাবার জন্য ছুটতে থাকে।

আর তখনই ভূমিসেনারা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো গোটা ধারাবনী গাঁ জুড়ে তাণ্ডব শুরু করে। একদল ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, আরেক দল প্রকাশ্য দিনের আলোয় যুবতী মেয়েদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ইজ্জত নষ্ট করতে থাকে। এক-একটি মেয়ের ওপর সাত-আটজন পর পর অত্যাচার চালিয়ে যায়। তাদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে গাঁওবালারা যখন এগিয়ে আসছে, আরেক দল ভূমিসেনা ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালাতে শুরু করে। আঠারোটা মানুষ তখনই মুখ থুবড়ে পড়ে শেষ হয়ে যায়। ভূমিসেনারা রক্তে আগুনে গণধর্ষণে ধারাবনী গাঁ-টাকে পুরোপুরি নরক বানিয়ে ফেলে।

দেবারতি এবং রাকেশ প্রায় একসঙ্গে শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে ওঠে, 'পুলিশের চোখের সামনে এই সব হয়েছে?'

'হাঁ।'

'পুলিশ কিছুই করেনি?'

'একগো অংলি ভি তোলেনি। সিরিফ দাঁত বার করে হেসেছে আর বলেছে অচ্ছুতিয়াদের পঙ্খ গজিয়েছে, ভূচ্চরের ছৌয়াদের বিলকুল ঠাণ্ডা করে দে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। পুরনো ভয়াবহ স্মৃতি চোখের সামনে যেন ফুটে উঠতে থাকে ধনুয়ার। তার দু'চোখ প্রথমে জলে ভরে যায়, পরক্ষণেই মুখটা হিংস্র হয়ে ওঠে। সে আবার শুরু করে এভাবে। গুলি এবং ধর্ষণের পর আর রুখে দাঁড়াতে সাহস হয়নি অচ্ছুৎদের। চিরকাল তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু

চোখের সামনে এমন বীভৎস হত্যা, এত রক্ত, এত আগুন এবং ধর্ষণ আগে আর কখনও তারা দেখেনি। আগুনের ফুলকির মতো যে সাহসটুকু আচমকা তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এক ফুঁয়ে তা নিভে যায়। প্রতিরোধের এবং প্রতিবাদের সব ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা এই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। নইলে একটা লোকও আর বেঁচে থাকত না, বাকি মেয়েদেরও সর্বনাশ হয়ে যেত।

ধারাবনী গ্রামটাকে একটা ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে ভূমিসেনা এবং পহেলবানেরা দুপুরের আগেই ফিরে যায়। বিকেলে আবার তারা এখানে ফিরে এসেছিল। বেশির ভাগ মানুষ পালিয়ে যাবার পর যে ক'জন তখনও তাদের গাঁয়ে পড়ে ছিল তাদের উদ্দেশে বন্দুক নাচিয়ে শাসিয়ে গেছে, কারো কাছে তারা যদি সকালবেলার ব্যাপারে মুখ খোলে, জানে খতম করে দেওয়া হবে।

ভূমিসেনাদের তাণ্ডব শেষ হবার আগেই পুলিশ চলে গিয়েছিল। তারা ফের আসে পরের দিন দুপুরে, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে এবং এলোপাথাড়ি কয়েকটা লোককে কোত্থেকে ধরে চালান করে দেয়।

সেই যে ধনুয়ারা এই জঙ্গলে এসেছিল, তারপর থেকে আর গাঁয়ে ফিরে যেতে সাহস করেনি। ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা'র মনোভাব না বুঝে তারা আর ফিরে যাবে না। সিং আর ঝা যদি এখনও গুস্‌সা পুষে থাকে তা হলে ফিরে গেলে কেউ আর বাঁচবে না, নির্ঘাত ভূমিসেনাদের নতুন করে লেলিয়ে দিয়ে তাদের খতম করে ফেলবে। তাদের পুরো রাগটাই ধনুয়ার ওপর, কেননা সে-ই তিন গ্রামের তাবত অচ্ছুৎকে জড়ো করে জমিমালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে চুপ করে যায় ধনুয়া।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। গাছের মাথায় পাখিদের ডাকাডাকি এবং ঝিঁঝিদের অক্লান্ত বিলাপ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই।

একসময় রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'পুলিশ কাদের ধরেছে তুমি জানো?'

ধনুয়া বলে, 'শুনেছি, পাসোয়ান বজরঙ্গী চৌধারী আর বৈজনাথকে ধরেছে।'

'এরাই খুনটুন করেছে?'

'নহী'। এরা পহেলবান। লাঠি-উঠি চালিয়েছে ঠিকই তবে খুনী হ'ল ভূমিসেনারা, তাদের হাতেই বন্দুক ছিল। পুলিশ ভূমিসেনাদের একজনকেও ধরেনি।'

'কেন ধরেনি বলতে পারো?'

ধনুয়া জানায়, ধরার কোনো প্রশ্নই নেই। গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী

সিংয়ের কাছে তাদের শির বিকিয়ে আছে।'

দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'যারা গুলি চালিয়েছে, মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে, তাদের চেনো?'

'চিনি, আমি কেন, তিন গাঁওয়ের সবাই চেনে।'

'তাদের নামগুলো বল।'

'মানকালাল, মংরু, হোরিচাঁদ, মনেন্দর, ভোলা, এতোয়ার, পাবন, ভৌরা, লছমন, গৈবী আউর মহেশ্বর।'

'যে মেয়েদের সর্বনাশ হয়েছে তারা কোথায়?'

'জঙ্গলেই আছে। ঝোপড়ি থেকে ওরা বেরোয় না। আমার জেনানা ত বেহোঁশ হয়ে আছে। অন্য মেয়েগুলো দিনরাত কাঁদে। রো-রোকে উনলোগোন মর যায়েগী।'

একটু চুপ। তারপর দেবারতি বলে, 'তোমরা পাটনা গিয়ে মন্ত্রীদের এসব কথা জানিয়ে আসোনি কেন?'

ধনুয়া জানায়, কোথায় পাটনা টৌন তারা জানে না। ওই শহরটার নামই শুধু কানে শুনেছে। ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরা গাঁয়ের অচ্ছুতেরা বিশ-পঁচিশ মাইলের বাইরে যে বিশাল পৃথিবী ছড়িয়ে আছে সেখানে কোনো দিন পা বাড়ায়নি। কোনোরকম ধারণাই নেই বাইরের জগৎ সম্পর্কে। আর মনিস্টাররা কোথায় থাকেন, কীভাবে তাঁদের ধরতে হয়, তারা জানে না।

দেবারতি বলে, 'সাহস করে তোমরা থানা ঘেরাও করলে না কেন?'

অদ্ভুত হাসে ধনুয়া। বলে, 'মেমসাব, পুলিশের চোখের সামনে ভূমিসেনারা গাঁওবালাদের খুন করল, মেয়েদের ইজ্জৎ নিল, ঘরে আগুন দিল। ফির তাদের কাছে গিয়ে কা ফায়দা? থোড়েসে আগেই ত বললাম, থানার চুল বিকিয়ে গেছে। কৌঈ ফায়দা নহী। ওখানে গেলে পুলিশ অফসর আমাদেরই গারদে ভরে দেবে।'

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। জঙ্গলের ওপর দিয়ে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। পোকা-মাকড় এবং শস্যকণা অর্থাৎ খাদ্যের খোঁজে যে সব পাখি দূরে চলে গিয়েছিল তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে। গাছপালার মাথায় এখন তাদের অশ্রান্ত চেঁচামেচি এবং ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। চারপাশে ঝিঁঝির ডাক আরও বেড়ে গেছে।

রাকেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছ, চলছে কী করে? খাচ্ছ কী?'

ধনুয়া জানায় রাতের অন্ধকারে তারা ধারাবনীতে চলে যায়। যার ঘরে যেটুকু চাল গেঁহু মকাই বা বাজরা ছিল, সব নিয়ে এসেছে। তা ছাড়া খাদ্যের সন্ধানে

দিনের বেলা এই বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। মজা নহরে প্রচুর মাছ আছে। নানা-রকম বুনো ফল, মেটে আলু, কন্দ, কচু, সুথনি রয়েছে। তবে জঙ্গলের খাবার তো অফুরন্ত নয়। তার ওপর ভরসা করে বেশি দিন চলতে পারে না। শিগগিরই পেটের দানাপানি যোগাড়ের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

টেপটা বন্ধ করে দেবারতি বলে, 'অন্ধকার হয়ে গেল। এবার আমাদের ফিরতে হবে। আজ যাই। কাল আবার আসব।'

উদাসীন ভঙ্গিতে ধনুয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপলোগোনকা মর্জি।'

'কাল সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলব। তোমাদের ফোটোও তুলব।'

ধনুয়া ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়।

এদিকে কে যেন ঘুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চারপাশের অন্ধকার তাতে খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে।

দেবারতি এবং রাকেশ উঠে পড়ে। ধনুয়া আনোখীকে বলে, 'চাচা, সাহাব আউর মেমসাবকে তুমি কাচ্চীতে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

আট

জঙ্গলের বাইরে কাঁচা সড়ক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে আনোখী। এখন রাকেশ এবং দেবারতি পাশাপাশি দুধলিগঞ্জের পি. ডব্লু. ডি. বাংলোর দিকে চলেছে।

চৈত্র মাসের শেষাশেষি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও এক ফোঁটা মেঘ বা কুয়াশা নেই। মাথার ওপর যতদূর চোখ যায় অনন্ত নক্ষত্রমালা আলোর বুটির মতো ছড়িয়ে আছে।

চলতে চলতে দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'কাল আপনি ধনুয়াদের ওখানে যাচ্ছেন তো?'

রাকেশ বলে, 'নিশ্চয়ই।'

'ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নেবেন।'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু রাস্তার ধারের গাছে গাছে কামার পাখিরা থেকে থেকে ডেকে উঠছে।

দেবারতি একসময় বলে, 'এখানে না এলে ভাবতে পারতাম না, এখনও ইণ্ডিয়ার কোনো কোনো জায়গায় ফিউডাল এজ চলছে।'

আস্তে মাথা নাড়েন রাকেশ, 'হুঁ।'

'পার্লামেণ্টে এত আইন পাশ হ'ল, কনষ্টিটিউসানে সব মানুষকে ইকোয়েল রাইটস দেওয়া হ'ল, একের পর এক ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, তবু ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরা গ্রামের মানুষেরা কোন লেভেলে পড়ে আছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে দেবারতি। বলে, 'এদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু একটা করা দরকার। করতেই হবে কিছু। কলকাতায় ফিরে—'

'কী ?'

'আমার যা কাজ, প্রথমে তা-ই করব। কাগজে এখানকার মারাত্মক অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টিং করে দিল্লী যাব। মিনিস্টারদের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত জানাবো। টেপ, ফোটো, পেপার কাটিং এম. পি-দের হাতে দিয়ে বলবো আপনারা পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলুন। সারা দেশ জুড়ে ঝড় তুলতে না পারলে কিছু হবে না। প্রতিটি মানুষকে এদের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।'

'গুড আইডিয়া।'

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে রাকেশের দিকে তাকিয়ে দেবারতি বলে, 'আপনি কী করবেন ভাবছেন ?'

'আমি—' একটু চিন্তা করে রাকেশ বলেন, 'দেখি কী করতে পারি।'

দেবারতি বলে, 'আপনি কিন্তু এদের ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।'

'আপনার ধারণা, আমার অনেক ক্ষমতা—তাই না ?'

'তা-ই।'

'কী করে এই ধারণা হ'ল ? আপনি তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।'

দেবারতি হাসে, 'সবই জানি মিস্টার সহায়। না হলে কী করে বললাম কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন—সেটা আমার জানা।'

কলকাতার এই মেয়ে সাংবাদিকটির মুখে নিজের পদবী শুনে অবাক হয়ে যান রাকেশ। মনে পড়ে, কিছুক্ষণ আগে জঙ্গলে বসে দেবারতি বলেছিল, সে এবং তিনি একই কারণে অচ্ছুৎদের গ্রামগুলোতে এসেছেন। কারণটা কী, স্পষ্ট করে তখন জানায়নি। বলেছিল, পরে এ নিয়ে কথা বলবে।

এবার রাকেশের মনে হয়, তাঁর নামটা অবোধনারায়ণের কাছ থেকে দেবারতি

জেনে থাকতে পারে কিন্তু কেন তিনি এখানে এসেছেন, ঘুণাক্ষরেও অবোধনারায়ণ বা অন্য কাউকেই জানাননি।

পি. ডব্লু. ডি.'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি ছাড়া আর কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে অত্যন্ত গোপনে তিনি ধারাবনীর হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ এবং ঘরে আগুন দেওয়া সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। পৃথিবীর কারো পক্ষেই এটা টের পাবার কথা নয়। তা হলে দেবারতি জানলো কীভাবে?

রাকেশ বললেন, 'কী উদ্দেশ্যে এসেছি, এবার নিশ্চয়ই বলতে পারেন।'

দেবারতি বলে, 'পারি। মিস্টার সহায়, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আপনি নিশ্চয়ই একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। ধারাবনী বারহৌলি মধিপুরার কেসটা আপনার কোর্টে উঠেছে। কিন্তু সাক্ষী আর এভিডেন্স পাচ্ছেন না। আমার ধারণা নিজের চোখে সমস্ত কিছু দেখতে আর উইটনেস যোগাড় করতে আপনার এখানে আসা—তাই তো?'

রাকেশ হকচকিয়ে যান। বলেন, 'এ সব খবর আপনি কোথায় পেলেন?'

দেবারতি হেসে হেসে বলে, 'পেয়েছি কোথাও—'

রাকেশ এবার এতটাই ঔৎসুক্য দেখান যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বলেন, 'প্লীজ বলুন না কোথায় পেয়েছেন—'

দেবারতি বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সাংবাদিকরা খবরের সোর্স জানায় না।'

রাকেশ কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চান না। অবুঝ বালকের মতো সমানে বলে যান, 'প্লীজ বলুন—প্লীজ—'

অনেকক্ষণ পর দেবারতি বলে, 'পাটনার একটা ডেইলির ল' কোর্ট রিপোর্টে ধারাবনীর খবরটা কিছুদিন আগে চোখে পড়েছিল। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশ সহায়ের কোর্টে ওখানকার কেস উঠেছে। কিন্তু ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে আসছে না। আর রাকেশ সহায়ও আইনের কী সব প্যাঁচ বের করে আসামীদের জামিন দিচ্ছেন না। তারপর পি. ডব্লু. ডি. বাংলোতে এসে শুনলাম, রাকেশ সহায় নামে একজন এসেছেন। তিনি নাকি ধারাবনী বারহৌলি আর মধিপুরায় কী একটা জরুরি কাজে যাবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনিও একই কথা জানালেন। এরপর সামান্য বুদ্ধি থাকলে বোঝা কি কঠিন, কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন।'

হতভম্বের মতো দেবারতির দিকে তাকান রাকেশ। বলেন, 'পাটনার কাগজ আপনাদের কলকাতায় যায়?'

'সারা দেশের কাগজ যায়। পাটনা কি ইণ্ডিয়ার বাইরে?'

একটু চুপ করে থেকে রাকেশ বলেন, 'অন্য প্রভিন্সের একটা ছোট্ট ল কোর্ট রিপোর্ট মনে করে রেখেছেন, এটা কিন্তু ভাবতে পারিনি।'

দেবারতি জানায়, দেশের অগুনতি পত্র-পত্রিকায় হাজার হাজার খবরের মধ্যে রিপোর্টটা মনে আছে সেটার অভিনবত্ব এবং ভয়াবহতার কারণে। আঠারো জন মানুষকে পুলিশের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা, আট-দশটি মেয়েকে গ্যাং-রেপ এবং অসংখ্য বাড়িঘরে আগুন ধরানোর পরও একটা স্বাধীন দেশে ক্রিমিনালদের শায়েস্তা করার জন্য একজন সাক্ষীও পাওয়া যায় না, ভয়ে আতঙ্কে কেউ নাকি আসামীদের সনাক্ত করতে আসছে না, এটা মারাত্মক ঘটনা। এই কারণেই রিপোর্টটা মনে থেকে গেছে দেবারতির।

অনেকক্ষণ আগেই জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে এসেছেন রাকেশরা। দু'ধারের মাঠ-প্রান্তর গাছপালা অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে আছে। দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে শিয়াল ডাকছে, গাছের মাথা থেকে ভেসে আসছে কামার পাখিদের চিৎকার আর ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর একটানা চলছে ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপ।

হঠাৎ দেবারতি ডাকল, 'মিস্টার সহায়।'

সারাদিনে কম করে বারো চোদ্দ মাইল হাঁটা হয়েছে। এখনও হেঁটেই চলেছেন রাকেশ। মাথার ওপর সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চৈত্রের আকাশ অনবরত গনগনে রোদ ঢেলে গেছে। তা ছাড়া ছিল প্রচণ্ড টেনসন এবং উত্তেজনা। দুপুরের আগে আগে ধারাবনী গাঁয়ে পোঁছুবার পর থেকে যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে পড়ছে। গোটা দিনের ছোটাছুটিতে শরীরের ভেতরটা যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে রাকেশের। যদিও এই মুহূর্তে প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা আরামদায়ক হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তবু অসীম ক্লান্তিতে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছেন রাকেশ। কোথাও বসে একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হ'ত। কিন্তু রাকেশ জানেন একবার বসলে আজ আর উঠতে পারবেন না। যে-ভাবেই হোক পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় তাঁকে পোঁছুতেই হবে। খোলা মাঠে তো আর রাতভর পড়ে থাকা যায় না।

চলতে চলতে মাথা সামান্য হেলিয়ে রাকেশ তাকান, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।' দেবারতি বলতে থাকে, 'যখন হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম, মনে হয়েছিল এদেশে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু আর নেই। হিউম্যান ভ্যালুজ, সামাজিক দায়িত্ব বোধ-টোধ সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আপনাকে দেখে খুবই আশা হচ্ছে মিস্টার সহায়।'

মনে মনে খুবই সঙ্কোচ বোধ করেন রাকেশ। কুণ্ঠিত মুখে বলেন, 'আমার সম্বন্ধে যতটা ভাবছেন ততোটা মহত্ত্ব কিন্তু আমার নেই।'

'আপনাকে তোষামোদ করে ভাল ভাল কথা বলে আমার বিন্দুমাত্র লাভ নেই মিস্টার সহায়। যা সত্যি তা আমি বলবই।' দেবারতি বলে যায়, 'একজন বিচারক দোষীদের শাস্তির জন্য সাক্ষী খুঁজতে চৈত্রের লু-বাতাস আর গনগনে রোদে মাইলের পর মাইল হেঁটে অচ্ছুৎদের গ্রামে চলে এসেছেন, এমন আর কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।'

'আপনিও তো কতদূর থেকে এখানে ছুটে এসেছেন।'

'ওটা আমার চাকরি। কিন্তু সাক্ষী যোগাড় করা আমার কাজ নয়। এখানে যে এসেছি তার সঙ্গে আমার কেরিয়ার জড়িয়ে আছে। আপনার আসার সঙ্গে আমার আসার অনেক তফাত।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না রাকেশ। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'আমি যে অচ্ছুৎদের গ্রামে এসেছি, দয়া করে সেটা আপনাদের কাগজে লিখবেন না বা কারো সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস্টার সহায়। একজন ম্যাজিস্ট্রেট কতটা ঝুঁকি নিয়ে সাক্ষী খুঁজতে বেরিয়েছেন সেটা আমি বুঝি। এটা জানাজানি হয়ে গেলে ঝড় বয়ে যাবে, আপনার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠবে—তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ব্যাপারটা গোপন থাকবে। আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।'

কৃতজ্ঞ রাকেশ বলেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

আরো কিছুক্ষণ চলার পর দেবারতি বলে, 'কাল আমাদের আজকের থেকেও আগে বেরিয়ে পড়তে হবে। রোদ উঠে গেলে হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হয়।'

রাকেশ ভাবলেন, আজ পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় ফিরে একবার শুয়ে পড়লে কাল কখন উঠতে পারবেন, কে জানে। শরীর জুড়ে যা ক্লান্তি এবং যন্ত্রণা তাতে কাল নড়াচড়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট থাকবে কিনা, এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তবু মুখে বললেন, 'ঠিক আছে।'

একসময় বেশ রাত করেই রাকেশরা পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পৌঁছে যান।

সর্বোধনারায়ণ এবং লছমন ছাড়া এখন আর কেউ জেগে নেই। গাঢ় ঘুমের আরকে দুধলিগঞ্জ পি. ডব্লু. ডি. বাংলোটা ডুবে আছে। চারপাশে গভীর রাত

ঝিম ঝিম করছে। যতদূর চোখ যায় সমস্ত চরাচর এখন নিঝুম।

অবোধনারায়ণ লাউঞ্জে বেতের চেয়ারে আর লছমন নিচে বসে সমানে ঢুলছে এবং অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে মশা মেরে চলেছে। লোহার গেট খোলার আওয়াজ কানে আসতেই দু'জনে চোখ মেলে তাকায়, তারপর তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বোঝা যায় ওঁদের জন্যই অবোধনারায়ণরা ওখানে বসে ছিল।

রাকেশরা লাউঞ্জে উঠে এলে অবোধনারায়ণ বলে, 'আপনাদের জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল স্যার।'

রাকেশ অবসন্ন গলায় বলেন, 'কেন ?'

'সেই কোন সুবে সুবে বেরিয়ে গেছেন। এত রাত হয়ে গেল, তবু ফিরছেন না। ভাবলাম রাস্তা হারিয়ে ফেললেন কিনা।'

'রাস্তা হারাবো কেন ? আপনি তো সব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'

'তা হলে—' বলতে বলতে থেমে যায় আবোধনারায়ণ।

রাকেশ তার মনোভাবটা বুঝতে পেরে বলেন, 'দেরি হ'ল কেন, তা-ই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ব্যাপারে আটকে গিয়েছিলাম।'

কথা বলতে বলতে বার বার অবোধনারায়ণের চোখ দেবারতির দিকে চলে যাচ্ছিল। সে হয়ত ভাবছিল, এঁরা সকালে কেউ কাউকে না জানিয়ে আলাদা আলাদা চলে গিয়েছিলেন। এখন একসঙ্গে ফিরলেন কী করে ? মনে যে প্রশ্নই দেখা দিক, মুখ ফুটে বলতে সাহস হয় না অবোধনারায়ণের।

এদিকে রাকেশ বা দেবারতি লাউঞ্জে উঠে আর দাঁড়ায়নি। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে রাকেশ দেবারতির উদ্দেশে বলেন, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' দেবারতিও তার কামরার দিকে চলে যায়।

অবোধনারায়ণ দেবারতিকে বলে, 'লছমন আপনার ডিনার নিয়ে যাচ্ছে ম্যাডাম।' বলে রাকেশের সঙ্গে তাঁর কামরায় এসে আলো জ্বালিয়ে দেয়, 'স্যার, আপনার ডিনার কখন দেব ?'

'এখনই দিন। বেশি কিছু দরকার নেই। দু' পীস টোস্ট আর এক কাপ দুধ হলেই চলবে।'

'আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। আপনি রেস্ট নিন।'

অবোধনারায়ণ চলে গেলে কোনোরকমে জুতোটুতো খুলে খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো শুয়ে থাকেন রাকেশ। তারপর উঠে বাথরুমে চলে যান।

স্নান-টান করে শরীরটা বেশ তাজা আর ঝরঝরে লাগে। সারাদিনের মারাত্মক ক্লান্তির অনেকটাই কেটে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই রাকেশ দেখতে পান, ট্রে-তে টোস্টের প্লেট এবং দুধের কাপ নিয়ে অপেক্ষা করছে অবোধনারায়ণ।

প্রায় চুপচাপ খাওয়া শেষ করে রাকেশ বলেন, 'কালও ভোরে, অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরুবার ইচ্ছা আছে। আজকের মতো পরোটা-টরোটার ব্যবস্থা করে রাখবেন।'

'রাখব স্যার।'

'আচ্ছা, গুড নাইট।'

'গুড নাইট স্যার—' বলে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আচমকা কী যেন মনে পড়তে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় অবোধনারায়ণ।

তার চোখেমুখে এমন একটা উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত ভাব রয়েছে যাতে অবাক হয়ে যান রাকেশ। জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে কিছু বলবেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।' অবোধনারায়ণ বলতে থাকে, 'ক্ষমা করবেন, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

লোকটা একটু বেশিই বকে। তাকে থামিয়ে দিয়ে রাকেশ বলেন, 'আসল কথাটা বলুন।'

'দুপুরে একটা লোক আপনার আর মিস সেনের খোঁজে এখানে এসেছিল।'

রাকেশ চমকে উঠলেন। পি. ডব্লু. ডি.'র ডেপুটি সেক্রেটারি ছাড়া আর কারো পক্ষে তাঁর এখানে আসার খবর জানা একেবারেই সম্ভব নয়। সতর্ক ভঙ্গিতে রাকেশ প্রশ্ন করেন, 'কে লোকটা ?'

অবোধনারায়ণ বলে, 'চিনি না। নাম বললে তৌহরলাল দাস।'

'একই সঙ্গে আমার আর মিস সেনের কাছে এসেছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো। কী বললে লোকটা ?'

'এম. এল. এ. ত্রিলোকী সিংজি আর জমিমালিক গিরিলালজি নাকি তাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে।'

রাকেশ হকচকিয়ে যান, 'কেন ?'

'বলতে পারব না।'

'ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা কী করে জানলেন, আমরা এখানে আছি ?'

'জানি না স্যার।'

'লোকটা কোথায় থাকে জানেন ?'

'না। আগে আর কখনও তাকে দেখিনি।'

একটু চিন্তা করে রাকেশ এবার বলেন, 'লোকটা আর কিছু বলে গেছে ?'

অবোধনারায়ণ বলে, 'কাল আবার আসবে। যা বলার আপনাদেরই বলবে।'

'কাল কখন আসবে ?'

'তা কিছু বলেনি।'

'মিস সেনকে লোকটার কথা জানিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনার এখানে আসার আগে ওঁর কামরায় গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে।'

অবোধনারায়ণ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কাল আপনারা তো সুবে সুবে বেরিয়ে যাচ্ছেন।'

রাকেশ সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকান, 'হ্যাঁ, কেন ?'

'লোকটা এলে কী বলব ?'

'কী আর বলবেন ! ও যখন আসবে তার ভেতর যদি আমরা ফিরতে পারি, দেখা হবে। না হলে কী আর করা—'

'আমার মনে হয় আপনাদের জন্যে তৌহরলাল অপেক্ষা করবে।'

'সেটা তার ইচ্ছা।'

'আমি এখন যেতে পারি স্যার ?'

'আসুন।'

অবোধনারায়ণ চলে যায়।

রাকেশ দরজা বন্ধ করে অন্যমনস্কর মতো বিছানায় এসে শুয়ে পড়েন। স্নানের পরও শরীরে যে ক্লান্তি রয়েছে, সমস্ত রাত একটানা ঘুমের পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু প্রচণ্ড এক টেনসান অনেক রাত পর্যন্ত তাঁকে ঘুমোতে দেয় না।

নয়

রাকেশ ভেবেছিলেন, পরদিন হয়তো ঘুম ভাঙতে ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। কিন্তু রোদ ওঠার ঢের আগেই জেগে গেলেন।

মুখটুখ ধুয়ে পোশাক বদলাতে না বদলাতেই অবোধনারায়ণ এবং লছমন চা কেক আর দুপুরের জন্য খাবারের প্যাকেট ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির। তারা জানায়, দেবারতিও উঠে পড়েছে এবং এখন তার কামরায় বসে চা খাচ্ছে।

রাকেশ চায়ের কাপে যখন শেষ চুমুকটা দিয়েছেন সেই সময় কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দেবারতি এ ঘরে আসে। বলে, 'রেডি?'

রাকেশ কাপ নামিয়ে রেখে উঠে পড়তে পড়তে বলেন, 'হ্যাঁ।'

আজ আর ভুল হয়নি। একটা চামড়ার সাইড ব্যাগে ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, নোটবুক-টুক আগেই গুছিয়ে ভরে রেখেছিলেন। ব্যাগটা তুলে নিয়ে দেবারতির সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। বাইরে আসতেই চোখে পড়ে আকাশ জুড়ে অগুনতি তারা। এখনও বেশ খানিকটা রাত রয়েছে।

পি. ডব্লু. ডি. বাংলো পেছনে ফেলে খানিকটা যাবার পর রাকেশ বলেন, 'অবোধনারায়ণের কাছে নিশ্চয়ই তৌহরলালের কথা শুনেছেন।'

দেবারতি বলল, 'শুনেছি।'

'ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা আমাদের খবর কী করে পেল, বুঝতে পারছি না।'

'ডেফিনিটলি ওদের কোনো সোর্স আছে। এই এরীয়ায় নতুন কেউ এলে তাদের ওপর খুব সম্ভব নজর রাখা হয়। বিশেষ করে ওই রকম মার্ডার আর রেপ-টেপের পর।'

'তা-ই হবে।'

'ঝা আর সিং আমাদের কাছে কেন লোক পাঠিয়েছে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'না। তবে মোটিভ নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো নয়। মনে হচ্ছে, তৌহরলাল আজ আমাদের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। ওর সঙ্গে কথা বললে সব বোঝা যাবে।'

'হ্যাঁ। ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।'

জঙ্গলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রোদ উঠে যায়। পুবের বাতাস এখনও তেতে ওঠেনি। চৈত্রের এই সকাল বড় স্নিগ্ধ, আরামদায়ক। সমস্ত চরাচর জুড়ে অগাধ প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে।

কালকের মতো আজও জঙ্গলের মাঝখানে মজা নহরের পাড়ে কিছু লোকজন দেখা গেল। তাদের ভেতর বুড়ো আনোখীও রয়েছে। রাকেশদের খাতির করে বসিয়ে সে শশব্যস্তে ধনুয়াকে তার চালা থেকে ডেকে আনে।

ধনুয়া অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'আপনারা এসে গেছেন?'

দেবারতি বলে, 'কালই তো বলে গেলাম আজ আসব।'

'তা বলেছিলেন। তবে—'

'কী ?'

'আমার মনে হয়েছিল, আজ আসবেন না।'

'কেন ?'

ধনুয়া এবার যা বলে তা এইরকম। টৌনের সাহাব এবং মেমসাব ঝোঁকের মাথায় অচ্ছুৎদের দুঃখের কথা শুনে ছুটে এসেছেন। ঝোঁক কেটে গেলে সে-সব তাঁদের মনেও থাকবে না।

রাকেশ সামান্য হেসে বলেন, 'দেখলে তো, তোমাদের কথা আমাদের মনে আছে কিনা—'

ধনুয়াকে স্বীকার করতে হয়, মনে আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এদিকে রাকেশ এবং দেবারতির আসার খবর পেয়ে দূরের চালাগুলো থেকে আরও কিছু লোকজন বেরিয়ে এসেছে।

সূর্য এতক্ষণ ঢিমে তালে পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে উঠে আসছিল। এবার দ্রুত ওপর দিকে ছুটতে শুরু করেছে। রোদের রং বদলে যাচ্ছে। বাতাস ক্রমশ তেতে উঠছে। এখনও আকাশে কিছু কিছু পাখি চোখে পড়ছে। রোদ যত গনগনে হয়ে উঠবে, পাখিরা ততই আকাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

একসময় ধনুয়া বলে, 'আজ কী জানতে চান বলুন—'

রাকেশ টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে বলেন, 'ভূমিসেনারা ক'জন মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে ?'

'লগভগ এগার জন—'

'আমরা তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা দেখা করে কথা বলতে চাই।'

'এগার জনকে এখানে পাবেন না। পাঁচ আওরত এই জঙ্গলে চলে এসেছে। দো আওরত ধারাবনীতেই আছে। বাকি চারজন কোথায় পালিয়েছে, বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে, এখানকার পাঁচজনের সঙ্গে এখন কথা বলি। পরে অন্যদের খোঁজ করব। তুমি এখন ব্যবস্থা করে দাও।'

'ঠিক হ্যায়, আইয়ে।'

রাকেশ এবং দেবারতিকে নিয়ে মজা নহরের ওপারে একটা ঝুপড়ির সামনে চলে আসে ধনুয়া। বাকি লোকজন তাদের সঙ্গে আসছিল। আনোখী ছাড়া তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ধনুয়া। সে ডাকে, 'লাজো—লাজো—'

ঝুপড়ির ভেতর থেকে ভীরু গলা ভেসে আসে, 'কা ?'

'বাইরে আয়।'

'কায়?'

রাকেশ এবং দেবারতির উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয় ধনুয়া।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে লাজো ভেতর থেকেই বলে ওঠে, 'নহীঁ। বড়ী সরমকা বাত।'

ধনুয়া বলে, 'সাহাব আউর মেমসাব আচ্ছা আদমী। আমাদের দুখভরি কহানি শুনে টৌন থেকে ছুটে এসেছে। বাইরে আয়।'

'নহীঁ।'

'নহীঁ নহীঁ করিস না।'

'নহীঁ।'

'তুই চাস না সিংজি আউর ঝা'জির পহেলবান আউর ভূমিসেনারা জেহেল (জেল) খাটুক, হারামজাদকা ছৌয়াগুলোর বুকে শুখা চানা ডলা হোক?'

উদাসীন গলায় লাজো জানায় সর্বশক্তিমান ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা'র লোকেদের চামড়ায় একটা টোকা মারার ক্ষমতা কারো নেই—জেলে পুরে বুকে শুকনো চানা ডলা তো অনেক দূরের কথা।

'তুই তা হলে বাইরে আসবি না?' ধনুয়া একটু হতাশ হয়েই এবার প্রশ্নটা করে।

'বলেছিই তো—না।'

ধনুয়া দেবারতিদের দিকে তাকায়। বলে, 'লাজোকে তো ঝোপড়ির বাইরে আনতে পারলাম না। এখন কী করবেন?'

দেবারতি বলল, 'যখন লজ্জা পাচ্ছে, জোর করতে হবে না। আরো তো ক'জন আছে। তাদের কাছে চল।'

দেবারতিদের সম্পর্কে প্রথম দিকে ধনুয়ার মনে খটকা ছিল। কিন্তু তাদের যত দেখছে ততই ভালো লাগছে, সংশয় কেটে যাচ্ছে। দুনিয়ায় কেউ যখন তাদের খবর নেয় না, তারা যখন পহেলবান এবং ভূমিসেনাদের ভয়ে গাঁ ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তখন বহুদূরের শহর থেকে এই দুই 'পড়িলিখী' সাহাব এবং মেমসাব প্রচুর কষ্ট করে আর প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। এঁরা ঝা'জি এবং সিংজির বিরুদ্ধে কতটা কী করতে পারবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ধনুয়ার। তার ধারণা, ঈশ্বরের চেয়েও প্রতাপান্বিত এই দু'জনের চুলের ডগা ছোঁয়ার মতো ক্ষমতা স্বর্গমর্তে কারো নেই। তবু নিরস্ত্র একটি পুরুষ এবং তরুণীর প্রচণ্ড সাহস এবং আন্তরিকতা ধনুয়াকে ক্রমশ মুগ্ধ করেছে। ধনুয়া বলে, 'আইয়ে হামনিকা সাথ—'

খানিক দূরে আরেকটা ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় তিন জন। তাদের পেছনে বুড়ো আনোথী।

ধনুয়া ডাকাডাকি শুরু করে, 'এ গন্না—'

ঝুপড়ির ভেতর থেকে মেয়েমানুষের গলা ভেসে আসে, 'ঘরমে নহী' রে ধনুয়া—'

ধনুয়া বলে, 'কোথায় গেছে তোর মরদ?'

মেয়েমানুষটি বাইরে আসে না। ভেতর থেকেই জানায়, তার মরদ অর্থাৎ গন্না অন্ধকার থাকতে থাকতেই ধারাবনী গাঁয়ে চলে গেছে। ধারাবনীতে তাদের ঘরে কিছু বাজরা আর গম ফেলে রেখে এসেছিল। গন্নার উদ্দেশ্য, লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলো নিয়ে আসা। গন্না সম্পর্কে খবরটা দিয়ে মেয়েমানুষটি শুধোয়, 'কুছ জরুরত হ্যায়?'

'হাঁ। বাইরে আয় পতিয়া।'

একটু পর পতিয়া নামের যে যুবতীটি বেরিয়ে আসা তার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে দেবারতিরা। তার ঠোঁট গাল এবং থুতনির কয়েক জায়গায় দগদগে ঘা। কেউ বা কারা যেন দাঁত এবং নখে খাবলা খাবলা চামড়া এবং মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। ঘাগুলো সেই কারণে।

পতিয়া নতুন লোকজন দেখে থমকে গিয়েছিল। এক পলক দেবারতিদের দিকে তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নেয়।

ধনুয়া বলে, 'আমি গন্নার কাছে আসিনি। জরুরতটা তোর সঙ্গে।'

মুখ না তুলে পতিয়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কা জরুরত?'

রাকেশদের সঙ্গে পতিয়ার পরিচয় করিয়ে তাঁদের এখানে আসার কারণটা জানিয়ে দেয় ধনুয়া। তারপর খুব নরম গলায় শুধোয়, 'ঘরে গন্না নেই। তুই কি সাহাব ঔর মেমসাবকে তোর দুখের কথা বলবি?' অর্থাৎ মরদ ঘরে নেই, এই অবস্থায় তার আওরতের মুখ থেকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং লজ্জাজনক এক ঘটনার কথা বের করতে খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে ধনুয়ার।

প্রথমটা হকচকিয়ে যায় পতিয়া। ক্রমশ তার দু' চোখ জলে ভরে যেতে থাকে। তারপরই সজল চোখের ভেতর থেকে আগুনের হল্কা ঠিকরে বেরিয়ে আসে। সে বলে, 'জরুর কহুঙ্গি। আমার সবই তো ওরা খতম করে দিয়েছে। ডরনেকা কুছ নহী', শরমানেকা ভি কুছ নহী'।'

লাজোর সঙ্গে পতিয়ার তফাতটা বুঝতে অসুবিধা হয় না রাকেশদের। আজ লাজো লজ্জায় গ্লানিতে তাঁদের সামনে বেরোয়নি, ঝুপড়ির ভেতর মুখ লুকিয়ে

বসে ছিল। কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে, সর্বনাশের শেষ মাথায় পৌঁছে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পতিয়া। সে জানে তার যা ক্ষতি হয়ে গেছে, তারপর আর হারাবার কিছু নেই।

'সাহাব, মেমসাব—' আঙুল বাড়িয়ে পতিয়ার মুখের ক্ষতগুলো দেখাতে দেখাতে ধনুয়া বলে, 'দেখুন, জানবরেরা পতিয়ার কী হাল করেছে। বোল্ পতিয়া, আপনা মুহ্ সে বোল্—'

পতিয়া শুরু করতে যাবে, রাকেশ হঠাৎ বলে ওঠেন, 'এক মিনিট, আগে তোমার একটা ছবি তুলে নিই।' কাঁধের ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে দ্রুত শাটার টিপে বলেন, 'চল, আমরা ওই ঘাসের জমিতে গিয়ে বসি। ওখানে বসে তোমার কথা শুনবো—'

কিছু দূরে শুকনো, হলদে ঘাসে-ভরা একটুকরো জমিতে গিয়ে ওরা বসে। মাঝখানে পতিয়া, তার মুখোমুখি রাকেশ এবং দেবারতি। তার ডান পাশে ধনুয়া এবং পেছনে আনোখী।

দেবারতি টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে ইন্টারভিউ নেবার ঢংয়ে জিজ্ঞেস করে, 'প্রথমে তোমার নাম বল—'

পতিয়া নাম বলে।

'জাত ?'

'গাঙ্গোতা।'

'তোমার মরদের নাম ?'

স্বামীর নাম দেহাতী মেয়েরা মুখে আনে না। পতিয়া চুপ করে থাকে।

পাশ থেকে ধনুয়া অবশ্য নামটা বলে দেয়। ভালো নাম গণেশ, ডাকনাম গন্না। গন্না নামটাই মুখে মুখে চালু রয়েছে।

'তোমাদের গাঁওয়ের নাম ?' দেবারতি আবার প্রশ্ন করে।

'ধারাবনী।'

'তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি ?'

'একগো নহী।'

'বিয়ে হয়েছে কতদিন ?'

'চার সাল।'

'জমিজমা কতটা ?'

পতিয়া জানায়, আগে তাদের এক ধুর মাটিও ছিল না। কয়েক বছর আগে কয়েক বিঘা পাথুরে পড়তি জমি তারা পেয়েছে। তবে সে ফসল ঘরে তুলতে পারেনি।

'ফসলের কথায় পরে আসছি। তার আগে জানতে চাই, এতকাল তোমাদের পেট চলেছে কী করে?'

'তারলোকী সিংজি আর গিরিলাল ঝা'জির জমিনে চাষের কাজ করে।'

'ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'কে চেনো?'

'হাঁ হাঁ জরুর। সিংজি ইধরকা এস্লে, বহোত বড়ে আদমী, কেত্তে জমিন উনকো। গিরিলালজি ভি বড়ে আদমী, বহোত বড়ে জমিমালিক। ইধরিকা যেত্তে যেত্তে জমিন হ্যায় সব কুছ ইন দোনোকা—'

'এঁদের তুমি দেখেছ?'

'হাঁ, জরুর।'

'কত বার?'

এক মুহূর্ত চিন্তা না করেই পতিয়া বলে, 'কমসে কম এক দো-শো বার।'

'আমরা শুনেছি ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা তোমাদের পড়তি জমি দানপত্র করে দিয়েছিলেন।'

'হাঁ।'

'যতদিন ওইসব খেতে ফসল ফলেনি ততদিন ওঁরা চুপচাপ ছিলেন। তারপর যেই ধান ফলল অমনি পহেলবান আর ভূমিসেনা পাঠিয়ে কেটে নিতে শুরু করল। তাই তো?'

'হাঁ। ওদের সাথ সাথ পুলিশ ভি এসেছিল।'

'কিন্তু এভাবে ফসল কেটে নেবে, এটা তোমরা মেনে নিতে চাওনি—কেমন?'

'হাঁ। ধন্নুয়া ভেইয়া বলল, এত্তে মেহনত করে খুন-পসিনা ঝরিয়ে ধান ফলিয়েছি। কিছুতেই তা ছিনিয়ে নিতে দেব না।'

'তারপরেই গণ্ডগোল বাধলো, কেমন কিনা?'

'হাঁ।'

'ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা তোমাদের গাঁয়ে ভূমিসেনা আর পহেলবান পাঠিয়ে দিলে—'

'হাঁ।'

'তারপর কী হ'ল বল—'

পহেলবান এবং ভূমিসেনারা কীভাবে ধারাবনীর ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, কীভাবে ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিনের আলোয় বন্দুকের গুলিতে আঠারোটি মানুষকে হত্যা করেছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে পতিয়া বলে, 'এর সাথ সাথ জানবরেরা আওরতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।'

দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'কারা তোমার সর্বনাশ করেছে, মনে করতে পারো ?'

'জরুর।' ঘৃণায় এবং অসহ্য রাগে চোখের তারা দুটো ধক ধক করতে থাকে পতিয়ার।

'কী নাম তাদের—জানো ?'

'জানি। চারগো কুত্তা—গৈবী, ভৌরা, মনেন্দর আউর নানকালাল।'

'ওদের এখন দেখলে চিনতে পারবে ?'

'এখন কেন, মৌত (মৃত্যু) না হওয়া পর্যন্ত ভূচ্চরের ছৌয়াদের আমি ভুলছি না। মওকা মিল যায় তো উয়ো জানবর লোগোনকা জান লে লুঙ্গি।'

'ঠিক আছে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এবার ঘরে যাও।'

পতিয়া নিস্পৃহ চোখে একবার দেবারতি এবং রাকেশের দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে উঠে নিজেদের ঝুপড়ির দিকে চলে যায়।

দেবারতিরাও উঠে পড়েছিল। রাকেশ ধনুয়াকে বললেন, 'এবার ?'

ধনুয়া কয়েক পলক চিন্তা করে বলে, 'চলুন, আপনাদের পারোর কাছে নিয়ে যাই।'

এরপর পারো এবং লাগু নামের দুটি যুবতীর ফোটো তোলেন রাকেশরা এবং আলাদা আলাদা ভাবে তাদের স্টেটমেণ্টও রেকর্ড করা হয়।

এগারোটি ধর্ষিতার মধ্যে যে পাঁচ আওরত এই জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে তাদের তিন জনের ফোটো এবং স্টেটমেণ্ট নেওয়া সম্ভব হয় কিন্তু দু'জন বাদ থেকে যায়। একটি মেয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে ঝুপড়ি থেকে বেরই হয় না আর ধনুয়ার আওরত তো বেহুঁশ হয়েই ঝুপড়িতে পড়ে আছে।

তিনটি লাঞ্ছিতা যুবতীর স্টেটমেণ্ট এবং ফোটো নিতে নিতে সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে। চৈত্রের শানানো রোদে এখন ছুরির ধার।

দেবারতি বলল, 'এখন কী করতে চান ?'

রাকেশ বলেন, 'সব রেপড গার্লেরই স্টেটমেণ্ট নেওয়া দরকার।'

'ধারাবনীতে গেলে দু'জনকে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাকি মেয়েগুলোকে ট্রেস করব কী করে ?'

'যেভাবে হোক করতেই হবে। কেসটাকে স্ট্রং করে দাঁড় করাতে হলে অন্ত

মেয়েগুলোকে খুবই দরকার।'

'হ্যাঁ।' একটু ভেবে দেবারতি বলে, 'পরে ওদের খোঁজ করা যাবে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখন কিছু খেতে না পারলে স্রেফ মরে যাব।'

রাকেশ হাসেন, 'খিদেতে আমার মাথাও ঝিম ঝিম করছে। সেই কোন ভোরে চা কেক খেয়ে বেরিয়েছিলাম।' বলতে বলতে ধনুয়া এবং আনোখীর দিকে ফেরেন, 'তোমরা খেয়ে এসো।'

'আপনারা ?'

'আমাদের সঙ্গে খাবার আছে। তোমরা খেয়ে এলে অন্য কাজ আছে।'

ধনুয়ারা চলে যায়। একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছের তলায় গিয়ে বসে দেবারতি এবং রাকেশ। নিজের নিজের ব্যাগ থেকে পরোটা, ভাজি, প্যাঁড়া এবং ওয়াটার বটল বের করে নেয় দু'জনে।

খেতে খেতে দেবারতি বলে, 'এখানকার রেপড মেয়েদের স্টেটমেণ্ট আর ফোটো নেওয়া হয়েছে। এবার পুরুষদের নিতে হবে।'

রাকেশ আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেন, 'হুঁ।'

'সকলেরটা নেওয়া কি দরকার ?'

'নিতে পারলে ভালো হয়।'

দেবারতি একটু চিন্তা করে এবার বলে, 'কালকের ভেতর এখানকার কাজ সেরে পরশু ধারাবনীতে যাব ভাবছি।'

রাকেশ শুকনো পরোটা চিবোতে চিবোতে বলেন, 'হ্যাঁ। ওখানে যেতে তো হবেই। ওটাই তো প্লেস অফ অকারেন্স।'

'তারপর বারহৌলি আর মধিপুরায় যাব। মোট কথা মার্ডার রেপ আর আর্সনের ব্যাপারে যেখান থেকে যা প্রমাণ পাওয়া যায়।'

'ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'র সঙ্গে দেখা করার দরকার আছে কি ?'

হঠাৎ রাকেশের মনে পড়ে যায়, কাল ঝা এবং সিং তাদের জন্য পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার দেখা করার ইচ্ছা নেই। তবে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ওদের কিছুই যায়-আসে না। যতই লুকিয়ে চুরিয়ে থাকি না, ওদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়নি। কাল—'

রাকেশের কথার মাঝখানেই দেবারতি বলে ওঠে, 'আরে তাই তো, কাল ঝা আর সিংয়ের লোক এসেছিল। আমরা না চাইলেও মনে হচ্ছে ওরা আমাদের সঙ্গে দেখা করবেই।'

'হুঁ।'

'পরে যা হবার হবে, আপাতত এখানকার কাজটা তো সেরে ফেলি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ দু'জনে খেয়ে নেয়। মাথার ওপর কর্কশ গলায় কাক ডাকতে থাকে। এ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথায়ও কোনো শব্দ নেই। রোদের দিকে এখন তাকানো যাচ্ছে না, চরাচরের ওপর দিয়ে আগুনের স্রোত খেলে যাচ্ছে।

একসময় রাকেশ বলেন, 'ওরা আমাদের কাছে কী চায় বলতে পারেন?'

দেবারতি বলে, 'না পারার কিছু নেই। বোঝাই যাচ্ছে, যারা এখানে রেপ, মার্ডার করেছে তারা ওদের লোক। আমরা এসবের প্রমাণ-ট্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি। এটা ওদের পক্ষে বিপজ্জনক। ওরা যেভাবে পারে আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করবে। তবে—'

'কী?'

'দে আর ইনটেলিজেন্ট পীপ্‌ল্। ওরা জানে ধনুয়াদের যেভাবে টরচার করা যায়, আমাদের বিরুদ্ধে সেই পদ্ধতিটা চলবে না। নইলে অনেক আগেই মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত। অবশ্য আমাদের নিয়ে সিং আর ঝা কী করতে চায়, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার কাজ শুরু হয়ে গেল। মোট দশটি পুরুষের জবানবন্দি এবং ফোটো নেওয়া হ'ল। তারপর জঙ্গলে পালিয়ে আসা অচ্ছুৎদের একটা গ্রুপ ফোটো এবং তাদের ঝুপড়িগুলোর ছবি।

এই সব কাজ সারতে সারতে বেলা হেলে যায়। রোদের রং বদলাতে থাকে। গরম লু-বাতাস ক্রমশ জুড়িয়ে আসে। আকাশে আবার পাখির ঝাঁক চোখে পড়ে।

টেপ-রেকর্ডার এবং ক্যামেরা ব্যাগে পুরতে পুরতে রাকেশ বলেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক।'

দেবারতি বলে, 'হ্যাঁ, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।' সে-ও তার ক্যামেরা-ট্যামেরা গুছিয়ে নেয়।

রাকেশ ধনুয়াকে বলেন, 'আজ যাওয়া যাক, কাল আবার আসব।'

আনোখী বলে, 'আপহিকা কিরপা।'

ধনুয়া বলে, 'আপলোগোনকা মর্জি।'

কাল বুড়ো আনোখী জঙ্গলের বাইরের কাচ্চী পর্যন্ত রাকেশদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। আজ আর আনোখীকে আসতে দেয় না ধনুয়া। সে নিজে রাকেশদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

খানিকক্ষণ চলার পর ধনুয়া হঠাৎ ডাকে, 'সাহাব, মেমসাব—'

দু'জনেই একসঙ্গে সাড়া দেয়, 'বল।'

'আপনারা এত তখলিফ করে রোজ রোজ আমাদের দুখভরি কহানী শুনে যাচ্ছেন। দুনিয়ার হর আদমীকে আমাদের কথা শোনাবেন। লেকেন—'

'লেকেন কী ?'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে ধনুয়া বলে, 'কোঈ ফায়দা নহীঁ, কুছ নহীঁ হোগা—কুছ নহীঁ।'

দেবারতি বলে, 'কালও তুমি একই কথা বলেছ। তোমাকে জোর দিয়ে বলছি, বাইরের লোক তোমাদের কথা জানতে পারলে অনেক কাজ হবে। তোমাদের সিংজি আর ঝা'জি এতে ভয় পেয়ে যাবে। মানুষ খুন করার জন্যে ওদের ভূমিসেনা আর পহেলবানদের জেল-ফাঁসি কেউ আটকাতে পারবে না।'

'নহীঁ, ও নহীঁ হো সাকতা—'

'তোমার এটা মনে হচ্ছে কেন ?'

'সিংজি এমে। এমেদের গায়ে হাত ঠেকাবার সাহস কারো নেই। থানা-পুলিশ থেকে দুনিয়ার হর আদমী তাদের ভয়ে কাঁপে।'

ধনুয়া সব রকম সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু তার সংশয় এখনও কাটছে না। তার চোখে একজন এম. এল. এ. রামজি বা কিষণজির মতো দেবতাদের চেয়েও শক্তিমান। যার কথায় থানা-পুলিশ ওঠে বসে, তাকে কে কী করতে পারে ?

রাকেশ কী ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে এম. এল. এ.-রা যা খুশি করতে পারে ?'

'হাঁ।'

'তাদের লোকজনেরা অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে ?'

'হাঁ।'

'কিন্তু দেশে আইনকানুন তো আছে।'

ধনুয়া বলে, 'এত্তে এত্তে আদমী খতম হ'ল, এত্তে এত্তে আওরতের ইজ্জৎ গেল, এত্তে এত্তে ঘরে আগুন লাগল। কানুন থেকে ফায়দা কী হয়েছে সাহাব ?'

প্রশ্নটা খুবই অস্বস্তিকর। রাকেশ বলেন, 'বড়ো জমিমালিক আর এম. এল. এ.-র লোকেরা জুলুম করলে তাদের কীভাবে শাস্তি হবে, তুমি কিছু ভেবেছ এ নিয়ে ?'

কয়েক পলক গভীরভাবে চিন্তা করে ধনুয়া। তারপর ভয়ে ভয়ে বলে, 'সোচা সাব। লেকেন বলতে ডর লাগে।'

'কীসের ডর ?'

'কোনো ডর নেই—বল।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ ঘাড় গুঁজে পাশাপাশি হাঁটে ধনুয়া। বোঝা যায়, দ্বিধা এবং ভয় সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তারপর জানায়, একটাই মাত্র উপায় আছে। এম্লেকে হটাতে হবে। সে যতদিন থাকবে, তার আদমীদের গায়ে কেউ একটা টোকা পর্যন্ত মারতে পারবে না।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'এম. এল. এ.-কে কী করে হটানো যায়?'

এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক জানা নেই ধনুয়ার। সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। তার চোখেমুখে হতাশার ছাপ পড়ে।

রাকেশ বলেন, 'আমি কিন্তু জানি।'

'ক্যায়সা?'

'এম. এল. এ. কীভাবে বানানো হয়, জানো তো?'

'জানি। চুনাওতে ভোট দিলে এম্লে হয়।'

'ত্রিলোকী সিংকে ভোট না দিয়ে ভালো সাচ্চা আদমীকে ভোট দিলেই এম. এল. এ. বদলে যাবে।'

ধনুয়া চমকে ওঠে বলে, 'একজনকেও তা হ'লে জানে বাঁচতে হবে না।'

রাকেশ এবং দেবারতি দু'জনেই অবাক। একসঙ্গে তারা জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

ধনুয়া জানায়, প্রতিবার চুনাওয়ের আগে আগে ত্রিলোকী সিংয়ের পহেলবানেরা এবং ভূমিসেনারা লাঠি এবং বন্দুক কাঁধে করে অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে ঘুরে ঘুরে বলে যায়, সবাই যেন সিংজির প্রতীকে মোহর মারে। যদি কেউ তা অমান্য ক'রে অন্য প্রতীকে ছাপ মারে এবং ত্রিলোকী সিংয়ের বদলে অন্য কেউ চুনাওতে জিতে যায়, গাঁকে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষদের এমন মার দেওয়া হবে যে সারা জীবনে তারা ভুলবে না আর আওরতদের নাঙ্গা করে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

রাকেশ বলেন, 'এ ব্যাপারটা মেনে নিলে তো ত্রিলোকী সিং ছাড়া আর কেউ এম. এল. এ. হতে পারবে না।'

ধনুয়া তক্ষুনি সায় দেয়, 'তা পারবে না।'

'তা হ'লে চিরকাল এই নিয়মই চলবে?'

'কা করে। হামলোগোন বহোত গরীব আনপড় আদমী।'

'কোনো ভালো লোক যদি এম. এল. এ. হয়ে তোমাদের কষ্ট ঘোচাতে চায়, তাকে ভোট দেবে না?'

ধনুয়া খানিকক্ষণ চিন্তা করে জানায়, আচ্ছা সৎ আদমীকে ভোট দেওয়া হাজার বার উচিত কিন্তু তেমন সাহসী মানুষ এ অঞ্চলে একটিও নেই যে চুনাওতে দাঁড়িয়ে ত্রিলোকী সিংয়ের বিরুদ্ধে জিততে পারে। ধনুয়া আরো জানায়, ত্রিলোকী সিংয়ের

জায়গায় সৎ হৃদয়বান সহানুভূতিসম্পন্ন নতুন এম. এল. এ. না এলে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না।

কথায় কথায় তারা জঙ্গলের বাইরে কাচ্চীতে পৌঁছে যায়।

ধনুয়া বলে, 'এবার আমরা ফিরে যাই।'

রাকেশরা বলেন, 'হ্যাঁ, কাল আবার দেখা হবে।'

এগারো

জঙ্গল পেছনে ফেলে অনেকটা চলে এসেছে দেবারতিরা। পশ্চিম দিগন্তের তলায় সূর্য কিছুক্ষণ আগে অদৃশ্য হয়েছে।

দূরে কোথায়ও হয়তো বৃষ্টি হয়েছিল। বাতাস এখন বেশ ঠাণ্ডা এবং আরাম-দায়ক। সারাদিন পর আদিগন্ত পড়তি জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ আর ততটা কষ্ট হচ্ছে না দেবারতিদের।

একসময় রাকেশ বলেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন ?'

দেবারতি মুখ ফিরিয়ে তাকায়, 'কী ?'

'ধনুয়াদের কাছে এম. এল. এ. হ'ল ভগবানের মতো পাওয়ারফুল !'

'হুঁ।'

'ওদের বিশ্বাস, একজন ভালো হৃদয়বান এম. এল. এ. এলে ওরা বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু ত্রিলোকী সিংকে যে কোনোদিন হটানো যাবে, এটা একেবারেই ভাবতে পারে না। না মরা পর্যন্ত লোকটা এখানে এম. এল. এ. থেকেই যাবে।'

একটু ভেবে দেবারতি বলে, 'হ্যাঁ। ভয়—'

রাকেশ বলেন, 'ভয়টা কাটাতে পারলে অনেক কাজ হ'ত। একটা স্বাধীন দেশে মানুষের ওপর এরকম টরচার হয়, না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না।'

'কী ?'

'ভয়টা ঘোচাবে কে ? ওটা সংস্কারের মতো ওদের রক্তের ভেতর ঢুকে গেছে। তা ছাড়া অশিক্ষা। লেখাপড়া না জানায় ওরা জানেই না স্বাধীন ভারতের কনস্টিটিউসান ওদের কতটা রাইট দিয়েছে।'

'এটা পলিটিক্সের ব্যাপার। অনেস্ট পলিটিক্যাল লীডারদের উচিত ওদের চোখ ফুটিয়ে দেওয়া।'

'তেমন লোক এখানে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'তা হ'লে তো ওদের জেনারেশনের পর জেনারেশন ঘাড় গুঁজে অত্যাচার সয়ে যেতে হবে। একটু প্রোটেস্ট করলে ভূমিসেনারা এসে ঘর জ্বালিয়ে দেবে, গুলি করে মানুষ মারবে। কিন্তু এ অবস্থা তো চিরকাল চলতে দেওয়া যায় না।'

দেবারতি একটু হেসে বলে, 'কিন্তু আপনি আমি কী করতে পারি বলুন—'

অন্যমনস্কর মতো রাকেশ বলেন, 'দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়দায়িত্ব আছে। কী করা যায়, সেটাই ভেবে বের করতে হবে।'

দেবারতি আর কিছু বলে না।

অনেকটা সময় দু'জনে চুপচাপ হাঁটতে থাকে। প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। দু'পাশের ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝিরা একটানা অক্লান্তভাবে গলা সেধে চলেছে। মাথার ওপর দিয়ে থেকে থেকে দু-একটা দল-ছুট পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে, গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ রাকেশ পাশ থেকে ডাকলেন, 'মিস সেন—'

মুখ ফেরায় দেবারতি, 'বলুন—'

'আমার একটা অদ্ভুত ফীলিং হচ্ছে।'

'কী?'

'তার আগে বলুন তো, আমরা ক'দিন ধারাবনী গ্রাম আর এই জঙ্গলে এলাম?'

দেবারতি কিছুটা অবাক হয়ে বলে, 'কাল আর আজ—দু'দিন।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে, আমরা যেন কয়েক বছর ধরে একটা এক্সপীডিসনে বেরিয়েছি—তাই না?'

'মিশনও বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ, তাও বলা যায়।'

'এই দু'দিনে ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পীপল সম্বন্ধে আমার যা এক্সপীরিয়েন্স হ'ল, সারা জীবনে তেমন অভিজ্ঞতা খুব বেশি হয়নি।'

'আমারও।'

'দু'জনে একই কেস দু' দিক থেকে দেখতে এসেছি। তবে আমাদের উদ্দেশ্য প্রায় একই। কাজের কাজ কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে?'

'কিছু তো নিশ্চয়ই হবে। অন্তত পলিটিক্যাল সার্কেলে আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা হৈচৈ অবশ্যই ফেলে দেওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, সেটা কম ব্যাপার নয়।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর রাকেশ বলেন, 'আপনাকে এখানে পেয়ে আমার কাজ অনেক সহজ হয়েছে। নইলে বেশ অসুবিধে হ'ত।'

দেবারতি জানায়, রাকেশের কাছ থেকে সে-ও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে।

স্থির হয়, এরপর থেকে তারা দু'জনে বিহারের ওই গ্রামগুলোতে তো যাবেই, যে-সব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে সেগুলো দুটো কপি করে একটা নেবে দেবারতি, একটা রাকেশ।

বারো

আজ আর কালকের মতো দেরি হয়নি। দেবারতিরা যখন পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পৌঁছুল, আটটা বাজতে বারো। এর মধ্যেই চারিদিক নিঝুম হয়ে গেছে। আসলে সূর্যাস্তের পরই এই জায়গাটা গাঢ় ঘুমের আরকে ডুবে যায়।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেবারতিদের চোখে পড়ল, কমপাউণ্ডের ভেতর একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরে লাউঞ্জে বেতের চেয়ারে বসে আছে জন-তিনেক লোক। অবোধনারায়ণকেও সেখানে দেখা যাচ্ছে। সে অবশ্য বসে নেই, একপাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বশংবদ ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছে এবং কিছু বলছে, তবে কথাগুলো এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

লাউঞ্জে উঠতেই অবোধনারায়ণ দৌড়ে আসে এবং বাকি লোক তিনটে সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায়।

অবোধনারায়ণ বলে, 'আপনাদের জন্যে এঁরা সেই বিকেল থেকে বসে আছেন।' লোক তিনটেকে দেখিয়ে দেয় সে।

রাকেশরা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যান। বলেন, 'আপনাদের তো চিনতে পারছি না।'

তিনজনের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। তার গোল মুখ, সতর্ক চোখ, চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা, ভারী চোয়াল, বাঘের থাবার মতো হাতের পাঞ্জা, মাথার পেছন দিকে মোটা টিকির গোছা, কানে সোনার মাকড়ি। লোকটার পরনে ফিনফিনে মিলের নতুন ধুতি, সেটাতে কোম্পানির ছাপ মারা আছে। ধুতির ওপর সিল্কের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির তলায় সোনার বিছে হার। তার পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা।

বাকি দু'জনের বয়স কম। তাদের পরনে ফুল প্যাণ্ট, বুশ শার্ট কিন্তু চুল

মধ্যবয়সীটির মতো করে ছাঁটা, পেছনে টিকির গোছাও রয়েছে। হাতে স্টিল ব্যাণ্ডের ইলেকট্রনিকস্ ঘড়ি।

মধ্যবয়সী প্রথমে নিজেদের পরিচয় দেয়। তার নাম ভুনেশ্বরপ্রসাদ। সে বড়ো জমিমালিক গিরিলাল ঝা'র 'পেরায়ভিট সিকরেটরি' (প্রাইভেট সেক্রেটারি)। অন্য দু'জন এম. এল. এ. ত্রিলোকী সিংয়ের পলিটিক্যাল এজেন্ট। এদের নাম জগন্নাথ লাল এবং রামরতন চৌবে।

আজকাল তাহলে বিহারের এই সুদূর দেহাতগুলোতে বড়ো জমিমালিকদের প্রাইভেট সেক্রেটারি পোষার ফ্যাশন চালু হয়েছে এবং এখানকার এম. এল. এ.-রা স্থায়ী পলিটিক্যাল এজেন্ট রাখছেন ?

রাকেশ বলেন, 'আপনাদের জন্যে কী করতে পারি বলুন।'

ভুনেশ্বরপ্রসাদ সবিনয়ে বলে, 'আপনারা অনেক দূর থেকে আসছেন। দেখে মনে হচ্ছে বহোত থকে গেছেন। আমরা বসছি, আপনারা নাহানা সেরে থোড়েসে রেস্ট করে নিন। তারপর বাতচিত হবে।'

'রেস্টের দরকার নেই। আপনাদের কাজটা আগে শেষ করুন।'

একটু ভেবে ভুনেশ্বর বলে, 'তাহলে কিরপা করে যদি একটু বসেন—'

'ঠিক আছে।'

সবাই বেতের চেয়ারগুলোতে বসে পড়ে।

অবোধনারায়ণ বলে, 'চা দিতে বলব ?'

রাকেশ বলেন, 'তা হলে তো ভালই হয়।'

অবোধনারায়ণ চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে যায়।

এবার ভুনেশ্বরপ্রসাদ বলে, 'গিরিলাল ঝা'জি আউর ত্রিলোকী সিংজি'র নাম আপনারা জরুর শুনে থাকবেন।'

'নিশ্চয়ই শুনেছি। ওঁরা ফেমাস লোক—' রাকেশ ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে দেন।

'আমরা তাঁদের কাছ থেকে আসছি।'

রাকেশ এবং দেবারতি সতর্ক ভঙ্গিতে ভুনেশ্বরপ্রসাদের দিকে তাকায়, তবে কোনো প্রশ্ন করে না।

ভুনেশ্বর এবার বলে, 'কালও একজনকে পাঠানো হয়েছিল। লেকেন আপনাদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি।'

দেবারতি বলল, 'শুনেছি কে যেন এসেছিল। আমাদের ফিরতে দেরি দেখে সে চলে গেছে।'

রাকেশ বলেন, 'দরকারী কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললে ভাল হয়।'

ভুনেশ্বরপ্রসাদ হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, 'হাঁ হাঁ জরুর। এবার মেহেরবানি করে বলুন, কাল হাঁথী ঘোড়া না জীপ পাঠিয়ে দেব ?'

রাকেশরা হকচকিয়ে যান, 'ও-সব কেন ?'

'ঝা'জি আউর সিংজি বলে দিয়েছেন, আপনাদের যেটা পসন্দ তাতে চেপে ওঁদের হাভেলিতে যাবেন।'

দেবারতি বলে, 'তার মানে ?'

'ঝা'জি আউর সিংজিকা মনমে বহোত দুখ হুয়া।'

দেবারতি এবং রাকেশ দু'জনেই অবাক। একই সঙ্গে তাঁরা বলে ওঠেন, 'কেন ?'

ভুনেশ্বরপ্রসাদ এবার যা উত্তর দেয় তা এইরকম। দেবারতির মতো কলকাতার একজন নাম-করা পত্রকার এবং রাকেশের মতো মহামান্য ম্যাজিস্টর সাহেব এত কষ্ট করে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পড়ে আছেন, তাতে ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা অত্যন্ত মর্মাহত। এখানে এসে ওঁরা দু'জনকে মেহমানদারির সুযোগ দেবেন না, এটা কখনও হতে পারে না। তাঁদের খাতিরদারির একটা সুযোগ দিতেই হবে।

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে যায় রাকেশের। দেবারতি এবং তিনি তো একেবারে লুকিয়ে, নিজেদের আইডেনটিটি সম্পূর্ণ গোপন রেখে এখানে এসেছেন। তাহলে গিরিলালরা তাঁদের আসার খবর পেলেন কী করে ? রাকেশ এই প্রশ্নটাই একটু ঘুরিয়ে করলেন।

ত্রিলোকী সিংয়ের এক নম্বর পলিটিক্যাল এজেন্ট অল্পবয়সী জগন্নাথ লাল হেসে হেসে বলে, 'সিংজি আউর ঝা'জির বিশ জোড়া করে আঁখ। এখানে একটা নয়া মচ্ছর ঢুকলেও ওঁরা দেখতে পান। ওঁদের আঁখে ধুলো ছিটিয়ে এখানে কিছু হবার যো নেই।'

'সব বুঝলাম। কিন্তু আমাদের মেহমানদারি করার কোনো দরকার নেই। এই বাংলোতে আমরা বেশ আছি।'

ভুনেশ্বরপ্রসাদ ওপাশ থেকে জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করেন। বলেন, 'তাই কখনও হয়। আপনাদের সেবা করতে না দিলে গিরিলালজি আউর ত্রিলোকীজি এত দুখ পাবেন যে বলে বোঝাতে পারব না।'

'একটা কথা আমাদের মাথায় একেবারেই ঢুকছে না।'

'কী ?'

'আমাদের দু'জনের জন্যে ওঁরা এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন ?'

এই সব কথাবার্তার ফাঁকে অবোধনারায়ণ এবং লছমন চা কেক বিস্কুট এবং

গুলাবজামুন নিয়ে আসে। এবার আর দাঁড়ায় না সে, চা ইত্যাদি সবার সামনে সাজিয়ে দিয়ে লছমনকে সঙ্গে করে চলে যায়।

এক ঢোক চা খেয়ে গুলাবজামুন চিবুতে চিবুতে ভুনেশ্বরপ্রসাদ বলে, 'এখানে বড়ে আদমী কেউ এলে গিরিলালজি কি ত্রিলোকীজির হাভেলিতে চরণকা ধুল দিতেই হয়।'

দেবারতি চোখের কোণ দিয়ে ভুনেশ্বরকে দেখতে দেখতে ঈষৎ তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'এটা বুঝি এখানকার নিয়ম?'

ভুনেশ্বর বলে, 'তা একরকম বলতে পারেন। মনিস্টার, বড়ে সরকারী অফসর, এম্লে, কলাকার, পত্রকার, যে-ই এখানে আসেন, একবার সিংজি আউর ঝা'জির হাভেলিতে না গেলেই নয়।'

একটু মজা করেই রাকেশ বলে ওঠেন, 'না গেলে কি কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়?'

'আরে ছি ছি—' শশব্যস্তে আধ হাত জিভ কেটে ভুনেশ্বরপ্রসাদ বলে, 'বড়ে আদমীদের খাতিরদারি আউর সেবা করে মনমে বহোত শান্তি পান সিংজিরা। এবার কিরপা করে বলুন, কাল আপনাদের জন্যে কখন হাঁথী ঘোড়া না জীপ পাঠাব?'

রাকেশের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তিনি শান্ত মুখেই বলেন, 'ঝা'জি আর সিংজিকে ধন্যবাদ। তবে কিছুই পাঠাতে হবে না।'

গিরিলাল এবং ত্রিলোকীর মতো সর্বশক্তিমান মানুষের মেহমানদারি উপেক্ষা করতে পারে এমন কেউ যে ভূ-ভারতে থাকতে পারে, ভুনেশ্বরপ্রসাদরা আগে কখনও দেখেনি। তারা একেবারে হকচকিয়ে যায়। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'তাহলে!'

'তাহলে কী?'

'আপনারা কি নিজেরাই যাবেন?'

রাকেশ কঠিন গলায় বলেন, 'না।'

ভুনেশ্বর রাকেশের মনোভাবটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে শুধোয়, 'ঝা'জি আর সিংজিকে আপনাদের ব্যাপারে কী বলব?'

'বলবেন, আমাদের পক্ষে তাঁদের হাভেলিতে যাওয়া একেবারেই সম্ভব না। ওঁরা যে মেহমানদারি করতে চেয়েছেন, এ জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবেন।'

ভুনেশ্বর এবার নতুন একটি খবর দেয়। কাচুমাচু মুখে বলে, 'ওঁরা কিন্তু আপনাদের জন্যে খুব আশা করে অপেক্ষা করছেন। আপনারা থাকবেন বলে দুই হাভেলিতেই

বড়ো বড়ো ঘর সাফ করা হচ্ছে, নয়া বিজলী পাংখা লাগানো হচ্ছে, জঙ্গলে শিকার খেলার জন্যে হাঁথী সাজানো হচ্ছে। নৌটঙ্কী গানাও হবে। এরপরও যদি না যান, বহোত দুখকা বাত।'

এত সব লোভনীয় ব্যবস্থার কথা শুনেও রাকেশদের টলানো যায় না। তাঁরা চুপচাপ বসেই থাকেন।

একটু চিন্তা করে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে ভুনেশ্বর এবার শুধোয়, 'হুকুম দিলে একটা কথা বলব—'

নিস্পৃহ স্বরে রাকেশ বলেন, 'কী কথা?'

'সিধা না বলে দেবেন না স্যার। সিংজি আর ঝা'জির মেহমানদারির কথাটা আরেক বার কি কিরপা করে ভেবে দেখবেন?'

'আরেক বার ভাবলেও একই কথা বলব। কিছু মনে করবেন না, অনেক রাত হ'ল। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, স্নান হয়নি। ভীষণ টায়ার্ড। এবার কিন্তু আমরা উঠব।'

'হাঁ হাঁ জরুর—' বলতে বলতে ব্যস্তভাবে ভুনেশ্বর এবং তার দুই সঙ্গী উঠে পড়ে। ভুনেশ্বর বলতে থাকে, 'কাল একজনকে পাঠিয়েছিলেন সিংজিরা, আজ পাঠিয়েছেন আমাদের। কিন্তু কোনো কাজই হ'ল না। এরপর হয়তো—'

'হয়তো কী?'

'গিরিলালজি আর সিংজিকেই খুদ আপনাদের কাছে আসতে হবে।'

রাকেশরাও উঠে পড়েছিলেন। দেবারতি বলে, 'যদি সত্যি সত্যিই আসেন, ওঁদের বুঝিয়ে বলব, আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না।'

রাকেশ বলেন, 'কেন ওঁরা কষ্ট করে আসবেন? কৃপা করে বলবেন যেন না আসেন।'

ভুনেশ্বর সামান্য হাসে, 'বললেও কি আর ওঁরা শুনবেন! আপনাদের মতো বড়ে আদমী এই পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পড়ে থাকবেন, এটা ওঁরা কিছুতেই হতে দেবেন না। জরুর ধরে নিয়ে যাবেন।'

রাকেশ স্থির চোখে তাকান, 'জবরদস্তি?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন এক তীব্রতা ছিল যাতে ভুনেশ্বরপ্রসাদ চমকে ওঠে। বলে, 'নেহী নেহী, পেয়ারসে—'

'আপনাদের একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, গিরিলালজিই আসুন আর ত্রিলোকীজিই আসুন আমরা কিছুতেই যাব না। তাঁদের মেহমানদারিতে আমাদের একেবারেই দরকার নেই।'

ভুনেশ্বরপ্রসাদের ছোট ছোট চোখ দুটোতে পলকের জন্য হিংস্রতা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় কিন্তু কণ্ঠস্বরে তার এতটুকু আভাস নেই। অত্যন্ত মধুর গলায়, বশংবদ ভঙ্গিতে সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, সিংজি আর ঝা'জিকে আপনাদের কথা বলব। আচ্ছা, নমস্তে—'

ভুনেশ্বরেরা তিনজন এরপর লাউঞ্জের শেষ মাথায় গিয়ে নিচে নুড়ির রাস্তায় নেমে জীপে ওঠে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

জীপটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন রাকেশরা।

দেবারতি বলে, 'এরা আশ্চর্য লোক তো। আমরা যেতে না চাইলেও ধরে নিয়ে যাবার জন্য খেপে উঠেছে।'

রাকেশ হাসেন, 'এমনি এমনি কি আর মেহমানদারি করতে চাইছে। চাইছে নিজেদের গরজে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

দেবারতি আস্তে মাথা নাড়ে—বোঝেনি।

রাকেশ এবার বলেন, 'মনে হচ্ছে, না গেলে ওরা কিছু গোলমাল পাকাবে।'

'আমারও সেই রকমই ধারণা। এই মোমেণ্টে ও-সব ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে। উই হ্যাভ টু ফেস দ্যাট। এখন যা দরকার তা হ'ল প্রথমে স্নান, তারপর খাওয়া এবং খাওয়ার পর টানা একটি ঘুম।'

সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় দেবারতি, 'রাইট। কালকের রুটিন ঠিক আছে তো?'

রাকেশ বেশ জোর দিয়ে বলেন, 'অবশ্যই।'

তেরো

পরদিন ভোর রাত্তিরে আবার জঙ্গলে গেল দেবারতিরা। আজ পনেরোটি পুরুষের স্টেটমেণ্ট রেকর্ড ক'রে এবং তাদের ফোটো তুলে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।

দেবারতিদের ধারণা ছিল, আজ ফিরে বাংলোতে স্বয়ং ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা'কে দেখতে পাবে। কাল রাতে ভুনেশ্বরপ্রসাদ সেরকম একটা ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিল। বড়ো জমিমালিক এবং স্থানীয় এম. এল. এ.-টি যদি সত্যি সত্যিই এসে পড়েন, তাঁদের কোন কৌশলে ঠেকানো হবে, কোন অজুহাতে তাঁদের কোঠিতে যাওয়া বন্ধ করা হবে, জঙ্গল থেকে ফিরতে ফিরতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেটা ছকে ফেলেছিল দেবারতিরা। বিনীতভাবে ফেরার কথা

বললে ওঁরা যদি না শোনেন, বাধ্য হয়ে কঠোর হতেই হবে।

যে-স্ট্র্যাটেজি দেবারতিরা ভেবে রেখেছিল তা আদৌ কাজে লাগল না। কেননা গিরিলাল, ত্রিলোকী বা তাঁদের লোকজনেরা আজ কেউ আসেনি।

তারপরের দিনও গিরিলালদের পক্ষ থেকে কেউ এল না। জঙ্গল থেকে ফিরে অবোধনারায়ণকে দেবারতিরা জিজ্ঞেস করে, ত্রিলোকী সিং বা গিরিলাল ঝা কোনো খবর পাঠিয়েছে কিনা। আসলে এই লোক দুটো তাদের মাথার ভেতর অস্বস্তিকর পোকার মতো যেন ঢুকে গেছে।

অবোধনারায়ণ জানায়, 'নেহী'। কেউ আসেনি বা খবরও পাঠায়নি।'

আর কোনো প্রশ্ন না করে ক্লান্ত শরীর টানতে টানতে দেবারতিরা লাউঞ্জে গিয়ে বসল।

রাকেশ বললেন,'কী ব্যাপার বলুন তো! পর পর দু'দিন লোক পাঠালেন না গিরিলালরা। হাতি ঘোড়া জীপ মোটর কত কি দেখাল। তারপর একেবারে চুপচাপ।'

দেবারতি হাসে, 'মেহমানদারির ভূতটা বোধহয় ওদের ঘাড় থেকে নেমে গেছে। বুঝতে পেরেছে এখানে সুবিধা হবে না।'

একটু চিন্তা করে রাকেশ বলেন, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

দেবারতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

রাকেশ এবার বলেন, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা প্ল্যান আঁটছে। আমরা ওদের নানা রকম কুকীর্তির ডকুমেণ্ট যোগাড় করছি আর ওরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে. তা তো হয় না। আমার ধারণা, খুব সহজে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে না।'

দেবারতিকে চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'কী করতে পারে গিরিলালেরা? ফিজিক্যাল অ্যাসাণ্ট? না-অন্য কিছু?'

'মনে হয় অ্যাসাণ্টটা করবে না। করলে এতদিনে করে ফেলত।'

'তা হলে?'

'ওদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক ধরতে পারছি না। তবে আমাদের আরো সতর্ক থাকতে হবে। অ্যাটাকটা কোন দিক থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

পরের দিন ভোরে রাকেশ বেরুতে পারলেন না। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, মাথায় কয়েক টন ওজনের ভার, গা বেশ তেতে উঠেছে। ক'টা দিন চৈত্রের অসহ্য রোদে প্রচণ্ড ঘোরাঘুরি গেছে। এভাবে ছোটাছুটির অভ্যাস কোনোকালেই নেই। এই গা ব্যথা, জর জর ভাব তারই ফল। বিছানা থেকে উঠতেও আজ তাঁর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

রোজ ভোরে উঠে মুখটুখ ধুয়ে সোজা রাকেশের ঘরে চলে আসে দেবারতি। এখানে বসে দু'জনে চা খেয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

আজ দেবারতি আসতেই রাকেশ বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বললেন, 'আজ আপনাকে একাই যেতে হবে।'

দেবারতি অবাক। বলল, 'কেন ? আপনি যাবেন না ?'

'আমার অবস্থা শোচনীয়। নড়বার উপায় নেই।' ব'লে না বেরুবার কারণটা বিশদভাবে জানিয়ে দিলেন রাকেশ।

দেবারতি ব্যস্ত হয়ে, একটু উদ্বিগ্নভাবেই রাকেশের কপালে হাত রাখে। বলে, 'হ্যাঁ, বেশ ভালোই জ্বর হয়েছে। আজ আর বিছানা থেকে উঠবেন না।'

পাশে অবোধনারায়ণ দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য দিনের মতো আজও সে চা, বিস্কুট এবং দুপুরের লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তবে লছমনকে দেখা গেল না।

দেবারতি অবোধনারায়ণকে বলল, 'থার্মোমিটার আছে ?'

অবোধনারায়ণ মাথা নাড়ে, 'নেহী।'

'এখন ডাক্তার পাওয়া যাবে ?'

'দশ মাইল দূরের টাউনে ডাক্তার দুবে আছেন। তাঁকে আজ খবর দিলে কাল আসেন।'

দেবারতি বলল, 'এখানে কারো অসুখ-বিসুখ হলে কী অবস্থা হয় বোঝাই যাচ্ছে। তবু ডাক্তার দুবেকে এখনই একটা খবর পাঠিয়ে দিন।'

অবোধনারায়ণ বলেন, 'হাঁ হাঁ জরুর।'

দেবারতির হাতটা এখনও রাকেশের উত্তপ্ত কপাল ছুঁয়ে আছে। রাকেশ এভাবে আগে আর কখনও কোনো তরুণীর স্পর্শ পাননি। দেবারতির হাত থেকে অপার্থিব কিছু চুঁইয়ে চুঁইয়ে তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে যেন। চোখ বুজে সেটা অনুভব করতে করতে তিনি বললেন, 'আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট রয়েছে। দুটো খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দেবারতি বলল, 'তবু একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। কিসের থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না। আগে থেকে প্রিক্যশন্ নেওয়া ভাল।'

দেবারতির সঙ্গে আলাপ মাত্র কয়েক দিনের। প্রায় অচেনা এই মেয়েটির উৎকণ্ঠা এবং মমত্ববোধ বড় ভাল লাগে রাকেশের। তিনি এ নিয়ে আর কিছু বলেন না।

দেবারতি একটু ভেবে এবার বলে, 'এক কাজ করা যাক বরং—'

দেবারতি খানিকক্ষণ আগেই কপাল থেকে হাতটা তুলে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে রাকেশ বললেন, 'কী ?'

'আপনি অসুস্থ। ভাবছি আজ আর বেরুবো না।'

রাকেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'না না, আমার অসুখের চেয়ে ওখানে যাওয়াটা অনেক বেশি জরুরী।'

দেবারতি কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে রাকেশ ফের বলে ওঠেন, 'আমাদের দিক থেকে কোনোরকম ঢিলে দেওয়া একেবারেই উচিত হবে না। রোজ না গেলে কখন কী ঝামেলা হবে, আর হয়তো ইমপর্টাণ্ট এভিডেন্সই পাওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কী মীন করতে চাইছি—'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় দেবারতি, 'হ্যাঁ।'

রাকেশ বলেন, 'আর দেরি করবেন না, এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আমার জন্যে ভাববেন না।'

রাকেশ কী কারণে তাকে গ্রামগুলোতে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে দেবারতির কাছে সেটা খুবই পরিষ্কার। ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'র তো জানতে বাকি নেই, কী উদ্দেশ্যে দেবারতিরা এখানে এসেছে। ভূমিসেনা এবং পহেলবানদের নানা কুকীর্তির এভিডেন্স এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করে দেবারতিরা নির্বিঘ্নে এখান থেকে ফিরে যাবে, এটা তারা কিছুতেই হতে দেবে না। রাকেশ চাইছেন, ত্রিলোকী আর গিরিলাল কিছু করার আগেই যত বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলে তাদের স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করে এবং ফোটো তুলে নেওয়া যায়। কেসটা তাহলে অত্যন্ত জোরালো হবে। আর আসামীদের শাস্তির পথ ততই মসৃণ হয়ে যাবে।

দেবারতি মজা করে বলে, 'চা না খেয়েই বেরিয়ে পড়তে বলছেন?'

বিব্রত মুখে রাকেশ হাসেন, 'আরে না না, চা খেয়েই যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ—' নিজের হাতে চা করে একটা কাপ রাকেশকে দেয় দেবারতি, একটা কাপ নিজে নেয়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রাকেশ বলেন, 'আজ আপনাকে একা একাই বেরুতে হচ্ছে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই কিন্তু ফিরে আসবেন।'

তার জন্য রাকেশের এই উৎকণ্ঠাটুকু ভাল লাগে দেবারতির। স্নিগ্ধ মুখে সে বলে, 'তা-ই আসব।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে শুকনো খাবারের প্যাকেট ব্যাগে পুরে বেরিয়ে যায় দেবারতি। তার সঙ্গে সঙ্গে অবোধনারায়ণও বাইরে যায়। একা ঘরে শুয়ে থাকেন রাকেশ।

এখনও আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে। অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। তবে বেশিক্ষণ না, একটু পরেই চারিদিক ফর্সা হয়ে যাবে। রাকেশ শিয়রের খোলা

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেবারতি একা সেই জঙ্গলে যাবে, এই দুশ্চিন্তাটা তাঁর মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে। যতক্ষণ না সে ফিরে আসছে, রাকেশের উৎকণ্ঠা কাটবে না।

এদিকে নুড়ির রাস্তায় নেমে দেবারতি লক্ষ্য করে অবোধনারায়ণ তার সঙ্গ ছাড়ে নি। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে সে পেছন পেছন হাঁটতে থাকে।

দেবারতির হঠাৎ মনে হয়, অকারণেই অবোধনারায়ণ তার সঙ্গ নেয় নি। সে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে অবোধনারায়ণ বলে, 'হাঁ দিদিজি—'

'বলুন।'

'যদি অপরাধ না নেন একটা কথা বলি।'

'অপরাধ নেব না, যা বলার বলে ফেলুন।'

একটু ইতস্তত করে অবোধনারায়ণ বলে, 'গিরিলালজি আর ত্রিলোকীজি বহুৎ বড়ে আদমী। ওঁরা এত বার লোক পাঠালেন। দুটো দিন ওঁদের হাভেলিতে গিয়ে থাকলে ভাল করতেন।'

পলকহীন স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে দেবারতি। তারপর বলে, 'গিরিলালজি আর ত্রিলোকীজির লোকেরা কি আমাদের রাজী করাবার জন্যে আপনাকে ধরেছে?'

'নেহী নেহী—' শশব্যস্তে বলে ওঠে অবোধনারায়ণ, 'আমাকে কেউ কিছু বলেনি। তবে—'

'তবে কী?'

'ওঁরা এই এরীয়ার বহোৎ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আদমী তো। ওঁদের যখন এত ইচ্ছা—'

'কেউ ইচ্ছা করলেই তা পূরণ করতে হবে? এমন কিছু নিয়ম আছে নাকি?'

'নেহী নেহী—' দেবারতির বলার ভঙ্গিতে রীতিমত ঘাবড়ে যায় অবোধনারায়ণ 'না, অ্যায়সাই বলছিলাম—' বলতে বলতে ঘুরে দ্রুত পেছন দিকে চলে যায়।

দেবারতিও আর দাঁড়ায় না, গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় নেমে পড়ে।

চোদ্দ

দেবারতি চলে যাবার পর বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। এখন আর এক ফোঁটা অন্ধকারও নেই। সকালের নরম সোনালী রোদের ঢল নেমেছে চারিদিকে।

দিগন্তের তলা থেকে সূর্যের অর্ধেকটা উঠে এসে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো আটকে আছে।

রাকেশ এখনও তাঁর বিছানায় শুয়েই আছেন। মাঝখানে উঠে একবার শুধু দুটো ট্যাবলেট খেয়েছিলেন। ওষুধের কারণেই হয়তো, গায়ের ব্যথাটা একটু কম লাগছে। তবে অদ্ভুত এক আলস্য সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। বিছানা থেকে উঠতে একেবারেই ভাল লাগছে না।

শুয়ে শুয়েই রাকেশ বাইরের বাগানে গাছপালার মাথায় পাখিদের চেঁচামেচি শুনতে পেলেন। মাঝে মাঝে মালির বাচ্চাগুলোর হুটোপুটি বা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। অবোধনারায়ণ চিৎকার করে বারকয়েক লছমনকে ডাকল। এ ছাড়া পি. ডব্লু. ডি. বাংলোটা একেবারেই নিঝুম।

রাকেশের একবার মনে হল, নিরবধি কাল তিনি এই প্রায় নিঃশব্দ সুষুপ্তির জগতে শুয়ে আছেন। শুয়ে থাকা ছাড়া এই পৃথিবীতে তাঁর যেন আর কোনো কাজ নেই। এখানকার নৈঃশব্দ আলস্য এবং স্তব্ধতা তাঁকে যেন ক্রমশ গ্রাস করছে।

হঠাৎ বাইরে জীপের তীব্র হর্ণ শোনা গেল। তারপরেই লোহার গেট খোলার কর্কশ ধাতব শব্দ।

শুয়ে শুঁয়েই রাকেশ টের পেলেন জীপটা ভেতরে নুড়ির রাস্তায় এসে ঘ্যাস্-স্ করে থেমে গেল। এই সকালবেলায় রোদ উঠতে না উঠতেই কে আসতে পারে? হঠাৎ আলস্যে-ভরা শিথিল মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে গেল রাকেশের। তাহলে কি ত্রিলোকী সিং বা গিরিলাল ঝা স্বয়ং এসে হাজির হলেন? না কি দু'জনেই একসঙ্গে?

নিজের অজান্তে খানিকটা উদ্বেগই বোধ করেন রাকেশ। তবে বিছানা ছেড়ে তাঁর ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। মনে মনে তিনি স্থিরই করে ফেলেন, গিরিলালেরা এলে কোনোরকম প্রশ্রয়ই দেবেন না। তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনে রূঢ় ব্যবহারই করবেন। অন্যায়ের সঙ্গে কোনোভাবেই আপস নয়।

পরক্ষণে রাকেশের মনে হয়, তিনি হয়তো ত্রিলোকী সিংদের কথা ভেবে অহেতুক উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। এমনও হতে পারে, পি. ডব্লু. ডি. বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের কেউ কিংবা কোনো ভি. আই. পি. বিশেষ কাজে অথবা বিশ্রাম নিতে এই নিরিবিলি বাংলোয় এসেছেন।

মিনিট দশেকও কাটেনি, অবোধনারায়ণ এ-ঘরে এসে ঢুকল। বলল, 'স্যার, নওলপুর থেকে একজন এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

রাকেশ ভেবে পান না, নওলপুর থেকে কে আসতে পারে। রীতিমত অবাকই হয়ে যান তিনি। জিজ্ঞেস করেন, 'কী নাম ভদ্রলোকের?'

'নাম বলেনি।'

'কী দরকার, কিছু বলল ?'

'না।'

'জিজ্ঞেস করে আসুন।'

'করেছিলাম। বললে, যা জানাবার আপনাকেই জানাবেন।'

একটু চিন্তা করে রাকেশ বলেন, 'ঠিক আছে, আধ ঘণ্টা বাদে পাঠিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা স্যার।' বলে অবোধনারায়ণ বেরিয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ আগের মতোই আলস্যে সময় কেটে যায়। কিন্তু মাথার ভেতর আগন্তুক সম্পর্কে চিন্তাটা থেকেই যায়। কিন্তু একমুখ দাড়ি-টাড়ি নিয়ে অচেনা একটি লোকের সামনে যাওয়া যায় না।

একসময় উঠে শেভ করে, মুখটুখ ধুয়ে এবং পোশাক বদলে ওধারের সোফায় রাকেশ সবে বসেছেন, একটা গলার স্বর ভেসে আসে, 'আসতে পারি স্যার ?'

মুখ ফেরাতেই দরজার বাইরে ঝকঝকে স্মার্ট চেহারার একটি যুবককে দেখতে পেলেন রাকেশ। বললেন, 'আসুন—'

যুবকটি ভেতরে এসে জানায় তার নাম অরুণ শর্মা, সে আসছে নওলপুর থেকে। জরুরী যে খবরটি এরপর সে দেয় তা হ'ল, ডিস্ট্রিক্ট জজ হেমবতীনন্দন দ্বিবেদী তাকে রাকেশের কাছে পাঠিয়েছেন।

রাকেশ প্রথমটা অবাক হয়ে যান। তারপর অরুণকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, 'দ্বিবেদীজি কি এখন নওলপুরের বাড়িতেই আছেন ?' হেমবতীনন্দনের পৈতৃক বাড়ি যে নওলপুর টাউনে সেটা জানেন রাকেশ।

অরুণ সন্তর্পণে মুখোমুখি একটা সোফায় বসে পড়েছিল। সসম্ভ্রমে বলে, 'জি।'

'আমি এখানে আছি, এ খবরটা দ্বিবেদীজি পেলেন কী করে ? আমি তো কাউকে জানিয়ে আসিনি।'

'বলতে পারব না স্যার।'

একটু ভেবে রাকেশ প্রশ্ন করেন, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। উনি কি বিশেষ কোনো দরকারে আপনাকে পাঠিয়েছেন ?'

অরুণ বলে, 'জি। একটা চিঠি দিয়েছেন আপনার নামে।' পকেট থেকে মুখ-আঁটা সাদা খাম বের করে সে রাকেশের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

খামটা নিয়ে রাকেশ দেখলেন, ওপরে তাঁর নাম লেখা রয়েছে। মুখ ছিঁড়ে ভেতরকার চিঠি বের করতেই চোখে পড়ল, মাত্র পাঁচটি লাইন লেখা রয়েছে :

'রাকেশ, চিঠি পাওয়ামাত্র পত্রবাহকের সঙ্গে চলে আসবে। জীপ পাঠিয়ে

দিলাম, আসতে অসুবিধা হবে না। তোমার সঙ্গে আজই দেখা হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। যত কাজই থাক, সব ফেলে আসতেই হবে। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে চিঠিতে লেখা সম্ভব হ'ল না। সাক্ষাতে কথা হবে।

হেমবতীনন্দন দ্বিবেদী।'

জরুরী বিষয়টা কী হতে পারে? কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না। হঠাৎ এভাবে লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবার পেছনে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনো ব্যাপার আছে। তা ছাড়া এই পি. ডব্লু. ডি. বাংলোর খবরই বা তাঁকে কে দিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড টেনসন অনুভব করতে থাকেন রাকেশ। চিঠিটা ভাঁজ করে আস্তে আস্তে খামের ভেতর পুরতে পুরতে জিজ্ঞেস করেন, 'দ্বিবেদীজি যে আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে বলেছেন তা কি আপনি জানেন?'

অরুণ ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'জি, জানি।'

সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না জেনেও রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে লিখেছেন তা কি জানেন?'

'জি, না।'

'দ্বিবেদীজি আপনাকে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসভাজনদের একজন হবেন। ওঁর সঙ্গে আপনার কি কোনোরকম আত্মীয়তা আছে?'

'জি, না। আমি জজসাহেবের অফিসে কাজ করি।'

'ঠিক আছে, আপনি বাইরে লাউঞ্জে গিয়ে বসুন। আমি মিনিট পনেরোর ভেতর রেডি হয়ে আসছি।'

অরুণ বেরিয়ে গেল।

পনেরো মিনিটও লাগল না, তার অনেক আগেই ফের ঘরে পরার পাজামা-পাঞ্জাবি বদলে শার্ট-ট্রাউজার্স পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন রাকেশ। অবোধ-নারায়ণকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, তিনি দরকারী কাজে বেরুচ্ছেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। এর মধ্যে যদি দেবারতি ফিরে আসে, তাকে যেন এই খবরটা অবশ্যই দেওয়া হয়।

অবোধনারায়ণ একটু অবাকই হয়। বলে, 'নিশ্চয়ই দেব। লেকেন স্যর—'

'কী হল?'

'আপনার তবিয়ত আচ্ছা নেহী। এখন বেরুনো কি ঠিক হবে?'

'না বেরিয়ে উপায় নেই।'

অরুণ লাউঞ্জে বসেছিল। তাকে ডেকে নিয়ে জীপে উঠলেন রাকেশ।

পনেরো

নওলপুর টাউনটা দুধলিগঞ্জের পি. ডব্লু. ডি. বাংলো থেকে দেড় শ' কিলোমিটার দক্ষিণে। আড়াই ঘণ্টায় অর্থাৎ দুপুরের বেশ কিছুটা আগেই সেখানে পৌঁছে গেলেন রাকেশরা।

টাউনের মাঝখানে প্রায় একর দুয়েক জায়গার মাঝখানে হেমবতীনন্দনদের বিশাল দোতলা বাড়ি। মোটা মোটা পিলার, শ্বেতপাথরে বাঁধানো লম্বা লম্বা বারান্দা, খড়খড়ি এবং রঙিন কাচের পাল্লা দেওয়া বড়ো বড়ো জানালা ইত্যাদি গথিক স্ট্রাকচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাড়িটা ঘিরে গোল করে উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল। পেছনেও বাগান এবং কাজের লোকেদের থাকার জন্য টালির শেডের লম্বা ব্যারাক।

বাড়ির ভেতর ঢুকে জীপ থেকে নামতেই একটি মধ্যবয়সী কাজের লোক দৌড়ে এল। বলল, 'আইয়ে সাহাব—'

এ বাড়িতে অনেক বার এসেছেন রাকেশ। নৌকর-নৌকরানীরা তাঁকে ভাল করেই চেনে। মাঝবয়সী লোকটার সঙ্গে দোতলা বাড়িটার দিকে যেতে যেতে বললেন, 'ভাল আছ তৌহর?'

'জি।'

'দ্বিবেদীজি বাড়ি আছেন?'

'জি।'

তৌহর রাকেশকে বিরাট ড্রইংরুমে নিয়ে আসে। বলে, 'আপনি বসুন সাহাব, আমি মালিককে খবর দিয়ে আসি।'

তৌহর চলে যায়।

এ বাড়িতে এখনও কিছুটা সাবেকী চাল থেকে গেছে। ড্রইংরুমটার দিকে তাকালেই তা টের পাওয়া যায়। পুরনো আমলের ভারী ভারী সোফা চারিদিকে সাজানো, মেঝেতে পুরু কার্পেট। সীলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, তার ভেতর নানারঙের বাল্ব। সীলিং-এ পঙ্খের কাজ। দরজার কাঠ খোদাই করে ফুল-লতাপাতা আঁকা হয়েছে। দেওয়ালে হেমবতীনন্দনের পূর্বপুরুষদের বড়ো বড়ো অয়েলপেন্টিং। এককোণে দাঁড়িয়ে আছে চার ফুট উঁচু একটা গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক।

এই ড্রইং রুমের সব খুঁটিনাটি রাকেশের মুখস্থ। তবু যতবার এ বাড়িতে আসেন, ঘড়ি অয়েলপেন্টিং ফ্যান ঝাড়লণ্ঠন—সমস্ত কিছু তাঁকে যেন নতুন করে আকর্ষণ করে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চারিদিক দেখছিলেন রাকেশ। একসময় গম্ভীর ভারী গলা কানে আসে, 'যাক, তুমি এসে গেছ—'

চেনা কণ্ঠস্বর। দ্রুত মুখ ফেরাতেই রাকেশ দেখতে পান, হেমবতীনন্দন তাঁর পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

হেমবতীনন্দনের বয়স সাতান্ন আটান্ন। লম্বা সুপুরুষ চেহারার এই মানুষটির শরীরে বয়সের ভার নেমেছে। নিখুঁত কামানো মসৃণ ডিম্বাকৃতি মুখ। চিবুকের তলায় এবং গলায় বেশ মেদ জমেছে। চওড়া কপাল তাঁর, ব্যাকব্রাশ-করা কাঁচা-পাকা চুল, পুরু লেন্সের চশমার ওধারে দূরভেদী সজাগ চোখ। তাঁর সমস্ত চেহারায় এমন এক প্রখর ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা চারপাশের সবাইকে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় চকিত করে তোলে।

এই মুহূর্তে হেমবতীনন্দনের পরনে খদ্দরের ধবধবে পাজামা এবং পাঞ্জাবি। পায়ে বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য হাল্‌কা হরিণের চামড়ার চটি।

হেমবতী বললেন, 'বসো রাকেশ—'

এই মানুষটির সঙ্গে আলাপের প্রথম দিন থেকেই শ্রদ্ধা করে আসছেন রাকেশ। যত দিন গেছে, শ্রদ্ধাটা বেড়েই চলেছে। এমন সৎ উদার দৃঢ় চরিত্রের মানুষ কমই দেখেছেন রাকেশ। হেমবতীনন্দনের মতো বিচারকেরা চিরকাল জুডিসিয়ারির মর্যাদা এবং সম্মান বাড়ান।

হেমবতীনন্দনও রাকেশকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এই তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটটিকে নানা কারণেই তাঁর পছন্দ। আজকাল জুডিসিয়ারির ওপরও বিভিন্ন দিক থেকে নানাভাবে চাপ আসছে। কিন্তু কোনো প্রেসারের কাছেই এখন পর্যন্ত মাথা নোয়াননি রাকেশ। সাহসী সৎ এবং একান্ত নির্লোভ এই তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি শুধু পছন্দই করেন না, রীতিমত সমীহও করে থাকেন। তাঁদের দিন তো শেষ হয়ে আসছে। চারিদিকে হাজার রকম নোংরামির মধ্যে রাকেশদের দেখলে এখনও আশা হয়, জুডিসিয়ারির সম্ভ্রম এঁদের হাতে হয়তো ভবিষ্যতে অনেকখানিই সুরক্ষিত থাকবে।

রাকেশ এগিয়ে এসে হেমবতীনন্দনকে প্রণাম করলেন। চাকরিতে ঢোকার সময় থেকেই এই মানুষটি তাঁর কাছে ফাদার ফিগার।

হেমবতী বসার পর রাকেশ তাঁর মুখোমুখি বসলেন।

হেমবতীনন্দন এবার বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছ, তাই না?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ স্যার। আমার জন্যে দুধলিগঞ্জের পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় লোক পাঠাবেন, এটা ভাবতে পারিনি।'

'তোমাকে ওভাবে ধরে আনা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না রাকেশ।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'আমি যে ওখানে আছি, আপনি খবর পেলেন কী করে? আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে একরকম লুকিয়েই দুধলিগঞ্জে চলে গিয়েছিলাম।'

এইসময় তৌহর ট্রেতে করে প্রচুর মিষ্টি এবং চা দিয়ে যায়।

হেমবতীনন্দন বলেন, 'শুরু কর। খেতে খেতে কথা হোক।' বলে নিজে শুধু এক কাপ চা তুলে নেন। কাপে ছোট একটি চুমুক দিয়ে এবার বলেন, 'খবর দেবার লোকের কি অভাব আছে? তুমি ওখানে যাওয়ায় যারা ভয় পেয়ে গেছে তারাই আমাকে জানিয়েছে।'

এবার খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে একটু উদ্বিগ্ন হয়েই হেমবতীর দিকে তাকান রাকেশ। গিরিলালরা সরাসরি কনফ্রনটেসনের দিকে না গিয়ে তাহলে এভাবে চতুর চালটি চেলেছে। এখন জানা দরকার, হেমবতীকে তারা কী খবর দিয়েছে?

হেমবতীনন্দন আবার বলেন, 'এভাবে তোমার দুধলিগঞ্জে যাওয়া কিন্তু ঠিক হয়নি রাকেশ। কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তোমার সারভিসের দিক থেকে তো বটেই, অন্য দিক থেকেও ভয়ানক রিস্কি। দেশটা আগের মতো আর নেই রাকেশ। সমস্ত পরিবেশ প্রতিদিন ডেটিরিওরেট করে যাচ্ছে।'

হেমবতী কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কোনো প্রশ্ন না করে রাকেশ তাকিয়েই থাকেন।

হেমবতী থামেননি, 'আমি কী জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছি, বুঝতে পারছ?'

রাকেশ বলেন, 'সবটা না হলেও কিছুটা পারছি।'

সেণ্টার টেবলের ওপর দিয়ে খানিকটা ঝুঁকে হেমবতীনন্দন গম্ভীর গলায় বলেন, 'তোমার নামে অভিযোগ করে আমার কাছে অ্যাপীল এসেছে।'

রাকেশ রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের অভিযোগ স্যার?'

'পক্ষপাতিত্বের। খুবই গুরুতর অভিযোগ।'

রাকেশ চুপ। ব্যাপারটা এবার অনেকখানিই পরিষ্কার হয়ে যায়। স্থির চোখে তিনি চার ফুট দূরে বসে থাকা শ্রদ্ধেয় শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষটিকে লক্ষ্য করতে থাকেন।

হেমবতীনন্দন বলেন, 'অভিযোগটা তোমার জানা প্রয়োজন।'

কোনো কথা না বলে রাকেশ উৎকণ্ঠিতের মতো তাকিয়ে থাকেন।

হেমবতী আবহাওয়াটাকে সহজ করার জন্য বলেন, 'অত টেন্স হতে হবে না। আগে সবটা শুনে নাও। টেক ইট ইজি। এ কি হাত গুটিয়ে রয়েছ যে। খাও খাও—'

আবছা গলায় রাকেশ বলেন, 'আপনি বলুন স্যার—'

'তোমার কোর্টে ধারাবনী বারহৌলির যে কেস গেছে তুমি নাকি তার অভিযুক্ত আসামীদের জামিন দাওনি। তার ওপর লুকিয়ে প্লেস অফ অকারেন্সে গিয়ে একজন নিউজ পেপার রিপোর্টারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নানা এভিডেন্স, ডকুমেণ্ট আর ফোটো যোগাড় করছ, বিভিন্ন লোকের স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করে নিচ্ছ। এইরকম সব অভিযোগ করা হয়েছে তোমার নামে।'

রাকেশ উত্তর দিলেন না।

হেমবতীনন্দন সহজ, স্বাভাবিক স্বরে বলেন, 'আমার ধারণা অভিযোগটা সত্যি।'

রাকেশ এবার বলেন, 'হ্যাঁ। যা যা আপনি বলেছেন আমি ঠিক তা-ই করেছি। অবশ্য এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। তবে—'

'তবে কী?'

'নিউজ পেপার রিপোর্টারটিকে আমি নিয়ে যাইনি। ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বারহৌলি বইহারিতে যে মাস-মার্ডার হয়েছে তারই রিপোর্ট করতে কলকাতা থেকে এসেছে সে। আর ঘটনাচক্রে আমরা একই বাংলোতে উঠেছি।'

হেমবতীনন্দন আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে কিন্তু না বলেও উপায় নেই।'

রাকেশের উদ্বেগ বেড়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা স্যার?'

'রিপোর্টারটি কি মহিলা?'

মুহূর্তে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যায় রাকেশের। তিনি সতর্ক ভঙ্গিতে বলেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

কোনো খুনের রায় পড়ার মতো নিরাসক্ত অবিচলিত ভঙ্গিতে হেমবতীনন্দন বলেন, 'মহিলাটির বয়েস কি কম? ইজ শী এ ইয়াং লেডি?'

হেমবতীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে চমকে ওঠেন রাকেশ। কাঁপা গলায় বলেন, 'হ্যাঁ।'

'তাঁর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে একটা স্ক্যাণ্ডাল পাকিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে রাকেশ।'

'কিন্তু স্যার—'

হাত তুলে রাকেশকে থামিয়ে দিতে দিতে হেমবতীনন্দন বলেন, 'তোমার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। আমি শুধু সতর্ক করে দিতে চাই তোমার বিরুদ্ধে মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে। যাই হোক, এবার অন্য কথায় আসা যাক।'

উদ্বিগ্ন মুখে রাকেশ তাকান।

হেমবতীনন্দন বলেন, 'মার্ডার কেস করার ক্ষমতা বা জুরিসডিকসন তোমার নেই। কেসটা সেসান জজের কোর্টে আগেই তোমার পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

রাকেশ মুখ নামিয়ে বলেন, 'তা ছিল স্যার। কিন্তু আসামীদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষীও পাওয়া যাচ্ছিল না। এত বড়ো জঘন্য একটা ক্রাইম ঘটে গেল অথচ খুনীদের শাস্তি হবে না, সাক্ষী প্রমাণের অভাবে ক্রিমিনালেরা রেহাই পেয়ে যাবে, সেটা হয় না। তাই—'

'তাই উইটনেস যোগাড় করতে ধারাবনী বারহৌলিতে গিয়েছিলে, কেমন ?'

'তা একরকম বলতে পারেন। অতগুলো মানুষকে ওপেন ডে-লাইটে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হ'ল। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছিল, ওখানে সত্যিকার অবস্থাটা কী। তারপর গ্রামগুলোতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না। ভারতবর্ষের গ্রাম সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে বদলে গেছে।'

'কিন্তু রাকেশ, একটা কথা তুমি মনে রাখোনি।'

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রাকেশ, 'কী স্যার ?'

হেমবতীনন্দন বলেন, 'তুমি শুধু নাগরিকই নও, একজন বিচারকও।' তাঁর স্বরে অটুট গাম্ভীর্য।

রাকেশ চুপ করে থাকেন।

হেমবতীনন্দন বলতে থাকেন, 'আর ধারাবনী বারহৌলির মার্ডার কেসটা তোমার কোর্টেই রয়েছে। একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য কী, আশা করি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।'

'না স্যার। তবে এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।'

'বল।'

'আমরা যে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করেছি, সে সবের ভিত্তিতে এই কেসের বিচার হওয়া উচিত।'

'রাইট। কিন্তু একটা কথা সব সময় একজন বিচারকের মাথায় রাখা উচিত। ইমোসানের দ্বারা চালিত হওয়া আমাদের প্রফেসানের লোকদের পক্ষে বিরাট ডিসকোয়ালিফিকেসন।'

'জানি স্যার। যে সব উইটনেস আর ডকুমেন্ট যোগাড় করেছি, সেগুলোর মধ্যে ইমোসান নেই। সবই সলিড এভিডেন্স। অবশ্য বলতে পারেন, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে হয়তো ওভাবে আমার ছুটে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু একজন বিচার-কের লিমিটেসন বা কাজকর্মের ধরাবাঁধা ফ্রেমের বাইরেও হিউম্যান কনসিডারেসন ব'লে একটা ব্যাপার থেকেই যায়। এটা বিবেকের প্রশ্ন।'

'হুঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হেমবতীনন্দন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত রাকেশ। অন্যায় করে আসামীরা পার পেয়ে যাবে, এটা কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তার পরেও একটা কথা থেকে যায়।'

'কী?'

'তুমি যে পদ্ধতিতে আসামীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে চাইছ সেটা তোমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না। জুডিসিয়ারিতে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। সেগুলো মেনে চলতে হয়।'

'কিন্তু স্যার—'

হাত নেড়ে রাকেশকে থামিয়ে দিতে দিতে হেমবতীনন্দন বলেন, 'তুমি যে এ ব্যাপারে বিচলিত হয়েছ সেটা তোমাকে ভুলে যেতে হবে। ওটা তোমার দেখার বা বিবেচনার বিষয় নয়।' তাঁর কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব এবং কঠোরতা ফুটে বেরোয়।

রাকেশ এবার প্রায় মরিয়া হয়েই বলেন, 'কিন্তু সাক্ষীরা কোর্টে আসতে পারলে এই কেসটা আমাদের সোসাইটির অনেকগুলো ভয়ঙ্কর দিক খুলে দিত।'

হেমবতীনন্দন এবার হেসে ফেলেন, 'তুমি কিন্তু একজন সোসাল ওয়ার্কারের মতো কথা বলছ রাকেশ। বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু একটু আলাদা।'

'স্যার, একজন বিচারকের সোসাল ওয়ার্কার হতে বাধা আছে কি? তার কাজটা তো এক হিসেবে সমাজ-সেবারই। উইকার সেকসানের বিরুদ্ধে যে অন্যায় হয় তার প্রতিকার একজন বিচারকের মতো আর কে-ই বা করতে পারে?'

হেমবতীকে এবার বেশ অসহিষ্ণুই দেখায়। নীরস ভারী গলায় তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরে না হয় একদিন আলোচনা করা যাবে। এখন যেটা অত্যন্ত জরুরি সেটা শুনে রাখো—'

রাকেশ হকচকিয়ে যান, তবে কোনো প্রশ্ন করেন না।

হেমবতীনন্দন বলেন, 'অভিযোগ এসেছে, তুমি ধারাবনী বারহৌলি কেসটা সম্পর্কে হাইলি প্রেজুডিসড্। তাই কেসটা আমি অন্য কোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন রাকেশ। তারপর বলেন, 'এই জন্যেই কি লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে এনেছেন?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া—' এই পর্যন্ত বলে দ্বিধান্বিতের মতো হঠাৎ থেমে যান হেমবতীনন্দন।

'কী ?' রাকেশের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে গভীর উৎকণ্ঠা।

'তোমাকে সতর্ক করেও দিতে চাইছি। অ্যাপারেণ্টলি যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ধারাবনী বারহৌলির কেসটার পেছনে পাওয়ারফুল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকেরা রয়েছে। তারা তোমাকে যে ছেড়ে দেবে না, সেটা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছ।'

'হ্যাঁ স্যার। যতদূর জানতে পেরেছি, এর পেছনে একজন বড় জমিমালিক আর একজন পলিটিক্যাল লীডার রয়েছে।'

কোনো মন্তব্য না করে আস্তে মাথা নাড়েন হেমবতীনন্দন।

রাকেশ থামেননি। ক্ষুব্ধ উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকেন, 'একজন পীপলস রিপ্রেজেণ্টেটিভ অন্যায় কাজ করে পার পেয়ে যাবে ?'

হেমবতীনন্দনকে এবার বেশ বিচলিত দেখায়। তিনি বলেন, 'এর উত্তর আমি দিতে পারব না। আমাদের কাজ হ'ল সলিড সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাকেশ বলেন, 'একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না স্যার।'

'কোন ব্যাপারটা ?' চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে হেমবতীনন্দনের জ্বল-জ্বলে চোখ দেখা যায়।

'বড় ল্যাণ্ডলর্ডরা অসহায় দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করে, তাদের ওপর এক্সপ্লয়টেসন চালায়, সেটা তবু বোঝা যায়। কয়েক শ' বছর ধরে এটা ফিউডাল সিস্টেমেরই একটা অঙ্গ। জমিন্দারি অ্যাবোলিসন হয়ে গেলেও বিহারের ইণ্টেরিয়র গ্রামগুলোতে এই টরচারটা এখনও প্রবলভাবেই চলছে। প্রায় রোজই সে খবর আমরা পাই। কিন্তু—'

গভীর মনোযোগে রাকেশের কথাগুলো শুনতে শুনতে হেমবতীনন্দন বলেন, 'কিন্তু কী ?'

রাকেশ এবার যা বলেন তা এইরকম। গরীবের চাইতে গরীব, অচ্ছুৎ, ভূমি-হীন মানুষদের সম্পর্কে বড়ো জমিমালিকদের মনোভাবটা তবু বোঝা যায় কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত কোনো জনপ্রতিনিধি যদি নিষ্ঠুর অমানুষিক আচরণ করে, তার কি শাস্তি হবে না ? দেশে আইন কানুন, আদালত, পেনাল কোড—এ সব থাকার তবে প্রয়োজন কি ? পুরোপুরি অ্যানার্কিই চলতে থাকুক।'

হেমবতীনন্দন বলেন, 'তোমাকে তো বেশ কয়েক বার বললাম, আমাদের ইমোসানাল হতে নেই। উই নীড ডকুমেন্টস, উইটনেস অ্যাণ্ড এভিডেন্স। এই ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে আমাদের আর কিছুই করণীয় নেই।'

'ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন স্যার, আপনি যা বলছেন তার সবটাই সত্যি। তবু তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়।'

'কী কথা ?'

'একজন পলিটিক্যাল লীডার যদি এভিডেন্স কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছুতে না দেয়, উইটনেসদের ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখে ?'

রাকেশের প্রশ্নগুলির মধ্যে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই। খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আজকের ভারতবর্ষে যে কোনো বিবেকবান মানুষই চারিদিকের পরিবেশ এবং ঘটনা দেখে এ সব জিজ্ঞাসা করতে পারে। ভেতরে ভেতরে হেমবতীনন্দন বেশ বিচলিতই হ'ন। কিন্তু বাইরের দিকে গাম্ভীর্য অটুট রেখে বলেন, 'পলিটিকস ইজ এ ব্যাড থিং—খুব খারাপ বস্তু।'

রাকেশ সবিনয়ে বলেন 'স্যার ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারছি না।'

কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে হেমবতীনন্দনের। ঈষৎ তীক্ষ্ণ গলায় তিনি বলেন, 'হোয়াট ডু ইউ মীন ?'

অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে রাকেশ বলেন, 'আমার মতে পলিটিকস খারাপ কিছু না। ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যাণ্ড ভাইটাল থিং ইন আওয়ার লাইফ। শুধু বাজে নোংরা অমানুষেরা এটা দখল করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে এ জাতীয় জঘন্য লোকেরা গায়ের জোরে রাজনীতিতে এসে ভিড় করছে। তার ফলে সাধারণ মানুষের মনে পলিটিকস সম্পর্কে একটা ভয়ঙ্কর ধারণা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।' একটু থেমে ফের বলেন, 'ধারাবনী বারহৌলির কেসটার ব্যাপারে গ্রামে না গেলে এ-সব আমি ভালো করে জানতেই পারতাম না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হেমবতীনন্দন বলেন, 'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। এদিক থেকে আমি বিষয়টা ভেবে দেখিনি।' একটু চিন্তা করে আবার বলেন, 'কিন্তু এরা খারাপ হলেও দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষমতাই এদের হাতে। বলা যায় এরাই সমস্ত কিছু কনট্রোল করে।'

'এখনও সবটা পারেনি। তবে অনেকটাই দখল করেছে।'

হেমবতীকে বেশ চিন্তিত দেখায়। তিনি রাকেশের কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন এবার বলেন, 'অসৎ পলিটিসিয়ানদের হাতে দেশটা পুরোপুরি চলে গেলে

সেটা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়।'

রাকেশ বলেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন স্যার—'

'কী বল তো?'

'পলিটিকসে সৎ মানুষদের পার্সেন্টেজ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এটা একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক লক্ষণ।'

হেমবতীনন্দন আস্তে মাথাটা হেলান। বলেন, 'হ্যাঁ, এটা আমার চোখে পড়েছে।'

রাকেশ বলেন, 'সৎ আদর্শবাদী মানুষেরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলে বা রাজনীতি সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লে দেশের অবস্থা কী হবে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'সবই তো বুঝি। তারপরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।'

'কী প্রশ্ন স্যার?'

'বাজে লোকেদের রাজনীতিতে ভিড় করা ঠেকাবে কী করে? এরা ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলের জন্য না পারে হেন কাজ নেই। কেননা এদের রয়েছে মানি পাওয়ার আর মাসল পাওয়ার। নিজেদের স্বার্থে এরা যে কোনো লেভেলে নেমে যেতে পারে। ভদ্র আদর্শবাদী মানুষ তো সেখানে নামতে পারবে না। সে ক্রমশ ফ্রাসট্রেটেড হয়ে দূরে সরে যাবে।'

সামান্য উত্তেজিত দেখায় রাকেশকে। তিনি বলেন, 'প্রাণের বা নোংরামির ভয়ে সরে গেলে তো চলবে না। সৎ মানুষদের আরো বেশি করে পলিটিকসে এগিয়ে আসতে হবে। পীপলের কাছে গিয়ে বদ মতলববাজ লোকেদের স্বরূপ তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। বোঝাতে হবে কিসে তাদের ভালো, কিসে মন্দ।'

একটু মজা করে হেমবতীনন্দন বলেন, 'রাজনীতি নিয়ে আজকাল খুব ভাবছ মনে হচ্ছে।'

'আগে তেমন করে ভাবিনি। ধারাবনীতে যাবার পর এই ভাবনাটা সারাক্ষণ আমাকে অস্থির করে রাখছে। ওখানে না গেলে ইণ্ডিয়ার রীয়েল একটা পিকচার আর এক ক্লাসের পলিটিসিয়ান সম্পর্কে আমি কিছু জানতেই পারতাম না। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল এবার।'

হেমবতীনন্দন সামনের দিকে ঝুঁকে এবার জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি রাজনীতিতে নামার কথা চিন্তা করছ নাকি?'

রাকেশ চমকে ওঠেন। হেমবতীনন্দন যা বললেন সেভাবে ব্যাপারটা আগে কখনও ভাবেননি। কথাটা হেমবতী হয়তো হালকাভাবেই ঠাট্টা করে বলেছেন

কিন্তু রাকেশের মস্তিষ্কে সেটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়ে দেয়। উত্তর না দিয়ে তিনি দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে থাকেন।

হেমবতীনন্দন আবার বলেন, 'তোমার বাবা ছিলেন একজন বিরাট ফ্রিডম ফাইটার। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আর সত্যিকারের আইডিয়ালিস্ট। সেদিক থেকে তোমার রক্তে খানিকটা পলিটিকস থেকেই গেছে। বলা যায়, ব্যাপারটা তোমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।'

রাকেশ বলেন, 'পলিটিকসের বিষয়ে আগে কখনও ভেবে দেখিনি। এবার ভাবব।'

হেমবতীনন্দন হকচকিয়ে যান। গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়েও ঠিক পেরে ওঠেন না। ব্যস্তভাবে বলেন, 'না না, রাজনীতি-টাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই। তোমার সামনে ব্রাইট কেরিয়ার রয়েছে। নিজের কাজ অনেস্টলি করে যাও। তাতেই সমাজের যথেষ্ট উপকার হবে।'

রাকেশ এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'স্যার, আপনি তো ধারাবনীর কেসটা আমার কাছ থেকে সরিয়ে অন্য কোর্টে দিচ্ছেন। তা হলে ওখানে ঘুরে এভিডেন্স যোগাড় করলে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না আপনার।'

হেমবতীনন্দন অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন, 'কী দরকার আর ওখানে যাবার। শুধু শুধু নতুন করে প্রবলেমে গিয়ে পড়া।'

হেমবতীর মনোভাব বুঝতে পারেন রাকেশ। তিনি তাঁর খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি একেবারেই চান না, রাকেশ কোনোরকম উটকো ঝঞ্ঝাট বা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ধারাবনী বারহৌলিতে আবার এভিডেন্স যোগাড় করতে গেলে নতুন করে কী সমস্যা তৈরি হবে, কে জানে। হেমবতীনন্দনের সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু মানুষটি বহু বিষয়েই অতিরিক্ত সাবধানী এবং মধ্যপন্থী। মধ্যপন্থী না বলে সংরক্ষণপন্থী বলাই ভালো। তাঁর মতে যা চলে আসছে তা-ই চলতে থাক। চিরাচরিত যে প্রথা বা নিয়ম চালু আছে তিনি তার বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তুলতে চান না। হেমবতী স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁর আচরণে এবং কথাবার্তায় মনে হতে পারে, যতটা গা বাঁচিয়ে চলা সম্ভব তিনি তার পক্ষপাতী।

রাকেশ এমনিতে যথেষ্টই বিনয়ী, শ্রদ্ধেয় বয়স্ক ব্যক্তিদের তিনি মান্য করেই চলেন। কিন্তু ধারাবনী বারহৌলির গণহত্যা তাঁর ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ এবং জেদকে উসকে দিয়েছে। তিনি দৃঢ়স্বরেই বলেন, 'আমাকে আরেক বার ওখানে যেতেই হবে স্যার।'

'কেন ?'

'আমার অনেক জিনিস ওখানে পড়ে আছে। সেগুলো অন্তত নিয়ে তো আসতে হবে।'

'অরুণকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে-ই নিয়ে আসতে পারবে।'

রাকেশ বলেন, 'জিনিসপত্র আনার জন্যেই শুধু না, আমার আরো জরুরি কাজ আছে ওখানে।'

হেমবতীনন্দনের মুখ দেখে মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

রাকেশ এবার কুণ্ঠিতভাবে বলেন, 'স্যার, আমি আপনাকে একটু বিরক্ত করব।'

'বিরক্ত আবার কী, বল—'

'আপনার জীপের ড্রাইভার যদি কষ্ট করে আমাকে দুধলিগঞ্জ পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসে, খুব উপকার হয়। নইলে আজ আর সেখানে ফিরতে পারব না।'

'তুমি কি এখনই যেতে চাও ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

হেমবতীনন্দন বললেন, 'তাই কখনো হয়! এই সবে এলে, এখনই ফিরবে কী ? আজ থেকে, কাল ভোরে বরং যেও।'

রাকেশ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'স্যার ক্ষমা করবেন, আজই আমাকে ফিরতে হবে।'

কী ভেবে হেমবতীনন্দন বলেন, 'ঠিক আছে, থাকতে যখন চাইছ না তখন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু রেস্ট নিয়ে বিকেলের দিকে যেও।'

আপত্তি করতে আর সাহস হয় না রাকেশের। মাথাটা সামান্য হেলিয়ে বলেন, 'আচ্ছা স্যার।'

ষোলো

বিকেলেই নওলপুরা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাকেশ। দুধলিগঞ্জে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে যায়।

ড্রাইভার একাই তাঁকে পৌঁছে দিতে আসেনি, সঙ্গে অরুণও এসেছিল।

সারাটা পথ অন্যমনস্কর মতো প্রায় চুপচাপ কাটিয়ে দিয়েছেন রাকেশ। কচিৎ

অরুণের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেছেন। তাঁর যা পদমর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব তাতে অরুণ যে উপযাচক হয়ে কিছু বলবে তেমন সাহস তার হয়নি। রাকেশ যা বলেছেন সে শুধু তারই উত্তর দিয়েছে।

রাকেশের অন্যমনস্কতার কারণও রয়েছে। তাঁর মাথার ভেতর অনবরত হেমবতীনন্দনের সেই কথাটা ঘুরে ঘুরে হানা দিয়ে যাচ্ছে। হেমবতী যদিও হালকা চালে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি রাজনীতিতে নামতে চান কিনা। এটা ফিক্সেসানের মতো রাকেশের মাথায় ঢুকে গেছে। এর মধ্যে ব্যাপারটা যত ভেবেছেন, ততই টিভির পর্দায় প্রতিফলিত কোনো দৃশ্যের মতো সারা দেশের রাজনৈতিক চিত্রটা তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। ক্রমশ অমানুষদের হাতে রাজনীতির মতো একটা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র চলে যাচ্ছে। এটা এখনও ঠেকাবার সময় আছে।

পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় ঢুকবার মুখে গেটের ডান পাশে একটা বড়ো কড়াইয়া গাছ। হঠাৎ রাকেশের চোখে পড়ে ধনুয়া আর বুড়ো আনোখী তার তলায় দাঁড়িয়ে আছে। চমকে ওঠেন তিনি এবং ব্যস্তভাবে জীপ থামাতে বলে নেমে পড়েন।

দূর থেকে ভালো করে বোঝা যায়নি। কিন্তু কড়াইয়া গাছটার কাছে যেতেই চোখে পড়ে আনোখীদের চোখেমুখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার ছাপ। কোনো কারণে তারা ভীষণ ভয় পেয়েছে।

আনোখীদের এই বাংলোর কাছে আশা করেননি রাকেশ। তাদের এখানে দেখে তিনি যতটা অবাক ঠিক ততটাই উদ্বিগ্ন। বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা!'

দু'জনে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হাঁ সাহাব, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী?' রাকেশ হকচকিয়ে যান।

'ওহী মেমসাহাব—'

'কার কথা বলছ?'

'যাঁর সঙ্গে দো রোজ আপনি আমাদের কাছে গেছেন—'

'কী হয়েছে তাঁর?'

'বহুৎ ভারী বিপদ।'

উদ্বিগ্ন মুখে রাকেশ বলেন, 'কিসের বিপদ? আমাকে সব খুলে বল।'

এরপর প্রবল উত্তেজনা এবং ভয় মিশিয়ে ধনুয়ারা যা বলে তার জট ছাড়িয়ে নিলে এরকম দাঁড়ায়। আজ দুপুরেও মেমসাহাব একলাই জঙ্গলে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন আর ফোটো তুলছিলেন। তখনও দুফার হয়নি, চার পাঁচগো আদমী বন্দুক নিয়ে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। ধনুয়ারা হাতজোড়

ক'রে মেমসাহেবকে ছেড়ে দেবার জন্য প্রচুর কাকুতি মিনতি করেছে, এমন কি পায়েও ধরেছে কিন্তু লোকগুলো বন্দুক উঁচিয়ে বলেছে, 'বিলকুল চুপ রহো। গলার নলিয়া দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বেরুলে জানে খতম করে দেওয়া হবে।'

মেমসাহেবকে নিয়ে লোকগুলো যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যায় সেইসময় সোজাসুজি তাদের পিছু নিতে ভরসা পায়নি ধনুয়ারা। তবে ওদের ওপর নজর রেখে গাছপালার আড়ালে আড়ালে কাচ্চী পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, যদি কোনো উপায়ে মেমসাহাবকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনা যায়। কিন্তু কাচ্চীতে ওরা জীপ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, মেমসাহাবকে জবরদস্তি গাড়িটায় তুলে ভূচ্চরের ছৌয়ারা উধাও হয়ে যায়।

ধনুয়া বলে, 'আমরা একবার ভেবেছিলাম মেমসাহাবকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব।'

রাকেশ বলেন, 'না না, তাতে ফল ভালো হ'ত না। ওদের হাতে বন্দুক ছিল। ছিনিয়ে আনতে গেলে তোমাদের শেষ করে দিত।'

এরপর ধনুয়া যা বলে তা এইরকম। জীপে মেমসাহেবকে তুলে হারামীরা চলে যাবার পর তারা এতই ঘাবড়ে যায় যে কী করবে বা কী করা উচিত, ভেবে পায় না। পরে সাহাব অর্থাৎ রাকেশের কথা তাদের মনে পড়ে যায়। ওদের নিশ্চিত ধারণা ঐ হারামজাদের ছৌয়াগুলো মেমসাহাবের কোনো ক্ষতি করে দেবে। সাহাবকে যদি কোনোরকমে খবর দেওয়া যায় হয়তো তিনি মেমসাহাবকে বাঁচাতে পারেন। তাই তারা রাকেশের খোঁজে পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় চলে আসে। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারে সাহাব সকালে বেরিয়ে গেছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই। এ সম্পর্কে বাংলোর কেউ যখন কোনোরকম হদিস দিতে পারল না তখন ধনুয়া এবং আনোখী স্থির করে ফেলে সন্ধে পর্যন্ত কড়াইয়া গাছের তলায় সাহাবের জন্য অপেক্ষা করবে। যদি তার মধ্যে সাহাব ফেরেন তো দেখা হবেই, নইলে আবার কাল ভোরে ফের চলে আসবে। ভগোয়ান রামজীকা কিরপা, আজই সাহাবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

শুনতে শুনতে রাকেশের নিশ্বাস আটকে আসে। দেবারতিকে যে বন্দুক উঁচিয়ে জোর করে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে, এমন একটা মারাত্মক সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতেই পারেননি। তা হ'লে একা একা তাকে আজ কিছুতেই জঙ্গলে ধনুয়াদের কাছে যেতে দিতেন না। প্রবল দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে তিনি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে কী বলবেন, ভেবে পান না।

অনেকক্ষণ পর রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'যারা মেমসাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে,

তারা কারা ? তাদের চেনো ?'

আনোথী এবং ধনুয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। নিজেদের মধ্যে নিচু চাপা গলায় কি আলোচনা ক'রে পরে বলে, 'তিন আদমীকে চিনি সাহাব। আরেক জনের মুখ আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'কারা ওরা ?'

ধনুয়া ইতস্তত করে। তার চোখেমুখে স্পষ্টতই ভয়ের ছাপ। সে বলে, 'ডর লাগতা সাহাব—'

ধনুয়ার মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না রাকেশের। তিনি বলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। তুমি বল—'

বারকয়েক ঢোক গিলে ধনুয়া জানায় তিন বন্দুকবাজের নাম সে বলে দিচ্ছে কিন্তু তার মুখ থেকেই যে রাকেশ নামগুলো শুনেছেন, এ কথা যেন কোনোভাবেই জানাজানি না হয়। তা হলে ওরা তাকে জানে খতম করে দেবে।

রাকেশ তাকে ভরসা দিয়ে বলেন, 'না না, তোমার ভয় নেই। আমি কাউকে বলব না। লোকগুলো কারা ?'

ধনুয়া বলে, 'এতোয়ার, পাসোয়ান আর ভৌরা। চৌথা বন্দুকবালার নাম জানি না।'

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে যায় রাকেশের। এই নামগুলো ধনুয়ার কাছে আগেও শুনেছেন। তিনি বলেন, 'এরা গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের ভূমিসেনা না ?'

'হাঁ, সাহাব।'

'ওরা মেমসাহেবকে কোথায় নিয়ে গেছে বলতে পার ?'

'নহী। তব্—'

'কী ?'

'বড়ে সরকার ঝা'জি আর সিংজির কাছে গেলে মেমসাহেবের পতা জরুর মিলবে।'

'তোমার কি মনে হয় ওঁরাই বন্দুকবাজদের পাঠিয়েছেন ?'

ধনুয়া উত্তর দেয় না।

এবার আরেকটা জরুরি কথা মনে পড়ে যায় রাকেশের। তিনি গভীর উদ্বেগে বলে ওঠেন, 'মেমসাহেবের সঙ্গে দুটো মেশিন ছিল না ?' ক্যামেরা এবং টেপ-রেকর্ডার সম্পর্কেই তিনি ইঙ্গিতটা দিলেন।

ধনুয়া বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, একটা ফোটোক খিঁচবার, আরেকটা গলার আওয়াজ ধরে রাখবার।'

'সে দুটো কোথায় ?'

ধনুয়া বলে, 'ও দোগো পয়লাই মেমসাহাবকা হাতোসে ছিনকে লিয়া।'

কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকেন রাকেশ। দেবারতির টেপ রেকর্ডারে ধর্ষিতা মেয়েদের আর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসা ধারাবনীর বিশ বাইশটি পুরুষের স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করা আছে। ক্যামেরাতেও রয়েছে লাঞ্ছিতা মেয়েদের এবং অত্যাচারিত পুরুষদের ছবির ফিল্ম।

রাকেশ ঠিক করে রেখেছিলেন সব স্টেটমেণ্ট এবং ফোটো যোগাড় করার পর স্টেটমেণ্টগুলো নিজের টেপ রেকর্ডারে তুলে নেবেন আর ফোটোগুলোর দুটো করে কপি করিয়ে একটা নেবেন তিনি এবং একটা দেবারতি। এখন ওগুলো হাতছাড়া হওয়া মানে এতদিনের পরিশ্রম পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। ধারাবনীতে যে গণহত্যা, ধর্ষণ আর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবার ঘটনা ঘটেছে তার যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ বন্দুকবাজেরা নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। হঠাৎ অসহ্য ক্রোধে এবং উত্তেজনায় রাকেশের মাথায় যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। একজন সৎ সাংবাদিককে ওভাবে বন্দুকের নল পিঠে ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং খুন-ধর্ষণের সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট করা যে কত বড় অপরাধ সেটা তিনি গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংকে টের পাইয়ে দেবেন। বুঝিয়ে দেবেন 'রুল অফ ল' এদেশ থেকে এখনও একেবারে লোপাট হয়ে যায়নি। যতই অ্যানার্কি চালাবার চেষ্টা করা হোক, জঙ্গলের নিয়ম মানুষের সমাজে তিনি কায়েম হতে দেবেন না।

একটা কথা মনে পড়তে রাকেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বলেন, 'সেই দুপুর থেকে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ। খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?'

ধনুয়া জানায়, কিছুক্ষণ আগে বড় সড়কে গিয়ে রামবহালের চায়ের দোকান থেকে লিট্টি কিনে এনে খেয়েছে।

রাকেশ তবু বলেন, 'আর কিছু খাবে ?'

'নেহী সাহাব।'

'লজ্জা ক'রো না।'

'না না, লজ্জার কী আছে। একটু আগেই তো আমরা খেয়েছি।'

'তা হলে এখন তোমরা ফিরে যাও।'

'লেকেন সাহাব—'

'বল—'

ধনুয়ার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়। সে বলে, 'মেমসাহাবকা কা হোগা ?'

দেবারতির ব্যাপারে ধনুয়াদের এই দুর্ভাবনাটুকু খুব ভালো লাগে রাকেশের।

তাঁদের সম্পর্কে ওদের সব সংশয় ঘুচে গেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে রাকেশরা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, বিশেষ করে দেবারতিকে ভূমিসেনারা তুলে নিয়ে যাবার পর ধন্নুয়ারা নিঃসন্দেহ হয়ে যায় তাদের এবং রাকেশদের প্রতিপক্ষ একই।

রাকেশ বলেন, 'মেমসাহেবের ব্যাপারে তোমরা চিন্তা ক'রো না। ও ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

ধন্নুয়া বলে, 'ঐ আদমীগুলো বহোত খতারনাক।'

'খতারনাক' কথাটা কাদের উদ্দেশে বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাকেশ বলেন, 'মেমসাহেবের গায়ে আঁচড় কাটার সাহস ওদের কারো হবে না।'

কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না ধন্নুয়াদের। তাদের কাছে গিরিলাল এবং ত্রিলোকী দানব বা ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান। পার্থিব কোন মানুষের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিতে আসা অসম্ভব।

আনোখী বিষণ্ণ গলায় বলে, 'মেমসাহাবের পত্তা পেলে আমরা জানতে পারব ?'

রাকেশ বলেন, 'নিশ্চয়ই। আমি দু-একদিনের ভেতর তোমাদের খবর দিয়ে আসব।'

'ঠিক হ্যায় সাহাব।'

বিমর্ষ মুখে আনোখীরা ফিরে যায়। আর রাকেশ চলে আসেন পি. ডব্লু. ডি. বাংলোর গেটের কাছে যেখানে হেমবতীনন্দনের জীপটা দাঁড়িয়ে আছে।

অরুণ জীপেই বসে ছিল। রাকেশের চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় সে। বলে, 'স্যার আপনাকে ভীষণ ওরিড দেখাচ্ছে। কোনো গোলমাল হয়েছে ?'

রাকেশ আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ। ভেবেছিলাম এখানে পৌঁছেই আপনাদের ছেড়ে দেব কিন্তু একটা বড়ো রকমের প্রবলেম দেখা দিয়েছে।'

কোনো প্রশ্ন না করে অরুণ তাকিয়ে থাকে।

রাকেশ এবার বলেন, 'একজনের জীবন ভীষণ বিপন্ন। আমাকে কয়েক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে। আপনাদের জীপটা এখন ছাড়তে পারছি না। এখানে গাড়ি-টাড়ির ব্যবস্থা নেই। আপনারা জীপ নিয়ে চলে গেলে খুবই অসুবিধায় পড়ে যাব।'

একটু চিন্তা করে অরুণ বলে, 'ঠিক আছে স্যার।'

'হয়তো আজ আপনাদের ফেরা হবে না। কালও যে কখন ফিরতে পারবেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যখন বলবেন তখনই যাব। আমার জন্যে ভাববেন না স্যার।'

রাকেশ বলেন, 'আপনার যাতে কোনোরকম অসুবিধা না হয়, ডিস্ট্রিক্ট জজকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেব। লিখব, আমিই আপনাকে আটকে রেখেছিলাম। আপনার আর ড্রাইভার সাহেবের একটু কষ্ট হবে কিন্তু একটা মানুষের প্রাণ বাঁচাবার কথা চিন্তা করে আশা করি আমাকে সাহায্য করবেন।'

অরুণ শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'আমাদের ব্যাপারে ভাববেন না স্যার। শুধু বলুন আমাদের কী করতে হবে—'

'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি বাংলোর ভেতরে গিয়ে একটা খবর নিয়ে আসছি।' বলে বাংলোর কম্পাউণ্ডে চলে আসেন রাকেশ।

অবোধনারায়ণ কেয়ার-টেকারের অফিসে বসে ছিল। রাকেশকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে। বলে, 'এই ফিরলেন স্যার ?'

'একটু আগে ফিরেছি।'

'আপনার তবিয়ত এখন—'

অবোধনারায়ণকে থামিয়ে দিয়ে রাকেশ বলেন, 'আমি পারফেক্টলি অলরাইট। এখানকার থানাটা কোথায় ?'

বিমূঢ়ের মতো কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে অবোধনারায়ণ। তারপর জানায় থানাটা এখান থেকে অনেক দূরে, তবে হাইওয়ে দিয়ে মাইলখানেক উত্তরে গেলে একটা পুলিশ চৌকি রয়েছে। সেখানে ক'জন কনস্টেবল আর একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে পাওয়া যাবে। খবরটা দিয়ে সবিস্ময়ে অবোধনারায়ণ জিজ্ঞেস করে, 'থানায় যাবেন স্যার ?'

'দেখা যাক।'

রাকেশ আর দাঁড়ান না। লম্বা লম্বা পায়ে গেটের বাইরে এসে জীপে উঠতে উঠতে ড্রাইভারকে বলেন, 'হাইওয়েতে চলুন—'

সতেরো

পুলিশ চৌকিতে এসে কাজের কাজ কিছুই হ'ল না। এখানে ছ'জন আর্মড কনস্টেবলকে নিয়ে রয়েছে একজন ছোট মাপের অফিসার। অফিসারটিকে এই মুহূর্তে পাওয়া গেল না। দশ মাইল দূরে এক গ্রামে কাল রাতে ডাকাতি হয়েছে। খবর পেয়ে আজ ভোরে তিনজন কনস্টেবল নিয়ে অফিসার বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। যে কনস্টেবলরা চৌকিতে রয়েছে তারা জানায় অফিসার তার বাহিনী

নিয়ে কখন ফিরবে, তদন্ত শেষ করে আদৌ আজ ফিরতে পারবে কিনা, তারা জানে না।

কনস্টেবলদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করে ফেলেছিলেন রাকেশ। এখন একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যাবে না। প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত মূল্যবান।

পুলিশ চৌকি থেকে বেরিয়ে জীপে উঠেই রাকেশ ড্রাইভারকে বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে চলুন—'

ডিস্ট্রিক্ট টাউন বা জেলাশহর এখান থেকে সত্তর আশি মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

এ শহরে রাকেশ অনেক বার এসেছেন। এখানকার প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি মহল্লা তাঁর চেনা। ড্রাইভারকে পথ দেখিয়ে তিনি সোজা এস. পি.'র বাংলোয় চলে এলেন।

এস. পি. জগমোহন শাস্ত্রীর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, বেশ ভারী চেহারা। এত রাতে রাকেশকে তাঁর বাংলোয় দেখে তিনি যতটা খুশি হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক। জানালেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগে-ভাগে না জানিয়ে হঠাৎ তাঁর বাংলোয় আসবেন, এটা তিনি ভাবতে পারেননি, যদিও এটা তাঁদের পরিবারের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

পরম সমাদরে রাকেশকে ড্রইং রুমে বসিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর হয়। প্রচুর নিমকিন প্যাঁড়া গুলাবজামুন এবং কফি আসে।

খাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা এখন নয়। কিন্তু আপত্তি করলেও রেহাই পাওয়া যাবে না। তাতে খানিকটা সময় নষ্টই শুধু হবে। অগত্যা খেতে খেতে পরস্পরের শারীরিক পারিবারিক ইত্যাদি খবরাখবর আদানপ্রদানের পর কাজের কথায় চলে আসেন রাকেশ, 'একটা বিশেষ প্রয়োজনে এত রাতে আপনার কাছে আসতে হ'ল—'

জগমোহন মৃদু হাসেন। বলেন, 'বুঝতে পেরেছি। হুকুম করুন আমি কী করতে পারি—'

'আমার আমর্ড ফোর্স দরকার। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ জন কনস্টেবলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

জগমোহন কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'কেন বলুন তো? ব্যাপারটা বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে।'

রাকেশ আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ। খুবই গুরুতর। এক জায়গায় রেইড করতে হবে। সার্চ ওয়ারেন্টের ব্যবস্থা আমি করব।'

জগমোহন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বললেন, 'দয়া করে যদি ব্যাপারটা খুলে বলেন—'

দেবারতিকে বন্দুক উঁচিয়ে তুলে নিয়ে যাবার ঘটনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন রাকেশ।

শুনে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন জগমোহন। তারপর বলেন, 'কী বলছেন মিস্টার সহায়?'

'ঠিকই বলছি।'

'আপনার ভুল হয়নি তো?'

'একেবারেই না।'

'কিন্তু—' কিছু বলতে গিয়ে দ্বিধান্বিতভাবে থেমে যান জগমোহন।

রাকেশ বলেন, 'কিন্তু কী?'

'গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিং সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি। তাঁরা অত্যন্ত রেসপেক্টেবল এবং ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। দিল্লী আর পাটনার বড়ো-বড়ো লোক তাঁদের পেছনে আছে। এঁদের বাড়িতে পুলিশ ঢুকলে তার ফলাফল কী হবে, আপনাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।'

অবিচলিত মুখে রাকেশ বলেন, 'না।'

'আপনি সব দিক ভালো করে ভেবে দেখুন স্যার।' জগমোহনকে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত দেখায়, 'আমার মতে এ-রকম একটা ড্রাস্টিক স্টেপ নেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।'

রাকেশ মৃদু হাসেন, 'স্টেপটা তো নেব আমি। আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? এর সব দায়িত্ব আমার।'

ঢোক গিলে জগমোহন বলেন, 'আমি আপনার ওয়েল-উইশার। আপনার মতো একজন ব্রাইট অনেস্ট মানুষের ক্ষতি হয়ে গেলে খুবই দুঃখের কথা। জেনে-শুনে সাপের গর্তে আপনাকে যেতে দিতে আমার সাহস হচ্ছে না।'

'আমার যাই ঘটুক না, ভয় পেয়ে কিছুতেই আমি পিছিয়ে আসব না।' রাকেশের চোখেমুখে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে, 'মাই ডিসিসান ইজ ফাইনাল। আর—'

'আর কী?'

'একটু আগে আপনাকে যা বলেছি আবারও সেটাই রিপিট করছি। গিরিলাল এবং ত্রিলোকীদের বাড়ীতে সার্চের ব্যাপারে যা ফেস করার আমিই করব। আপনার গায়ে যাতে আঁচড় না লাগে সেদিকটা আমি দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

জগমোহন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'একটা কথা বলব ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'প্রথমেই আর্মড ফোর্স নিয়ে হানা না দিয়ে এক কাজ করা যেতে পারে।'

'যেমন ?'

'আমরা গোপনে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখি সত্যিসত্যিই দেবারতিজিকে গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের লোকেরা তুলে নিয়ে গেছে কিনা—'

'নতুন করে খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন নেই। রিলায়েবল সোর্স থেকে জেনেছি ওরাই দেবারতিকে নিয়ে গেছে। আমি কিন্তু আর দেরি করতে পারব না জগমোহনজি। এক-একটা মিনিট চলে যাওয়া মানেই দেবারতির ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।'

জগমোহন হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলেন, 'এরপর আমার আর কিছু বলার থাকতে পারে না। আর্মড ফোর্স কবে আপনার দরকার ?'

রাকেশ বলেন, 'আজই। এই মুহূর্তে পেলে ভালো হয়।'

জগমোহন বিব্রতভাবে বলেন, 'আজ কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যবস্থা করতে কিছুটা সময় লাগবে।'

চিন্তিত দেখায় রাকেশকে। ইচ্ছা করেই কি কৌশলে দেরি করিয়ে দিতে চাইছেন জগমোহন যাতে ত্রিলোকী সিংদের সুবিধা হয়। খানিকটা সময় নিয়ে তিনি কি রাকেশের উদ্দেশ্যটা ওঁদের জানিয়ে দেবেন ? পরক্ষণেই তাঁর মনে হয় নিতান্ত অকারণেই জগমোহনকে সন্দেহ করছেন। সৎ দায়িত্বশীল অফিসার হিসেবে এই মানুষটির যথেষ্ট সুনাম আছে। তবে তিনি অতিরিক্ত সাবধানী, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে। শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত না হয়ে তিনি কিছুই করবেন না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তিনি বড়ো হয়েছেন। মিডল ক্লাস মেণ্টালিটি সর্বক্ষণ তাঁর ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে। কোনোরকমে গা বাঁচিয়ে চাকরিটি বজায় রাখতে পারলেই তিনি খুশি। নিরুপায় না হলে তিনি একেবারেই ঝুঁকি নিতে চান না। আর ক'টা বছর চাকরি আছে, নির্বিঘ্নে সেটা কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছু কাম্য নেই। তাঁর জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নেই, বড়ো মাপের উচ্চাশাও তিনি পোষণ করেন না। ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের সামান্য এক কেরানীর ছেলে হয়ে তিনি এস. পি. হয়েছেন, এতেই সন্তুষ্ট জগমোহন।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কতটা সময় লাগবে ?'

জগমোহন বলেন, 'ধরুন আজকের রাতটা। কাল সকালের মধ্যেই আশা করি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'মুশকিল হয়ে গেল।' বলে একটু ভাবলেন রাকেশ, তারপর আবার বললেন, 'কিন্তু কী আর করা! আমি এখানকার সরকারি গেস্ট হাউসে চলে যাচ্ছি। কাল ভ্যানসুদ্ধ আর্মড ফোর্স ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

'অবশ্যই।' জগমোহন বললেন, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা অনুরোধ করব। দয়া করে গরীবখানায় যখন এসেই পড়েছেন, রাতটা একটু কষ্ট করে এখানে কাটিয়ে দিলে আমাদের ভালো লাগবে। কাল এখান থেকেই আর্মড ফোর্স নিয়ে চলে যাবেন।'

'ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে আরো দু'জন রয়েছে। আজ আমরা গেস্ট হাউসেই চলে যাই। আপনার অনুরোধ নিশ্চয়ই আমার মনে থাকবে। পরে সময় হলে আপনাকে মেহমানদারি করার একটা চান্স দেওয়া যেতে পারে।' বলে হাসলেন রাকেশ।

জগমোহন বলেন, 'সময় একটু করতেই হবে স্যার। আর সেটা খুব তাড়াতাড়িই।'

আঠারো

পরের দিন ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে আমর্ড ফোর্স নিয়ে রাকেশরা যখন বারহৌলি গাঁয়ে পৌঁছলেন তখনও দুপুর হয়নি। সূর্যটা আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে।

রাকেশ জানতেন, গিরিলাল ঝা থাকেন বারহৌলিতে আর ত্রিলোকী সিংয়ের হাভেলি মধিপুরায়। তিনি ঠিকই করে ফেলেছেন, প্রথমে বারহৌলিতে গিরিলালের বাড়ি সার্চ করাবেন। সেখানে দেবারতিকে না পাওয়া গেলে বাধ্য হয়ে তাঁকে যেতে হবে মধিপুরায়।

রাকেশদের জীপ রাস্তা দেখিয়ে আগে আগে এসেছে। পেছনে কালো রংয়ের বিরাট পুলিশ ভ্যানে আর্মড ফোর্স। দেখে মনে হয়, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই তিনি ঐ গ্রাম দুটোয় চলেছেন।

আজকের দিনটা মেঘলা মতো। রোদের তেজ তেমন নেই, লু-বাতাসও বইছে না। আকাশের এ-মাথায় সে-মাথায় কালো মেঘ সেই ভোর থেকেই জমতে শুরু করেছে। এখান থেকে কয়েক'শ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে কোনো কারণে নিম্নচাপ হওয়ায় আকাশে এত মেঘের আনাগোনা।

চৈত্র মাসে বেশ কিছুদিন একটানা আগুন ঝরাবার পর এই প্রথম ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আজকের গরমটা অন্য দিনের মতো ততটা অসহ্য নয়।

বারহৌলি গ্রামে ঢোকার মুখে রাকেশদের জীপ এবং পুলিশ ভ্যানটাকে নিরুপায় হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। সামনে প্রচুর লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক হাতী। হাতীটাকে চমৎকার সাজানো হয়েছে। তার পিঠে জরি এবং মখমল দিয়ে বানানো ঝকমকানো হাওদা, হাওদার মাথায় ছত্রি। ঘাড়ের ওপর মাহুত ডাঙস নিয়ে বসে আছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে দু'জন মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে আসেন। একজনের চেহারা পাতলা, ছিপছিপে। তাঁর পরনে চুস্ত এবং মলমলের পাঞ্জাবি. পায়ে শুঁড়-তোলা বাহারে নাগরা। পাঞ্জাবির তলায় সোনার হার দেখা যাচ্ছে। হাতে সোনার ব্যাণ্ডে দামী ঘড়ি।

নিখুঁত কামানো মুখ তাঁর। গায়ের রং বাদামী, মাঝারি চোখে ধূর্ত চাউনি। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় লোকটি সৌখিন এবং অত্যন্ত চতুর।

দ্বিতীয় লোকটি চেহারার দিক থেকে একেবারে উল্টো। চর্বির আস্ত একটি পাহাড়। গলা নামক বস্তুটি তাঁর নেই বললেই চলে। প্রকাণ্ড শরীরের ওপর মুণ্ডুটা একেবারে ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন। গোলাকার মুখে বসন্তের চিরস্থায়ী দাগ। হাতের আঙুলগুলি মোটা মোটা এবং থ্যাবড়া। চোখ দুটি ক্ষুদে ক্ষুদে এবং অত্যন্ত সজাগ, মাথার চুল চামড়া ঘেঁসে ছোট ছোট করে ছাঁটা। পেছন দিকে এক গোছা মোটা টিকি।

লোকটির পরনে দেহাতী ধরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। দুই হাতে হীরে-চুনি-পান্না-গোমেদ ইত্যাদি বসানো ছ' সাতটা আংটি। জামার বোতামও হীরের। পায়ে চকচকে পাম্প সু চামড়ার ওপর একেবারে কামড়ে বসে গেছে।

চর্বির ঢিবি এবং ছিপছিপে পাতলা চেহারা, দু'জনে জীপের কাছে এসে জোড় হাতে, অত্যন্ত বশংবদ ভঙ্গিতে বললেন, 'নমস্তে স্যার, আপনার জন্যে সেই সকাল থেকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

এই দু'জন কারা হতে পারেন, আন্দাজ করতে পারছিলেন রাকেশ। তার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, স্নায়ুগুলো টান টান। তবু প্রতিনমস্কার জানিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাদের ঠিক চিনতে পারলাম না তো।'

দু'জনেই তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দিলেন। যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং।

গম্ভীর মুখে রাকেশ বলেন, 'আমি এখানে আসব, আপনারা জানতেন ?'

গিরিলাল এবং ত্রিলোকী একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'জরুর।'

'কী ভাবে ?' বলেই হঠাৎ রাকেশের খেয়াল হয় জগমোহন নিশ্চয়ই তাঁর আসার খবর এঁদের দেননি, নিশ্চয়ই পুলিশের মধ্যে গিরিলালদের লোকজন রয়েছে। তাদের পক্ষে আগে ভাগে জানিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।

গিরিলাল অমায়িক হেসে বলেন, 'দেবারতিজি এসেছেন আর আপনি আসবেন না, তাই কখনো হয় ? এটা হতেই পারে না। আমরা ভেবেই রেখেছিলাম, আজ সুবেহ্ সুবেহ্ আপনারা চলে আসবেন। লেকেন আপনার পোঁছতে লেট হয়ে গেল। ওটা অবশ্য কিছু না।'

রাকেশ এবার চুপ। স্থির চোখে দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তবে যে-জন্য কাল সন্ধে থেকে তিনি অস্থির হয়ে আছেন সেই খবরটা অবশ্য পাওয়া গেল। দেবারতির খোঁজে তিনি সঠিক জায়গাতেই এসেছেন।

গিরিলাল অনেকটা ঝুঁকে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে এবার বলেন, 'একটু কষ্ট করে আপনাকে নামতে হবে যে স্যার—'

'কেন ?' রাকেশের চোখ কুঁচকে যায়।

গিরিলালের কণ্ঠস্বর এবার আরো বিগলিত শোনায়, 'কৃপা করে যখন এতদূর চলেই এসেছেন, মেহমানদারি করার একটা সুযোগ দিন।'

গিরিলালের কথার উত্তর না দিয়ে রুক্ষ গলায় রাকেশ বলেন, 'দেবারতিজিকে বন্দুকবাজ পাঠিয়ে জবরদস্তি ধরে এনেছেন কেন ? আশা করি আপনারা জানেন কাজটা কতটা বে-আইনি।'

ত্রিলোকী এবং গিরিলাল দু'জনেই শশব্যস্তে আর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে জিভ কাটেন। বলেন, 'এ আপনি কী বলছেন স্যার ? এত বড়ো অন্যায় আমরা করতে পারি ? আসলে—'

'আসলে কী ?'

'দেবারতিজি নিজের ইচ্ছায় এখানে চলে এসেছেন।'

রাকেশ ভেবেছিলেন, বারহৌলি বা মধিপুরায় পোঁছলেই গিরিলালদের সঙ্গে মারাত্মক কনফ্রনটেসন শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এঁদের রণকৌশল একেবারেই অন্যরকম। বিনয়ে সর্বক্ষণ এঁরা যেন মাটিতে মিশেই আছেন, যেন রাকেশের দুই বশংবদ নৌকর। অর্থাৎ গিরিলালদের স্ট্র্যাটেজি হ'ল, সরাসরি সংঘর্ষে না যাওয়া। এঁরা এমন একটা ভাব করছেন যেন রাকেশ তাঁদের কাছে এক মহামান্য অতিথি। তাঁর খাতিরদারিতে যাতে কোনোরকম ত্রুটি ঘটে না

যায় সেজন্য দু'জনেই একেবারে তটস্থ। কিন্তু এঁরা যে কতটা ধুরন্ধর তা একটা কূট চালেই ধরা যাচ্ছে। দেবারতিকে জোর করতে হয়নি, স্বেচ্ছায় সে এখানে চলে এসেছে !

গিরিলালদের বিনয় বা আনুগত্যের ভানে এতটুকু নরম হননি রাকেশ। প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার ভেতর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে তাঁর। চাপা তীব্র গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'দেবারতিজি কোথায় ?'

গিরিলাল বলেন, 'আমারই গরীবখানায়। তাঁকে কাল বলেছি, রাত্তিরে আপনি হয়তো আসতে পারবেন না, তবে আজ সুবেহ্ জরুর চলে আসবেন। দেবারতিজি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কৃপা করে জীপ থেকে নামুন—'

'কেন ?'

'হাঁথীটা আপনার জন্যে অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিতে মেজাজ খুবই শান্ত, তবু জানবর তো। কখন ধৈর্য হারিয়ে বিগড়ে যায়। আসুন স্যার—'

রাকেশ প্রচণ্ড বিরক্তি এবং ক্রোধ সত্ত্বেও অবাকই হন। বলেন, 'হাতীর মেজাজের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?'

হাত কচলাতে কচলাতে গিরিলাল বলেন, 'আমাদের সবার ইচ্ছা, হাঁথীর পিঠে করে আমাদের গাঁওয়ের ভেতরে যান। আপনার মতো বড়ে আদমী আগে আর কখনও আমাদের বারহৌলিতে আসেননি। উতরিয়ে, উতরিয়ে—' চারপাশে বিশাল জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফের বলেন, 'এই দেখুন, গাঁওবালারা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে সেই সুরয ওঠার আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। আইয়ে, আইয়ে—'

বিপুল চেহারার এই স্থূল মাংসল লোকটির মস্তিষ্ক যে কত সূক্ষ্ম এবং কত রকমের ধূর্তামিতে ঠাসা, সেটি টের পাওয়া যাচ্ছে। রাকেশ বলেন, 'হাতীতে চড়ার অভ্যাস আমার নেই। আমি জীপে করেই যাচ্ছি।'

'স্যার, আমরা বড়ো আশা করে আছি।'

'আপনাদের তো বললামই, হাতীতে আমি কখনও চড়িনি। আমি কেন, আমাদের বংশের কেউ কোনোদিন ওঠেনি।'

'কোনো তখলিফ হবে না স্যার।'

গিরিলাল এবং ত্রিলোকী হাতজোড় করে করুণ মুখে একরকম জোরজারই করতে থাকেন কিন্তু রাকেশকে টলানো যায় না। শেষ পর্যন্ত হতাশ ভঙ্গিতে গিরিলালরা বলেন, 'আমাদের বহুৎ দুখ দিলেন স্যার। আপনি যখন হাঁথীতে উঠবেন না তখন কী আর করা! জীপেই চলুন—' বারহৌলি গাঁয়ের যে-সব

লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, হাতের ইশারায় তাদের সবাইকে সরিয়ে জীপের জন্য রাস্তা করে দেন ত্রিলোকীরা।

রাকেশ গিরিলালকে বলেন, 'আমি এখানকার কিছুই চিনি না। আপনার বাড়িটা কোথায় ?'

গিরিলাল বলেন, 'বেশি দূর না, মোটে দু'রশি পথ। আপনি হুকুম করলে জীপে উঠে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাকেশ বলেন, 'উঠুন।'

গিরিলাল এবং ত্রিলোকী জীপে উঠে বসলে রাকেশ বলেন, 'একটা কথা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।'

'কী ?'

'আপনাদের দু'জনের নামেই সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে।'

গিরিলালেরা জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে, বিষণ্ণ মুখে বলেন, 'বহুৎ দুখকা বাত স্যার। আপনি নিশ্চয়ই দেবারতিজির কথা ভেবে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাই তড়িঘড়ি ওয়ারেণ্ট বের করে এনেছেন। এর কোনো জরুরত ছিল না। আমরা কেউ ক্রিমিনাল না, বলতে পারেন সরকার আর কানুনের সেবক।'

রাকেশ উত্তর দিলেন না।

গিরিলাল এবার যথেষ্ট দুঃখিতভাবে বলেন, 'দেবারতিজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন তাঁকে আমরা কতটা সম্মান দেখিয়েছি।'

রাকেশ এবারও চুপ।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল। পেছন পেছন পুলিশ ভ্যানটাও আসতে শুরু করেছে।

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যানটা একবার দেখে নেন গিরিলাল। তারপর কুণ্ঠিত মুখে বলেন, 'স্যার একটা আর্জি আছে।'

রাকেশ বলেন, 'কী ?' তাঁর চোখেমুখে রীতিমত সতর্কতা।

গিরিলাল জোড়হাতে জানান, তাঁদের কোঠিতে আগে আর কখনও পুলিশ ঢোকেনি। বাড়ি দূরের কথা, বারহৌলি গাঁয়ের চৌহদ্দিতে কেউ কোনোদিন পুলিশ দেখেনি। গিরিলাল এখানকার 'সরগনা' আদমী, অর্থাৎ মান্যগণ্য শ্রদ্ধেয় মানুষ। আচমকা তাঁর কোঠিতে পুলিশ হানা দিলে তাঁর সম্বন্ধে গাঁওবালাদের ধারণা খুবই খারাপ হয়ে যাবে। তাদের চোখে গিরিলালদের মর্যাদা অনেকটাই

নষ্ট হবে। যে কারণে পুলিশের এই হাঙ্গামা তার তো কোনো প্রয়োজনই নেই। রাকেশ তাঁর কোঠিতে গেলেই দেখতে পাবেন, কলকাতার পত্রকার সেখানে নিরাপদে এবং সসম্মানেই রয়েছেন। কথাটা কতখানি সত্য, দেবারতিজিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন রাকেশ। কাজেই গিরিলাল চান, পুলিশ ভ্যানটা গ্রামের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাক। তারা যখন স্যারের সঙ্গে এসেই পড়েছে, খাতির-দারিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না। তাদের জন্য উৎকৃষ্ট আরাম এবং ভোজনের যাতে ব্যবস্থা হয়, সেটা তিনি অবশ্যই দেখবেন।

কিছুক্ষণ ভাবেন রাকেশ। এটা গিরিলালদের কোনো চতুর চাল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিকই করে ফেলেন পুলিশ ভ্যানটা আপাতত গ্রামের বাইরেই থাকবে। আর যাই হোক একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর হামলা করতে এরা সাহস করবে না। তবু গিরিলালকে হুঁশিয়ার করে দেন, 'আপনার সম্মানের দিকটা আমি দেখছি, কিন্তু এতটুকু গোলমাল দেখলে পুলিশ তক্ষুনি গ্রামের ভেতর চলে আসবে।'

'হাঁ হাঁ জরুর।' তৎক্ষণাৎ সায় দেন গিরিলাল।

এবার জীপ থামিয়ে আর্মড ফোর্সের সঙ্গে যে অফিসারটি এসেছিলেন তাঁকে ভ্যান থেকে ডাকিয়ে আনেন রাকেশ। বলেন, তিনি ভ্যান নিয়ে বাইরের রাস্তায় যেন অপেক্ষা করেন।

অফিসার সসম্ভ্রমে বলেন, 'আচ্ছা স্যার।'

এরপর গিরিলালদের সঙ্গে বারহৌলি গ্রামের ভেতর চলে যান রাকেশ।

উনিশ

প্রায় চার-পাঁচ একর জায়গার মাঝখানে প্রকাণ্ড দুর্গের মতো গিরিলালের তেতলা হাভেলি। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তার একদিকে টিনের শেডের তলায় পুরনো মডেলের হুডখোলা তিন চারটে মোটর, আর আছে ছ-সাতটা ফীটন। ক'টা দামি ঘোড়াও এখানে দেখা গেল। ফাঁকা চত্বরটার আরেক দিকে শ্বেত পাথরে বাঁধানো শিবমন্দির। সেখানে মৈথিলী পুরোহিত খালি গায়ে পুজোর আয়োজন করছে। তাকে সাহায্য করছে তিন চারটি নানা বয়সের মেয়েমানুষ।

বাড়িটার পেছন দিকে নানা রকম সবজি এবং ফলের বাগান। অজস্র নৌকর-নৌকরানীকে এধারে ওধারে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে।

গিরিলাল এবং ত্রিলোকী রাকেশকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই গোটা হাভেলি তটস্থ হয়ে ওঠে। নৌকররা দৌড়ে কাছে চলে আসে। গেঁয়ো পদ্ধতিতে অনেকটা গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গিতে তারা লাইন দিয়ে দাঁড়ায়।

গিরিলাল একটা মাঝবয়সী নৌকরকে ডেকে নিচু গলায় বলেন, 'কাল যে মেমসাহেব এসেছেন তাঁকে খবর দে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে গেছেন।'

নৌকরটা উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে দৌড়ে যায়।

এরপর গিরিলাল জোড়হাতে গাঢ় বিনয়ে রাকেশকে বলেন, 'আইয়ে স্যার, আমাদের বহুৎ 'পুণ' যে এই গরীবখানায় আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

লোকটা যে কতোবড়ো ধূর্ত, তা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছিলেন রাকেশ। এমনিতে তিনি ধীর স্থির সংযত মানুষ। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, একটি চড় কষিয়ে দেন। লোকটার নকল বিনয় এবং বশংবদ ভঙ্গির পেছনে যে কী গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে এখনও তা আঁচ করা যাচ্ছে না। তাঁকে এভাবে কোনো ফাঁদের ভেতর ঢোকানো হ'ল কিনা কে জানে। তবে এরা যদি তাকে সত্যিই বিপদে ফেলে, তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। এদের চরম সর্বনাশের ব্যবস্থা করতে দরকার হলে গোটা অ্যাডমিনিস্ট্রেসন তোলপাড় করে ফেলবেন।

রাকেশ জিপ থেকে নেমে এলেন। তাঁর মাথায় এখন একটাই চিন্তা, দেবারতিকে কী অবস্থায় দেখবেন। চাপা শুষ্ক গলায় রাকেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'দেবারতি কোথায়?'

গিরিলাল হাসেন, 'চিন্তা নায় করনা স্যার। কলকাতার পত্রকার এই বাড়িতেই আছেন। পয়লা তাঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাব। আইয়ে, আইয়ে—'

ফাঁকা জায়গার পর চওড়া-চওড়া পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেই বিরাট বারান্দা। তার একধারে দোতলার ওঠার সিঁড়ি। রাকেশ গিরিলালদের সঙ্গে সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন।

একসময় গিরিলালেরা তাঁকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে আসেন।

ঘরটি প্রকাণ্ড। গোটা মেঝে পুরু কার্পেটে মোড়া। একধারে বিশাল মকরমুখি খাট। আরেক দিকে ভারী ভারী আলমারি। মাঝখানে সোফা-টোফা সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা। একদিকের দেয়ালে গিরিলাল ঝায়ের পূর্বপুরুষদের সারি সারি অয়েল পেইন্টিং। আরেক দেয়ালে শিব দুর্গা বিষ্ণু রথ থেকে শুরু করে বজরঙ্গবলী পর্যন্ত অজস্র দেবদেবীর বাঁধানো ছবি। দু'ধারের যাবতীয় ছবিতে টাটকা ফুলের মালা।

এই বিশাল কামরাটির একটি সোফায় বসে আছে দেবারতি। দেখেই বোঝা

যায়, কাল রাতে এক সেকেণ্ডের জন্যও সে ঘুমোতে পারেনি। তার চোখেমুখে মারাত্মক উৎকণ্ঠার ছাপ।

একটা সোফা দেখিয়ে গিরিলাল বলেন, 'কৃপা করকে পধারিয়ে স্যার—'

পলকহীন দেবারতিকে লক্ষ্য করতে করতে একটা সোফায় বসে পড়েন রাকেশ। বোঝাই যাচ্ছে, প্রবল টেনসান ছাড়া আর মেয়েটির অন্য কোনো ক্ষতি হয়নি।

রাকেশকে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না দেবারতি। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে, পারল না। ঠোঁট দুটো অসহ্য আবেগে শুধু কাঁপতে লাগল।

রাকেশ বসার পর গিরিলালরাও বসে পড়েছিলেন। গিরিলাল বলেন, 'দেবা-রতিজি সামনেই বসে আছেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন, আমরা তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছি কিনা—'

রাকেশ ভেতরে ভেতরে গিরিলালদের ওপর এতই অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন যে তাঁদের কথার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন, 'এঁরা যা বলছেন তা কি ঠিক?' এভাবে প্রশ্ন করাটা যে ভদ্রতাবিরুদ্ধ, রাকেশ তা জানেন। কিন্তু মনে মনে তিনি স্থিরই করে ফেলেছেন এই লোকগুলোকে কোনোভাবেই সৌজন্য বা ভদ্রতা দেখাবেন না। গিরিলালেরা এসবের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

রাকেশ যে এজাতীয় প্রশ্ন করে একরকম অসম্মানই করছেন, সেটা একেবারেই গায়ে মাখেন না গিরিলালেরা। তাঁরা বলেন, 'আপনি যে আমাদের সামনেই দেবারতিজির কাছে জানতে চাইছেন, আমরা তাতে খুশি। সব কিছু নিজের কানে শুনে নেওয়া ভাল।'

রাকেশকে দেখে অনেকখানি সাহস ফিরে পেয়েছিল দেবারতি। সে জানায় তার সঙ্গে আদৌ দুর্ব্যবহার করা হয়নি। বরং যথেষ্টই আরামে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাকেশ গিরিলালদের দিকে ফিরে এবার জিজ্ঞেস করেন, 'আরামেই যদি রেখে থাকেন তা' হলে বন্দুকবাজদের পাঠিয়ে জোর করে এঁকে ধরে এনেছিলেন কেন? এসবের মানে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

গিরিলাল জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে বলেন, 'স্যার, প্রথম থেকেই আমাদের মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করে এসেছেন। আসলী বাতটা হ'ল—' বলতে বলতে থেমে যান।

রাকেশ তীক্ষ্ণ চোখে গিরিলালকে লক্ষ্য করতে থাকেন।

গিরিলাল এবার বলেন, 'বুঝলেন স্যার, এদিককার লোকজন ভালো না, বহুৎ

খতারনাক। একা একা জোয়ানী লড়কী ঘুমতি ফিরতি। তাই পেহারাদার পাঠিয়েছিলাম। তা' ছাড়া—'

লোকগুলোর শয়তানি প্রায় সূক্ষ্ম চারুকলার পর্যায়ে উঠে গেছে। তাঁদের দেখতে দেখতে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'আমাদের ইচ্ছা ছিল আপনারা একবার দয়া করে আমাদের এখানে আসুন। এজন্যে কতবার লোক পাঠিয়েছি! লেকেন আপনাদের কৃপা পাইনি। তাই ভাবলাম—'

রূঢ় গলায় রাকেশ বলেন, 'তাই ভাবলেন দেবারতির পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ধরে নিয়ে যাই। তা' হলে নিশ্চয়ই তার খোঁজে আমি এখানে চলে আসব, তাই না?'

গিরিলাল হাতজোড় করে বলেন, 'স্যার, আমাদের ওপর থেকে আপনার গুসসা আর গেল না। বন্দুক দিয়ে কেন লোক পাঠিয়েছিলাম তা আপনাকে আগেই জানিয়েছি। তবে হাঁ দেবারতিজি এলে আপনিও যে চলে আসবেন, এটা আমাদের মাথায় ছিল। এই কৌশলটুকুর জন্যে আশা করি আপনার ক্ষমা পাব।'

আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। একটা মাঝবয়সী নৌকর এই সময় রুপোর প্রকাণ্ড ট্রেতে প্রচুর ক্ষীরের মিঠাই এবং উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই নিয়ে আসে।

গিরিলাল সসম্ভ্রমে নিজের হাতে খাবারের প্লেটগুলি রাকেশ এবং দেবারতির সামনে সাজিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'এই গরীবখানায় আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল। একটু মুহ্‌ মিঠা করুন।'

রাকেশ দামী সুখাদ্যগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান না। বলেন, 'মিঠাই খাবার জন্যে এখানে আসিনি। আমরা এখন যাব।' দেবারতিকে বলেন, 'চলুন—'

গিরিলাল এবং ত্রিলোকী নাছোড়বান্দা হয়ে প্রচুর কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। কিন্তু দেবারতি বা রাকেশ, কেউ খাবারের প্লেটগুলি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না।

গিরিলাল শেষ পর্যন্ত জানান, রাকেশদের এই গ্রামে আসাটা একটা বড়ো রকমের তৌহার। তাঁদের আনন্দদানের জন্য অনেক পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে। দুপুরে তাঁরা এখানে ভোজন করবেন। বিকেলে দূরের ঐ জঙ্গলে হাতীর পিঠে চড়িয়ে তাঁদের শিকার খেলতে নিয়ে যাওয়া হবে। ঐ জঙ্গলে বুনো শুয়ার, হরিণ, খরগোস থেকে শুরু করে নানা ধরনের জন্তু জানোয়ার রয়েছে। আর রয়েছে অজস্র পাখি—সিল্লি, মাণিক পাখি, বুনো হাঁস, তিতির ইত্যাদি। কপাল ভাল

থাকলে এমন কি চিতা-টিতাও পাওয়া যেতে পারে। ইচ্ছামত রাকেশরা পশুপাখি শিকার করতে পারেন।

রাতের অনুষ্ঠানটা আরো বিশাল এবং ব্যাপক। গিরিলালরা নৌটঙ্কীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন রাকেশদের সম্মানে। সাহারসা থেকে এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত দল এসে সারারাত নৌটঙ্কী গাইবে। গিরিলালদের আর্জি আজকের রাতটা তো রাকেশেরা থাকবেনই, কাল দুপুরে ভোজনের পর রাকেশরা যেখানে হুকুম করবেন সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

রাকেশের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'এ-সবের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের এত খাতিরদারি না করলেও চলবে।'

গিরিলালেরা চোখেমুখে পুত্রশোকের কষ্ট ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁদের দেখে মনে হয়, এত দুঃখ জীবনে আর কখনও পাননি।

রাকেশের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, দেবারতির সঙ্গে ক্যামেরা এবং টেপরেকর্ডার ছিল। সে-দুটোতে ধরা রয়েছে ধর্ষিতা মেয়েদের আর গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা ভীতসন্ত্রস্ত পুরুষদের যাবতীয় স্টেটমেণ্ট এবং ফোটো।

রাকেশ দেবারতির উদ্দেশে বলেন, 'আপনার ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার কোথায় ?'

দেবারতি উত্তর দেবার আগেই গিরিলাল বলে ওঠেন, 'ও দুটো আমার কাছে আছে স্যার।'

রাকেশের কপাল কুঁচকে যায়, 'আপনার কাছে কেন ?'

গিরিলাল বলেন, 'দামী জিনিস তো। তাই নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। চিন্তা নায় করনা।' বলেই তক্ষুনি একটা নৌকরকে ডেকে টেপরেকর্ডার আর ক্যামেরাটা আনিয়ে দেন।

রাকেশের মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছিল। সন্দিগ্ধভাবে বোতাম টিপে যখন তিনি টেপ রেকর্ডারটা চালাতে যাবেন সেই সময় গিরিলাল বলেন, 'ক্ষমা করবেন স্যার—'

আচমকা ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা না বুঝে বিমূঢ় মুখে রাকেশ বলেন, 'মানে ?'

'টেপ চালিয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না।' শান্ত গোবেচারি ভঙ্গিতে বলেন গিরিলাল।

রাকেশ চমকে ওঠেন, 'কী বলছেন আপনি ?'

এতক্ষণ ত্রিলোকী সিং একটি কথাও বলেননি। তাঁর ভূমিকা ছিল নিবিষ্ট শ্রোতার। এবার খুব নিরীহ গলায় বলেন, 'আপনারা যে-সব স্টেটমেণ্ট যোগাড়

করেছিলেন, সব মুছে ফেলা হয়েছে। আর ক্যামেরার ফিল্মও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।'

অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় মাথার দু-পাশে রক্তবাহী শিরাগুলি দড়ির মতো পাকিয়ে উঠতে থাকে রাকেশের। দেবারতিকে ওভাবে তুলে আনার কারণটা এতক্ষণে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। কোনোরকমে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করেন তিনি। তীব্র গলায় বলেন, 'ওগুলো নষ্ট করলেন কেন?'

উত্তেজনাশূন্য মসৃণ মুখে ত্রিলোকী শুধু হাসেন। রাকেশ লক্ষ্য করেন, গিরিলালের মুখেও সেই একই রকম হাসি ফুটে উঠেছে। ত্রিলোকী বলেন, 'এ-সব বহুৎ গন্ধা চীজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহাব, আপনার মতো সাচ্চা আদমীর কি এগুলো ছোঁয়া উচিত?'

এতক্ষণে ত্রিলোকীদের সমস্ত পরিকল্পনাটা রাকেশের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। জলন্ত চোখে তিনি তাকিয়ে থাকেন।

গিরিলাল ঝা ত্রিলোকীর মতো ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যান না। সোজাসুজি আসল কথাটাই বলেন, 'নিজেদের মৃত্যুবাণ কি অন্যের হাতে কেউ তুলে দেয় স্যার?'

কর্কশ স্বরে এবার রাকেশ বলেন, 'কিন্তু—'

'বলুন।'

'ক'বার আপনারা টেপ আর ফিল্ম নষ্ট করবেন? আমরা আবার ফোটো তুলব, টেপ করব।'

ত্রিলোকী সিং রাজপুতের মধ্যে পুরনো ফিউডাল মনোভাবের প্রায় সবটাই এখনও রয়ে গেছে। তবে তার ওপর সামান্য একটু পালিশটালিশ হয়তো পড়েছে। তা' ছাড়া তিনি জানেন তাঁর জমিতে যে সব অচ্ছুৎ ঐরু-গৈরুর-ভৈরুর দল হাল-লাঙল চালায়, তাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলা যায় ঠিক সেই স্বরে এবং ভঙ্গিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে কিছু বলা সম্ভব না। তাঁর মুখে আগের হাসিটি ফুটেই থাকে। শুধু দুই চোখের তারায় অদ্ভুত হিংস্রতা ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়। ত্রিলোকী সিং বলেন, 'সে সুযোগ বোধহয় আর পাবেন না স্যার।'

লোকটা তাঁকে একরকম চ্যালেঞ্জই জানাচ্ছে। কী অসীম দুঃসাহস এদের! এই গ্রামে না এলে এদের আসল চেহারাটা কোনোদিনই জানা যেত না। পলকহীন কিছুক্ষণ তিনি ত্রিলোকীদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর দেবারতির দিকে ফিরে বলেন, 'চলুন, যাওয়া যাক—'

দেবারতি উঠে দাঁড়ায়।

গিরিলাল চোখেমুখে আন্তরিক দুঃখের একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে বলেন, 'বহোত

আপসোস কি বাত। আপনারা এলেন, লেকেন গরীবখানায় কিছুই মুখে দিলেন না।'

উত্তর না দিয়ে দেবারতিকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান রাকেশ। গিরিলালেরা তাঁদের বাড়ির বাইরে সেই জীপটা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। গাড়িতে উঠে রাকেশ ড্রাইভারকে বলেন, 'দুধলিগঞ্জ পি. ডব্লু. ডি. বাংলো চলিয়ে—'

বারহৌলি গাঁ থেকে বেরুবার পর যে পুলিশ ভ্যানটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা তাদের পেছন পেছন চলতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ আগে গিরিলালের বাড়িতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর থেকে একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছেন রাকেশ। তিনি ভেবে পান না, যে ভারতবর্ষে 'রুল অফ ল' বলে একটা কথা চালু আছে, সেখানে গিরিলাল এবং ত্রিলোকীর মতো লোকেদের এতটা দুঃসাহস আর স্পর্ধা হয় কি করে? মনে হয় তাঁর মস্তিষ্কের ভেতর একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

বারহৌলি গাঁ পেছনে ফেলে দেড়-দুই কিলোমিটার যাবার পর দেবারতিই প্রথম কথা বলে, 'আমাদের এতদিনের এত পরিশ্রম একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।'

রাকেশ চমকে ওঠেন। তারপর চমকটা থিতিয়ে এলে কঠিন মুখে বলেন, 'কিছুই নষ্ট বা ব্যর্থ হয় না মিস সেন। ঐ লোক দুটো কী টাইপের ক্রিমিনাল সেটা তো অন্তত জানা গেল।'

দেবারতি আর কোনো প্রশ্ন করে না।

জীপ এবড়ো-খেবড়ো দেহাতী রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে।

কুড়ি

পি. ডব্লু. ডি. বাংলোয় পৌঁছবার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সূর্যটা বিরাট লাল বলের মতো গড়াতে গড়াতে পশ্চিম দিগন্তের তলার দিকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই টুক করে ওটা আরো নিচে নেমে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে নেমে যাবে। শেষ বিকেলের আলো এখন ম্যাড়মেড়ে, মলিন। কাছের যা কিছু, এখনও স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু দূরের গাছপালা, আরো দূরের, আকাশ এবং আকাশের গায়ে ক্লান্ত পাখির ঝাঁক—সব দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে লাউঞ্জে মুখোমুখি দুটো বেতের সোফায় বসে আছেন রাকেশ এবং

দেবারতি। মাঝখানে একটা সেণ্টার টেবল। তার ওপর দু'কাপ চা থেকে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে।

রাকেশদের মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায় বারহৌলি গ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফিউডাল সিস্টেমের সঙ্গে ডেমোক্রেসি মিশিয়ে বারহৌলি মধিপুরা ধারাবনী ইত্যাদি গ্রামগুলোতে যে-সব কাণ্ডকারখানা চলছে তা প্রায় অভাবনীয়।

দেবারতি হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি গিরিলাল ঝা'র বাড়ি না গেলে কী যে করতাম, ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

কাল দেবারতিকে বন্দুক উঁচিয়ে তুলে নিয়ে যাবার খবরটা পাওয়ার পর থেকে সেই যে রাকেশের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়েছিল, এখনও তা কাটেনি।

দূরে ঝাড়ালো গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ওরা আপনার কোনোরকম ক্ষতি করত না। আমি না গেলে টেপ আর ফিল্মটা নষ্ট করে সসম্মানে আপনাকে এই বাংলোয় পোঁছে দিয়ে যেত।' একটু থেমে বললেন, 'আপনার বা আমার ক্ষতি করা ওদের উদ্দেশ্য ছিল না।'

'এখন তা বুঝতে পারছি।' দেবারতি বিষণ্ণ গলায় বলে, 'সব ডকুমেণ্ট আর ফোটোগ্রাফ ওরা নষ্ট করে দিল। ধারাবনীর 'মাস কিলিং'-এর ওপর যে একটা বড়ো করে রিপোর্ট তৈরি করব তার আর উপায় নেই।'

রাকেশ উত্তর দিলেন না।

দেবারতি স্বগতোক্তির মতো ফের বলে, 'এখানে এসে কোনো কাজ হ'ল না। হাতের ভেতর এত ভালো ভালো মেটিরিয়াল পেয়েও হারাতে হ'ল। এরকম ঘটনা আমার সাংবাদিক জীবনে আর কখনও ঘটেনি।'

রাকেশ অন্যমনস্কর মতো এবার বললেন, 'দুর্দান্ত একটা এক্সপীরিয়েন্স হ'ল, কি বলেন?'

'তা বলতে পারেন। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

'কী?'

'এত বড়ো একটা ক্রাইম করে লোকগুলো পার পেয়ে যাবে? আঠারোটা লোককে এরা খুন করেছে। এরপর তো যা ইচ্ছা তাই করে যাবে।'

রাকেশকে খুবই চিন্তিত এবং বিচলিত দেখায়। বিভ্রান্তের মতো তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন শুধু।

দেবারতি বলতে থাকে, 'আমরা অসহায়ের মতো এই অন্যায় মেনে নেব? এত বড়ো দেশে কারো কি কিছু করার নেই?'

হঠাৎ উঠে পড়েন রাকেশ। এবার তাঁকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখায়। এলো-মেলো পায়ে লাউঞ্জে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'এ হতে পারে না, পারে না।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমরা ওদের বিরুদ্ধে কী করতে পারি ? দে আর সো পাওয়ারফুল।'

রাকেশ হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, 'এই অবস্থায় ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পদ্ধতিটা আমার ঠিক জানা নেই। কয়েকজনের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করে নিতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর দেবারতি বলল, 'ভাবছি, কাল কলকাতায় ফিরে যাব।'

পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন রাকেশ। এ-ক'দিন একসঙ্গে ধারাবনীতে কাজ করে দু'জনে খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। বললেন, 'কালই যাবেন ?'

'এখানে কাজ তো কিছুই হ'ল না। শুধু শুধু বসে থেকে কী হবে।'

'সেটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু—'

'কী ?'

রাকেশ কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'আমি যা ভেবেছি, শেষ পর্যন্ত সেটা যদি করে উঠতে পারি আপনার সাহায্য খুবই দরকার হবে।'

দেবারতি বুঝতে পারছিল, ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা সম্পর্কে রাকেশ মনে মনে কোনো একটা বড়ো রকমের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও তাঁর কিছু দ্বিধা আছে। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করে পরিপূর্ণ চোখে রাকেশকে দেখতে দেখতে বলল, 'সবরকম সাহায্যই পাবেন। আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। চিঠি লিখলেই চলে আসব।'

'ধন্যবাদ।'

দেবারতি সামান্য হাসে, তবে কিছু বলে না।

রাকেশ তার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করে বলেন, 'আমি কী করতে যাচ্ছি, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার কৌতূহল হচ্ছে, তাই না ?'

দেবারতি বলে, 'অস্বীকার করব না, তা একটু হচ্ছে।'

'কিন্তু ডিসিসানটা আমি এখনও নিতে পারিনি। তাই বলছি না।'

দেবারতি চুপ করে থাকে।

পরদিন সকালে নিজের নিজের স্যুটকেশ গুছিয়ে পি. ডব্লু. ডি. বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়েন রাকেশরা। লছমন স্যুটকেশ দুটো নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বাস রাস্তা পর্যন্ত আসে।

আপাতত বাসে করে রাকেশরা যাবেন পূর্ণিয়া রেল স্টেশনে। বিকেলে কলকাতার ট্রেন আছে। সেটাতে দেবারতিকে তুলে দিয়ে রাকেশ সোজা চলে যাবেন নওলপুর টাউনে। ডিস্ট্রিক্ট জজ হেমবতীনন্দন দ্বিবেদীর সঙ্গে দেখা করবেন।

সাহারসার দিক থেকে পূর্ণিয়ার বাস এসে যায়। এ অঞ্চলের বাসে আকছার যে দৃশ্য দেখা যায় তা থেকে এটা আলাদা কিছু নয়। তেমনই গাদাগাদি ঠাসা-ঠাসি ভিড়। পা-দানি. বনেট, ফুটবোর্ড—আগাপাশতলা সর্বত্র মানুষ ঝুলছে, ছাদের ওপরও প্রচুর মানুষ।

দম-আটকানো ভিড়ের বাসে ঠেলেঠুলে কোনোরকমে রাকেশ এবং দেবারতি উঠে পড়ে।

ভাগ্যটা আজ ভালোই বলতে হবে। দু-আড়াই কিলোমিটার যাবার পর একটা ছোটখাটো বাজারের কাছে এসে বাসটা থামতেই ত্রিশ-চল্লিশটা লোক নেমে যায়। দেখেই বোঝা যায় দেহাতী বরযাত্রীর দল, তাদের মধ্যে ছোকরা বরটি কোরা ধুতি, নতুন ফুল শার্ট, কাঁচা চামড়ার বুট জুতো, গলায় গোলগোলি ফুলের মালা এবং চুল থেকে চুঁইয়ে আসা তেলে বিশেষভাবে শোভা পাচ্ছে।

বরযাত্রীর দলটা নেমে যেতে বাসটা অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু তাই না, বসারও জায়গা পেয়ে গেল দেবারতিরা।

পূর্ণিয়ায় বাস পৌঁছল সাড়ে তিনটেয়। তিনটে পঞ্চাশে ট্রেন।

রাকেশই টিকিট কেটে দেবারতিকে নিয়ে একটা মোটামুটি ফাঁকা কামরায় উঠে মুখোমুখি বসলেন। হাতে এখনও কুড়ি মিনিটের মতো সময় রয়েছে।

রাকেশ বলেন, 'তিনটে দিন নানা ইভেন্টের মধ্যে কেটে গেল. কি বলেন ?'

'হ্যাঁ।' ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে দেয় দেবারতি। বলে, 'সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক্সাইট্মেন্টের মধ্যেও। একটা কথা ভাবি—' বলতে বলতে থেমে যায় সে।

'কী ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রাকেশ।

'যে মারাত্মক ঘটনার ওপর রিপোর্ট করতে এসেছিলাম, আপনি না থাকলে কী বিপদেই যে পড়তাম !'

রাকেশ মৃদু হাসেন।

ধারাবনীর গণহত্যা সম্পর্কে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে দু'জনে। কিন্তু কুড়িটা মিনিট তো অফুরন্ত সময় নয়। হঠাৎ প্লাটফর্মে প্রথম ঘণ্টি বেজে ওঠে। দু' মিনিট পর আরো একবার বাজবে। তৃতীয় ঘণ্টির পর ট্রেন ছেড়ে দেবে।

রাকেশ বলেন, 'এবার ওঠা যাক।'

প্ল্যাটফর্মে নেমে দেবারতি যে জানালার পাশে বসে আছে তার সামনে দাঁড়ান রাকেশ। বলেন, 'আমার ঠিকানা তো আপনাকে দিয়েছি। কলকাতায় পৌঁছেই চিঠি দেবেন।'

গাঢ় গলায় দেবারতি বলে, 'নিশ্চয়ই দেব।'

এরমধ্যে কখন যেন আরো দু'বার ঘণ্টি বেজে গেছে। তারপরই গার্ডের হুইসিলের সঙ্গে ট্রেন চলতে শুরু করে।

একটা হাত জানালার ওপর রেখে কথা বলছিল দেবারতি। নিজের অজান্তেই. স্বয়ংক্রিয় কোনো গভীর আবেগে হাতটা পলকের জন্য একবার স্পর্শ করেন রাকেশ। ট্রেনের স্পীড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যতক্ষণ দেখা যায়, ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেবারতির দিকে তাকিয়ে থাকেন রাকেশ। একসময় ট্রেনটা ডিসটাণ্ট সিগনাল পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একুশ

পুর্ণিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাস রাস্তার দিকে যেতে যেতে অদ্ভুত এক শূন্যতা যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে রাকেশকে। দেবারতির সঙ্গে ক'দিনেরই বা আলাপ! মাত্র তিনটে কি চারটে দিন। তার মধ্যেই মেয়েটা কখন যেন তার জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। এইমাত্র সে চলে যাবার পর সেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

তিরিশ-বত্রিশ বছরের জীবনে দেবারতির মতো এমন মেয়ে আর কখনও দেখেন নি—এত তেজী, সাহসী এবং জেদী। তাঁর মতোই দেবারতি সামাজিক অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে শেখেনি। শুধু সামাজিক অন্যায়ই না, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধেও সে তার দিক থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

দেবারতি যে কলকাতার একটি বিখ্যাত ইংলিশ ডেইলির দুঃসাহসী পত্রকার, এর বেশি তার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা হয়নি। এই ক'দিনে এত সব মারাত্মক এবং নাটকীয় অভিজ্ঞতায় তাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন যে দেবারতি সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছুই জিজ্ঞেস করা যায়নি। ব্যক্তিগত খবর নেবার মতো এক মুহূর্ত সময়ও তাঁদের হাতে ছিল না।

যদিও দেবারতি জানিয়ে গেছে, রাকেশের চিঠি পেলেই ফের এখানে চলে আসবে কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন। হয়তো আসবে, আবার নাও তো আসতে পারে। কলকাতায় গিয়ে কীভাবে কোন কাজে সে জড়িয়ে পড়বে, আগে থেকে বলা সম্ভব না। গিরিলাল ঝা'র বাড়ি থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, সেই কৃতজ্ঞতার কারণে আবেগের বশে এখানে আসার কথা দেবারতি বলে থাকতে পারে। আবেগ কী দীর্ঘায়ু হয় ? সে অবশ্য জানিয়ে গেছে, কলকাতায় গিয়েই চিঠি লিখবে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। হয়তো রাখবে। তবে এ ব্যাপারে কিছুটা সংশয়ও থেকে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কয়েক শ' কিলোমিটার দূরে বিহারের এক ছোটো স্টেশনে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, প্রচুর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা পালন করা কতটা সম্ভব সে ব্যাপারে রাকেশ পুরোপুরি নিশ্চিত নন। কলকাতার মতো সুবিশাল মেট্রোপলিসে ফিরে যাবার পর ধারাবনী বারহৌলির স্মৃতি দেবারতির মনে এখনকার মতো টাটকা থাকবে না, ক্রমশ সে-সব ঝাপসা হয়ে যাবে। কলকাতায় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এত উত্তেজনা এবং এতই আকর্ষণ যে দেবারতিকে নানা দিকে প্রবল টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। দু' মাস চার মাস কি দু' বছর পর ধারাবনী বারহৌলির কথা তার আর মনেও থাকবে না। এমনও হতে পারে নতুন কোনো অ্যাসাইনমেণ্ট দিয়ে তাদের কাগজ 'মর্ণিং সান' দেবারতিকে হয়তো ভারতের অন্য কোনো স্টেটে কিংবা বিদেশেও পাঠিয়ে দিতে পারে।

এ-সব কথা মনে হ'তেই বিষণ্ণ বোধ করেন রাকেশ। অন্যমনস্কর মতো একসময় বাস স্ট্যাণ্ডে চলে আসেন। দেবারতির ভাবনাটা আচ্ছন্ন করে রাখলেও মনে মনে তিনি স্থিরই করে রেখেছিলেন, সোজা নওলপুরে গিয়ে হেমবতীনন্দনের সঙ্গে দেখা করবেন। ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা তাঁদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে হেমবতীর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না রাকেশকে। মিনিট পনেরোর মধ্যে নওলপুরের বাস এসে যায়।

খুব একটা ভিড় নেই বাসটায়। এক কোণে জানলার ধারে সীটও পেয়ে যান রাকেশ।

নওলপুরে হেমবতীনন্দনের বাড়িতে রাকেশ যখন এসে পৌঁছন, সন্ধে পেরিয়ে গেছে। তাঁকে দেখে রীতিমত অবাকই হন হেমবতী। রাকেশকে এই মুহূর্তে তিনি আশা করেননি। বলেন, 'তুমি !'

রাকেশ আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'হ্যাঁ স্যার, একটা জরুরি কাজে আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম। হঠাৎ আসতে হলো, আগে তাই খবর দিতে পারিনি।'

হেমবতী বলেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে চা-টা খেয়ে নাও।' একটা নৌকরকে ডেকে চা মিষ্টি এবং প্রচুর নোনতা খাবার আনালেন তিনি।

রাকেশ বাধা দিলেন না, দিয়ে লাভও নেই। আতিথেয়তার ব্যাপারে কোনো আপত্তিই কানে তুলবেন না হেমবতীনন্দন। তা' ছাড়া বাসে অনেকটা রাস্তা ছোটাছুটির কারণে মাথা ধরে গেছে। এখন এক কাপ চা না হলেই নয়। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।

চুপচাপ চা-মিষ্টি খেয়ে হেমবতীর দিকে তাকান রাকেশ।

হেমবতী বলেন, 'তোমার জরুরি কথাটা এবার শোনা যাক।'

রাকেশ এভাবে শুরু করেন, 'স্যার, কাল আমার ভয়ানক একটা এক্সপীরিয়েন্স হয়েছে। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, চব্বিশ ঘণ্টা আগেও কল্পনা করতে পারতাম না। ভারতবর্ষ কাদের হাতে চলে যাচ্ছে?'

বিমূঢ়ের মতো হেমবতী জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে?'

কাল কীভাবে দেবারতিকে বন্দুকের নল দেখিয়ে গিরিলাল ত্রিলোকীর লোকেরা জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল এবং কীভাবে তাদের ক্যামেরা আর টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখা যাবতীয় তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে, ইত্যাদি সব কিছুই এক নিশ্বাসে বলে যান রাকেশ।

হেমবতীর ধারণা ছিল, এমন মারাত্মক অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলিউড কিংবা বম্বের ক্রাইম ছবিতেই ঘটতে পারে। সমস্ত শোনার পর তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'তুমি যা বললে তা তো মীডিয়াভেল এজে ঘটা সম্ভব ছিল।'

রাকেশ বলেন, 'স্বাধীন ভারতেও ঘটছে স্যার। এর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লে, এমন ঘটনার কথা কারো মুখে শুনলে আমিও বিশ্বাস করতাম না।'

হেমবতীকে এবার বিচলিত দেখায়। চিন্তিতভাবে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এখন তুমি কী করতে চাও?'

রাকেশ বলেন, 'আপনাকে সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, পর পর এত ক্রাইম করেও লোকগুলো পার পেয়ে যাবে? আমরা কি এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারব না?' তাঁর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা এবং ক্ষোভ ফুটে বেরোয়।

'নেওয়া উচিত। কিন্তু—' কথা শেষ না করে দ্বিধান্বিতভাবে থেমে যান হেমবতীনন্দন।

উৎসুক স্বরে রাকেশ বলেন, 'কিন্তু কী?'

'তোমার জার্নালিস্ট বন্ধুটি তো কলকাতায় চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি কি থানায় ডায়েরি করেছেন?'

'না।'

'কেসটা আদালতে না গেলে গিরিলাল ত্রিলোকী বা তাদের লোকেদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। ওদের এগেনস্টে স্টেপ নেবার কথা ভাবছ অথচ একজন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তোমার কি এটা মনে হলো না ডায়েরিটা করে রাখা উচিত?'

একটা খুব বড়ো রকমের ভুল যে হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারেন রাকেশ। কিন্তু এখন আর আপসোস করে লাভ নেই। তিনি চুপ করে থাকেন।

হেমবতী এবার বলেন, 'তা' ছাড়া আরো একটা দিক ভেবে দেখেছ?'

'কী স্যার?'

'তোমার জার্নালিস্ট বন্ধু একটা অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে এখানে এসেছিলেন। আর কখনও এদিকে আসবেন কিনা সন্দেহ। অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে আর কোথাও হয়তো চলে যাবেন। অথচ গিরিলালদের সঙ্গে যুদ্ধটা মেইনলি তাঁকেই করতে হবে। অন্যেরা পেছনে থেকে তাঁকে সাহায্য করতে পারে মাত্র।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাকেশ। কলকাতায় ফিরে গিয়ে নানা কাজেই জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেবারতির। কিছুক্ষণ আগে পূর্ণিয়া থেকে আসতে আসতে সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি।

হেমবতী বলতে থাকেন, 'তিনিই যদি না থাকেন, তাঁকে বে-আইনি আটকে রেখে সব ডকুমেণ্ট যে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেটা প্রমাণ করবে কে? এই কেসে আসল লড়াইটা কিন্তু তাঁর সঙ্গেই।'

রাকেশ ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'দেবারতি খবর দিলেই চলে আসবে স্যার।'

'তা হয়তো আসবেন—কিন্তু আরেকটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'কালই যদি বারহৌলি থেকে সোজা থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে, কেস অনেক জোরালো হতো। ধরা যাক, শেষ পর্যন্ত দেবারতিজি এলেন, ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াল। কিন্তু তাঁকে যে বন্দুক দেখিয়ে তুলে নিয়ে গেছে, তা কি কেউ দেখেছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কে দেখেছে ?

'অনেকে। ধন্নুয়া আনোখী গন্না পতিয়া—এমনি বিশ পঞ্চাশ জন।'

'এরা কারা ?'

'গিরিলালদের ভয়ে যারা ধারাবনী গাঁ থেকে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে।'

'ও, যাদের ওপর টরচার হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হেমবতী বলেন, 'তারা কি কোর্টে গিয়ে গিরিলালদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে রাজি হবে ?'

রাকেশ জোর দিয়ে বলেন, 'হবে স্যার। না হলে টেপ-রেকর্ডারে ওদের স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করে রাখতে পারতাম ? ভয়টা একবার ভাঙিয়ে দিতে পারলে ওদের দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়।'

'হ্যাঁ, ভয় ভাঙানোটাই আসল ব্যাপার।'

অনেকটা সময় চুপচাপ কেটে যায়।

তারপর হেমবতী ধীরে ধীরে শুরু করেন, 'তা' হলে দেখা যাচ্ছে সমস্যা এখন দুটো। এক, গিরিলালেরা তাদের লোক দিয়ে ধারাবনীতে খুন জখম রেপ ইত্যাদি করিয়েছে। দুই, নিজেদের দুষ্কর্মের সাক্ষ্যিপ্রমাণ সব নষ্ট করে দিয়েছে। এই তো ?'

'হ্যাঁ। এদের এত দুঃসাহস যে একজন নাম-করা জার্নালিস্টকে পর্যন্ত এ জন্যে তারা বন্দুক দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায় আর একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সরাসরি এভিডেন্স এবং ডকুমেণ্ট নষ্ট করার কথা জানিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা না নিলে এই রিজিওনে আরো মারাত্মক আকারে মার্ডার রেপ আর্সন ঘটবে।'

'তোমার কথা সবটাই সত্যি রাকেশ। কিন্তু গিরিলালদের বিপক্ষে কতটা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, বলা মুশকিল। মানে—'

গিরিলালেরা একের পর এক অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে আর তাদের গায়ে সামান্য একটা টোকা পর্যন্ত মারা যাবে না, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না রাকেশ। হেমবতীকে থামিয়ে ক্ষুব্ধ মুখে তিনি বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, এভিডেন্স উইটনেস না পেলে আমাদের কিছুই করার নেই। পেনাল কোডের ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে আমরা পা বাড়াতে পারি না। আমাদের ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনি অদৃশ্য শেকলে হাত-পা বাঁধাও রয়েছে। এই তো ?'

রাকেশের কণ্ঠস্বরে এমন তীব্রতা ছিল যাতে হকচকিয়ে যান হেমবতী। ধীরে ধীরে বলেন, 'হ্যাঁ, তাই। আগেও তোমাকে একথা বলছি।'

'কিন্তু সব কিছুর ওপর রয়েছে হিউম্যান কনসিডারেসান, জাসটিস আর সামাজিক দায়িত্ববোধ। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড এগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে।' বেশ অসহিষ্ণুভাবেই বলেন রাকেশ।

রাকেশের মুখের দিকে এক পলক তাকান হেমবতী। এই তরুণ সৎ নির্লোভ বিচারকটির অসহিষ্ণুতার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনিও জানেন মানবিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ—এ-সব খুব বড়ো ব্যাপার কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাগুলির বাইরে তাঁর দৃষ্টি খুব বেশিদূর পৌঁছয় না। প্রায় সারা জীবন পেনাল কোডের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। এমন নয় যে ধারাবনীর দুসাদ-চামার-গঞ্জুদের জন্য তাঁর সহানুভূতি বা মমত্ববোধ নেই। কিন্তু যৌবনের শুরু থেকে পেনাল কোড ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁর যে অভ্যাস এবং ধ্যানধারণা তৈরি হয়ে গেছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা এই বয়সে আর সম্ভব নয়। হেমবতীর কথায়-বার্তায় চলায়-ফেরায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ জীবনযাপনের সমস্ত দিকে শুধুই ভারতীয় দণ্ডবিধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনকানুন। সস্নেহে হেসে তিনি বলেন, 'তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। তবু তোমার ওয়েল-উইশার হিসেবে একটা পরামর্শ দিতে চাই।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রাকেশ, 'বলুন—'

'কোর্টে গিরিলালদের যা হবার হবে। এ নিয়ে নিজেকে আর বেশি করে ইনভলভ ক'রো না। মনে রেখো উই পীপল অফ্ জুডিসিয়ারি আর নো পলিটি-সিয়ান অর সোসাল রিফর্মার। আইনকে তার কাজ করতে দাও।'

হেমবতীব ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝতে পারেন রাকেশ। তাঁর কেরিয়ার এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে অভিভাবকের মতো পরামর্শ দিচ্ছেন। সেদিনও গিরি-লালদের সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের কেরিয়ারকে সুরক্ষিত রাখার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। এতটা আত্মকেন্দ্রিক এখনও হয়ে উঠতে পারেননি।

রাকেশ বলেন, 'কিন্তু স্যার, নিজেকে আরেকটু ইনভলভ্ করলে যদি 'রুল অফ ল' মর্যাদা পায়, ক্রিমিনালরা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেটা করা কি উচিত না?'

হেমবতী বলেন. 'কী করতে চাও তুমি?'

'সব জেনে-শুনে আমি গিরিলালদের ছেড়ে দিতে পারি না!'

'ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ, তার স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করেছ কি?'

'সবটা ভাবিনি, তবে—'

'কী ?'

'দু'চারদিনের ভেতর সব ঠিক করে ফেলব।'

হেমবতী বুঝতে পারেন, এই একরোখা জেদী যুবকটিকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু টলানো যাবে না। এতদিন রাকেশকে স্নেহ করেই এসেছেন, আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে যায় হেমবতীর। শ্রদ্ধার পাশাপাশি এক ধরনের আশঙ্কাও বোধ করতে থাকেন। কেননা গিরিলালরা আদৌ মানুষ ভাল নয়। যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ।

রাকেশ এবার বলেন, 'স্যার, আপাতত দুটো কাজ করব, ভেবেছি।'

স্থির চোখে তাকান হেমবতী, 'কী ?'

'গিরিলালদের কেসটা সেসানস কোর্টে ট্রান্সফার করব।'

'আর ?'

'কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাব। মা-বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে ভালো করে আলোচনা করে নিতে চাই। তা' ছাড়া আমার বোন আর ভগ্নিপতিরও এ সময় মণিহারিতে আসার কথা আছে। তাদের সঙ্গেও কথা বলে নেব। সবার মতামত নিয়ে দেখি কী করা যায়।'

'সেই ভাল। কবে ছুটি নেবে ?'

'দু'চারদিনের মধ্যেই। আজ স্যার চলি—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান রাকেশ।

হেমবতী জিজ্ঞেস করেন, 'এখন কোথায় যাবে ?'

যে মহকুমা শহরে থাকেন তার নাম করেন রাকেশ।

হেমবতী বলেন, 'অসম্ভব। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা হয়ে যাবে। আজকের রাতটা এখানে থেকে কাল সকালে বরং যেও।'

কয়েকটা দিন শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে রাকেশের। আজও ছোটাছুটি কম হয়নি। অসীম ক্লান্তিতে হাত-পা একেবারে ভেঙেচুরে যাচ্ছে যেন। রাত এগারোটা পর্যন্ত বাস জার্নি করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। আস্তে আস্তে ফের সোফায় বসে পড়েন রাকেশ। বলেন, 'আচ্ছা স্যার।'

বাইশ

পরের দিন ভোরের বাসে তাঁর শহরটি অর্থাৎ দেহরিতে ফিরে যান রাকেশ নিজের বাংলোয় ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে যায়।

এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পোস্টিং পাওয়ার পর মণিহারি থেকে একটি মাঝবয়সী কাজের লোক নিয়ে এসেছিলেন রাকেশ। নাম ভুরেলাল। ভুরেলাল সব দিক থেকেই চৌকস। রসুই করা থেকে শুরু করে ঘর সাফাই, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, একাই সব করে থাকে। তার ওপর বেজায় বিশ্বাসী। সে আসার পর একটা পয়সাও খোয়া যায়নি। দোষের মধ্যে সন্ধের পর এক লোটা ভাং চড়িয়ে ঘণ্টাখানেক ভাম হয়ে বসে থাকে।

রাকেশকে দেখে ভুরেলাল শুধোয়, আজ তিনি আদালতে যাবেন কিনা।

রাকেশ বলেন, 'নিশ্চয়ই যাব। তুমি রান্না চড়িয়ে দাও।'

এরপর আর কিছু বলতে হয় না ভুরেলালকে, তার হাতে-পায়ে বিজরি খেলতে থাকে।

এখন আর জিরোবার সময় নেই। দ্রুত শেভ করে এবং স্নান-টান সেরে খাওয়ার টেবলে এসে রাকেশ দেখতে পান, এর মধ্যে ভাত, ডাল, ভাজা এবং নিরামিষ একটা তরকারি করে ফেলেছে ভুরেলাল।

বাংলো থেকে রাকেশের কোর্ট টাঙ্গায় পাঁচ মিনিটের রাস্তা। খাওয়া-দাওয়া সেরে আদালতে এসে আজ মাত্র দু'টি কাজ করেন রাকেশ। বারহৌলির গণহত্যার মামলা সেসানস কোর্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেলেন এবং সেই সঙ্গে কুড়ি দিনের ছুটির একটা দরখাস্তও পাঠিয়ে দেন। প্রথমে ভেবেছিলেন এক সপ্তাহ ছুটি নেবেন। পরে ভেবে দেখেছেন, প্রায় আট মাস পর মণিহারি যাচ্ছেন, ওখান থেকে দিন কুড়ির আগে ছাড়া পাওয়া যাবে না।

দেবারতিকেও একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কী ভেবে আর লিখলেন না।

তিন দিনের মধ্যে ছুটি পেয়ে গেলেন রাকেশ। সঙ্গে সঙ্গে সুটকেশে কয়েকটা শার্ট-ট্রাউজার্স, শেভিং বক্স এবং দরকারি কিছু জিনিসপত্র পুরে, সরকারি বাংলো ভুরেলালের জিম্মায় রেখে পূর্ণিয়ার বাস ধরলেন। ওখান থেকে ট্রেনে মণিহারি যাবেন। বরাবর যা করেন, এবারও পূর্ণিয়ায় বাস থেকে নেমে বাড়ির জন্য কিছু কলাকন্দ আর মুগের লাড্ডু কিনে নেবেন। বাবা কলাকন্দ খুব পছন্দ করেন, মা'র প্রিয় লাড্ডু। তা' ছাড়া বাড়িতে একটা দেহাতী মেয়ে কাজ করে। নাম পার্বতীয়া। স্বামীর সঙ্গে কাটান-ছাড়ান হবার পর দুটো বাচ্চা নিয়ে বছর দুয়েক রাকেশদের কাছে আছে। বাচ্চাদুটোর জন্য জামা-টামা কিনতে হবে। যখনই রাকেশ মণিহারি যান, ওদের জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে যান।

বাস পূর্ণিয়ায় যখন পৌঁছল বিকেল হয়ে গেছে। বাজার থেকে পার্বতীয়ার

দুই মেয়ের জন্য ইজের এবং ফ্রক আর মিষ্টি কিনে টাঙ্গায় সোজা স্টেশনে চলে এলেন রাকেশ।

পূর্ণিয়া থেকে ট্রেন সরাসরি মণিহারি যায় না, কাটিহারে নেমে আবার অন্য ট্রেন ধরতে হবে।

দু'বার ট্রেনে ঘণ্টা দুয়েক লাগল। রাকেশ যখন বাড়ি পৌঁছলেন, আটটা বেজে গেছে।

মণিহারি পুরোপুরি শহরও না, আবার গ্রামও তাকে বলা যাবে না। গ্রাম এবং শহর এখানে তালগোল পাকিয়ে একটা বর্ণসংকর চেহারা নিয়েছে।

বেশ কয়েক বছর হলো মণিহারিতে বিজলী এসেছে, সিনেমা হল হয়েছে, পীচ ঢালা অনেক রাস্তাও চোখে পড়বে। তবু এর এক পা রয়েছে পাঁচ শ' বছর আগের ভারতবর্ষে যেখানে হাজার রকমের কুসংস্কার, দহেজ প্রথা, কট্টর জাতপাতের সওয়াল এখনও প্রবল। মণিহারির আরেক পা রয়েছে সামনের দিকে, যেখানে নতুন নতুন স্কুল বসছে, পণপ্রথা এবং জাতপাতের বিচার কিংবা সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ শোনা যায়। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে কিছু-দিন আগে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা মিছিলও বার করেছিল।

স্টেশন থেকে সাইকেল-রিকশা নিয়ে রাকেশ যখন বাড়ি পৌঁছলেন, আটটা বেজে গেছে। তাঁদের মহল্লাটা মণিহারির একেবারে উত্তর প্রান্তে। স্টেশন কিংবা বাজারের দিকটা অনেক রাত পর্যন্ত সরগরম থাকে কিন্তু রাকেশদের পাড়াটা সন্ধের পরপরই ঘুমিয়ে পড়ে। আটটার মধ্যেই এখানকার চারপাশ নিঝুম। অবশ্য তাঁদের বাড়িটা বাদ দিয়ে।

প্রায় দেড় বিঘে জায়গা জুড়ে রাকেশদের বাড়ি। মাঝখানে টিনের চালের খান ছয়েক বড়ো বড়ো ঘর। মেঝে এবং দেওয়াল অবশ্য পাকা। এক ধারে বাঁধানো কুয়ো। বিজলী থাকায় পাম্প করে কুয়ো থেকে জল তোলার ব্যবস্থা আছে।

বাড়িটার সামনে এবং পেছনে ফুল আর ফলের বাগান। নানা ধরনের গাছ-পালায় চারপাশ বোঝাই। আম জাম লিচু বাতাবী পেয়ারা কাগজি লেবু পাতি লেবু থেকে শুরু করে চালতা কুল ইত্যাদি তো আছেই। ফাঁকে ফাঁকে গন্ধরাজ বেল গাঁদা দোপাটি এবং গোলাপ। শীতকালে কপি ধনেপাতা শালগম ওলকপি আর মুলোরও চাষ করা হয়।

বাগানে উঁচু উঁচু ক'টা ল্যাম্পপোস্ট পুঁতে জোরালো আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে বাগানের আলোগুলো জ্বলছিল। পাম্প চালিয়ে লম্বা রবারের

নলে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিলেন চন্দ্রলেখা। আর বাউণ্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে সুপুরি এবং নারকেলের চারা পুঁতছিলেন রাজেশ্বর। হাতে হাতে তাঁদের এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছিল পার্বতীয়া এবং তার দুই মেয়ে—মোতি আর সুরতিয়া। মোতির বয়স নয়, সুরতিয়ার সাত।

সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে, সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে নেমে পড়লেন রাকেশ। তারপর কাঠের গেট খুলে ভেতরে চলে এলেন।

গেটের লোহার কবজায় বহুকাল তেল-টেল পড়েনি, খুলতে গেলেই কর্কশ আওয়াজ হয়।

শব্দ কানে যেতেই রাজেশ্বররা গেটের দিকে তাকান। হাত থেকে রবারের নলটা দ্রুত মাটিতে নামিয়ে চন্দ্রলেখা এগিয়ে আসেন। তাঁর পেছন পেছন রাজেশ্বর আর পার্বতীয়া। সবার আগে আগে প্রায় উড়তে উড়তে এসে পড়ে মোতি, সুরতিয়া। তারা খুশিতে সমানে চেঁচাতে থাকে, 'মামাজি আ গিয়া, মামাজি আ গিয়া—' তাদের আনন্দ আর উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ওরা জানে, কয়েক মাস পর পর রাকেশ যখন বাড়ি আসেন ওদের জন্য কিছু-না-কিছু আনবেনই।

মোতি এসে প্রায় ছোঁ মেরেই সুটকেশটা রাকেশের হাত থেকে নিয়ে নেয়।

রাকেশ বলেন, 'আরে আরে, তুই পারবি না। ওটা ভীষণ ভারী।'

মোতি বলে, 'পারব। ঘাবড়ানা নেহী।' জামাকাপড় এবং মিষ্টির বাক্সে ঠাসা সুটকেশটার যথেষ্ট ওজন। ওটা টেনে নিয়ে যেতে মোতির পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে যায়। সুরতিয়াও অবশ্য তার সঙ্গে হাত লাগায়।

রাকেশ হাত উল্টে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলেন, 'নাঃ, মেয়েটাকে নিয়ে পারা যায় না।' তাঁর বলার ভঙ্গিতে স্নেহ আর প্রশ্রয়ের সুর। আসলে মোতি এবং সুরতিয়াকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। রাকেশের কাছে তাদেরও যত আবদার।

চন্দ্রলেখারাও এতক্ষণে রাকেশের কাছে চলে এসেছেন। রাজেশ্বর বলেন, 'কি রে, তুই হঠাৎ চলে এলি!'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, আসতে হলো।'

'আগে তো চিঠিপত্র কিছু দিসনি।'

'চিঠি লেখার মতো সময় ছিল না।'

চন্দ্রলেখা স্বামীকে বলেন, 'ছেলেটাকে এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?'

রাজেশ্বর হকচকিয়ে যান, 'না না, আয় সোনু—' রাকেশের ডাক নাম সোনু।

বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়ির পথ। বাড়ির দিকে যেতে যেতে চন্দ্রলেখা বলেন, 'তোর শরীর ভাল আছে তো?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, মা। তোমরা কেমন আছ?'

চন্দ্রলেখা বলেন, 'আমরা কখনও খারাপ থাকি?' 'বলতে বলতে স্নিগ্ধ হাসি ফোটে তাঁর চোখে।

যতই শারীরিক কষ্ট হোক বা অসুস্থ হয়ে পড়ুন, চন্দ্রলেখা এবং রাজেশ্বর কখনও তা স্বীকার করবেন না। যখনই জিজ্ঞেস করা হোক, তাঁদের মুখে একই উত্তর, ভালো আছেন। নিজের মা-বাবার মতো মানুষ আর দেখেননি রাকেশ।

গেট থেকে মূল বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। পাশাপাশি চলতে চলতে রাজেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'এখন কোথেকে আসছিস?'

রাকেশ জানান, তাঁর কাজের জায়গা থেকে সরাসরি বাড়ি আসছেন।

ডান পাশ থেকে চন্দ্রলেখা বলে ওঠেন, 'জানিস সোনু—তুই আজ এসেছিস, খুব ভাল হয়েছে। নইলে দু-একদিনের ভেতর তোকে টেলিগ্রাম করতে হতো।'

রাকেশ বলেন, 'কেন মা?'

'দিল্লী থেকে লচ্ছুর চিঠি পেয়েছি। ওরা কাল এখানে আসছে।'

লচ্ছু রাকেশের ছোটো বোন। মোটামুটি এই সময়টা দিল্লী থেকে এসে মণিহারিতে দিন পনেরো কাটিয়ে যায় ওরা। তবে কালই যে আসবে, এটা জানা ছিল না রাকেশের। তিনি খুশি হ'ন। বলেন, 'বাড়ি তা' হলে এবার জমজমাট হয়ে উঠবে, কী বল মা?'

গাঢ় আবেগের গলায় চন্দ্রলেখা বলেন, 'এই দিন ক'টার জন্যে সারা বছর আমরা তাকিয়ে থাকি।'

রাকেশ বলেন, 'মণীশও আসছে তো?' মণীশ তাঁদের জামাই। প্রতি বছর সে আসতে পারে না, কোনো-না-কোনো কাজে দিল্লীতে আটকে যায় কিংবা তার মা-বাবাকে দেখতে লক্ষ্ণৌ যেতে হয়। মণীশের মা-বাবা তাঁর দাদার কাছে লক্ষ্ণৌতে থাকে।

চন্দ্রলেখা বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মণীশও আসছে।'

'দুর্দান্ত খবর।'

এই সময় হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় রাজেশ্বরের। ব্যস্তভাবে তিনি হঠাৎ বলেন, 'হ্যাঁরে সোনু, তোর সেই ধারাবনীর কেসটার কী হলো? সেই যে আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেলি, তারপর আর তো কোনো খবর দিলি না।'

রাকেশ বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'সেই জন্যেই আমি আজ এলাম। ধারাবনীর কেসটা খুব খারাপ দিকে চলে গেছে। বুঝতে পারছি না কী করব?'

রাজেশ্বর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রলেখা বলেন, 'ওসব কথা এখন থাক। আগে গিয়ে জিরিয়ে নে। স্নান করবি তো?'

ফাল্গুন শেষ হতে-না-হতেই দু'বেলা স্নান করেন রাকেশ। দিনে একবার, সন্ধের পর আরেক বার। এটা তাঁর বহুকালের অভ্যাস। দিনে দু'বার স্নান চলে সেই জুলাই আগস্ট পর্যন্ত। রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ মা।'

বাড়িটার সামনের দিকে পাশাপাশি দুটো বিরাট ঘর। ডান ধারের ঘরের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল সিমেন্টের বারান্দা। সেখানে খানকতক বেতের চেয়ার আর মোড়া এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। আর রয়েছে পুরনো একটা তক্তপোষ, সেটার ওপর আধময়লা চাদর পাতা। সিলিং থেকে একটা বেশি পাওয়ারের বাল্ব ঝুলছে।

বাড়ি এলে ডান পাশের ঘরটায় থাকেন রাকেশ। বাঁ পাশের ঘরে চন্দ্রলেখা আর রাজেশ্বর। তবে একসঙ্গে ছেলেমেয়ে দু'জনেই এসে পড়লে চন্দ্রলেখারা তাঁদের ঘরটা মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে ভেতরের কোনো ঘরে চলে যান।

রাকেশ একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়েন।

রাজেশ্বর পার্বতীয়াকে বলেন, 'আজ আর সুপুরির চারাগুলো লাগানো যাবে না। তুই ওগুলো ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দে। কাল ভোরে লাগাবো।'

পার্বতীয়া চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে চন্দ্রলেখা বলেন, 'তাড়াতাড়ি আসবি। সোনু এসেছে, রসুই চড়াতে হবে।'

'আচ্ছা মা'জি।' পার্বতীয়া বড়ো বড়ো পা ফেলে বাগানে নেমে যায়।

রাকেশ বলেন, 'এত রাত্তিরে তোমাদের আর ব্যস্ত হতে হবে না মা। বেশি কিছু করতে হবে না। রুটি আর একটু সবজি টবজি করে দিলেই রাতটা চলে যাবে।'

'ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।' চন্দ্রলেখা আর বসলেন না, ভেতরে চলে গেলেন। এ বাড়িতে রান্নাটা পার্বতীয়াই করে থাকে। পার্বতীয়া যদিও জাতে গাঙ্গোতা অর্থাৎ অচ্ছুৎ, রাজেশ্বররা জাতপাত বা ছুয়াছুত কিছুই মানেন না। এই নিয়ে মণিহারির বামহন-কায়াথদের মধ্যে একসময় কম ঘোঁট পাকানো হয়নি। কিন্তু রাজেশ্বরের ব্যক্তিত্ব এতই প্রবল এবং তাঁর দেশপ্রেমের এমনই একটা জোরালো ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে যে সামনে এসে কেউ কিছু বলতে সাহস করেনি। এটাকে একটা সৃষ্টিছাড়া 'কেস' হিসেবে সবাই মেনে নিয়েছে।

রাজেশ্বর ওধারের তক্তপোষে গিয়ে বসেন। মোতি আর সুরতিয়া রাকেশের সুটকেশটা টেনে নিয়ে আসার পর এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ না সুটকেশ খোলা হচ্ছে, ওদের নড়ানো যাবে না।

রাজেশ্বর সস্নেহে বলেন, 'মোতি আর সুরতিয়ার জন্যে কিছু এনেছিস ?'

রাকেশের খেয়াল ছিল না। এবার ব্যস্তভাবে বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এনেছি।' পকেট থেকে চাবি বের করে সুটকেশ খুলে দুই বোনকে ফ্রক আর ইজের দেন, 'এগুলো তোদের।' তারপর মিঠাইয়ের প্যাকেট বের করে বলেন, 'এগুলো দাদীকে দিয়ে আয়।'

খুশিতে নাচতে নাচতে মিষ্টির বাক্স আর জামাটামা নিয়ে ভেতরে চলে যায় মোতিরা।

এলোমেলো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রাজেশ্বর বলেন, 'বেশ রাত হয়েছে। এবার স্নানটা সেরে নে। রান্না বোধহয় হয়ে এল।'

রাকেশ আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন।

তেইশ

রাত্তিরে বাবা অথবা মা'র সঙ্গে ধারাবনীর সেই গণহত্যা নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়েই শুয়ে পড়েছিলেন রাকেশ। সারাদিন বাস এবং ট্রেন জার্নির কারণে শরীর ছিল ভয়ানক ক্লান্ত। বিছানায় গা ঢেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ কখন বুজে এসেছিল, রাকেশ টের পাননি।

আজ যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, বেশ বেলা হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর।

ঘুম ভাঙলে এক মুহূর্তও বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন না রাকেশ। এটা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু আজ কোর্টে যেতে হবে না, কাজেই তাড়াহুড়োও নেই। সর্বাঙ্গে সুখদায়ক আলস্য মেখে বালিশে থুতনি ডুবিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

দূরে গাছপালার মাথায় অজস্র পাখি উড়ছে। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনের মতো পাখিদের ওড়া-উড়ি দেখলেন রাকেশ। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখ চলে গেল বাগানের দিকে। রাজেশ্বর কম্পাউণ্ড ওয়ালের ধার ঘেঁষে সুপুরির চারা লাগাচ্ছেন। তাঁকে হাতে হাতে সাহায্য করছে মোতি আর সুরতিয়া। রাকেশ বরাবর লক্ষ্য করেছেন, এই মেয়ে দুটো প্রায় সর্বক্ষণ রাজেশ্বরের গায়ে লেগে থাকে।

কাল হঠাৎ তিনি এসে পড়ায় চারা লাগানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ ভোর থেকেই খুব সম্ভবত বাকি কাজটুকু শেষ করে ফেলছেন রাজেশ্বর। এ বছরেই

জানুয়ারিতে সত্তর পেরিয়েছেন—কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য তাঁর। শিরদাঁড়া টান টান। বয়স তাঁকে এতটুকু নুইয়ে ফেলতে পারেনি। যখন যে কাজ হাতে নেন তাতেই নিজের সবটুকু এনার্জি ঢেলে দেন। একসময় দেশের মুক্তি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন, জীবনের সেরা সময়টা তাতেই শেষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর রাজনীতির চেহারা দেখে ক্ষোভে বিতৃষ্ণায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এখন গাছপালা ফুল এবং বাচ্চাদের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন। এ-সবের মধ্যেই নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছেন। অন্য কোনোদিকে তাঁর আর নজর নেই। এমন কর্মঠ একরোখা মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

আরো খানিকক্ষণ হয়তো শুয়ে থাকতেন রাকেশ। কিন্তু রাস্তার দিক থেকে সাইকেল-রিকশার ঘন্টি শোনা গেল। তারপরেই উঁচু গলার ডাকাডাকি, 'মা বাপুজি মোতি সুরতিয়া—তাড়াতাড়ি এসো।'

কণ্ঠস্বরই বুঝিয়ে দেয়—লচ্ছু অর্থাৎ সরযূ। রাকেশের ছোটো বোন। সে আসা মানেই ঝড় বয়ে যাওয়া।

রাকেশের চোখে পড়ল, কাঠের গেটের ওধারে দুটো সাইকেল-রিকশা এসে দাঁড়িয়েছে। একটাতে সরযূ আর বনি। বনি সরযূর মেয়ে। অন্যটায় মণীশ। দুটো রিকশাতেই প্রচুর লটবহর। ফাইবারের সুটকেশ, বেতের এবং ক্যানভাসের ঢাউস বাস্কেট, ওয়াটার বটল, ফ্লাস্ক ইত্যাদি।

মোতি আর সুরতিয়ার কান একেবারে খরগোশের মতো খাড়া। রিকশার ঘন্টি আর সরযূর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'আম্মী মৌসী' বলে তারা গেটের দিকে ছোটে।

এবারও রাজেশ্বরের চারা পোঁতা হলো না, কাজটা স্থগিত রেখে তিনিও লম্বা লম্বা পা ফেলে গেটের দিকে এগিয়ে যান। এদিকে বাড়ির ভেতর থেকে চন্দ্রলেখা পার্বতীয়াকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

রাকেশের পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। দ্রুত খাট থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে তিনি গেটের কাছে চলে আসেন।

এদিকে সরযূ মণীশ আর বনি রিকশা থেকে নেমে পড়েছে। তাদের মালপত্রও নামানো হয়েছে। একটা ভারী সুটকেশ টানতে টানতে মোতি আর সুরতিয়া বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সরযূ বা রাকেশ কয়েক মাস পর এ বাড়িতে আসেন, মোতিরা দুই বোন টেনে হিঁচড়ে তাদের সুটকেশ-টুটকেশ নিয়ে যাবেই। রাকেশের মতো সরযূও দিল্লী থেকে ওদের জন্য কিছু-না-কিছু আনবেই। আর সেটা ভালো করেই জানে তারা।

না বললেও শুনবে না মোতিয়া। কাজেই সরযূ আর আপত্তি করে না। মেয়েদের সঙ্গে পার্বতীয়াও হাতে হাতে বাস্কেট-টাস্কেটগুলো সামনের বড়ো বারান্দায় নিয়ে রাখতে থাকে। রিকশাওলাটা এ বাড়ির সবাইকে চেনে। সে-ও পার্বতীয়াদের সঙ্গে হাত লাগায়।

রাকেশকে দেখে সরযূ দারুণ খুশি। উৎফুল্ল মুখে বলে, 'তুমি কবে এলে দাদা?'

রাকেশ বলেন, 'কাল রাত্তিরে। এসেই শুনলাম, তোরাও দু-একদিনের ভেতর এসে পড়বি।'

'ছুটিটা দারুণ কাটবে।' বলেই ঝড়ের বেগে মা বাবা আর দাদাকে প্রণাম সেরে নেয় সরযূ। সাতাশ আটাশ বছর বয়স হলো, ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়—কিন্তু এখনও তার মধ্যে আশ্চর্য এক ছেলেমানুষি রয়েছে।

সরযূর তুলনায় মণীশ অনেকটাই গম্ভীর, তার স্বভাবে উচ্ছলতা কম। তবে সে খুবই ভদ্র, বিনয়ী। নিচু হয়ে রাজেশ্বর এবং চন্দ্রলেখাকে প্রণাম করে যখন রাকেশের পায়ের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছে সেই সময় রাকেশ তাকে তুলে ধরে মজা করে বলেন, 'ব্যস ব্যস, অত পায়ের ধুলো নিতে হয় না।'

মণীশ বলে, 'না, মানে—'

'আরে বাবা, তুমি যে আমাকে যথেষ্ট সম্মান কর, সেটা আমার জানা আছে। তার জন্যে পায়ে হাত দেবার দরকার নেই। চল, ভেতরে যাওয়া যাক।' বলে বনিকে কোলে তুলে তার নাকে নাক ঘষে আদর করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। বাকি সবাই তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

চলতে চলতে সরযূ বলে, 'তুমি নাকি কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ দাদা?'

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে সরযূর দিকে তাকান রাকেশ। বলেন, 'কীসের কাণ্ড রে?'

'কী একটা কেস নিয়ে নাকি ভীষণ ইনভলভড্ হয়ে পড়েছ।'

ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে যায়। রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ। ধারাবনী বলে একটা গ্রামে বড়ো ল্যাণ্ডলর্ডরা অনেক লোক খুন করেছে। কেসটা আমার কোর্টে এসেছে। তাতেই জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু—'

সরযূ বলে, 'কী?'

'তুই জানলি কেমন করে?'

'মা চিঠি লিখে জানিয়েছে।'

মা কিংবা বাবা যে সরযূকে চিঠি লিখতে পারে, এটা আগে ভাবেননি রাকেশ।

এই সম্ভাবনার কথাটা মনে পড়া উচিত ছিল। মনে মনে সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করেন তিনি।

সরযূ ফের বলে, 'ঐ কেসের ব্যাপারে তোমার নাকি বিপদ হতে পারে?'

রাকেশ বলেন, 'তার পসিবিলিটি আছে।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল মণীশ। এবার সে বলে, 'কী ধরনের বিপদ?'

রাকেশ মণীশের দিকে ফিরে বলেন, 'সেটা নির্ভর করে আমি আরো কতটা ইনভলভড্ হবো, তার ওপর।'

'আপনি কি কোর্টের জুরিসডিকসনের বাইরে গিয়েও ইনভলভড্ হতে চান?'

'তোমরা সবে এলে। রেস্ট-টেস্ট নাও, বিকেলে এ-নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তারপর ও ব্যাপারে কতদূর এগুনো যায়, সেটা ঠিক করব।'

'আমরা কিন্তু আপনার জন্যে ভয়ঙ্কর ওরিড।'

রাকেশ অল্প হাসেন, 'কেন?'

মণীশ চিন্তাগ্রস্তের মতো বলে, 'ঐ সব বিগ ল্যাণ্ড ওনারদের সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা আছে। দে আর ভেরি ডেঞ্জারাস পীপল।'

'তোমার ধারণার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কোনো তফাত নেই। কিন্তু আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি। এখন ফেরা সম্ভব কিনা তোমাদের কাছে জেনে নেব।'

সারাদিন হৈ হৈ করে কেটে গেল। হাসিঠাট্টা মজা আর গল্পগুজবে মেতে থাকল সবাই। তারপর সন্ধেবেলায় সামনের বড়ো বারান্দায় পারিবারিক সভা বসল। এখানে রাজেশ্বর চন্দ্রলেখা রাকেশ সরযূ এবং মণীশ ছাড়া আর কেউ নেই। পার্বতীয়া রান্নাঘরে ভীষণ ব্যস্ত। মোতি আর সুরতিয়া বনিকে নিয়ে ভেতরের ঘরে খেলছে। বনি মোতিদের খুব পছন্দ করে। মণিহারিতে এলেই ওদের সঙ্গে তার খুব ভাব জমে যায়। ভেতর থেকে তাদের হৈ চৈ হুটোপুটি আর হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে।

সরযূ বলে, 'এবার তোমার প্রবলেমের কথা বলো দাদা—'

ধারাবনীর গণহত্যা সম্পর্কে যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে নানারকম ঝুঁকি নিয়ে তিনি যা করতে চেয়েছেন, সব বলে গেলেন রাকেশ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'এখন আমার কী করা উচিত?'

সঙ্গে সঙ্গে কেউ উত্তর দেয় না। অনেকক্ষণ পর সরযূ বলে, 'এদেশে এরকম মধ্যযুগের বর্বরতা চলছে, এ ভাবাই যায় না।'

সরযূর এই মন্তব্য সম্পর্কেও কেউ কিছু বলে না।

একটু ভেবে রাকেশ বলেন, 'মাঝখানে আমি একবার মণিহারি এসেছিলাম। মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছিলাম, সাক্ষী প্রমাণ যোগাড় করতে ধারাবনী বারহৌলি যাব। সেখানে যাবার পর দেখা গেল আমাদের সোসিও-পলিটিক্যাল রোগের রুট কোথায় চলে গেছে। এর শিকড় তুলে ফেলতে হলে গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের মতো লোকেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, নইলে চোখকান বুজে তাদের কুকর্ম সয়ে যেতে হয়। আর এসব যত সহ্য করা হবে ততই এদের সাহস বেড়ে যাবে। নিজেদের ইচ্ছেমতো এই লোকগুলো প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেসান তৈরি করে ফেলেছে। দেশের পক্ষে এটা মারাত্মক।'

সরযূ হালকা গলায় বলে, 'তুমি খুব আইডিয়ালিস্টদের মতো কথা বলছ দাদা।'

রাকেশ মা-বাবাকে দেখিয়ে বলেন, 'আইডিয়ালিজমের পাগলামি আমাদের রক্তে তো জন্মাবার পর থেকেই আছে, না কি বলিস!' অল্প থেমে বলেন, 'আইডিয়ালিজমের কথা থাক। একজন সৎ নাগরিক হিসেবেও তো আমাদের কিছু ডিউটি থেকে যায়। তার ওপর আমি একজন জুডিসিয়ারির লোক।'

মণীশ এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলে, 'ওরা এভিডেন্স-টেভিডেন্স সবই তো নষ্ট করে দিয়েছে। এরপর আর কি কিছু করা যাবে?'

রাকেশ বলেন, 'করা নিশ্চয়ই যায়।'

'কী?'

'নতুন করে ফের সাক্ষী প্রমাণ যোগাড় করা।'

'তা হলে তো ডাইরেক্ট কনফ্রনটেসনে যেতে হয়।'

রাকেশ হাসেন, 'অবশ্যই।'

এই সময় এ-অঞ্চলের হরিজনদের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে গেট পেরিয়ে বারান্দার কাছাকাছি চলে আসে। তাদের বয়স পাঁচ থেকে দশের ভেতর। সবার হাতে বই-খাতা বা শ্লেট। এরা রোজ সন্ধেবেলা রাজেশ্বরের কাছে পড়তে আসে। গাছপালা ফুল পাখি আর ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়েই ইদানীং তাঁর পৃথিবী।

রাজেশ্বর বাচ্চাগুলোকে বলেন, 'আজ তোদের ছুটি। কাল আসিস।'

ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করতে করতে চলে যায়। এমন আচানক ছুটি পাওয়া যাবে, এটা তারা ভাবতেও পারেনি।

চন্দ্রলেখা দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'আমার একটা কথা বলার আছে।'

সবাই তাঁর দিকে তাকায়।

চন্দ্রলেখা এবার যা বলেন তা এইরকম। অপরাধীদের শাস্তির জন্য কেরিয়ার এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাকেশ ধারাবনী বারহৌলিতে গেছেন। অন্য কোনো

বিচারক যা করেন না বা করতে সাহস পান না, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন। ধারাবনী বইহারিতে তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতার কথা ডিস্ট্রিক্ট জজকে জানানোও হয়েছে। এর পর রাকেশের আর কিছু করার থাকতে পারে না। দেশের আইন এবং উচ্চ আদালত এবার তাদের কাজ করুক।

রাকেশ স্থির চোখে মাকে লক্ষ্য করছিলেন। এবার বলেন, 'মা, তুমি বোধ হয় খুব ভয় পেয়ে গেছ।'

চন্দ্রলেখা আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। মৃদু গলায় বলেন, 'হ্যাঁ।'

'এটা তুমি কী বললে মা !'

'কী আবার বললাম !'

রাকেশ বলেন, 'বৃটিশ আমলে পুলিশ যখন বার বার হানা দিয়েছে, আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছে, বাবাকে জেলে পুরেছে, তখন তো এতটুকু ঘাবড়াও নি। রাজেশ্বর সহায়ের সহধর্মিণীর মুখে ভয়ের কথা মানায় না।'

চন্দ্রলেখা বলেন, 'তারা ছিল বিদেশী। কিন্তু স্বাধীনতার পর মানুষের ওপর দেশের মানুষের এই অত্যাচার, এ যে ভাবাই যায় না। আর ঐ লোকগুলো জন্তুর চাইতেও মারাত্মক। নিজেদের গায়ে আঁচড় পড়লে ওরা যা ইচ্ছা করতে পারে। ভয়টা সে জন্যে।'

সঞ্জয়ের মতামতও প্রায় একই রকম। সে বলে, 'মা ঠিকই বলেছেন।'

সরযূ বলে, 'বুঝতে পারছি ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা ভীষণ অন্যায় করেছে। তুমি তাদের পানিশমেন্টের জন্যে যথেষ্ট করেছ। এরপর তো আর কিছু করার নেই।'

রাকেশ বলেন, 'করার অনেক কিছুই আছে।'

'যেমন ?'

'এই প্রশ্নটার উত্তর পরে দেবো। তার আগে বলি, ডিস্ট্রিক্ট জজ হিমগিরিজির সঙ্গে আমার যা আলোচনা হয়েছে তাতে মনে হ'ল, জুডিসিয়ারিতে থেকে ত্রিলোকী সিংদের বিরুদ্ধে আর এগুনো যাবে না। আমাদের সারভিসে এমন সব কোড অফ কনডাক্ট রয়েছে যার বাইরে একটা পা-ও ফেলা যায় না। তাই ভাবছিলাম—'

'কী ?'

'চাকরিটা ছেড়ে দেবো।'

চন্দ্রলেখা সরযূ এবং সঞ্জয় চমকে ওঠে। চন্দ্রলেখা বলেন, 'চাকরি ছাড়বি !'

রাজেশ্বর কোনো মন্তব্য করেন না। স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে ছেলেকে লক্ষ্য করতে থাকেন।

মা'র দিকে ফিরে শান্ত স্বরে রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ মা, এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই।'

চন্দ্রলেখাকে বেশ বিচলিত দেখায়। তিনি বলেন, 'তুই চাকরি ছাড়লে কি লোকগুলো সাজা পেয়ে যাবে?'

'না।'

'তবে?'

রাকেশ বলেন, 'চাকরি ছাড়ার পর ধারাবনী বইহারি অঞ্চলে আমি কাজ শুরু করব।'

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, 'কী কাজ?'

রাকেশ জানান, নতুন করে ধারাবনীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষি-প্রমাণ সংগ্রহ করবেন। তা ছাড়া ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলালদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলবেন। বড়ো জমি-মালিকরা কিভাবে নিজেদের স্বার্থে রাজনীতিকে চতুরভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন।

সঞ্জয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'কিন্তু এসব তো পলিটিক্যাল লীডারদের কাজ।'

রাকেশ বলেন, 'রাজনীতি কোনো নোংরা জঘন্য বস্তু নয়। আসলে ব্যাপারটা কি জানো, স্বাধীনতার পর আইডিয়ালিস্ট সৎ মানুষেরা পলিটিকসে আর আসছেন না। ইনডিপেনডেন্সের আগে যাঁরাও বা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা দূরে সরে গেছেন।' বলে চোখের কোণ দিয়ে রাজেশ্বরকে দেখিয়ে দেন।

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

রাকেশ থামেন নি, 'তার ফলে কী দাঁড়াচ্ছে? সবচেয়ে পাওয়ারফুল এই অস্ত্রটি চলে যাচ্ছে কতকগুলো স্বার্থপর ফেরেববাজ বদ লোকের হাতে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, দেশের ভবিষ্যৎ কী, ভাবতে পারো?' বলতে বলতে তাঁর মনে পড়ে যায় ঠিক এই কথাগুলো হিমগিরিকেও তিনি ক'দিন আগে বলেছিলেন। আসলে ধারাবনীতে যাওয়ার পর তাঁর চোখ খুলে গেছে। অসৎ বদমাসেরা যেভাবে রাজনীতিকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলছে তাতে তিনি খুবই শঙ্কিত। ব্যাপারটা ফিক্সেসানের মতো রাকেশের মাথায় ঢুকে গেছে।

সঞ্জয় বলে, 'শেষ পর্যন্ত পলিটিকসে নামবেন?'

'তা-ই তো ভাবছি।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'রাজনীতিতে না নেমে কি কিছু করা যায় না ?'

রাকেশ বলেন, 'তুমি বলতে চাইছ, চাকরিও রাখব, সেই সঙ্গে নিজের চামড়ায় আঁচড়টি না লাগে তার ব্যবস্থা করে জনসেবাও করব, তাই তো ? কিন্তু দুটো একসঙ্গে সম্ভব না। তা ছাড়া—'

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, 'তা ছাড়া কী ?'

'আমাদের জেনারেশানের মানুষেরা রাজনীতিতে গুণ্ডা বজ্জাতদেরই ভিড় করতে দেখছে। তাই বোধহয় তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ ?'

'তা বলতে পারেন। আজকাল পলিটিকস চলে স্টেনগান মেশিনগান বোমা পিস্তলের স্ট্রেনথে। মার্ডার ইজ এ পার্ট অব দা গেম। ভয়টা সেখানেই।'

রাকেশ হেসে ফেলেন। বলেন, 'তোমার ধারণা গিরিলাল আর ত্রিলোকীর মাসলম্যানরা আমাকে খুন করে ফেলবে ?'

সঞ্জয় চুপ করে থাকে।

রাকেশ এবার বলেন, 'একজন এক্স-ম্যাজিস্ট্রেটকে শেষ করে ফেলাটা খুব সহজ হবে না। ত্রিলোকী সিংরা যত পাওয়ারফুলই হোক না, এখনও কাজটা বেশ ডিফিকাল্ট। তা ছাড়া ওখানে কাজে নামার আগে যথেষ্ট প্রিকসানও নেবো।'

সঞ্জয় বলে, 'কিরকম ?'

'মোটামুটি ভেবেছি প্রথমে অ্যাডমিনিস্ট্রেসনকে জানাবো। টপ পুলিশ অথরিটি আর প্রেসকে খবর দেবো। একসময় যাঁরা দেশের ফ্রীডমের জন্যে অনেক অত্যাচার সয়েছেন কিন্তু স্বাধীনতার পর নানা কারণে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাঁদেরও ডাকব।' বলে রাজেশ্বরের দিকে তাকান, 'বাবুজি, তুমি কী বলো ?'

রাজেশ্বর মনোযোগী শ্রোতার মতো এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বলেন, 'তোর সব কথা শেষ হোক, তারপর যা বলার বলব।'

চন্দ্রলেখা বিভ্রান্তের মতো স্বামীর দিকে তাকান, 'সোনু চাকরি ছেড়ে এ সব কী পাগলামি করতে চাইছে ! তুমি কিছু বলবে না ?'

রাজেশ্বর বলেন, 'আমার বলার কী থাকতে পারে ! সোনু যথেষ্ট সাবালক। ও যা ভাল বুঝছে তাই করছে।'

'ওর চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে তা হ'লে তোমার সায় আছে ?' চন্দ্রলেখার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ ফুটে ওঠে।

রাকেশ অবাক বিস্ময়ে মাকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি শুনেছেন বাবা ঘর-সংসার ছেড়ে দেশের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কোনো পিছুটান তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। চন্দ্রলেখাও স্বামীকে বাধা দেন নি, বরং সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। রাজেশ্বর যে দেশের কাজ করছেন, এটা ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত গৌরব এবং মর্যাদার বিষয়। কিন্তু রাকেশ যখন গরীব অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করতে চাইছেন, চন্দ্রলেখা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত মনে হয় রাকেশের। কিছুদিন আগে ধারাবনীতে সাক্ষিপ্রমাণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে মা-বাবার সঙ্গে যখন পরামর্শ করতে এসেছিলেন, চন্দ্রলেখা আপত্তি করেন নি। কিন্তু এখন আরো বড়ো বিপদের ঝুঁকি যখন রাকেশ নিতে চাইছেন মারাত্মক এক ভয় তাঁকে যেন ঘিরে ধরেছে। রাজেশ্বরের ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিধামুক্ত কিন্তু রাকেশের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ উল্টো। সেটা কি তিনি ছেলে বলেই? হয়ত তাঁর জীবন পুরোপুরি নিরাপদ এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত দেখতে চান মা।

হঠাৎ আরো একটা সম্ভাবনা বিদ্যুৎচমকের মতো রাকেশের মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়ে যায়। ইংরেজদের তুলনায় ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝায়েরা হয়ত আরো বেশি হিংস্র, বড় মাপের বর্বর। এরা পারে না এমন কাজ নেই। তাই চন্দ্রলেখা ভয় পেয়ে গেছেন।

রাজেশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তা করে চন্দ্রলেখার প্রশ্নের উত্তর দেন, 'ও যদি চাকরি ছেড়ে ধারাবনীর লোকজনের জন্যে কিছু করতে পারে, আমার আপত্তি নেই।'

চন্দ্রলেখা সরযূ বা সঞ্জয় আবছাভাবে হয়ত ভেবেছিল, রাকেশ আর যা-ই করুন রাজেশ্বর মেনে নেবেন, কিন্তু চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে কোনোভাবেই রাজী হবেন না। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

আস্তে আস্তে সকলকে একবার দেখে নিয়ে রাজেশ্বর এবার বলেন, 'আসলে শুরুটা তো কাউকে করতেই হয়। মার্ডার এক্সপ্রপ্রিয়েটেসন শুধু ধারাবনীতে হচ্ছে না। ত্রিলোকী সিং গিরিলালদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে চলবে কী করে? সোনু যা ডিসিসান নিয়েছে, আমি হ'লেও তা-ই করতাম। তবু সোনুকে আমার কিছু বলার আছে।'

উৎসুক মুখে বাবার দিকে তাকান রাকেশ।

রাজেশ্বর বলেন, 'তুই যে চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বলছিস, সেটা খুব ভাল করে ভেবে দেখেছিস তো?'

রাকেশ আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'একটা কথা তোর মাথায় রাখা দরকার। ইমোসানের মাথায় অনেকে অনেক কিছু ক'রে ফেলে। পরে যেন আপসোস করতে না হয়।'

'না বাবুজি, আপসোসের কোনো প্রশ্নই নেই। সব দিক ভেবেই এই ডিসিসান নিয়েছি।'

'তা হ'লে ঠিক আছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাজেশ্বরই ফের শুরু করেন, 'যে কাজ করতে যাচ্ছিস সেটা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। এতে বহু মানুষের সাহায্য দরকার। যে ক্লাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছিস সেটা খুব সহজ নয়। এতে যদি আমার কোনো প্রয়োজন থাকে বলিস। আমি রাজী।'

গভীর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় রাজেশ্বরকে লক্ষ্য করতে থাকেন রাকেশ। এই মানুষটি স্বাধীনতার পর দেশের চেহারা দেখে এতই মর্মাহত হয়েছেন যে নিজেকে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ কোনোদিন যে ক্রমশ কতকগুলো স্বার্থপর ফন্দিবাজ বদমাসের হাতে চলে যাবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল! আগে আগে রাজেশ্বরের আক্ষেপ হ'ত নতুন প্রজাতির এই সব ধুর্ত রাজনৈতিক দালালদের হাতে দেশকে দেবার জন্যই কি তাঁর মতো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জীবনের অর্ধেকেরও বেশি জেলখানায় ক্ষয় করেছেন বা ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে নিজেদের বলি দিয়েছেন?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাকেশের মনে হয়, রাজেশ্বরের ভেতরকার পুরনো মিয়মাণ সৈনিক যেন নতুন সংঘাতের ইঙ্গিত পেয়ে গেছে। চল্লিশ বছর আগের রাজেশ্বরকে দেখার সুযোগ হয় নি রাকেশের, রূপকথার গল্পের মতো তাঁর নানা কীর্তিকাহিনী তিনি শুনেই এসেছেন শুধু। সেদিনের সেই অসীম সাহসী মহিমান্বিত যোদ্ধা এখনও শেষ হয়ে যায় নি। সত্তর বছর বয়সে জীবনের শেষ যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত।

রাকেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ক্ষুব্ধ চন্দ্রলেখা বলে ওঠেন, 'ছেলেটাকে তুমি এভাবে তাতিয়ে দিচ্ছ!'

রাজেশ্বর হেসে হেসে বলেন, 'তাতাব কেন? এ সব ওর রক্তেই আছে। এর নাম উত্তরাধিকার।'

চন্দ্রলেখা উত্তর দেন না। তাঁর চোখেমুখে ক্ষোভ এবং আশঙ্কা ফুটেই থাকে।

চাকরি ছাড়ার ব্যাপারটা গোড়া থেকেই পছন্দ হয় নি সরযূর। সে বলে,

'দাদা, এ সব পাগলামির কোনো মানে হয় না। এ এক ধরনের সুইসাইডাল রোমান্টিসিজম।'

রাজেশ্বর বলেন, 'সোনুর মতো আইডিয়ালিস্ট পাগলেরা সংখ্যায় যত বাড়বে দেশের পক্ষে ততই ভাল। রোমান্টিক, ভিসনারি—এ সব না হ'লে ইণ্ডিয়ার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার।'

সরযূ এমনিতে খুবই হাসিখুশি, আমুদে। কিন্তু এখন তাকে যথেষ্ট গম্ভীর দেখাচ্ছে। সে বলে, 'এবার আমরা কত আশা করে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, দাদার বিয়েটা ফাইনাল করে যাব। তা না—' হঠাৎ থেমে যায় যে।

মণিহারিরই একটি মেয়ে, মাধুরীর সঙ্গে বছর তিনেক ধরে রাকেশের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। মাধুরী স্মার্ট ঝকঝকে মেয়ে, লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভাল, এ বছর নাগপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম. এ-তে। ব্যবহার চমৎকার, দেখতেও সুশ্রী।

মাধুরীর বাবা মথুরাপ্রসাদ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, কাটিহারে তাঁর জুট মিল, কাচ কল এবং পেপার মিল রয়েছে। অঢেল পয়সা ওঁদের। সংসারও নির্ঝঞ্ঝাট। মাধুরীরা দুই বোন, ভাই নেই। দিদির আগেই বিয়ে হ'য়ে গেছে।

মথুরাপ্রসাদের খুব ইচ্ছা রাকেশের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দেবেন। পুরনো সৎ পেট্রিয়টদের সম্পর্কে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তা ছাড়া রাকেশ সব দিক থেকে অসাধারণ। রাজেশ্বরের পরিবারে মেয়ে দিতে পারলে তাঁর মর্যাদা বাড়বে। তাঁর পক্ষে এটা এক ধরনের স্টেটাস সিম্বলের ব্যাপার।

মণিহারির মেয়ে হলেও রাকেশের সঙ্গে তিন চার বারের বেশি মাধুরীর দেখা হয় নি। কেননা পাঁচ ছ বছর বয়স থেকেই রাঁচীর কনভেণ্টে পড়তে চলে গিয়েছিল সে। হোস্টেলে থেকে থেকেই এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে। আর রাকেশ ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিয়ে পাটনায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ছুটিছাটায় দু'জনে মণিহারি আসতেন, কিন্তু দেখা হয়েছে কিনা রাকেশের মনে নেই।

বছর তিনেক আগে মাধুরী যখন বি. এ ফাইনাল ইয়ারে, মথুরাপ্রসাদ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। প্রথমে এ বিয়েতে যথেষ্ট আপত্তি ছিল রাজেশ্বরের। অত বড়লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে ভরসা পান নি। মথুরাপ্রসাদকে বার বার বুঝিয়েছেন, তাঁর মতো গরীবের ঘরে মেয়ে দেবার মানে হয় না। কিন্তু মথুরাপ্রসাদ অনড়।

রাজেশ্বরের সংশয় ছিল, এই ক্লাসের লোকেরা প্রতিটি পা ফেলে সুদূরপ্রসারী কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে। রাজনৈতিক নেতাদের ভাঙিয়ে তারা সরকারি পারমিট,

লাইসেন্স বা অন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। রাজেশ্বর পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি রাজনীতি করেন না, তাঁর কোনো ক্ষমতাই নেই, কারো কোনো প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন না। জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে শিহরিত ভঙ্গিতে মথুরাপ্রসাদ জানিয়েছেন, কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নিয়ে তিনি আসেন নি, তাঁর মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে রাজেশ্বর গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবেন।

বহুবার রাজেশ্বরের কাছে এসেছেন মথুরাপ্রসাদ, মেয়েকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে এনেছেন। মথুরাপ্রসাদের ভদ্রতা, বিনয় এবং মাধুরীর নম্র মধুর ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত তিনি খুশি হয়েছেন, তবে কোনোরকম কথা দেন নি। শুধু বলেছেন, 'আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে-জামাই—এদের সঙ্গে আলোচনা করি। দেখি ওরা কী বলে।' আলোচনা তিনি করেছেনও। সঞ্জয় এবং সরযূর খুবই ইচ্ছে, এ বিয়ে হোক। কিন্তু রাকেশ সরাসরি মতামত দেন নি ; শুধু বলেছেন, 'যাক না আর কিছুদিন। এত তাড়া কিসের ?'

ছুটিতে রাকেশের বাড়ি আসার খবর পেলে মথুরাপ্রসাদ ছুটে আসেন। মাধুরীকেও দু-একবার নিয়ে এসেছেন। মাধুরীর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর ভাল লেগেছে।

গত বছর মথুরাপ্রসাদ রাজেশ্বরকে জানিয়েছিলেন, এম. এ. পরীক্ষার পরই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান। অনেকদিন ধরে তাঁরা আশায় আশায় আছেন। তাঁর ধারণা এবার রাজেশ্বররা অনুগ্রহ করবেন, কিন্তু রাকেশ মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। তার ওপর ধারাবনীর ঐ গণহত্যাটা ঘটে গেল।

রাকেশ সরযূর দিকে মুখ ফেরান। মজার একটা ভঙ্গি করে বলেন, 'তুই ভাবছিস চাকরিটা ছেড়ে দিলে মাধুরীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, এই তো ?'

সরযূ চুপ করে থাকে।

রাকেশ ফের বলেন, 'একটা অ্যাসিড টেস্ট হয়ে যাক। দেখা যাক চাকরি ছাড়ার পর মথুরাপ্রসাদজি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন কিনা।'

সরযূ উত্তর দেন না।

চন্দ্রলেখা বলেন, 'কেউ তোর হাতে মেয়ে দেবে না।'

রাকেশ হাত দুটো উল্টে দিয়ে বলেন, 'তা হলে আর কী করব, চিরকুমার হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে দেখছি।'

চন্দ্রলেখা রাগের গলায় বলেন, 'এখন এসব ঠাট্টা ভাল লাগছে না।'

রাকেশ আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্য হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে চন্দ্রলেখার একটা হাত ধরে গম্ভীর গলায় বলেন, 'মা, আমি একটা বড়ো কাজে নামতে যাচ্ছি। তুমি রাগ ক'রে থাকবে ?'

চন্দ্রলেখা উত্তর দেন না, ছেলের হাতের ওপর নিজের একটা হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকেন। এই স্পর্শের মধ্যেই রাকেশ অনুভব করতে পারেন, চাকরি ছেড়ে জীবনের নতুন একটি পর্ব শুরু করার ব্যাপারে মা আর আপত্তি করবেন না। এটা তাঁর বড়ো রকমের প্রাপ্তি।

রাকেশ আর চন্দ্রলেখাকে সরযূ লক্ষ্য করছিল। সে বলে, 'দাদা, শেষ পর্যন্ত মাকেও তোমার দলে টেনে নিলে!'

রাকেশ বলেন, 'শুধু কি মাকেই, তোদেরও টানব। সঞ্জয় আর তোকেও আমার দরকার।'

'কিন্তু আমরা তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব? দিল্লীতে থাকি, ইউনিভার্সিটির ক্লাস আছে। অত দূরে থেকে তোমার কোন কাজে আসব?'

'আপাতত মোরাল সাপোর্টটা তো দে। পরে জানাবো, কী সাহায্য তোদের কাছে চাই।'

চব্বিশ

দু সপ্তাহের ছুটি নিয়ে মণিহারি এসেছিলেন রাকেশ। ভেবেছিলেন গোটা ছুটিটা সরযূ সঞ্জয় বনির সঙ্গে হৈ হৈ করে কাটিয়ে দেবেন। একদিন সাহেবগঞ্জের ওধারে গিয়ে বাড়ির সবাই পিকনিক করবেন। নৌটঙ্কীর ওপর তাঁর দারুণ ঝোঁক। কাটিহার গিয়ে দু-তিন রাত নৌটঙ্কী শুনে আসবেন। একদিন ঝিলে মাছ ধরতে যাবেন ছিপ-টিপ নিয়ে।

কিন্তু দু'দিন কাটতে না কাটতেই রাকেশ ঠিক করে ফেললেন, ফিরে যাবেন। ধারাবনীর সেই মানুষগুলো, ভয়ার্ত পশুর মতো যারা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, এখন কীভাবে তাদের দিন কাটছে? যতদিন দেবারতি আর তিনি ওখানে ছিলেন গিরিলালরা তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার ওদের নজর এবং রাগ এসে পড়বে ধনুয়াদের ওপর। ধনুয়াদের জন্যই যে তাঁরা ওখানে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করতে গিয়েছিলেন, গিরিলালরা তা নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না। এর মধ্যেই তাদের ভূমিসেনারা হয়ত জঙ্গলে হানা দিয়েছে। পতিয়া পারো লাগু এবং আর যারা অত্যাচারের কথা জানিয়েছিল গিরিলালরা তাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। এই সময়টা রাকেশের একান্তভাবে ধনুয়াদের কাছে থাকা খুবই জরুরী। ভয় বা লোভ দেখিয়ে গিরিলালেরা যদি ওদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলে, তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আজ সকালে সামনের বারান্দায় সবাই চা খেতে বসেছিল। সরযূ আর সঞ্জয় চন্দ্রলেখা এবং রাজেশ্বরের সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে পিকনিক করার বিষয়ে কথা বলছিল। সরযূর ইচ্ছা, সাহেবগঞ্জের ওধারে যে ছোট পাহাড় রয়েছে সেখানে গিয়ে বনভোজন করে। সঞ্জয় চায়, নদীতে যে নতুন চর পড়েছে, সে জায়গায় গিয়ে একটা দিন হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে আসে। দু'জনেই নিজের নিজের পছন্দ-করা 'স্পট' সম্পর্কে অনড়। চন্দ্রলেখা আর রাজেশ্বর কার পক্ষে মত দেবেন বুঝতে না পেরে অল্প অল্প হাসছেন।

অন্যমনস্কর মতো বোন এবং ভগ্নিপতির ছেলেমানুষি ঝগড়া শুনতে শুনতে রাকেশ ভাবছিলেন, এখনই ধনুয়াদের কাছে ফিরে যাবার কথাটা ওদের কাছে বলা দরকার। সবাইকে থামিয়ে যখন তিনি বলতে যাবেন সেইসময় গেটের বাইরের রাস্তায় একটা বড়ো মোটর এসে দাঁড়ায়। তার ভেতর থেকে নেমে আসেন মধ্যবয়সী মথুরাপ্রসাদ।

রাকেশ একটু চমকেই ওঠেন। এই মুহূর্তে মথুরাপ্রসাদকে তিনি আশা করেন নি।

এদিকে রাজেশ্বররা উঠে দাঁড়িয়েছেন। সরযূ ব্যস্তভাবে গেটের কাছে গিয়ে মথুরাপ্রসাদকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। রাজেশ্বর এবং চন্দ্রলেখা হাতজোড় ক'রে বলেন, 'আইয়ে আইয়ে—'

মথুরাপ্রসাদের বয়স ষাট বাষট্টি। সাদাসিধে ভালোমানুষ ধরনের চেহারা। পোশাক আশাকে কোনোরকম আলাদা পারিপাট্য নেই। ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পসু, যা যা সাধারণ ভদ্রলোকে পরে থাকে তার বেশি কিছু নয়। তবে হাতের ঘড়িটা নাম-করা বিদেশী কোম্পানির এবং যথেষ্ট দামি।

মথুরাপ্রসাদের স্বাস্থ্য বেশ মজবুত, শরীরে অনাবশ্যক চর্বি নেই। তিনি যে একজন চতুর সফল ব্যবসায়ী, দেখে বোঝা যায় না।

মথুরাপ্রসাদ এগিয়ে এসে রাজেশ্বরকে প্রণাম করেন, তারপর চন্দ্রলেখার পা ছোঁওয়ার জন্য হাত বাড়ান। চন্দ্রলেখা বিব্রতভাবে দ্রুত খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলেন, 'না না, পায়ে হাত দিয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না।'

রাকেশ জানেন, মথুরাপ্রসাদ যখনই এ বাড়িতে আসেন, রাজেশ্বরকে প্রণাম করবেনই। তবে চন্দ্রলেখা কখনই প্রণাম নেন না। এই ব্যাপারে তাঁর ভীষণ সঙ্কোচ।

মথুরাপ্রসাদ বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনারা সব দিক থেকে আমার চেয়ে

বড়ো। আপনাদের চরণ ছুঁলে আমার আত্মার শান্তি, আমার পুণ্ (পুণ্য)। কৃপা ক'রে এর থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

লোকটা কি খুবই ধূর্ত? চাটুকারিতায় চন্দ্রলেখা এবং রাজেশ্বরকে কি মথুরাপ্রসাদ বশীভূত করে রাখতে চান? সেটাই মনে হবার কথা। কিন্তু তাঁর সারল্যমাখা মুখচোখের দিকে তাকালে আদৌ কোনো সন্দেহ হয় না। তাঁকে দেবদূতের মতো নিষ্পাপ ভাবতে ইচ্ছা হয়।

আরো কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে চন্দ্রলেখা বলতে থাকেন, 'আমাকে লজ্জা দেবেন না। দয়া ক'রে বসুন।'

অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে বসতেই হয় মথুরাপ্রসাদকে। তাঁকে দেখে রাকেশরা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বসার পর আবার সবাই বসে পড়েন।

মথুরাপ্রসাদ কোন উদ্দেশ্যে আজ হানা দিচ্ছেন, বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না রাকেশের। ভেতরে ভেতরে প্রচুর অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন।

সরযূ রাকেশের ঠিক পাশেই বসে ছিল। চোখের কোণ দিয়ে দাদাকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে সে হাসতে থাকে। মথুরাপ্রসাদের হঠাৎ এই এসে পড়াটা তার কাছে খুবই মজার ঘটনা।

এদিকে চন্দ্রলেখা দু মিনিটের মধ্যে অতিথি আপ্যায়নের সুচারু ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। পার্বতীয়াকে দিয়ে চা এবং প্রচুর মিষ্টি আনিয়ে নিজের হাতে মথুরাপ্রসাদের সামনে সাজিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে সুগৃহিণী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অহেতুক সঙ্কোচ নেই মথুরাপ্রসাদের। যে পরিমাণ খাদ্যবস্তুই দেওয়া হোক, তিনি আপত্তি করেন না। প্লেট থেকে একটা কলাকন্দ তুলে নিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'কাল রাতে কাটিহারে খবর পেলাম রাকেশ সরযূ আর সঞ্জয় বাড়ি এসেছে। আজ সকালে আমার পাটনা যাবার কথা ছিল। সেটা ক্যানসেল ক'রে মণিহারি ছুটে এলাম।'

পাটনা যাওয়া স্থগিত রেখে এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে এখানে ছুটে আসার কারণটা কারো কাছেই অজানা নয়। তবে কেউ কোনো উত্তর দেন না। কেননা রাকেশ তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা ক'রে ফেলেছেন তার মধ্যে আপাতত বিয়ের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই সবাইকে চুপ ক'রে থাকতে হয়।

একটা কলাকন্দ শেষ ক'রে এবার প্যাঁড়া তুলে নেন মথুরাপ্রসাদ। আস্তে আস্তে বলেন, 'অনেক আশা নিয়ে আজ এসেছি। অনেক দিন আমরা অপেক্ষা

করছি, এবার শুভ কাজটা হয়ে গেলে বহুত শান্তি পাই। বুঝতেই পারেন, আমি মেয়ের বাপ। আপনাদের কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি, মাধুরীকে আপনারা পুতহু ক'রে নেবেন। তবু বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তা থেকেই যায়।'

রাজেশ্বর এবং চন্দ্রলেখা আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তবে মুখে কিছুই বলেন না।

মথুরাপ্রসাদ এবার বলেন, 'সামনের মাসে একটা তারিখ আছে। আমার ইচ্ছা শুভ কাজটা ঐ দিনই হয়ে যাক। আপনাদের অনুমতি পেলে কাল থেকে বিয়ের আয়োজন করতে থাকি।' বলে আশান্বিত ভঙ্গিতে প্রথমে রাজেশ্বর এবং পরক্ষণে চন্দ্রলেখার দিকে তাকান।

রাজেশ্বর এতক্ষণে মুখ খোলেন। ঈষৎ বিব্রতভাবে বলেন, 'আমার বা আমার স্ত্রীর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু রাকেশের পক্ষে এই মুহূর্তে বিয়েটা বোধ হয় সম্ভব হচ্ছে না।'

কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মথুরাপ্রসাদের চোখ একবার রাকেশের দিক থেকে দ্রুত ঘুরে এসে রাজেশ্বরের মুখের ওপর স্থির হয়। বিমূঢ়ের মতো তিনি বলেন, 'কেন ?'

রাজেশ্বর বলেন, 'আপনি ওকেই জিজ্ঞেস করুন।'

অগত্যা ফের রাকেশের দিকে তাকাতে হয় মথুরাপ্রসাদকে।

রাকেশ ভেতরে ভেতরে প্রবল অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোনোরকমে তিনি বলেন, 'আমাকে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় বিয়ে করা উচিত না।'

মথুরাপ্রসাদের খানিক আগের বিমূঢ়তা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তিনি বলেন, 'চাকরি ছাড়তে হবে ? কেন ?'

বারহৌলি ধারাবনীর গণহত্যার কথা সংক্ষেপে জানিয়ে রাকেশ এবার যা বলেন, তা এইরকম। বিচারকের চাকরি বজায় রেখে গিরিলাল ঝা, ত্রিলোকী সিং এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের গায়ে সামান্য আঁচড় কাটা আদৌ সম্ভব না। নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিজের চামড়া বাঁচিয়ে চলা তাঁর পক্ষে কোনোরকম কঠিন কাজ ছিল না। গিরিলালদের সঙ্গে হাত মেলালে কিংবা তাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে চোখ বুজে থাকলে তিনি যা চাইবেন তা-ই পেয়ে যাবেন। পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ কি তারও বেশি টাকা। কিন্তু বিবেক এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ তাঁকে একেবারেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না, অনবরত তাঁকে মানসিক এক সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গিরিলালদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হ'লে চাকরি না ছেড়ে উপায় নেই।

এমন একটা ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মথুরাপ্রসাদ। তিনি ঝানু বিজনেসম্যান। টাকা পয়সা লাভ ক্ষতি ইত্যাকার মোটা দাগের পাকা মেটিরিয়ালিস্টিক ব্যাপার ছাড়া তাঁর মাথায় আর কিছুই ঢোকে না। মানুষ তিনি খারাপ না, নিজের স্বার্থে ঘা না পড়লে কারো ক্ষতির কথা ভাবতেও পারেন না। কিন্তু গিরিলালরা রাকেশের তো কোনো অনিষ্ট করে নি, যাদের সর্বনাশ করেছে তারা যদি ওদের বিরুদ্ধে লড়ার সাহস না পায়, সেজন্য দেশের সরকার আছে, কানুন আছে। এত সব থেকেও যদি গিরিলালদের শায়েস্তা না করা যায় তা হ'লে ধরে নিতে হবে এটাই ধারাবনী বারহোলির মানুষদের ভবিতব্য। দেশের কানুন যা পারে না সেখানে চাকরি ছেড়ে গিরিলালদের বিপক্ষে দাঁড়ানোটা ঘোর মূর্খামি। চাকরি ছাড়ার এমন একটা উদ্ভট কারণ মথুরাপ্রসাদের মস্তিষ্কে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয় যেন। অনেকক্ষণ পর তিনি বলেন, 'চাকরিটা কি না ছাড়লেই নয় ?'

রাকেশ বলেন, 'না।'

কিছুক্ষণ আগের বিপর্যয় এবং বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেন না মথুরাপ্রসাদ। তাঁর ভেতর থেকে চতুর ব্যবসায়ীটি আবার মাথা চাড়া দেয়। চমৎকার একটি চাল দিয়ে বলেন, 'তোমার কি ধারণা, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি ওদের জেল কি ফাঁসির ব্যবস্থা করতে পারবে ?'

এই প্রশ্নটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না রাকেশ। গিরিলালদের সাজা দিতে পারবেন, এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন। কাজটা মারাত্মক, কী ধরনের কঠিন তাঁর চেয়ে কে আর ভাল জানে। ওদের হাতে অঢেল টাকা, প্রচুর বন্দুক, অজস্র কার্তুজ আর বেপরোয়া ভাড়াটে খুনীর দল। তা ছাড়া পলিটিক্যাল পার্টি আর অ্যাডমিনিস্ট্রেসানের বহু মানুষকেই ওরা কিনে নিয়েছে। প্রতিপক্ষ যে কতটা ক্ষমতাবান, সে সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা আছে। কাজেই গিরিলালদের জেলে পোরা বা ফাঁসিতে ঝোলাবার গ্যারান্টি দেওয়া সহজ নয়।

রাজেশ্বররা চুপচাপ একজন ধুরন্ধর বিজনেসম্যান এবং একজন আইডিয়ালিস্ট বিচারকের অদৃশ্য দড়ি টানাটানি লক্ষ্য করছিলেন।

রাকেশ চিন্তিতমুখে বলেন, 'সেটা পারব কিনা বুঝতে পারছি না। তবে—'

মথুরাপ্রসাদ খানিকটা ঝুঁকে বলেন, 'তবে কী ?'

'একটা চেষ্টা তো অন্তত করতে পারব।' রাকেশ বলতে থাকেন, 'যদি হেরেও যাই, এটা তো ঠিক, খুব সহজে ওদের ছেড়ে দিই নি। ওরাও টের পাবে, যা খুশি ক'রে পার পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোনো দুষ্কর্ম করতে গেলে দশ বার ভাববে। এখানেই আমার স্যাটিসফ্যাকসান।'

যারা নিরর্থক স্যাটিসফ্যাকসান নিয়ে খুশি হয়, মনুষ্যজাতির সেই বিরল শ্রেণীটির মধ্যে আর যে-ই হোক, মথুরাপ্রসাদ পড়েন না। যে রাকেশের সামনে অনন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, যাঁকে এতকাল বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে, আজ তাঁর বোকামি এবং নিজের জীবন নিয়ে হঠকারিতা মথুরাপ্রসাদকে অবাক ক'রে দেয়। তবু তিনি আশা ছাড়েন না। বলেন, 'চাকরি ছাড়লে যদি ঐ লোকগুলোর উপকার হ'ত, গিরিলালরা সাজা পেত, তাহ'লে না হয় এটা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না তখন নিজের ক্ষতি ক'রে কী হবে?'

রাকেশ উত্তর দেন না। চাকরি ছাড়ার পেছনে তাঁর কোন বোধ কাজ করছে সেটা মথুরাপ্রসাদকে বোঝানো সম্ভব নয়।

একটু চিন্তা ক'রে মথুরাপ্রসাদ এবার বলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রাকেশ।

'তুমি চাকরিটা ছেড়ো না।' রাকেশ চুপ করে থাকেন।

মথুরাপ্রসাদ নতুন ক'রে শুরু করেন, 'তোমার বয়স কম, বারহৌলির গরীব মানুষগুলোর ওপর টরচার দেখে খুব অস্থির হয়েছে। খুব স্বাভাবিক। আমারও খারাপ লাগছে। এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। আমি বলি কি, ওপর মহলে আমার জানাশোনা আছে। তেমন বুঝলে গিরিলালদের জেলে ঢোকাতে না হয় পঞ্চাশ হাজার, একলাখ, দু লাখ খরচ করা যাবে। টাকা ঢাললে অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।'

মথুরাপ্রসাদের অঙ্কটা পরিষ্কার। বিবেকবান ভাবী জামাইকে তিনি বারহৌলির গণহত্যা, ধর্ষণ এবং গ্রাম জালানোর উত্তাপ থেকে অক্ষত অবস্থায় বের ক'রে আনতে চান। তাঁর ইচ্ছা দু লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ ক'রে রাকেশের উদ্বেল বিবেককে শান্ত ক'রে মেয়ের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবেন। টাকার শক্তি সম্পর্কে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু মথুরাপ্রসাদ জানেন না গিরিলাল এবং ত্রিলোকীর হাতে তাঁর চেয়ে কম টাকা নেই। তাঁর মতো বিজনেসম্যান না হ'লেও ওরাও ল্যাণ্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। মানি-পাওয়ার ছাড়া ওদের আর যা আছে তা হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা আর জনবল। আজকের ভারতবর্ষে পলিটিক্যাল পাওয়ারই হ'ল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। ওটা হাতে থাকলে সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া যায়। সারা জীবন চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হবে না মথুরাপ্রসাদের পক্ষে। নিজের সমস্ত জমানো অর্থ খরচ ক'রেও গিরিলালদের গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত মারতে পারবেন না।

রাকেশ বলেন, 'ওদের কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা আছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেসানের

সব লেভেলে ইনফ্লুয়েন্সও যথেষ্ট। টাকার জোরে ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না।'

এদিকটা ভেবে দেখেন নি মথুরাপ্রসাদ। তিনি প্রায় হকচকিয়ে যান। বলেন, 'তাহ'লে ?'

'চাকরি আমাকে ছাড়তেই হবে।' রাকেশ বলেন, 'বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে অনেক ক্ষমতা। ক্ষমতা হয়ত খানিকটা আছে কিন্তু আমাদের এতরকম নিয়ম মেনে চলতে হয় যে ইচ্ছা থাকলেও আসামীদের বিরুদ্ধে কিছু ক'রে ওঠা যায় না।'

'ক্ষমতা থাকতেই কিছু করতে পারছ না, চাকরি ছাড়লে কী ক'রে পারবে ?'

তুখোড বিজনেসম্যান মথুরাপ্রসাদ এ জাতীয় একটা প্রশ্ন যে করবেন, রাকেশ তা আন্দাজ করেছিলেন। বলেন, 'দেখা যাক।'

এমন একটা ভাসা ভাসা উত্তরে খুশি হন না মথুরাপ্রসাদ। বলেন, 'চাকরি ছেড়ে ঠিক কী করতে চাও তুমি ?'

মোটামুটি একটা কর্মসূচি ঠিক ক'রে রেখেছেন রাকেশ, কিন্তু আগেভাগে সেটা তিনি মথুরাপ্রসাদকে জানাতে চান না। বলেন, 'এখনও স্পষ্ট ক'রে ভাবিনি, তবে কিছু একটা তো করতেই হবে।'

মথুরাপ্রসাদ আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে রাকেশ দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

মথুরাপ্রসাদ কিছু না ব'লে রাকেশের দিকে তাকান।

রাকেশ বলেন, 'সব কথা তো শুনলেন। এই অবস্থায় বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমার জন্যে আপনাদের আর অপেক্ষা না করাই ভাল।'

মথুরাপ্রসাদ বলেন, 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে। কিন্তু সব কিছু শোনার পরও আমার কিছু বলার আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না।'

'চাকরিটা ছাড়া উচিত হবে কিনা, আরেক বার সেটা ভাল ক'রে ভেবে দেখো।'

বোঝা যাচ্ছে, এখনও আশা ছাড়েন নি মথুরাপ্রসাদ। রাকেশ অবশ্য কোনো উত্তর দেন না।

পঁচিশ

পরের দিনই পূর্ণিমা হয়ে মহকুমা শহরে ফিরে যান রাকেশ। সরকারি বাংলোয় পৌঁছতে বিকেল হয়ে যায়।

এখানে নামমাত্র একটা মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। কয়েকটা খোয়া-ওঠা ধুলোয়-ভরা আঁকাবাঁকা প্যাঁচালো রাস্তা, টালির শেডের ছোটোখাটো একটা হাসপাতাল, লো ভোল্টেজের বিজলী, কাঁচা খোলা নর্দমা—এই সব নিয়ে এখানকার পৌর নিগম। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এখনও ওয়াটার সাপ্লাই-এর পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। জলের ব্যবস্থা যার যার নিজেকেই করে নিতে হয়। এখানকার সব বাড়িতেই হয় টিউবওয়েল, নইলে কুয়ো।

রাকেশের বাংলোতে বাথরুমের লাগোয়া একটা কুয়ো রয়েছে। তাঁকে দেখামাত্র ভুরেলাল বাথরুমে জল তুলে দেয়। ইস্তিরি-করা ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি আর তোয়ালে সাজিয়ে রেখে আসে। সে জানে, খানিকক্ষণ জিরিয়ে প্রথমে স্নান করবেন রাকেশ। স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দেবার পর ভুরেলাল সোজা রান্নাঘরে চলে যায়। আপাতত চা এবং কিছু খাবার করতে হবে, তারপর রসুই।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম ক'রে স্নানটান সেরে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সামনের দিকের চওড়া ব্যালকনিতে এসে একটা ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দেন রাকেশ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা, গরম পুরী আর আলুভাজা নিয়ে আসে ভুরেলাল। রাকেশের সামনে একটা নিচু টেবিলে সে সব রাখতে রাখতে বলে, 'আপনি তো বিশ রোজের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন। এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?'

বোঝা যায়, পুরো ছুটিটা না কাটিয়ে রাকেশ ফিরে আসায় ভুরেলাল রীতিমত অবাকই হয়েছে। রাকেশ বলেন, 'জরুরী কাজে চলে আসতে হ'ল।'

জরুরী কাজটা কী, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না ভুরেলালের। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলে, 'রাতে কী খাবেন? ভাত না রোটি?'

'রোটি?'

'সবজি উবজি কী করব?'

'তোর যা ইচ্ছা।'

ভুরেলাল রান্নাঘরের দিকে ফিরে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে তার। বলে, 'দো আদমী আপনার খোঁজে এসেছিল।'

কারা আসতে পারে তাঁর কাছে? গিরিলালেরা কি নতুন ক'রে লোক পাঠাল? রাকেশ চায়ের কাপ তুলে নিয়েছিলেন। সেটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেন, 'লোক দুটোর কী নাম? কী জন্যে এসেছিল, কিছু বলে গেছে?'

ভুরেলাল জানায়, লোক দুটির যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। বুড়ো মানুষই বলা যায় তাঁদের। নাম রামলখনজি আর ভাগবতজি। চেহারা দেখে মনে হয়েছে তাঁরা মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। দু'জনেই নাকি রাজেশ্বরজি অর্থাৎ রাকেশের পিতাজি রাজেশ্বর সহায়ের বন্ধু। কী উদ্দেশ্যে তাঁরা এসেছিলেন সেটা অবশ্য জানিয়ে যান নি। তবে বলেছেন, আগামী কাল সকালে ফের আসবেন। ভুরেলাল জানিয়েছিল, রাকেশ ছুটি কাটিয়ে অন্তত আরো দিন পনেরো ষোল পর মণিহারি থেকে ফিরবেন। ভাগবতজিরা নাকি বলেছেন, তাঁদের কাছে খবর আছে রাকেশ তার অনেক আগেই চলে আসবেন। যতদিন না তিনি ফেরেন, রোজ সকালে একবার ক'রে ওঁরা খোঁজ নিয়ে যাবেন।

ভাগবত এবং রামলখন নামে রাজেশ্বরের কোনো বন্ধু আছেন কিনা রাকেশের জানা নেই। তাঁর কাছে ওঁদের কী এমন দরকারি কাজ থাকতে পারে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাকেশ বলেন, 'ওঁদের ঠিকানা-টিকানা দিয়ে গেছেন ?"

'না।' আস্তে মাথা নাড়ে ভুরেলাল।

পিতৃবন্ধু এই অচেনা মানুষ দুটি সম্পর্কে কাল সকালের আগে কিছুই জানা যাবে না। রাকেশের মন কিছুটা কৌতূহল এবং কিছু সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যা।'

ভুরেলাল চলে যায়।

তারপর অন্যমনস্কর মতো চা এবং খাবার-টাবার খেয়ে রাকেশ তাঁর শোওয়ার ঘর থেকে প্যাড, কলম, সাদা খাম ইত্যাদি নিয়ে আসেন। চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে তিনি যখন মনস্থির ক'রে ফেলেছেন তখন আর দেরি করার মানে হয় না।

বাবার বন্ধুদের ব্যাপারে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল রাকেশের। সেটাকে একমুখী করে তিনি সংক্ষেপে পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে সরকারি চাকরির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন।

লেখাটা হয়ে যাবার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বারকয়েক পড়লেন রাকেশ। খুবই মর্যাদাপূর্ণ চিঠি। পদত্যাগের জন্য কাউকে দায়ী করা হয় নি, কোনো অজুহাতও খাড়া করেন নি। জুডিসিয়ারির কঠোর নিয়মের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে যে অসুবিধা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই চিঠিতে। আবেদন করা হয়েছে, চিঠিটি পাওয়ামাত্র তাঁকে থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আরো একবার পড়ে পদত্যাগ-পত্রটা সাদা খামে পুরে আঠা দিয়ে মুখ সেঁটে দিলেন রাকেশ। তার ওপর হিমগিরির নাম লিখে তার তলায় লিখলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ। হিমগিরির মাধ্যমেই চিঠিটা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে।

ঠিকানা-টিকানা লেখার পর রাকেশ ভাবলেন, কাল আদালতে গিয়ে পিওন দিয়ে পদত্যাগ-পত্রটা হিমগিরির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এর একটা অফিসিয়াল রেকর্ড রাখা দরকার। তাঁর ধারণা, দিন দশেকের ভেতর কর্তৃপক্ষ তাঁর পদত্যাগ মেনে নিয়ে তাঁকে অব্যাহতি দেবেন। অর্থাৎ আর কয়েকটা দিন তিনি এই বাংলোতে থাকতে পারবেন। পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হবার পর একটা দিনও আর এখানে থাকার ইচ্ছা নেই তাঁর।

চিঠিটা টেবিলে রেখে চুপচাপ বসে থাকলেন রাকেশ।

সন্ধে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চারিদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার। বাংলোর সামনের রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির ক'টা বাতি টিম টিম করে জ্বলছে। সে আলোতে প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

সন্ধের পর পরই এই নগণ্য মহকুমা শহর নিঝুম হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে রাকেশদের এই মহল্লাটা। ক্বচিৎ দু-একটা সাইকেল রিকশা বা টাঙ্গা মৃদু আওয়াজ তুলে ঢিমে তালে সামনে দিয়ে চলে যায়। টাঙ্গার তলায় আর সাইকেল রিকশার হ্যাণ্ডেলে আটকানো কেরোসিনের আলো ক্রমশ দূরে, আরো দূরে ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকে।

শহরের এই দিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। বাড়ি-ঘর কম। চারপাশে প্রচুর গাছপালা। এধারে ওধারে অজস্র জোনাকি উড়ছে। অনেক দূরে কোথায় যেন শিয়াল ডেকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো কুকুর চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের তাড়া ক'রে যায়।

দূরমনস্কর মতো ঝাপসা শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেবারতির কথা মনে পড়ে যায় রাকেশের। পদত্যাগের মতো এত বড় একটা সিদ্ধান্ত যে নিয়েছেন, সেটা তাকে জানানো দরকার। এরপর যে কর্মসূচির ছক ক'রে রেখেছেন তাতে দেবারতির সাহায্য খুবই জরুরী। প্রেস মিডিয়া একটা অত্যন্ত জোরালো অস্ত্র। খবরের কাগজ পাশে থাকলে তাঁর শক্তি অনেক বেড়ে যাবে।

রাকেশ এবার দেবারতিকে চিঠি লিখতে শুরু করেন। পদত্যাগের খবর জানিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আভাস দিতে দিতে লেখেন, দিন পনের-কুড়ি পর দেবারতি যদি একবার দুধলিগঞ্জ পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় আসতে পারে, খুব ভালো হয়। সে কাছে থাকলে রাকেশ অনেকটা ভরসা পাবেন, ইত্যাদি।

চিঠিটা খামে পুরে দেবারতির নাম এবং তার কাগজের ঠিকানা লিখে ফেলেন রাকেশ। আর তখনই পি. ডব্লু. ডি'র সেই ডেপুটি সেক্রেটারি বন্ধুটির কথা মনে পড়ে। তাঁকে একটা চিঠি লিখে দুধলিগঞ্জের সেই বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা

করতে হবে। আপাতত ওখানে থেকেই ধারাবনী আর সেই জঙ্গলটায়, যেখানে আনোখীরা লুকিয়ে আছে, যাতায়াত করবেন। অবশ্য পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় খুব বেশিদিন থাকা যাবে না, বড়ো জোর সপ্তাহ খানেক। পরে পরিস্থিতি বুঝে একটা থাকার জায়গা ঠিক ক'রে নিতে হবে।

রাকেশের ধারণা, রাতারাতি ওখানকার কাজ শেষ হবে না। যাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ তারা প্রবল শক্তিমান। এই লোকগুলোকে দমাতে অনেকটা সময় লাগবে। 'গিয়েই ওদের গুঁড়িয়ে দিলাম'—ব্যাপারটা এত সহজ নয়। কাজেই ধারাবনীর কাছাকাছি একটা স্থায়ী আস্তানা দরকার।

পি. ডব্লু. ডি'র ডেপুটি সেক্রেটারি বন্ধুটির নাম শেখর শর্মা। দুধলিগঞ্জ বাংলোয় কয়েক দিন থাকার ব্যবস্থা করতে এবার তাঁকে চিঠি লিখতে গিয়েও থেমে যান রাকেশ। শেখরকে চিঠি লিখলেই তিনি দুধলিগঞ্জের বাংলোয় খবর পাঠাবেন। রাকেশ যে যাচ্ছেন সেটা আগেই জানাজানি হ'য়ে যাবে। এটা তাঁর আদৌ কাম্য নয়। শেষ পর্যন্ত চিঠিটা আর লেখেন না।

একসময় ভুরেলাল এসে বলে, 'হুজৌর, খানা তৈরি হ'য়ে গেছে। এখন খাবেন ?'

গোটা দিন ট্রেন আর বাস জার্নির ধকলে রাকেশ খুবই ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়া দরকার। রাতটা টানা ঘুমোতে পারলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। বলেন, 'দে।'

অনেক সময় এই বারান্দায় বসেই খেয়ে নেন রাকেশ। ভুরেলাল বলে, 'এখানেই খাবার দেবো ?'

'নিয়ে আয়।'

একটা উঁচু টেবিল টেনে এনে তার ওপর চাপাটি, সবজি, কিছু ভাজা, দই এবং দুটো মিষ্টি সাজিয়ে দেয় ভুরেলাল। দু বেলাই রাকেশ টক দই খান।

খেতে খেতে রাকেশ বলেন, 'আমি আর দশ বারো দিন এখানে আছি ভুরেলাল। তারপর এই বাংলো ছেড়ে দিতে হবে।'

এমন একটা খবরের জন্য তৈরি ছিল না ভুরেলাল। সে প্রায় হকচকিয়ে যায়। বলে, 'কেন হুজৌর ?'

চাকরি ছাড়ার কথাটা বলতে গিয়েও থেমে যান রাকেশ। একটু চিন্তা ক'রে বলেন, 'আমাকে অন্য একটা কাজে আরেক জায়গায় যেতে হবে।'

রাকেশ কোথায় যাবেন তা জানার জন্য উতলা হয়ে ওঠে ভুরেলাল। তবে এটাও সে জানে নিজের সীমা ছাড়িয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই। সে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

রাকেশ এবার বলেন, 'আমি যেদিন এই বাংলো ছাড়ব তার আগেই তুই বাড়ি ফিরে যাবি।'

ভুরেলাল খুবই বিশ্বাসী এবং অনুগত। মাথা নিচু ক'রে মনিবের হুকুম তামিল করে যায় সে। আজ নিজের অজান্তেই বলে ওঠে, 'লেকেন—'

'কী?'

'আমি চলে গেলে আপনার খানা-উনা কে পাকাবে? ঘর সাফাই, কাপড়া ধোয়া—এ সব কে করবে? হুকুম হো যায় তো একটা কথা বলব।'

'কী কথা?'

'আমি বাড়ি ফিরব না।'

একটু অবাকই হ'ন রাকেশ। জিজ্ঞেস করেন, 'তা হ'লে কোথায় যাবি?'

ভুরেলাল আচমকা রাকেশের পায়ের কাছে বসে পড়ে। বলে, 'আপনি যেখানে যাবেন সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন।'

রাকেশ বিব্রত বোধ করেন। মনে মনে স্থির ক'রে ফেলেছেন আগেভাগে কাউকে না জানিয়ে তিনি দুধলিগঞ্জ ডাক বাংলায় গিয়ে উঠবেন কিন্তু সেখানে ক'দিন থাকা সম্ভব হবে কে জানে, তারপর কোথায় কীভাবে থাকতে হবে, সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুরেলালকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

রাকেশ বলেন, 'আমার সঙ্গে তোকে নিয়ে যাবার অসুবিধা আছে। তুই এখন বাড়ি যা। থাকার মতো একটা ব্যবস্থা করতে পারলে তোকে খবর দেবো, তখন চলে আসিস।'

ভুরেলাল খুঁতখুঁত করতে থাকে, 'আমি না থাকলে আপনার বহুত তখলিফ হবে।'

'তা তো জানি। কিন্তু তোকে এখন নিয়ে যাবার উপায় নেই।' অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভুরেলালকে বাড়ি ফিরে যেতে রাজি করান রাকেশ।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন রাকেশ, সেইসময় ভাগবত এবং রামলখন এলেন। এঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

দু'জনেরই বয়স সত্তরের কাছাকাছি, বেশির ভাগ চুল শাদা হয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে ভাগবতের চেহারা এখনও বেশ মজবুত। শিরদাঁড়া টান টান। চামড়া অবশ্য কিছুটা কুঁচকে গেছে। নিচের পাটির তিন চারটে দাঁত নেই। তবু চলায় ফেরায় বেশ একটা টগবগে ভাব। তুলনায় অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছেন রামলখন। পিঠ বেঁকে যাওয়ায় খানিকটা ঝুঁকে হাঁটেন, গাল তোবড়ানো,

স্বাস্থ্যও নড়বড়ে হয়ে গেছে। তবে একটা দাঁতও পড়ে নি। এই বয়সেও চোখের দৃষ্টি অটুট রয়েছে, এখনও চশমা ছাড়াই চলে যায়। অবশ্য তাঁর সঙ্গী ভাগবতের চোখে পুরনো আমলের নিকেলের ফ্রেমে পুরু বাইফোকাল লেন্স।

আলাপ-পরিচয়ের পর তাঁদের সসম্ভ্রমে বসালেন রাকেশ।

ভাগবত বলেন, 'কাল সকালে আমরা এসেছিলাম। তোমার কাজের লোক বলল, তুমি মণিহারি গেছ। কবে ফিরবে ঠিক নেই। তুমি ক'রে বলছি বলে কিছু মনে করলে না তো? বয়েসে অনেক ছোটই হবে।'

রাকেশ হেসে বলেন, 'না না, কিছু মনে করি নি। তুমি ক'রে নিশ্চয়ই বলবেন। কাল এখানে ফিরে এসে আপনাদের কথা ভুরেলালের কাছে শুনেছি।'

'ঐ লোকটির নাম বুঝি ভুরেলাল। তা সে বললে তুমি কবে ফিরবে তার নাকি কিছু ঠিক নেই। আমরা ঠিক করলাম, রোজ সকালে একবার ক'রে আসব। একদিন না একদিন দেখা হ'য়ে যাবে। আজই দেখা হ'য়ে গেল।'

ভুরেলালকে ডেকে ভাগবতদের জন্য চা আনতে বলেন রাকেশ।

'আভি লাতে হ্যায়।' ব'লেই ভুরেলাল রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে যায়।

এবার রাকেশ আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কি এই শহরেই থাকেন?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়েন রামলখন, 'পথরকুঁয়া গাঁয়ে আমাদের বাড়ি।'

'সে তো এখান থেকে পাঁচ ছ' মাইল দূরে।'

'হ্যাঁ। তা তো হবেই।'

'যদ্দূর জানি ওখানে বাস কি টাঙ্গা যায় না। সাইকেল রিকশা চলার মতো রাস্তাও নেই।'

'না, গাড়িটাড়ির বালাই নেই ওদিকে।'

'তা হ'লে?'

'তা হ'লে আর কি, মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই দু'জনে চলে এলাম।'

বিমূঢ়ের মতো রাকেশ প্রশ্ন করেন, 'কালও নিশ্চয়ই হেঁটে এসেছিলেন?'

হেসে হেসে রামলখন বলেন, 'হ্যাঁ। যদ্দিন তুমি না ফিরতে, রোজই আমাদের আসতে হ'ত। দেহাতী মানুষ তো, আমাদের রোজ পাঁচ দশ মাইল হাঁটার অভ্যেস আছে।'

রাকেশ অবাকই হ'য়ে যান। সত্তর বছরের দুই বৃদ্ধ পর পর দু'দিন পাঁচ ছ' মাইল পথ হেঁটে এসেছেন, দরকার হ'লে রোজই এভাবে আসতেন। রাকেশের পক্ষে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তেমন অভ্যাসই নেই। তিনি বলেন, 'আমার কাছে আপনাদের কোনো দরকার আছে?'

ভুরেলাল চা নিমকি এবং মুগের লাড্ডু দিয়ে যায়। খেতে খেতে ভাগবত বলেন, 'জরুরী তলব পেয়ে আমাদের ছুটে আসতে হয়েছে।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না। রাকেশ বলেন, 'কিসের তলব? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তোমার বাবা রাজেশ্বরজি টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার সঙ্গে যেন দেখা করি। চিঠিটা পেলাম পরশু বিকেলে। সেদিন আর আসি নি। কাল চলে এলাম, তারপর আজ।'

এবার মনে পড়ে যায়। রাজেশ্বর বলেছিলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে চিঠি লিখবেন। ইংরেজ আমলে এঁরা সবাই দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে লড়াই করেছেন, জেলের অন্ধকার সেলে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। বাবার সহযোদ্ধা এই অসীম সাহসী মানুষগুলি সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তিনি বলেন, 'বাবুজি কী লিখেছেন আপনাদের?' রাকেশের অবশ্য মোটামুটি ধারণা আছে রাজেশ্বর তাঁর সম্বন্ধে কী লিখতে পারেন, তবু প্রশ্নটা করলেন।

রামলখন বলেন, 'তার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিটা কি ছেড়ে দিয়েছ?'

'রেজিগনেসন লেটার লিখে রেখেছি, আজ কোর্টে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।'

'তোমার বাবুজি লিখেছেন, চাকরি ছাড়ার পর ধারাবনীতে গিয়ে ত্রিলোকী সিং আর গিরিবালা ঝা'দের সঙ্গে সত্যিকারের লড়াই শুরু করবে। তখন যেন তোমাকে সাহায্য করি।'

দ্বিধান্বিতভাবে রাকেশ বলেন, 'কিন্তু—'

ভাগবত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কী?'

'আপনাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এখন আর—'

হাত তুলে রাকেশকে থামিয়ে দিয়ে ভাগবত জানান, বয়স কোনো ব্যাপারই না। বৃটিশ আমলে দেশের জন্য যখন সংগ্রাম করেছেন তখন চোখের সামনে ছিল মহিমান্বিত শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ। কিন্তু স্বাধীনতার পর যে বাঞ্ছিত স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা দ্রুত বিলীন হ'য়ে যেতে লাগল। 'পোস্ট-ইণ্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট' অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী নতুন প্রজন্মের দেশপ্রেমিকরা সব কিছু দখল ক'রে বসল। দেশের জন্য এরা কখনও একটা দিন জেল খাটে নি, পুলিশের লাঠি বা বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেয় নি। এরা বোঝে শুধু পারমিট, ঘুষ, রিগিং ক'রে ক্ষমতা দখল, ব্ল্যাক মানি ইত্যাদি। আদর্শবাদ নামে বস্তুটাকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে এরা দেশের বাইরে বার ক'রে দিয়েছে। ফলে রাজেশ্বরের মতো ভাগবতরাও

নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। অখ্যাত নগণ্য গ্রামে চুপচাপ পড়ে থাকেন, গাছের চারা বুনে বনসৃজন করেন, গরিব কিষাণদের ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে পড়ান, কেউ বিপদে পড়লে ছুটে যান। এই সব পুরাকালের বৃদ্ধ দেশব্রতীদের যে একেবারে ভুলে যাওয়া হয় নি সেজন্য ঘটা ক'রে তাম্রপত্র এবং কিঞ্চিৎ পেনসান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কারণে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ এম. এল. এ বা এম. পি-দের সুপারিশ দরকার। বেশির ভাগ প্রাচীন দেশসেবকই এককালের সংগ্রামের দাম হিসেবে তা মেনে নিয়েছেন কিন্তু রাজেশ্বরের মতো আরো অনেক মানুষ এখনও মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বেঁচে আছেন। দেশের কাজ করেছেন, তার জন্য বখশিস নিতে রাজী হননি। ভাগবত এবং রামলখন সেই প্রজাতির মানুষ।

অখ্যাত গ্রামের ফসলদায়ী মাটিতে ফুলের চারা গাছের বীজ বুনে, আনপড় চাষীদের ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, রোগীর সেবা ক'রে দু'জনের বাকি জীবন নিঃশব্দে বিনা সমারোহে কেটে যেত। কিন্তু হঠাৎ রাজেশ্বরের টেলিগ্রাম তাঁদের ভেতর বহুকালের প্রাচীন যোদ্ধাকে যেন জাগিয়ে তুলেছে। সারা দেশ জুড়ে যেখানে ফেরেববাজি, স্বজনপোষণ, ভ্রষ্টাচার, স্বার্থপরতা এবং অন্ধকার সেখানে তাঁদের পুরনো সহকর্মী রাজেশ্বরের সন্তানের মধ্যে আগুনের একটি ফুলকি দেখতে পেয়েছেন তাঁরা। উদ্দীপ্ত ভাগবত এবং রামলখন তাই কালও এসেছিলেন, আজও ছুটে এসেছেন। জীবনের শেষ দিগন্তে পৌঁছেও তাঁরা একেবারে ফুরিয়ে যান নি। বহু সংগ্রামের সৈনিক নতুন যুদ্ধের দামামা শুনতে পেয়েছেন যেন।

ভাগবত বলেন, 'বেটা, আমাদের ধারণা হয়েছিল এই দেশের সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা একেবারে শেষ হ'য়ে যাই নি।' বলতে বলতে তাঁর গলার স্বরে গাঢ় আবেগ ভর করে।

রামলখন বলেন, 'তোমার রেজিগনেসন কবে নাগাদ অ্যাকসেপ্টেড হবে ব'লে মনে করছ?'

রাকেশ সময় সম্পর্কে একটা আন্দাজ দেন।

ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'ধারাবনীতে কবে যাচ্ছ?'

'রেজিগনেসন লেটারটা অ্যাকসেপ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে।'

একটু চিন্তা ক'রে রামলখন বলেন, 'আমরা মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব। তোমার সঙ্গেই আমরা ধারাবনী যেতে চাই।'

রাকেশ জানান, এত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ভুরেলালকে যা বলেছিলেন ভাগবতদেরও ঠিক তাই বলেন তিনি। ধারাবনীতে গিয়ে আগে একটা থাকার

জায়গার ব্যবস্থা করবেন, তারপর ভাগবতদের খবর দেবেন। তখন ওঁরা গেলেই চলবে।

ভাগবতরা এতে রাজী হ'ন না। বলেন, 'তুমি যখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলে তখন গিরিলাল ঝায়েরা কী ধরনের ব্যবহার করেছে, সেটা ভেবে দেখ।' এবার যখন ওখানে যাবে, তোমার হাতে কোনো সরকারি ক্ষমতা থাকবে না। গিরিলালেরা তোমাকে শেষ ক'রে দিতে চাইবে। এই অবস্থায় তোমার পাশে অনেক মানুষ থাকা দরকার। জনবল ছাড়া একটা পা-ও এগুতে পারবে না। মনে রেখ, ধারাবনীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো সময় তোমার বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

রাকেশ হাসেন, 'আমার জীবনরক্ষার জন্যে যেতে চাইছেন?'

কোনোরকম দ্বিধা না ক'রেই ভাগবত বলেন, 'তা বলতে পার? আমাদের দেশের ল্যাণ্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাটরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে না পারে এমন কাজ নেই। তার ওপর তাদের হাতে যদি পলিটিক্যাল পাওয়ার থাকে।'

রাকেশ অবাক হ'য়ে যান। ভাগবত বা রামলখনের মতো মানুষদের সম্পর্কে চিরদিনই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বিস্ময়টা যুক্ত হ'ল এই কারণে, একালের রাজনীতি আর ক্ষমতালিপ্সু ধান্দাবাজ লোকজনের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলেও দেশের যাবতীয় খবর তাঁরা রাখেন, তাঁদের দৃষ্টি খুবই পরিষ্কার। তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাগবতরা যে উদ্বিগ্ন, এ জন্য রাকেশ কৃতজ্ঞতা বোধ করেন। রাকেশ বলেন, 'আমার গায়ে খুব তাড়াতাড়ি ওরা হাত দেবে ব'লে মনে হয় না।'

ভাগবত এবং রামলখন প্রায় একই সঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'এদের বিশ্বাস নেই। যখন যা খুশি এরা ক'রে বসতে পারে। আমরা তোমার সঙ্গেই ধারাবনী যাব। পরে রাজেশ্বরজিও ধারাবনী আসবেন।'

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের কিছু একটা রাকেশের ভাবনার মধ্যে ঘটে যায়। ত্রিলোকী সিং এবং ভাগবত ঝা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনি। এই দু' জনেরই রয়েছে প্রচুর অর্থবল, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং মাসল পাওয়ার। যে কোনো মুহূর্তে তারা তাদের প্রতিপক্ষকে চুরমার ক'রে দিতে পারে। ছেলের ক্ষতি হবে, এই আশঙ্কাতেই কি রাজেশ্বর দুই পুরনো বিশ্বাসী বন্ধুকে রাকেশের পাহারাদার ক'রে ধারাবনী অঞ্চলে পাঠাতে চাইছেন এবং নিজেও আসবেন ব'লে স্থির করেছেন?

অবশ্য রাকেশও ভেবে রেখেছিলেন পুরনো স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দরকার হ'লে ডেকে নেবেন। রাজেশ্বরকে সে আভাসও দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বাপুজি যে এ ব্যাপারে এত দূর এগিয়েছেন, এটা ভাবা যায় নি।

যাই হোক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও ভাগবতদের ঠেকানো গেল না, তাঁরা

রাকেশের সঙ্গে যাবেনই। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হ'তে হয় রাকেশকে। ভাগবতরা জানান, এক সপ্তাহ পর থেকে মাঝে মাঝে এসে রাকেশ কবে ধারাবনী রওনা হবেন সেই তারিখটা জেনে যাবেন।

রাকেশ বলতে পারতেন, তাঁর পদত্যাগ-পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রামলখনদের জানিয়ে দেবেন, কবে ধারাবনী যাওয়া হবে। এক সপ্তাহ পর থেকে রোজ এত কষ্ট ক'রে হেঁটে এসে জেনে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সব এক বগ্‌গা লোকেদের ওসব ব'লে কোনো কাজ হবে না, একবার যা মাথায় ঢুকেছে সেটাই ক'রে ছাড়বেন। রাকেশ বলেন, 'ঠিক আছে, তাই আসবেন।'

ছাব্বিশ

ঠিক ষোল দিনের মাথায় সরকারের তরফ থেকে রাকেশের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণের খবর আসে। সেই সঙ্গে আলাদা ক'রে ডিস্ট্রিক্ট জজ হিমগিরিনন্দনের একটি চমৎকার চিঠি। তিনি লিখেছেন, রাকেশের সাহসিকতা এবং দেশ ও সমাজ সম্পর্কে গভীর দায়বদ্ধতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁদের মতো প্রবীণ মানুষ যাঁরা চিরকাল কেরিয়ার আর আইনের কূট নিয়ম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের নির্দিষ্ট ফ্রেমের বাইরে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি নিতে তাঁরা কোনোদিনই পারবেন না। রাকেশের সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে আগে থেকেই তিনি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। সেই শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় বহুগুণ বেড়ে গেল।

এখন দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এই সময়টা রাকেশ বাংলোর সামনের ব্যালকনিতে এসে বসেন। আজও বসে আছেন। হাতে হিমগিরির চিঠি।

এই মুহূর্তে পেছনের বাগান থেকে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ ভেসে আসছে। যে পাখিরা সকালে খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল, তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে। বাগানটা এখন তাদের চেঁচামেচি এবং ডানা ঝাপটানোর শব্দে সরগরম।

কিছুক্ষণ দূরমনস্কর মতো আকাশ, পাখি, দূরের গাছপালা দেখতে থাকেন রাকেশ। নিজেকে ভীষণ হালকা লাগছে তাঁর। কঠোর নিয়মের ফ্রেমে আটকানো জুডিসিয়ারির চাকরি থেকে মুক্ত হ'য়ে এবার তিনি জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে পা রাখতে চলেছেন। সেখানে রয়েছে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা। গিরিলাল এবং ত্রিলোকীদের সম্পর্কে তিনি কতদূর কী করতে পারবেন, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবু প্রবল উদ্দীপনা এবং আবেগে তিনি ভেতরে ভেতরে টগবগ করছেন।

রাকেশ স্থির ক'রে ফেলেন, ভুরেলালকে কালই মণিহারি পাঠিয়ে পরশু দুধলিগঞ্জ চলে যাবেন। ইচ্ছা করলে আরো কিছুদিন এই বাংলোয় থাকতে পারেন তিনি। কিন্তু চাকরি যখন ছেড়েই দিয়েছেন তখন আর এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না।

হঠাৎ রাকেশের চোখে পড়ে, রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় বসে লণ্ঠনের চিমনি মুছছে ভুরেলাল। তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন তিনি। তারপর ডাকেন, 'ভুরেলাল—'

ভুরেলাল ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।

রাকেশ বলেন, 'চিমনি মোছা হ'লে একবার এদিকে আসিস।'

'হাঁ।'

একটু পর ভুরেলাল কাছে এসে দাঁড়ায়। রাকেশ বলেন, 'আজ রাত্তিরেই মালপত্র সব গুছিয়ে ফেলবি। কাল তোকে মণিহারি ফিরে যেতে হবে।'

ভুরেলাল বলে, 'কালই?'

'হ্যাঁ।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ভুরেলাল, তার আগেই ভাগবত এবং রামলখন ব্যালকনির সামনে এসে দাঁড়ান। ইদানীং রোজই ওঁরা পাথরকুঁয়া গাঁ থেকে এখানে আসছেন।

ভুরেলাল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

রামলখনরা ভেতরে এসে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার রেজিগনেসন অ্যাকসেপ্টান্সের খবর এল?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, আজই এসেছে।'

'তা হ'লে তো ঝঞ্ঝাট মিটেই গেল। কবে ধারাবনী রওনা হচ্ছ?'

'পরশু।'

'হ্যাঁ। ওধারের কাজটা তাড়াতাড়িই শুরু করা দরকার। নইলে পরে আর সাক্ষীপ্রমাণ জোগাড় করা যাবে না। পরশু কখন যাবে?'

'দুপুর একটায় একটা বাস ছাড়ে। সেটাই ধরব। আমি ঠিক বারোটায় বাস টারমিনাসে পৌঁছে যাব।'

'পরশু আমরা চলে আসছি। সোজা বাস টারমিনাসে যাব, না এখানে আসব?'

রাকেশ ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছেন, আপত্তি করে লাভ হবে না। বলেন, 'বাস টারমিনাসেই তো শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। কষ্ট করে এখানে আর আসবেন না, সোজা ওখানেই চলে যাবেন।'

'সেই ভাল।'

এরপর চা খেয়ে একসময় উঠে পড়েন রামলখনরা।

সাতাশ

ভুরেলালকে মালপত্র গোছগাছ ক'রে ফেলতে বলেছিলেন রাকেশ। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজেও তার সঙ্গে হাত লাগান তিনি। একার সংসার হ'লে কী হবে, নানা জিনিসে বাংলোর ঘরগুলো ঠাসা। বেশির ভাগই বই। তা ছাড়া কিউরিওর প্রচণ্ড শখ রাকেশের। দামি দামি দুষ্প্রাপ্য সব জিনিস—ষোড়শ শতকের বাতিদান, গুপ্ত যুগের মুদ্রা, নবাবী আমলের কারুকাজ-করা পেতলের বাক্স, প্রাচীন শিলালিপি বা দেবমূর্তি, ইত্যাদি চারিদিকে ছড়ানো। বই এবং কিউরিও ছ'টা কাঠের পেটিতে ভরে ফেলেন রাকেশ। এগুলো ভুরেলালের সঙ্গে মণিহারিতে পাঠিয়ে দেবেন। অল্প কিছু জামা-কাপড়, শেভিং বক্স এবং দরকারি ক'টা জিনিস একটা বড়ো স্যুটকেশে গুছিয়ে নেন। আর হোল্ড-অলে বালিশ, কম্বল, বেড-কভার ইত্যাদি। এগুলো তাঁর সঙ্গে যাবে।

এখানকার যাবতীয় আসবাব গভর্নমেণ্টের। রাকেশ এস. ডি. ও'কে বাংলো ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি চলে গেলেই সরকারের লোকজন এসে বাংলোর দখল নেবে।

পরদিন ভুরেলালকে মণিহারি পাঠিয়ে দিলেন রাকেশ। তার পরদিন অর্থাৎ আজ স্যুটকেশ হোল্ড-অল একটা টাঙ্গায় চাপিয়ে তিনি যখন বাস টারমিনাসে পৌঁছুলেন, ঘড়িতে বারোটা বেজে সাত।

রাকেশের এই দু'দিনে কেন যেন আবছাভাবে মনে হয়েছিল, রামলখনরা যথেষ্ট জোর দিয়ে বলে গেলেও শেষ পর্যন্ত ধারাবনীতে না-ও যেতে পারেন। কিন্তু বাস টারমিনাসে টাঙ্গা থেকে নামতেই দেখা গেল দু'জনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের সঙ্গে টিনের স্যুটকেশ, বেতের ঝুড়িতে হেরিকেন, কেরোসিনের টিন, ছোটখাটো দরকারী নানা জিনিস এবং শতরঞ্জিতে-মোড়া বিছানা। দু'জনে উদ্‌গ্রীব রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রাকেশকে দেখে দ্রুত কাছে এগিয়ে আসেন।

রামলখন ফিতেয়-বাঁধা পকেট ঘড়ি বের করতে করতে বলেন, 'তোমার

কিন্তু বারোটায় আসার কথা ছিল। সাত মিনিট লেট ক'রে ফেলেছ। আমরা কিন্তু ঠিক সময়েই এসে দাঁড়িয়ে আছি।'

ছেলেবেলা থেকে রাজেশ্বরকে দেখে রাকেশ বুঝতে পেরেছেন এই সব মানুষ একেবারে অন্য ধাতের। রামলখন এবং ভাগবতরা তাঁর সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আন্দোলন করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, জেল খেটেছেন। স্বভাবের দিক থেকে তাঁরা হুবহু রাজেশ্বরের মতোই, আলাদা হবেন কেন? শৃঙ্খলা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা থেকে তাঁদের এক চুলও নড়ানো যাবে না। বারোটায় আসবেন বলেছেন, ঠিক বারোটাতেই চলে এসেছেন। বিব্রত মুখে রাকেশ অবশ্য একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। সরকারি বাংলো বরাবরের মতো ছেড়ে দিতে হ'ল ব'লে সব বুঝিয়ে আসতে অনেকটা সময় লেগে গেছে, তাই দেরি হ'য়ে গেল, ইত্যাদি।

রামলখন বলেন, 'ঠিক আছে, এখন টিকিট কেটে বাসে ওঠা যাক। দেরি করলে বসার জায়গা পাওয়া যাবে না।'

রাকেশ তিন জনের টিকিটই কাটতে চেয়েছিলেন কিন্তু রামলখনরা কিছুতেই কাটতে দিলেন না। সবাই নিজের নিজের টিকেটের দাম দিলেন।

রাকেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রামলখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বলেন, এটা রাকেশের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমস্ত দায়িত্বশীল সচেতন মানুষের কর্তব্য। ধারাবনী অঞ্চলে যে ভয়াবহ গণহত্যা ঘটে গেছে রামলখনরা তার প্রতিবাদ করতে চান। তাঁদের আন্তরিকতা কতটা, তা বোঝানোর জন্যই টিকিটের দাম দিয়েছেন। রাকেশকে দুঃখ দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁদের নেই। ভাগবতরা জানেন, ইদানীং রাজনৈতিক নেতারা পয়সা দিয়ে মিটিং মিছিলে লোক জড়ো করেন। মাথাপিছু পাঁচ-সাত টাকা আর ভরপেট 'ভোজন'। রাজনীতির এই সব 'তরিকা' তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর দেশ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে এ সবের হয়ত প্রয়োজন আছে কিন্তু রাজনীতিকে তাঁরা আজন্ম যে চেহারায় দেখে এসেছেন এবং আমৃত্যু দেখতে চান তার সঙ্গে এ সবের আদৌ কোনো মিল নেই। তাঁরা যা করবেন তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, ভেতরকার জোরালো তাগিদে। যেখানে নিজেদের ধ্যান-ধারণা বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে না, কোটি টাকা দিলেও সেখানে যাবেন না। ধারাবনীর গণহত্যা তাঁদের প্রবল নাড়া দিয়েছে ব'লেই যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে রাকেশের দায়িত্ব যতটা, দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে তাঁদেরও ঠিক ততটাই। এই কারণে তাঁরা রাকেশকে তাঁদের জন্য পয়সা খরচ করতে কেন দেবেন? এক বিরাট অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুই জেনারেসানের তিনটি মানুষ যুক্ত হয়েছেন, সেটাই আসল কথা।

টিকিট কাটার পর তিনজন বাসে উঠে স্যুটকেশ বিছানা-টিছানা সীটের তলায় গুছিয়ে রেখে বসে পড়েন।

এ অঞ্চলের কোনো কিছুই সময়ের ধার ধারে না। বাস ছাড়ার কথা ছিল কাঁটায় কাঁটায় একটায়। ছাড়তে ছাড়তে দুটো বাজিয়ে দিল। তার মধ্যে বাসটা মালপত্র এবং মানুষে বোঝাই হ'য়ে গেছে। ভেতরটা এমনই ঠাসা যে একটা ছুঁচও ঢোকানো যাবে না।

এই বাসটা দুধলিগঞ্জ ধারাবনীর পাশ দিয়ে সোজা পূর্ণিয়া স্টেশনে যাবে। বেশির ভাগ যাত্রীই পূর্ণিয়ার। রাস্তায় ক্বচিৎ দু-একজন নামে, ওঠে তার দশগুণ। ফলে বাসের মাথায়, পা-দানিতে, মাড-গার্ডে মানুষ ঝুলতে ঝুলতে চলেছে।

সন্ধের কিছু আগে দুধলিগঞ্জের কাছে হাইওয়ের ধারে রাকেশদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে যায়।

বাসে আসতে আসতে রাকেশ ঠিক করে ফেলেছিলেন, রাতটা দুধলিগঞ্জের পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় কাটিয়ে পরের দিন ভোরে বেরিয়ে পড়বেন। প্রথমে ধনুয়াদের খোঁজে জঙ্গলে যাবেন। এতদিন ওরা সেখানে আছে কিনা কে জানে। জঙ্গলে ওদের না পাওয়া গেলে সোজা ধারাবনীতে যেতে হবে।

রাকেশ লক্ষ করলেন, খানিক দূরে ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছের তলায় 'চায়কা দুকানে'র মালিক সেই মধ্যবয়সী লোকটা সবান্ধবে বসে জমিয়ে গল্প করছে। সেদিনকার মতো ওদের ডেকে মালপত্র পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পৌঁছে দিতে বলবেন কিনা যখন ভাবছেন, সেই সময় পেছন থেকে রামলখন বলেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে ? চল, যাওয়া যাক—'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতেই রাকেশ দেখতে পান, রামলখন এবং ভাগবত তাঁদের বাক্স-বিছানা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। মনে মনে রীতিমত লজ্জা পান রাকেশ। সত্তর বছরের দুই বৃদ্ধ নিজেদের মালপত্র নিজেরাই ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, আর তিনি কিনা কুলি ডাকার কথা ভাবছিলেন! অগত্যা নিজের স্যুটকেশ এবং ব্যাগ তুলে নিতে হয় রাকেশকে। তিনি জানেন, চা-ওলাকে দিয়ে রামলখনদের বাক্স-টাক্স পৌঁছে দিয়ে আসার কথা বললেও ওঁরা রাজী হবেন না।

ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা এখন কোথায় যাব ?'

রাকেশ পি. ডব্লু. ডি বাংলোর কথা বলেন।

ভাগবত বলেন, 'সোজা ধারাবনীতে চলে গেলে হ'ত না ?'

রাকেশ বুঝতে পারেন, ভাগবতরা ভেতরে ভেতরে অস্থির হ'য়ে আছেন।

তাঁদের ইচ্ছা, আজ থেকেই কাজ শুরু ক'রে দেবেন। বলেন, 'এতটা রাস্তা বাস জার্নি ক'রে এলেন। আজ রাতটা ভালো ক'রে রেস্ট নিন। কাল ধারাবনী যাবেন।'

ভাগবত আর আপত্তি করেন না। বলেন, 'ঠিক আছে। পি. ডব্লু. ডি বাংলোতেই তা হ'লে যাওয়া যাক।'

তিনজন হাইওয়ে পেছনে রেখে ডান দিকের 'কাচ্চী' বা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েন।

পি. ডব্লু. ডি বাংলায় ওঁরা যখন পৌঁছন, পশ্চিম আকাশের গায়ে শেষ বেলার লালচে রং কেউ যেন এলোপাথাড়ি ব্রাশ টেনে মাখিয়ে রেখেছে। সূর্যটাকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, ঘন গাছপালার ওধারে সেটা এখন উধাও।

আনুষ্ঠানিকভাবেই গরমকাল শুরু হ'য়ে গেছে। এখনকার দিনগুলো বেশ লম্বা। ফলে সূর্যাস্তের শেষ আভা আরো কিছুক্ষণ আকাশে লেগে থাকবে।

রাকেশরা গেটের কাছে আসতেই তাঁদের চোখে পড়ে, কেয়ার টেকার অবোধনারায়ণ সামনের বাগানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাতব্বরি চালে মালীদের কাজের তদারক করছে।

হঠাৎ গেটের দিকে মুখ ফেরাতে রাকেশদের দেখতে পায় অবোধনারায়ণ। প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। এই মুহূর্তে তার মুখচোখ দেখলে টের পাওয়া যাবে, যতটা অবাক সে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে ভয়। রাকেশ এখানে ফের আসতে পারেন, এটা সে আদৌ ভাবতে পারে নি। তার ভেতরে স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে কিছু একটা যেন ঘটে যায়। নিজের অজান্তে একরকম দৌড়েই গেটের কাছে চলে আসে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আপনি!'

আগাগোড়া অবোধনারায়ণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন রাকেশ। বেশ মজাই লাগছিল তাঁর। এই লোকটা স্টেট গভর্নমেণ্টের এমপ্লয়ী হ'য়েও ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা'কে মারাত্মক ভয় পায়। গিরিলালরা যে রাকেশকে একেবারেই পছন্দ করে না, সেটা সে অনেক আগেই টের পেয়ে গেছে। অথচ রাকেশকেও চটানো যায় না। প্রথমত তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, তার ওপর পি. ডব্লু. ডি'র ডেপুটি সেক্রেটারির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক'দিন আগেও অবোধনারায়ণের অবস্থা হয়েছিল রাজায় রাজায় যুদ্ধের মাঝখানে উলুখাগড়ার মতো। রাকেশ ক'দিন এখানে থাকার পর যে চলে গিয়েছিলেন তাতে সবচেয়ে খুশি হয়েছিল সে। কিন্তু আবার তাঁকে ফিরে আসতে দেখে হঠাৎ তার রক্তচাপ ভয়ানক বেড়ে গেছে।

রাকেশ গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'হ্যাঁ, জরুরী কাজে আসতে হল। আগেই আপনাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু সময় পাই নি।' ভাগবতদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন। দয়া করে আমাদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

ঢোক গিলে অবোধনারায়ণ বলে, 'আপনারা এখানে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো আসা।'

'লেকেন স্যার—'

'আবার কী ?'

'কাল সকালে পাটনা থেকে স্টেট গভর্নমেণ্টের একজন সেক্রেটারি কয়েকজনকে নিয়ে আসবেন। তাঁদের জন্য তিনটে কামরা 'বুক' করা আছে। এ ছাড়া আর কোনো কামরা খালি নেই।'

রাকেশ বলেন, 'আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমরা রাতটুকু শুধু থাকব। সকালেই এখান থেকে চলে যাব।'

অবোধনারায়ণ একেবারেই চায় না, রাকেশরা এই বাংলোয় থাকেন। কিন্তু রাত্তিরে তিনটে কামরা খালি থাকার কথা ব'লে ফেলার ফলে নিজের ফাঁদে নিজেই আটকে গেছে। সে বলে, 'কিন্তু স্যার—'

'আবার কী হ'ল ?'

'সেক্রেটারি তাঁর লোকজন নিয়ে কাল ভোরেই চলে আসবেন।'

'তাঁরা আসার আগে আমরা আপনার কামরা খালি ক'রে দেব। আমাদের জন্যে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।'

কড়া পাঁচন গেলার মতো মুখ ক'রে ঘোর অনিচ্ছায় শেষ পর্যন্ত অবোধনারায়ণকে বলতে হয়, 'আচ্ছা, আসুন স্যার।'

কেয়ার টেকারের সঙ্গে বাগান পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে বাংলোর লাউঞ্জে উঠে আসেন রাকেশরা। নিজের হাতেই ডান দিকের বড় কামরাটার দরজা খুলে দেয় অবোধনারায়ণ। রাকেশরা ভেতরে ঢুকলে সেও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমার অপরাধ নেবেন না স্যার। আপনি ভি. আই. পি, আবার সেক্রেটারি সাহেবও ভি. আই. পি। আমি কোন দিকে যে যাই !'

রাকেশ বুঝতে পারেন, তিনি যে রেজিগনেসন দিয়েছেন, সেটা অবোধনারায়ণ জানে না। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি তার পক্ষে জানা সম্ভবও না। পদত্যাগের কথাটা রাকেশ আর জানালেন না। কাল সকালে বাংলো ছেড়ে যাওয়ার সময় জানিয়ে দেবেন। সামান্য নির্দোষ একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে এখানে রাতটুকু

কাটিয়ে যাওয়া খুব একটা গর্হিত ব্যাপার নয়—এতে যখন কারো কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা হচ্ছে না। রাকেশ জানেন, তিনি সরকারি চাকরিতে নেই, এই খবরটা পাওয়া মাত্র অবোধনারায়ণের বশংবদ ভিজে বেড়াল-মার্কা চেহারা মুহূর্তে বদলে যাবে।

অবোধনারায়ণের কথার উত্তর না দিয়ে অল্প হাসেন রাকেশ।

অবোধনারায়ণ এবার জিজ্ঞেস করে, 'রাত্তিরে আপনাদের খাওয়ার কী ব্যবস্থা করব ?'

'বেশি কিছু করতে হবে না। চাপাটি, সবজি আর ডাল-টাল পেলেই চলে যাবে।'

'কখন ডিনার দেব স্যার ?'

'আটটা সাড়ে আটটার ভেতর। তখন খাবারের বিলটাও দিয়ে দেবেন।'

'ঠিক আছে স্যার।' ব'লেও অবোধনারায়ণ চলে যায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

রাকেশ সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি আর কিছু বলবেন ?'

ভাগবত এবং রামলখনকে দেখিয়ে অবোধনারায়ণ বলে, 'এঁদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না ?'

'এঁরা আমার বাবুজির বন্ধু।'

কী উদ্দেশ্যে দুই পিতৃবন্ধুকে সঙ্গে ক'রে হঠাৎ আবার রাকেশ এই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় এলেন তা জানার হয়ত ইচ্ছা ছিল অবোধনারায়ণের, তবে এ বিষয়ে সরাসরি কোনো প্রশ্ন করতে তার সাহস হয় না। একটু চিন্তা ক'রে সে এবার জিজ্ঞেস করে, 'শ্রীমতীজি তো এলেন না।'

কার কথা অবোধনারায়ণ বলছে, বুঝতে না পেরে রাকেশ বলেন, 'কে শ্রীমতীজি ?'

'ওহী কলকাত্তাকা পত্রকার। আপনি যার সঙ্গে সুবেহ্ উঠেই গাঁওয়ে গাঁওয়ে চলে যেতেন।'

অর্থাৎ দেবারতির কথা জানতে চাইছে অবোধনারায়ণ। ভেতরে ভেতরে ভীষণ বিরক্ত হ'ন রাকেশ। লোকটা ভেবেছে কি ? তিনি এলেই দেবারতিকে এখানে আসতে হবে ? নাকি তার কথার মধ্যে সূক্ষ্ম কোনো ইঙ্গিত রয়েছে ? দেবারতিকে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে অবোধনারায়ণ মনে মনে অর্থবহ কিছু কি খাড়া করে নিয়েছে ?

নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখে রাকেশ বলেন, 'আমি এলেই দেবারতিজিকে আসতে হবে নাকি? উনি সেবার ওঁর কাজে এসেছিলেন, আমি এসেছিলাম আমার দরকারে। এখানে দেখা হ'য়ে গিয়েছিল।'

বেশ দমে যায় অবোধনারায়ণ। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'হাঁ হাঁ, তাই তো। তা স্যার, এবার কি কোনো জরুরী কাজে এসেছেন?'

লোকটার কৌতূহল যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রাকেশের মনে পড়ে যায়, অবোধনারায়ণের সঙ্গে ত্রিলোকীদের গোপন যোগাযোগ রয়েছে। সে কি কৌশলে তাঁর কাছ থেকে খবর যোগাড় ক'রে ত্রিলোকীদের জানিয়ে দেবে? অত্যন্ত গম্ভীর মুখে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কী জন্যে এসেছি সেটা জানা কি খুব দরকার?'

রাকেশের কণ্ঠস্বরে এমন একটা শীতল কঠোরতা রয়েছে যে অবোধনারায়ণ ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। মিনমিনে গলায় 'না স্যার, না স্যার, এমনি জানতে চাইছিলাম। আচ্ছা স্যার, আমি এখন যাই, দরকার হলেই ডাকবেন। আমি এখনই চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—' বলতে বলতে একরকম দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এদিকে রামলখন এবং ভাগবত হাতমুখ ধুয়ে এসে সোফায় বসেছেন। রাকেশ তাঁর ব্যাগ থেকে তোয়ালে এবং সাবান টাবান বের ক'রে বাথরুমে চলে যান।

অবোধনারায়ণ রাকেশের গতিবিধি সম্পর্কে অতিরিক্ত কৌতূহল দেখালেও সরকারি গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার হিসেবে যথেষ্ট করিৎকর্মা। এখানকার সারভিস সম্পর্কে কারো অভিযোগ করার কিছু নেই। কাঁটায় কাঁটায় অবোধনারায়ণ রাকেশদের তিনজনকে কাছে বসিয়ে ডিনার খাইয়ে দিয়ে গেল।

ভোরে উঠতে হবে। তাই কেউ আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলেন না। সাড়ে ন'টার মধ্যেই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সারা গায়ে দীর্ঘ বাস জার্নির ক্লান্তি মাখানো ছিল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে রাকেশের চোখ বুজে আসতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে দেবারতিকে ফের মনে পড়ে যায়। কলকাতায় ফিরে গিয়েই চিঠি লিখবে বলেছিল দেবারতি কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনো চিঠি আসে নি। কলকাতার মতো বিশাল মেট্রোপলিসে ফিরে গিয়ে সে হয়ত বিহারের সুদূর অখ্যাত গ্রামে নিষ্ঠুর গণহত্যার সাক্ষী প্রমাণ যোগাড় করতে যে একরোখা জেদী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ধর্মযোদ্ধার মতো ঘুরে বেড়িয়েছিল সে কথা ভুলে গেছে। কিংবা মনে থাকলেও তাঁর স্মৃতি ঝাপসা

হয়ে গেছে। তবু দেবারতিকে খুব দরকার। যে বিশাল যুদ্ধে তিনি নেমে পড়েছেন সেখানে সাহসী নিরপেক্ষ প্রেসকেও সঙ্গে চাই। শুরুটা অবশ্য তিনিই করেছেন কিন্তু একা এত বড় যুদ্ধ জেতা যায় না। এর জন্য সৎ নিঃস্বার্থ বহু সহযোদ্ধাকেও পাশে প্রয়োজন। বিশেষ করে দেবারতিকে। রাকেশ চিঠি তো তাকে লিখেছেন। তবে আদৌ সে আর এখানে আসবে কিনা, কে জানে।

আটাশ

পরদিন রোদ ওঠার অনেক আগেই ঘুম ভেঙে যায় রাকেশের।

ঘরের সব জানালা খোলা ছিল। প্রথমেই বাইরে চোখ চলে যায়। বাগানের গাছপালা বা দূরের আকাশ কিছুই স্পষ্ট নয়। পাতলা জলো কালির মতো হালকা অন্ধকার সমস্ত চরাচরের ওপর আটকে আছে। তার ওপর জড়িয়ে রয়েছে ফিনফিনে মিহি কুয়াশার একটা পর্দা।

এখন পৃথিবীর কেউ বুঝিবা জেগে নেই। এমনকি বাগানের ওধারে উঁচু উঁচু গাছগাছালির মাথায় যে পাখিরা রাত কাটায় তাদেরও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকেন রাকেশ। তারপর ধীরে ধীরে পাশ ফিরতেই চোখে পড়ে ডান দিকের দেওয়ালের পাশের বিছানা দুটো খালি। ভাগবতরা কাল রাত্তিরে ওখানেই শুয়েছিলেন। এত ভোরে তাঁরা উঠে কোথায় গেলেন, কে জানে।

রাকেশ কিছুটা উদ্বেগই বোধ করেন। ওধারে বাথরুমের দরজাটা খোলা রয়েছে। সেখানেও ভাগবতদের দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে রাকেশ সোজা বাইরে চলে আসেন। লাউঞ্জে টান টান দাড়িয়ে, হাতজোড় ক'রে, পুব দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন ভাগবত এবং রামলখন। দু'জনেরই স্নান হ'য়ে গেছে। ডাকতে গিয়েও থমকে যান রাকেশ। মনে পড়ে রাজেশ্বরেরও এই একই অভ্যাস। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বারো মাস ভোরবেলায় উঠে স্নান সেরে এভাবেই দাঁড়িয়ে তিনি ভোরের সূর্যকে স্বাগত জানান।

রাকেশ আর ভাগবতদের ডাকেন না, ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে মুখ ধুয়ে স্নান সেরে নেন। তারপর পোশাক বদলে একটা সোফায় বসে ভাগবতদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর ভাগবতরা ঘরে ফিরে রাকেশকে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'বা, তুমি রেডি দেখছি। স্নানও সেরে ফেলেছ। সকালে ওঠার অভ্যেস আছে বুঝি?'

রাকেশ মৃদু হাসেন, 'আছে। তবে আপনাদের মতো অত ভোরে নয়।'

রামলখন বলেন, 'আমরা যখন উঠলাম, দেখি তুমি ঘুমোচ্ছ। তাই আর ডাকিনি। স্নান ক'রে বাইরে চলে গিয়েছিলাম। তা এবার বেরিয়ে পড়া যাক, না কি বল?'

'হ্যাঁ, এখনই বেরুব। রোদ চড়ে গেলে যেতে খুব কষ্ট হবে।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই অবোধনারায়ণ রেস্ট হাউসের সেই বেয়ারাকে—যার নাম লছমন—নিয়ে কামরার ভেতর চলে আসে। লছমনের হাতে প্রকাণ্ড ট্রে-তে তিনজনের মতো চায়ের সরঞ্জাম, টোস্ট, কলা এবং লাড্ডু। তা ছাড়া রয়েছে ব্রাউন পেপারের তিনটে বড়ো প্যাকেট।

প্যাকেট তিনটে দেখিয়ে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'এগুলোর ভেতর কী আছে?'

অবোধনারায়ণ বলে, 'ওগুলো লাঞ্চ প্যাকেট। কিছু শুকনো খাবার—পরটা, আলুর শুখা তরকারি আর প্যাঁড়া দিয়েছি। আপনারা যেখানে যাবেন সেখানে হয়ত হোটেল টোটেল পাবেন না। খুব তখলিফ হবে। তাই—'

কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থাকেন রাকেশ। তাঁরা যে ধারাবনীতে যাবেন সেটা বোধহয় আন্দাজ ক'রে নিয়েছে অবোধনারায়ণ। লোকটা যে অতীব ধুরন্ধর, তা টের পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না। এই লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে আসার মধ্যে সূক্ষ্ম যে চাতুরিটুকু রয়েছে তাতে রেগে ওঠার চেয়ে বেশি ক'রে মজাই পান রাকেশ। অবোধনারায়ণের সঙ্গে হঠাৎ একটু রগড় করার ইচ্ছা হয় তাঁর। বলেন, 'আমরা কোথায় যাব, আপনি কি জানেন?'

অবোধনারায়ণ ভীষণ দমে যায়। হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ ক'রে শশব্যস্তে বলে, 'নেহী স্যার, নেহী।'

'তা হ'লে কী ক'রে বুঝলেন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে হোটেল টোটেল কিছু নেই?'

অবোধনারায়ণ বার দুই ঢোক গিলে নিজেকে ধাতস্থ করে নেয়। তারপর বলে, 'এখানে যখন এসেছেন তখন ভাবলাম কাছাকাছি কোথাও যাবেন। তাই—' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'স্যারের যদি দরকার না হয় তা হ'লে ওগুলো রেখেই দেবো।'

লোকটার ধূর্তামিতে রাকেশ চমৎকৃত। তিনি যে ফাঁদই পাতুন, কিছুতেই তাতে পা দেবে না অবোধনারায়ণ। তাঁরা যে ধারাবনী যাচ্ছেন, সেটা যে

অবোধনারায়ণ ধরে ফেলেছে, কিছুতেই তাকে দিয়ে তা কবুল করানো যাবে না। রাকেশ এই নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। অযথা রোদের তাত বাড়তে দেওয়ার মানে হয় না। তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, যখন নিয়েই এসেছেন ঐ লাঞ্চ প্যাকেটগুলো আর ফেরত নিতে হবে না। কাল রাতে আপনাকে বিল দিতে বলেছিলাম। আনেন নি তো?'

'রাত্তিরে আর ডিসটার্ব করতে চাই নি। আজ নিয়ে এসেছি।' পকেট থেকে বিল বের ক'রে সবিনয়ে টেবলের একধারে রেখে দেয় অবোধনারায়ণ।

রাকেশ বলেন, 'আধ ঘণ্টা বাদে আসুন। আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিই।'

'আচ্ছা স্যার।'

অবোধনারায়ণ লছমনকে সঙ্গে ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, এবং ঠিক আধ ঘণ্টা পর ফিরে আসে।

ততক্ষণে ব্রেকফাস্ট শেষ হ'য়ে গেছে রাকেশদের। অবোধনারায়ণকে বিলের টাকা মিটিয়ে দিয়ে তাঁরা তিনজন মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

উনত্রিশ

পি. ডব্লু. ডি বাংলোর বাইরে এসে রামলখন জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা এখান থেকে প্রথমে কোথায় যাচ্ছি? প্লেস অফ অকারেন্সে, মানে ধারাবনীতেই কি?'

রাকেশ বলেন, 'না চাচাজি, আমরা আগে যাব সেই জঙ্গলটায়।'

ভাগবত বলেন, 'ও, যেখানে ধারাবনীর লোকজনেরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওরা কি এখনও সেখানে আছে?'

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়েন রাকেশ, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। জঙ্গলে গিয়ে যদি ওদের না পাই, তখন ধারাবনীতে যাওয়া যাবে।'

ভাগবত বলেন, 'সেই ভাল।'

পি. ডব্লু. ডি বাংলোর সামনে দিয়ে যে কাঁচা রাস্তা বা কাচ্চী গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সোজা পুব দিকে চলে গেছে সেটা ধরে তিন জন সোজা এগিয়ে যান।

এখন সাড়ে সাতটার মতো বাজে। এর মধ্যেই রোদের তাত বাড়তে শুরু

করেছে। তবে গরম কালের শুরুতে দক্ষিণ দিক থেকে উল্টোপাল্টা জোরালো হাওয়া বইতে থাকে এ অঞ্চলে। হাওয়ার কারণে রোদের তেজ ততটা বোঝা যায় না।

সুটকেশ টুটকেশ বইতে না হ'লে ফাঁকা নির্জন রাস্তায় হাঁটতে ভালই লাগত রাকেশের। এত লটবহর তাঁকে বেশ বিপাকেই ফেলে দিয়েছে। ভাগবতরা সঙ্গে না থাকলে লোক টোক জুটিয়ে মালপত্র তার কাঁধেই চাপিয়ে দিতেন।

চলতে চলতে চোখের কোণ দিয়ে মাঝে মাঝে ভাগবতদের লক্ষ করছিলেন রাকেশ। সত্তর-পেরুনো দু'টি মানুষ তাঁদের বাক্স-বিছানা কাঁধে তুলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পা ফেলে চলেছেন। মুখে বিরক্তি বা ক্লেশের চিহ্নমাত্র নেই। কাঁধের ওপর এতটা ওজন চাপানো রয়েছে তা তাঁদের দেখে বোঝা যায় না। যেন এভাবে চলতেই তাঁরা চিরকাল অভ্যস্ত।

ভাগবতদের দিকে তাকিয়ে কুলির কথা ভাবতে লজ্জা পান রাকেশ। এই সব মানুষের ধাতই আলাদা। এঁদের যত দেখা যায় ততই অবাক হ'তে হয়।

রামলখন একসময় বলেন, 'তোমার এখানকার কাজ কিভাবে শুরু করবে, কিছু ভেবেছ ?'

রাকেশ বলেন, 'না চাচাজি, কিছুই ঠিক করিনি। বেশ ক'টা দিন ধারাবনীর মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আগে ওখানে যাই। সব দেখেশুনে নিই। তা ছাড়া আপনারা সঙ্গে রয়েছেন। আপনাদের পরামর্শ আর অ্যাডভাইস মতো যা করার করব।'

'সেই ভাল।'

একটু চিন্তা করে রাকেশ এবার বলেন, 'গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিং, এই লোক দুটো খুব খারাপ। আমি যে রেজিগনেসান দিয়েছি সে খবর ওরা খুব সম্ভব পেয়ে গেছে। না পেলেও দু-চারদিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। তখন আমাদের সঙ্গে ওদের ব্যবহার কিরকম হবে, সেটাই ভাবছি।'

ভাগবত হাসেন। ওধার থেকে মজার গলায় বলেন, 'নিশ্চয়ই জামাই-আদর করবে না।'

ভাগবতের বলার ভঙ্গিতে রাকেশ এবং রামলখন হেসে ফেলেন। রামলখন বলেন, 'কতটা আর খারাপ ব্যবহার করবে ? শেষ পর্যন্ত হয়ত ওরা বন্দুকধারীদের লেলিয়ে দেবে।'

ভাগবত বলেন, 'অতটা সাহস কি ওদের হবে ? একবার জেনোসাইড করেছে। তা নিয়ে কিছুটা হ'লেও হৈ চৈ হয়েছে। তারপর একজন এক্স-ম্যাজিস্ট্রেট আর

দু'জন ফ্রিডম ফাইটারের গায়ে হাত তুলতে দশ বার ওদের ভাবতে হবে। দেশটা এখনও ততটা মগের মুল্লুক হ'য়ে ওঠে নি। তা ছাড়া—'

'কী?'

'ধরা যাক, এর জন্যে আমাদের প্রাণটাই গেল। জীবন তো একটাই। ভাল কাজে সেটা যদি যায় তো যাবে। আর কতদিন বাঁচব বল। দু'বছর, চার বছর, বড়ো জোর দশ বছর। পৃথিবীতে সত্তর বাহাত্তরটা বছর কাটিয়ে দিয়েছি। অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ানের চেয়ে অনেক বেশি তো বেঁচে থাকলাম। এখন মারা গেলেও আক্ষেপ থাকবে না।'

রামলখন গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলেন, 'ঠিক বলেছ।' ভেতরের আশ্চর্য এক উদ্দীপনায় তাঁর চোখ জলজল করতে থাকে।

সূর্য যখন প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে, সেই সময় রাকেশরা জঙ্গলের কাছে পোঁছে যান।

এখন চারিদিকে শানানো রোদ ছুরির মতো ঝলকে যাচ্ছে। সেদিকে তাকানো যায় না। তপ্ত লু-বাতাস চরাচরের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

রাকেশের সমস্ত শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে। গেঞ্জি এবং ট্রাউজারের তলায় স্রোত বইছে যেন। এমনকি প্রতিটি চুলের গোড়া থেকে বিন বিন ক'রে ঘামের দানা বেরিয়ে আসছে। এতটা রাস্তা স্যুটকেশ টুটকেশ টেনে এনে মনে হচ্ছে হাত দুটো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে পড়বে।

অনেক আগেই রাকেশ হুড়মুড় ক'রে মাটিতে পড়ে যেতেন। কিন্তু সত্তর বছরের দুই বৃদ্ধ ঝলসানো আকাশের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘামে ভিজে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের চোখমুখ দেখে মনেই হয় না তাঁরা এতটুকু ক্লান্ত। খুব সম্ভব এখনও এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ভাগবতরা আরো পঞ্চাশ মাইল হেঁটে যেতে পারেন। এই মানুষ দু'টিই রাকেশের ভেতরকার প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে উসকে দিয়ে এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছেন, তাঁকে ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে পড়তে দেন নি। নিজেদের অদম্য এনার্জির খানিকটা রাকেশের মধ্যেও ওঁরা চারিয়ে দিতে পেরেছেন।

স্যুটকেশ এবং ব্যাগ নামিয়ে রেখে জোরে বার কয়েক শ্বাস নেন রাকেশ। খানিকটা ভাপে-ভরা বাতাস তাঁর ফুসফুসে সরাসরি ঢুকে যায়। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেন তিনি কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না।

বারকয়েক চেষ্টার পর কণ্ঠস্বর বাইরে বের ক'রে আনতে পারেন রাকেশ। বলেন, 'আমরা পোঁছে গেছি।'

রাকেশের দেখাদেখি ভাগবত এবং রামলখন তাঁদের বাক্স-বিছানা মাটিতে নামিয়ে রেখেছিলেন। ভাগবত বলেন, 'তা হ'লে ধারাবনীর লোকজনদের ডাকো। ওদের নামটাম জানো তো?'

রাকেশ বলেন, 'জানি। কিন্তু এখান থেকে ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না—অবশ্য যদি ওরা জঙ্গলে এখানে থাকে।'

'শুনতে পাবে না কেন?'

'ওরা জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে রয়েছে।'

'তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চল।'

ফের তিনজন মালপত্র তুলে নেন। রাকেশ প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে তাঁর দুই সঙ্গীকে চাপ-বাঁধা ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেন। যেখান দিয়ে আনোখি প্রথম দিন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল, এটা সেই রাস্তা নয়। অসহ্য রোদে এবং শ্রান্তিতে সেদিনের রাস্তাটা তিনি খুঁজে বের করতে পারেন নি। আসলে সেই রাস্তাটার মুখে তেমন গাছপালা ছিল না। চারপাশ বেশ ফাঁকা ফাঁকা। কিন্তু এখন রাকেশরা যেখান দিয়ে যাচ্ছেন সেখানে প্রচুর গাছগাছালি থাকার কারণে চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন। রোদের ধারালো ফলা গায়ে লাগছে না। ঘন ছায়ার জন্য ঠাণ্ডায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকটা এলোমেলো হাঁটার পর শেষ পর্যন্ত রাকেশ তাঁর চেনা সেই মজা নহরটার কাছে পৌঁছে যান। সেটার দুই পাড়ে পঁচিশ তিরিশটা বাঁশের চালা তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। ধারাবনী থেকে পালিয়ে এসে আনোখিরা ওগুলো বানিয়ে নিয়েছিল।

দুপুর এখানে ঝাঁ ঝাঁ করছে। যেদিকেই তাকানো যাক, কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। গাঢ় গভীর স্তব্ধতা এই বনভূমির ওপর অনড় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো জনমনুষ্য এখানে বা ধারেকাছে কোথাও আছে ব'লে মনে হয় না। জ্বলন্ত আকাশের নিচে বিক্ষিপ্ত চালাগুলো এক অলীক উপনিবেশ বলে মনে হয়। কারা কবে যেন এগুলো খাড়া ক'রে কিছুকাল থাকার পর কোন নিরুদ্দেশে উধাও হয়ে গেছে। তাদের বসবাসের সামান্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখানে ওখানে পড়ে আছে শুধু।

ভাগবত বলেন, 'লোকজন কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ নেই নাকি?'

রাকেশ বলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তবু একবার ডেকে দেখি।' সুটকেশ ব্যাগ নামিয়ে রেখে গলার স্বর উঁচুতে তুলে জোরে ডাকতে থাকেন রাকেশ, 'এ আনোখি, ধনুয়া,—কোই হ্যায়?'

জমাট নিস্তব্ধতাকে করাতের মতো চিরে দিয়ে ক'টা ভুষো কাক সামনের অর্জুন গাছের মাথায় বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। তারা মানুষের গলা শুনে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়।

ভাগবত বলেন, 'মনে হচ্ছে কেউ নেই। এখান থেকে সবাই চলে গেছে। আমরা বরং খানিকক্ষণ জিরিয়ে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে ধারাবনীতেই চলে যাই।'

রাকেশ বলেন, 'আমি আরেক বার চেষ্টা করে দেখি।' বলে গলা আরো চড়িয়ে ডাকতে থাকেন, 'ধনুয়া ধনুয়া, আনোখি—'

এবার একটা চালা থেকে মেয়েমানুষের ভীরু গলা ভেসে আসে, 'ও লোগ নহীঁ হ্যায়।'

যাক, জায়গাটা একেবারে জনশূন্য নয়। রাকেশ লক্ষ করলেন, ধনুয়া যে চালাটায় থাকত, কণ্ঠস্বর সেখান থেকে আসছে।

উৎসুক মুখে ওধার থেকে রামলখন বলেন, 'আছে আছে, মানুষ আছে।'

রাকেশ ব্যস্তভাবে বলেন, 'আপনারা এখানে গাছের ছায়ায় বসুন। আমি মেয়েলোকটির সঙ্গে কথা ব'লে আসি।' ভাগবতদের একটা ঝাঁকড়া পিপর গাছের তলায় রেখে তিনি মজা নহরের ধার-ঘেঁষা শেষ চালাটার সামনে এসে দাঁড়ান। বলেন, 'তুম কৌন ?'

মেয়েমানুষটি বাইরে আসে না, চালার ভেতর থেকেই উত্তর দেয়, 'কুঁদরী।'

নামটা রাকেশের অজানা নয়। আগের বার যখন এখানে এসেছিলেন, আনোখির মুখে শুনেছিলেন। কুঁদরী ধনুয়ার ঘরবালী বা স্ত্রী। গিরিলালদের ভূমিসেনা এবং পহেলবানেরা তার ইজ্জৎ 'লুটে' নিয়ে তার রক্তাক্ত বিধ্বস্ত শরীরটা ফাঁকা মাঠে ফেলে চলে যায়। সেবার কুঁদরীকে দেখেন নি রাকেশ, দেখা সম্ভবও ছিল না। তখনও সে পুরোপুরি বেহুঁশ, তার বাঁচার আশা কেউ করে নি। যাক, মেয়েটা যে মারা যায় নি, এতে খুশি হলেন রাকেশ।

কুঁদরী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি জরুর ম্যাজিস্টর সাহিব ?'

রাকেশ রীতিমত অবাক হ'য়ে যান। বলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কী ক'রে ? আগে কখনও দেখেছ কি ?'

'নহীঁ। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আপনি আর দুই বুড্ঢা বাবা পিপর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। আমার মরদ বলেছিল, আর কেউ এখানে না আসুক, আপনি জরুর আসবেন।'

রাকেশ অভিভূত হয়ে যান। ধনুয়াকে কোনোরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান নি তবু তাঁর প্রতি তার গভীর বিশ্বাস। তার ধারণা, একদিন না একদিন তিনি

তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। শুধু মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করবেন না। এমন ধারণা ধনুয়ার কেন হয়েছে, সে-ই জানে।

পদত্যাগ করলেও পরশু পর্যন্ত তিনি ছিলেন জুডিসিয়ারিতে। বেশ কয়েকটা বছর তাঁর সেখানেই কেটে গেল। বিচারকদের কোনো কারণেই উচ্ছ্বসিত বা আপ্লুত হ'তে নেই। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁরা দেখে থাকেন নিরাসক্ত চোখে। কিন্তু ধনুয়ার মতো গেঁয়ো অশিক্ষিত একটি মানুষের বিশ্বাস তাঁর বুকের ভেতরকার কোনো অদৃশ্য তারে যেন আঙুল ছুঁইয়ে দিয়েছে।

কুঁদরী এবার বলে, 'মেমসাহিব নহীঁ আয়ী?'

রাকেশ বুঝতে পারেন, দেবারতির কথা বলছে কুঁদরী। একটু অবাক হয়েই বলেন, 'তুমি কি মেমসাহেবকে দেখেছ?' প্রশ্নটা ক'রেই খেয়াল হয়, তাঁর মতোই দেবারতিকে দেখা কুঁদরীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার বেহুঁশ অবস্থায় তারা দু'জন এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

কুঁদরী বলে, 'আমার মরদের কাছে শুনেছি।'

'মেমসাহেব কলকাতায় থাকেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি। মনে হয়, শিগগিরই চলে আসবেন।'

একটু চুপ।

তারপর রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাকে ছাড়া এই জঙ্গলে আর কাউকেই তো দেখছি না। বাকি সবাই গেল কোথায়?'

কুঁদরী এবার যা বলে তা এইরকম। রাকেশরা এখান থেকে চলে যাবার তিন চার দিন পর গিরিলাল এবং ত্রিলোকীর লোকজন এসে ধারাবনীর গাঁওবালাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে জঙ্গল থেকে ফের গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তারা লাঠি বন্দুক কিছুই আনে নি। এনেছিল প্রচুর পুরি হালুয়া লাড্ডু ইত্যাদি উৎকৃষ্ট সব সুখাদ্য। আর এনেছিল মাথাপিছু দু সের ক'রে আটা, ডাল, সবজি, নিমক, মিরচা, আনাজ এবং মশলাপাতি। সবার সঙ্গে তারা চমৎকার ব্যবহার করেছে। বলেছে, যা হওয়ার তা তো হ'য়েই গেছে। যারা মারা গেছে তাদের আর বাঁচানো যাবে না। এতগুলো মানুষের মৃত্যু নিশ্চয়ই 'বহুত দুখকা বাত'। তবু এ কথা মনে রাখতে হবে, মানুষ অমর নয়, মৃত্যু তাদের ঘটতই। যেভাবে তারা মারা গেছে সেটা অবশ্য খুবই আক্ষেপের। কিন্তু পুরনো দুঃখের স্মৃতি আঁকড়ে জঙ্গলে পড়ে থাকা কাজের কথা নয়। তাদের সংসার আছে, রোজগারপাতি করতে হবে, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। গাঁ ছেড়ে এখানে পড়ে থাকলে কিভাবে তাদের পেটের দানা জুটবে? কোথায় পাবে পয়সাকড়ি?

রাগের মাথায় উত্তেজনার ঝোঁকে ভূমিসেনারা একটা খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছে। গিরিলালজিরা যতটা পারেন তার ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবেন। যে সব বাড়িঘর পুড়ে গেছে সেগুলো ফের নতুন করে বানিয়ে দেওয়া হবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, বংশ পরম্পরায় গিরিলালদের সঙ্গে ধারাবনী বইহারির মানুষ জনের সম্পর্ক। গিরিলালদের যেমন তাদের ছাড়া চলবে না তেমনি তাদেরও গিরিলালদের ছাড়া চলতে পারে না। কাজেই দু পক্ষের স্বার্থেই যা হ'য়ে গেছে তা ভুলে যাওয়া একান্ত জরুরি। গিরিলালদের জমি তাদের চষতে হবে। যদি তারা চাষবাস না করে, জমি থেকেও গিরিলালদের ফায়দা নেই।

প্রথমটা কেউ ধারাবনীতে ফিরে যেতে রাজী হয় নি। যারা ক'দিন আগে পহেলবান এবং ভূমিসেনা লেলিয়ে দিয়েছে তাদের এই সব ভালো ভালো কথার কী দাম? খুন জখম এবং গাঁ জ্বালানোর স্মৃতি তাঁদের মনে তখনও এত টাটকা যে গিরিলালদের লোকজনকে বিশ্বাস করতে পারে নি। ঘৃণা আতঙ্ক এবং ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে তাদের কথা শুধু চুপচাপ শুনে গেছে। তারা বুঝতে পারছিল না এটা কোনো চোরা ফাঁদ কিনা। লোভ দেখিয়ে, অনুশোচনার কথা ব'লে গ্রামে টেনে নিয়ে যাবার পর নতুন কোনো বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে কিনা গিরিলালেরা, সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। বার বার এসে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা ধারাবনীর গাঁওবালাদের বিশ্বাস খানিকটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল।

সবাই জঙ্গল ছেড়ে চলে গেলেও কুঁদরী, আনোখি আর ধনুয়া ফিরে যায় নি। তাদের অবিশ্বাস কিছুতেই কাটছে না। যে ক্ষতি ত্রিলোকী আর গিরিলালের লোকেরা করেছে তা আদৌ পূরণ হওয়ার নয়। গিরিলালদের সম্পর্কে তাদের মনে যে চিরস্থায়ী ঘৃণা এবং আতঙ্ক জমা হয়েছে তা কোনো দিনই মুছে যাবে ব'লে মনে হয় না।

প্রায় এক দমে কথাগুলো বলে কুঁদরী থামে।

অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিলেন রাকেশ। এই তো ক'দিন আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। এর ভেতর এত সব ব্যাপার ঘটে গেছে, এ যেন ভাবা যায় না।

গিরিলাল এবং ত্রিলোকী যে কতটা ধুরন্ধর তা এই ঘটনায় নতুন ক'রে টের পাওয়া যাচ্ছে। গণহত্যা, ধর্ষণ এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবার পর তারা এখন তোষামোদের পথ ধরেছে। হয়ত বুঝতে পেরেছে, রাকেশ সহজে তাদের ছেড়ে দেবেন না, তিনি এখানে ফিরে আসবেনই। তখন ধারাবনীর লোকজন যাতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বড় রকমের হাঙ্গামা না বাধাতে পারে সে জন্য আগে থেকেই

তাদের ঘৃণা এবং আক্রোশ যতটা কমিয়ে ফেলা যায় তার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। গিরিলালদের চাতুরি আর দূরদর্শিতা তারিফ করার মতো।

রাকেশ ভেতরে ভেতরে বেশ দমে যান। তিনি যে উদ্দেশে চাকরি ছেড়ে এখানে ছুটে এসেছেন তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি ধারাবনীর মানুষের সাহায্য না পান। এরা যখন চাল-আটা-সব্জি এবং সামান্য ক'টা টাকার জন্য গিরিলালদের ফাঁদে পা দিয়েই ফেলেছে তখন কিছু কি আর করা সম্ভব হবে?

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রাকেশ। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়, সবাই চলে গেলেও তিনটি মানুষকে টলানো যায় নি। তারা এই জঙ্গলের মাটি কামড়ে তাঁরই আশায় পড়ে আছে। নাঃ, পুরোপুরি হতাশ হওয়ার কারণ নেই।

রাকেশের মধ্যে নতুন ক'রে উদ্যম ফিরে আসে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাকেই শুধু দেখছি। ধনুয়া আর আনোখি কোথায়?'

'ওরা নৌপুরার হাটিয়ায় (হাটে) গেছে।'

নৌপুরার নামটা প্রথম শুনলেন রাকেশ। সেটা যে কোথায় সে সম্পর্কে তাঁর আদৌ কোনো ধারণা নেই। বলেন, 'নৌপুরা এখান থেকে কত দূরে?'

কুঁদরী অনিশ্চিতভাবে বলে, 'হোগা, পাঁচ সাত 'মিল' (মাইল)।'

'কখন ফিরবে?'

'সন্ধের আগে আগে।'

'হাটে কি জিনিসপত্তর কিনতে গেছে।'

'নহী ।'

'তবে?'

'ওখানে হাটিয়াওলাদের সামান (মালপত্র) ব'য়ে কামাই করতে। পাইসা না হ'লে চলবে কী করে?'

ধনুয়াদের হাটে যাওয়ার কারণটা এবার স্পষ্ট হ'য়ে যায়। গ্রামে তারা ফিরে যায় নি। গিরিলালদের অনুগ্রহ নিতে তারা রাজী নয়। অথচ রোজগার না করলে পেটের দানা জুটবে কিভাবে? তাই হাটে গিয়ে কুলীর কাজ করছে। রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'রোজই ওরা হাটে যায়?'

'হাঁ।' কুঁদরী বলতে থাকে, 'সুবেহ্ ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়ে। সুরয ডোবার সময় ফিরে আসে।'

'এতটা সময় তুমি একা একা জঙ্গলে কাটাও?'

'কা করে? আমাকে পাহারা দেবার জন্যে মরদ যদি ঘরে বসে থাকে, কামাই বন্ধ হ'য়ে যাবে। কামাই বন্ধ হ'লে ভুখা মরব।'

রাকেশ এমনিতে শান্ত চুপচাপ ধরনের মানুষ, খুবই স্বল্পভাষী। কিন্তু অসহ্য গনগনে রোদের ভেতর এতটা রাস্তা হেঁটে আসার পর এখানে কুঁদরীকে পেয়ে তাঁর কথা বলতে ভাল লাগছে। জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি যে সারাদিন একা থাকো, ভয় করে না ?'

কুঁদরী বলে, 'পয়লা পয়লা দু-একদিন করত। এখন আর করে না।'

একটু চিন্তা ক'রে রাকেশ এবার বলেন, 'তোমার খাওয়া হ'য়ে গেছে ?'

বেশ অবাক হয়ে যায় কুঁদরী। বলে, 'খাওয়ার কথা জানতে চাইছেন কেন সাহিব ?'

'আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার আছে। তুমি কিছু নাও।'

একটু চুপ ক'রে থাকে কুঁদরী। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে জানায়, কাল রাত্তিরে লিট্টি বানিয়েছিল। খাওয়ার পর কয়েকটা বেঁচে গিয়েছিল। আজ সকালে ধনুয়া গোটা চারেক খেয়ে নৌপুরায় গেছে। বাকি চারটে কুঁদরী খেয়েছে। ধনুয়া ফিরে এলে সন্ধেবেলায় চাপাটি আর ভাজি ক'রে নেবে। রাতে খেলেই চলবে। এখন তার কিছু দরকার নেই।

রাকেশ সস্নেহে বলেন, 'রাত হ'তে অনেক দেরি। এখন এগুলো নাও তো।' স্যুটকেশ থেকে পরোটা তরকারি এবং শুকনো লাড্ডু বের ক'রে এনে কুঁদরীদের চালার দিকে এগিয়ে যান তিনি।

কুঁদরী আর আপত্তি করে না। বাঁশের ঝাঁপ খুলে বাইরে এসে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়ায়।

মেয়েটার বয়স খুব বেশি হলে আঠার-উনিশ। মাজা কাঁসার মতো গায়ের রং। টান টান চেহারা। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন রাকেশ। কুঁদরীর কপালে গালে থুতনিতে এবং গলার কাছে অনেকগুলো জায়গায় চামড়া উঠে ঘা হ'য়ে আছে। দু-একটা শুকিয়ে এলেও, বেশির ভাগ এখনও দগদগে। এগুলো যে গিরিলালদের পহেলবানদের কীর্তি, বুঝতে অসুবিধা হয় না। কামড়ে খামচে মেয়েটাকে প্রায় শেষ ক'রে দিয়েছে জন্তুর দল।

মেয়েটার জন্য বুকের ভেতর চাপা কষ্ট হ'তে থাকে রাকেশের। সেই সঙ্গে গভীর সহানুভূতিতে মন ভরে যায়।

বেশিক্ষণ কুঁদরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দ্রুত তার হাতে খাবার দিয়ে রাকেশ বলেন, 'তুমি ঘরে যাও। আমি গাছের তলায় যাচ্ছি।'

কুঁদরী তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢোকে না। দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'আপনি কি এখনই চলে যাবেন ম্যাজিস্টর সাহিব ?'

তার মনোভাব বুঝতে পারেন রাকেশ। বলেন, 'না। ধনুয়ারা না ফেরা পর্যন্ত এখানে থাকব।' বলে আস্তে আস্তে ভাগবতদের কাছে চলে যান।

ত্রিশ

সন্ধের আগে আগে পশ্চিম দিগন্তে টকটকে লাল রং ছড়িয়ে সূর্য যখন ডুবে যাচ্ছে সেই সময় ধনুয়া আর আনোখি জঙ্গলে ফিরে আসে। দূর থেকে মজা নহরের পাড়ে পিপর গাছের তলায় রাকেশদের দেখে প্রথমটা তারা অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কাছে চলে আসে। তাদের চোখে মুখে যতটা বিস্ময় তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি আর উত্তেজনা। দৌড়ে আসার কারণে দু'জনেই হাঁপাচ্ছিল।

জোরে শ্বাস টানতে টানতে ধনুয়া বলে, 'কখন এসেছেন ম্যাজিস্টর সাহিব ?'

রাকেশ বলেন, 'সেই দুপুরবেলা। তখন থেকে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আমরা হাটিয়ায় গিয়েছিলাম।'

'জানি। কুঁদরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

আনোখি বলে, 'তা-ই হবে। না হ'লে জানবেন কী ক'রে যে আমরা এখানে পড়ে আছি।' তারপর ভাগবতদের দেখিয়ে বলে, 'এঁদের চিনতে পারলাম না ম্যাজিস্টর সাহিব। আগের বার আপনার সঙ্গে দেখি নি।'

রাকেশ বলেন, 'তখন ওঁরা আসেন নি।'

আনোখিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। তাদের বসতে ব'লে ভাগবতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন রাকেশ। দেশকে স্বাধীন করার জন্য এঁরা যে সমস্ত জীবন যুদ্ধ করেছেন, ইংরেজদের আমলে বছরের পর বছর জেল খেটেছেন, এর ওপর বিশেষ ক'রে জোর দেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামী ব্যাপারটা তেমনভাবে মাথায় ঢোকে না ধনুয়াদের। তবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন এত সম্মান দিচ্ছেন তখন এঁরা খুবই 'বড়ে আদমী' হবেন ব'লেই তাদের ধারণা। ধনুয়ারা মাথা ঝুঁকিয়ে হাতজোড় ক'রে সসম্ভ্রম বলে, 'নমস্তে।'

ভাগবতরাও প্রতি-নমস্কার জানান।

এবার রাকেশের দিকে ফিরে ধনুয়া বলে, 'আমি জানতাম আপনি আর মেম-সাহিব আবার এখানে আসবেন। দু'জন না এলেও একজন তো এসেছেন।'

এ সব কথা আগেই কুঁদরীর সঙ্গে হয়ে গেছে। কেন দেবারতি তাঁর সঙ্গে আসতে পারে নি, সেটা জানিয়ে দেন রাকেশ।

ধনুয়া বলে, 'কুঁদরীর সঙ্গে আপনার জান-পয়চান হ'য়ে গেছে তা হলে! সেবার তো ঝোপড়ির ভেতর থেকে বাইরে আনা যায়নি।'

এবার কিভাবে আলাপ হয়েছে তা বললেন রাকেশ। কুঁদরী জড়সড় হয়ে চুপ-চাপ ঝুপড়িতে বসে থাকলে তাঁরা জঙ্গলে ধনুয়াদের আশায় বসে থাকতেন না, সোজা ধারাবনীতে চলে যেতেন।

ধনুয়া অল্প হাসে। বলে, 'কুঁদরী যে বুদ্ধি ক'রে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে তাতে ভালই হ'ল। নইলে আপনাদের সঙ্গে কিভাবে দেখা হ'ত ভগোয়ান জানে।'

রাকেশ বলেন, 'দেখা আমাদের হ'তই। ধারাবনীতে গেলে তোমার খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম। আরেক বার আমাদের জঙ্গলে আসতে হ'ত, এই আর কি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ধনুয়া বলে, 'আপনারা চলে যাওয়ার পর এখানে কী হয়েছে জানেন? গিরিলাল ঝা আর—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রাকেশ বলেন, 'আমি সব জানি। কুঁদরী আমাকে বলেছে।' একটু ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'সবাই ধারাবনীতে চলে গেল। গিরিলাল আর ত্রিলোকীর লোকেরা তোমাদের যেতে বলে নি?' যেতে যে বলেছে সেটা ভাল ক'রেই জানেন রাকেশ। তবু প্রশ্নটা যে করলেন তার কারণ ধনুয়াদের মুখ থেকে সরাসরি তিনি তাদের উদ্দেশ্যটা জানতে চান।

ধনুয়া বলে, 'যেতে আবার বলে নি! সবার চেয়ে বেশি গেহুঁ, রুপাইয়া আর চাউর আমাদের দিতে চেয়েছিল।'

'তা হ'লে গেলে না কেন?'

এবার ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ধনুয়া, 'ম্যাজিস্টর সাহিব আমাদের গায়ে মানুষের খুন আছে। আমরা রাস্তার কুত্তা না, গাড্ডার চুহা না—আদমী। আমাদের ঘরবালীর ইজ্জৎ নিল, গাঁও জ্বালিয়ে দিল, পুরুখদের বুকে গুলি চালিয়ে খতম করল, এখন তিন চার সের গেহুঁ আর পাঁচ দশগো রুপাইয়া দিতে এসেছে! আমাদের আওরতদের ইজ্জৎ আর আমাদের জানের দাম এত কম! ভেবেছে কী ভূচ্চরের ছৌয়ারা?'

রাকেশ বুঝতে পারছিলেন, এই ছেলেটার অপমান বোধ অত্যন্ত তীব্র। তার মধ্যে টাটকা আগুন রয়েছে। এই আগুন যদি ধারাবনীর অন্য সবার মধ্যে থাকত! ধনুয়া সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

হঠাৎ রাকেশের চোখে পড়ে ভাগবত এবং রামলখন পলকহীন ধনুয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। অচ্ছুৎ আনপড় এক যুবকের এই সাহস, দৃঢ়তা এবং মানসম্মান-বোধ তাঁদের অবাক ক'রে দেয়।

রাকেশ ধনুয়াকে বাজিয়ে নেবার জন্য বলেন, 'তোমরা তোমাদের লোকেদের আটকালে না কেন?'

'রুখতে তো চেয়েছিলাম, লেকেন গেহুঁ আর রুপাইয়ার লোভে সবাই চলে গেল। ওরা মানুষ না, ইজ্জতের কথা ভূচ্চরগুলো একবারও ভাবল না। শালেদের পেটটাই বড়। থুঃ থুঃ থুঃ—' প্রবল বিতৃষ্ণায় এবং ঘৃণায় মাটিতে তিনবার থুতু ফেলে ধনুয়া। পরক্ষণে হয়ত ধারাবনীবাসীদের প্রতি তার করুণাই হয়। গলার স্বর অনেকটা নরম ক'রে বলে, 'না গিয়ে কী আর করবে, এই জঙ্গলে পড়ে থাকলে ভুখাই মরতে হবে। গরিব আদমী সব—ক্ষেতি নেই, পাইসা নেই, মন তো এমনিতেই দুবলা হয়ে যায়।'

গরীব তো ধনুয়া এবং আনোখিও। তবু মেরুদণ্ডে এত শক্তি এবং দৃঢ়তা তারা কোথায় পেল? রাকেশ বলেন, 'কুঁদরীর কাছে শুনলাম, তুমি আর আনোখি হাটে মাল বওয়ার কাজ করছ। এই ক'রে তো সারা জীবন চলে না। জঙ্গলে কতদিন এভাবে পড়ে থাকবে?'

ধনুয়ারা চুপ ক'রে থাকে।

রাকেশ বলেন, 'ও সব পরে ভাবা যাবে। এখন বিশ্রাম কর গিয়ে।'

আনোখি এবং ধনুয়া উঠে পড়ে। তারপর খালের ধারে সেই চালাগুলোর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়।

একত্রিশ

এখন পূর্ণিমা চলছে।

সন্ধের পর পরই চাঁদির থালার মতো গোল চাঁদটি দিগন্তের তলা থেকে আকাশে উঠে আসে। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় সমস্ত চরাচর। উত্তর বিহারের এই নগণ্য বনভূমির ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম এবং বিশাল বিশাল গাছগুলিকে কোনো অতিমানবীয় চিত্রকরের আঁকা অলৌকিক ছবি ব'লে মনে হয়।

শুধু হেমন্ত বা শীতেই না, গরমকালেও এখানে কুয়াশা পড়ে। আজ সকালেও গাছপালার মাথায় মিহি কুয়াশা ফিনফিনে পর্দার মতো জড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন

তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ মেঘমুক্ত। চন্দ্রালোকে অনেকটা দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়।

রাকেশরা সেই পিপর গাছটার তলায় এখনও বসে আছেন। রাতটা কোথায় কিভাবে কাটাবেন, আনোখিদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে ঠিক ক'রে নিতে হবে। আপাতত, ধারাবনীতে কিভাবে তাঁরা কাজ শুরু করবেন তা-ই নিয়ে আলোচনা চলছিল। তিনজনেই অবশ্য একমত, ধারাবনীতে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা না ব'লে এবং এখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মসূচিই স্থির করা যাবে না।

রাকেশদের আলোচনার মধ্যে আনোখি আর ধনুয়া দুটো মশাল জ্বালিয়ে ফের চলে আসে।

ভাগবত বলেন, 'এমন চমৎকার চাঁদের আলো রয়েছে। মশাল দিয়ে কী হবে। নিভিয়ে ফেল।'

আনোখি জানায়, মশাল জ্বালিয়ে রাখা দরকার। কেননা, এই জঙ্গলে খতারনাক সব জানোয়ার আছে। আগুন দেখলে তারা কাছে ঘেঁষবে না।

মশাল দুটোর নিচের দিক মাটিতে পুঁতে দিয়ে আনোখিরা রাকেশদের সামনে এসে বসে। কেউ কিছু বলার আগে ধনুয়াই শুরু করে, 'ম্যাজিস্টর সাহিব, রাতে ওখানে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি।' বলে আঙুল বাড়িয়ে পরিত্যক্ত চালাগুলো দেখিয়ে দেয়।

খোলা আকাশের তলায় এই জঙ্গলে যেখানে দাঁতাল শুয়োর, হুড়ার, সাপখোপ অবাধে চরে বেড়ায়, রাতে ঘুমনোটা খুবই বিপজ্জনক। রাকেশ বলেন, 'সেই ভাল।'

'আপনাদের সঙ্গে বিস্তারা আছে তো?'

'আছে।'

'এখানে কড়োর কড়োর (কোটি কোটি) মশা। ভূচ্চরগুলো কামড়ে গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে। মশারি এনেছেন তো?'

ছোকরার সব দিকে খেয়াল আছে। রাকেশ অল্প হেসে বলেন, 'এনেছি।'

আনোখি জিজ্ঞেস করে, 'রাত্তিরে আপনাদের ভোজনের কী হবে?'

অবোধনারায়ণ লোক যেমনই হোক, ড্রাই লাঞ্চের প্যাকেটে প্রচুর খাবার দিয়েছিল। কুঁদরীকে দিয়ে এবং নিজেরা খেয়েও অনেকটা বেঁচে গেছে। রাকেশ বলেন, 'আমাদের সঙ্গে খাবার আছে।'

'ঠিক তো? না হ'লে কুঁদরী রোটি বানিয়ে দেবে। তবে আমরা অচ্ছুৎ, আমাদের ছোঁয়া আবার খাবেন কিনা—' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় ধনুয়া।

রাকেশ অস্বস্তির ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'আমরা ছুয়াছুত মানি না। যে আদর ক'রে খেতে দেবে তার হাতেই খাই। বিশ্বাস কর, আমাদের কাছে যথেষ্ট খাবার রয়েছে। এই দেখ—' স্যুটকেশ খুলে লাঞ্চের প্যাকেট বের ক'রে খুলে ধরেন। বলেন, 'কী, মিথ্যে বলেছি ?'

ধন্নুয়া হেসে ফেলে, 'না, সচ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

জ্যোৎস্নার ঢল-নামা এই বনভূমিতে রাত বাড়তে থাকে। সারাদিন খাদ্যের খোঁজে ঘোরাঘুরির পর সন্ধের আগে আগে ক্লান্ত পাখিরা গাছের মাথায় ফিরে এসেছিল। অনেকক্ষণ তাদের চেঁচামেচি, হৈচৈ এবং ডানা ঝাপটানোর শব্দে চারিদিক সরগরম হয়ে ছিল। তারপর কখন তারা একেবারে চুপ হ'য়ে গেছে, কে জানে। চারিদিক এখন একেবারে নিঝুম। শুধু গাঢ় স্তব্ধতাকে চিরে দিয়ে কাছা-কাছি কোনো গাছ থেকে একটা কামার পাখি গমগমে গলায় চেঁচিয়ে উঠছে। আর মাটির তলা থেকে উঠে আসছে অদৃশ্য ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ। এই সব অশরীরী শব্দ ঝোপঝাড, দীর্ঘ বনস্পতি এবং লতাগুল্মের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূর দূরান্তে। দুধের স্রোতের মতো চন্দ্রালোকে সব মিলিয়ে ক্রমশ এক অপার্থিব আবহাওয়া তৈরি হ'তে থাকে।

একসময় রাকেশ বলেন, 'কাল সকালে আমরা ধারাবনী চলে যাব।' ব'লে ধন্নুয়ার মুখের দিকে তাকান।

গলার ভেতর অস্পষ্ট শব্দ করে ধন্নুয়া, 'হাঁ।'

'তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে ?'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না ধন্নুয়া। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে কিছু ভাবতে থাকে। অর্থাৎ ধারাবনীতে যাওয়ার ব্যাপারে সে মনস্থির করতে পারছে না।

ওপাশ থেকে আনোখি গলা খাকরে অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করে, 'আমাদের এখন যাওয়াটা কি ঠিক হবে হুজৌর ?' বলে পরক্ষণে কী ভেবে শশব্যস্তে আবার শুরু করে, 'আপনারা সাথ সাথ থাকবেন। চিন্তাকা কুছ নহী। তব্—'

'তবে কী ?'

'আমরা সিংজি আর ঝা'জির লোকেদের বলে দিয়েছিলাম গাঁওয়ে ফিরব না। এখন যদি চলে যাই, শালেরা হাসবে। বলবে, আমাদের তেজ বিলকুল মরে গেছে।'

এদিকটা ভাবেন নি রাকেশ। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বলেন, 'ঠিক আছে, কাল আমাদের সঙ্গে তোমাদের যেতে হবে না। আগে আমরা গিয়ে ভাল ক'রে সব দেখি। তারপর অবস্থা বুঝে তোমাদের ধারাবনীতে নিয়ে যাব।'

আনোখি এবং ধনুয়া সায় দিয়ে বলে, 'সে-ই ভাল।'

একটু চুপচাপ। তারপর ধনুয়া বলে, 'তবে একটা কথা হুজৌর।'

রাকেশ বলেন, 'কী?'

ধনুয়া উত্তেজিতভাবে বলে, 'ভূচ্চরের ছৌয়া খুনীদের ছাড়া হবে না। ওদের ফাঁসিতে চড়াতেই হবে। কুত্তাগুলো এত্তে আদমীর জান নিয়েছে, এত্তে আওরতের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে। ওদের সাজা না হ'লে—'

ধনুয়াকে হাত তুলে থামিয়ে দিতে দিতে রাকেশ বলেন, 'সেই জন্যেই তো আমরা এসেছি। আমাকে কিছুদিন সময় দাও।'

ধনুয়া চুপ করে থাকে।

রাত ক্রমশ বেড়ে চলে, সেই সঙ্গে নিঝুম এই বনভূমির স্তব্ধতা। ঝিঁঝির ডাকও একসময় থেমে যায়। শুধু জেগে থাকে কামার পাখিরা। জঙ্গলের চারিদিক থেকে তাদের গম্ভীর কর্কশ চিৎকার এখানকার অপার্থিব আবহাওয়াকে আরো ভীতিকর ক'রে তুলতে থাকে।

এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আর বাড়িয়া পোকা মানুষের রক্তের গন্ধ পেয়ে চারপাশ থেকে রাকেশদের ওপর হানা দিতে শুরু করেছে।

আনোখি বলে, 'হুজৌর, তুরন্ত ভোজন শেষ ক'রে নিন। মশারির ভেতর না ঢুকলে মচ্ছররা হাল বুরা (খারাপ) ক'রে দেবে।'

আনোখি ঠিকই বলেছে। এভাবে বসে থেকে শরীরের রক্তকে মশাদের খাদ্য হিসেবে উপহার দেবার মানে হয় না।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা খাবে না?'

আনোখি জানায়, কুঁদরী চুলা ধরিয়ে তাদের জন্য রোটি টোটি তৈরি করছে। খাবার বানানো হ'য়ে গেলে তারাও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে।

স্যুটকেশ থেকে আগেই খাবারের প্যাকেট বের ক'রে ফেলেছিলেন রাকেশ। রামলখন এবং ভাগবতও তাদের প্যাকেট বের করেন। মিনিট দশেকের মধ্যে তাঁদের খাওয়া চুকে যায়। তারপর আনোখিরা তিনজনকে তিনটে পরিত্যক্ত চালায় নিয়ে তোলে এবং বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে তাঁদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর চালাঘর থেকে বেরিয়ে রাকেশ দেখতে পান, পিপর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাগবত এবং রামলখন টান টান দাঁড়িয়ে, হাতজোড় ক'রে পূর্বমুখী হ'য়ে সূর্য প্রণাম করছেন। এর মধ্যেই তাঁদের স্নান হয়ে গেছে। কাল

ভোরেও দুধলিগঞ্জের পি. ডব্লু. ডি বাংলোর লাউঞ্জে একই দৃশ্য চোখে পড়েছিল রাকেশের।

একটা কথা ভেবে রাকেশ অবাক হ'ন, এখানে মজা নহরে হাঁটুভর কাদাটে জল রয়েছে, তার ওপর কচুরিপানার স্তর। এই জলে স্নান করা অসম্ভব। তবে ওঁরা স্নানের জল কোথায় পেলেন?

আস্তে আস্তে ভাগবতদের কাছে এসে দাঁড়ান রাকেশ। সূর্যস্তব এবং প্রণামের পর ওঁরা তাঁর দিকে ফিরলে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কোত্থেকে স্নান ক'রে এলেন?'

ভাগবত বলেন, 'এখান থেকে পশ্চিম দিকে আধ মাইলখানেক গেলে একটা বিল পাওয়া যাবে। সেখানে বুক সমান টলটলে পরিষ্কার জল রয়েছে। স্নানটা ওখানেই সেরে এসেছি।'

'ভোরবেলা উঠে জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। জানোই তো সূর্য ওঠার আগে স্নান করাটা আমাদের অভ্যাস।' ভাগবত বলতে থাকেন, 'যাও, আর দেরি ক'রো না। তুমিও স্নান সেরে এসো। রোদ উঠতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে না পারলে কষ্ট হবে।' ব'লে দূরে বিলের দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দেন।

রাকেশ ফের চালায় গিয়ে স্যুটকেশ থেকে ব্রাশ পেস্ট তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে বিলে চলে যান। এভাবে খোলা জায়গায় স্নান করার অভ্যাস নেই তাঁর। কিন্তু এছাড়া করারই বা কী আছে? একটা কথা মাথায় আসতে রাকেশের বেশ মজাই লাগছে, চাকরিতে রেজিগনেসান দেবার পরদিন থেকেই তিনি তা হ'লে 'ডিক্লাসড' হ'তে শুরু করলেন? এ একরকম ভালই হ'ল, অশিক্ষিত, ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষজনের মধ্যে থেকে যখন কাজকর্ম করতে হবে তখন আগেকার আরাম এবং বিলাসের অভ্যাসগুলো ছাড়া দরকার।

বিল থেকে স্নান সেরে ফিরে এসে রাকেশ দেখেন আনোখি এবং ধনুয়া ভাগবতদের সঙ্গে কথা বলছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কুঁদরী। অর্থাৎ ওদেরও এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেছে।

রামলখন বলেন, 'এই দেখ, ধনুয়ারা কী কাণ্ড করেছে!' বলে পদ্মপাতায় মোড়া তিনটে বড় প্যাকেট দেখিয়ে দেন।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী আছে ওগুলোতে?'

'রোটি আর ভাজি। অন্ধকার থাকতে থাকতে কুঁদরীকে তুলে আমাদের জন্যে এ-সব করিয়েছে ধনুয়া।'

রাকেশ ধনুয়াকে বলেন, 'কুঁদরীকে এত কষ্ট দিলে কেন?'

ধনুয়া বলে, 'রোটি ওটি না নিয়ে গেলে ধারাবনীতে কী পাবেন, না পাবেন তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? তাই—'

কাল অবোধনারায়ণও এভাবেই তাঁদের জন্য ড্রাই লাঞ্চের প্যাকেট দিয়েছিল। কথাটা ঠিকই বলেছে ধনুয়া। রাকেশ এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি করেন না। শুধু বলেন, 'তোমাদের দাম নিতে হবে কিন্তু।'

ধনুয়ারা কিছুতেই পয়সা নেবে না। তারা জানায়, ভালবেসে রাকেশদের জন্য তারা খাবার তৈরি ক'রে দিয়েছে। যাঁরা তাদের জন্য শহর থেকে এতদূর দৌড়ে এসেছেন তাঁদের জন্য এই সামান্য খাবারটুকু না ক'রে দেওয়াটা একান্তভাবেই বেইমানি। রাকেশরা বোঝান, ধনুয়ারা গরিব, ঘরবাড়ি ছেড়ে এতদূরে এই জঙ্গলে প্রচণ্ড কষ্ট ক'রে পড়ে আছে। তাদের এভাবে খাবার-দাবার দান খয়রাত করার মানে হয় না। যখন তারা যথেষ্ট কামাই করবে, নিজেদের ফেলে-আসা বাড়িতে ফিরতে পারবে, ফেরত পাবে ভূদান যজ্ঞের সময় দানপত্র ক'রে দেওয়া জমি-জমার দখল, তখন যত ইচ্ছা তত যেন খাওয়ায়। রাকেশরা একবারও আপত্তি করবে না।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাকেশদের কাছ থেকে পয়সা নিতে হয় ধনুয়াকে। একটু বেশি ক'রেই দাম দেন রাকেশরা।

রামলখন আকাশের দিকে একপলক তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলেন, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

আনোখি বলে, 'চলুন, আপনাদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'না না, তার দরকার নেই। আমরা ঠিক চলে যেতে পারব। তোমাদের তো আবার হাটে যেতে হবে।'

আনোখিরা কোনোরকম ওজর বা আপত্তিতে কান দেয় না। রামলখনদের মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে বলে, 'চলিয়ে—'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে ভাগবত বলেন, 'নাঃ, তোমাদের সঙ্গে পারার উপায় নেই।'

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পুব দিকে খানিকটা যাবার পর রাকেশ বলেন, 'স্যুটকেশ টুটকেশগুলো এবার আমাদের দিয়ে তোমরা ফিরে যাও।'

কথাগুলো আনোখিদের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে।

ধারাবনীর কাছাকাছি এসে মালপত্র নামিয়ে আনোখিরা বলে, 'এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি। আপনারা গাঁওয়ে চলে যান। আবার কবে দেখা হবে?'

রাকেশরা বাক্স-বিছানা তুলে নিতে নিতে বলেন, 'পরশু বিকেলে আমি তোমাদের ওখানে যাব।'

'ঠিক হ্যায়। নমস্তে—'

আনোখি এবং ধনুয়া হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। রাকেশরা তিনজন সামনের দিকে এগিয়ে যান।

বত্রিশ

ধারাবনীতে রাকেশরা যখন পেঁৗছন, সূর্যটা আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। এখনও দুপুর হ'তে ঘণ্টা দেড় দুই বাকি। তবু এরই মধ্যে বাতাস এত তেতে উঠেছে, মনে হয়, চারিদিকে আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে।

আগের বার রাকেশ যখন ধারাবনীতে এসেছিলেন, সমস্ত গ্রামটা ছিল ধ্বংস-স্তূপ। বেশির ভাগ বাড়িঘর ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনেকগুলো। মাত্র কয়েকটাই কোনোরকমে অটুট দাঁড়িয়ে ছিল।

এখন কিন্তু সেদিনের সেই বিধ্বস্ত ধারাবনীকে চেনা যাচ্ছে না। ভগ্নস্তূপের তলা থেকে নতুন ঝকঝকে একটা গ্রাম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ঘরের মাথায় আনকোরা টিন বা টালি, বেড়াগুলো কাঠ এবং বাঁশের। পোড়া গাঁয়ের ছাই বা ভাঙাচোরা টালি আর টিনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ময়দানবের হাতের ছোঁয়ায় রাতারাতি চেহারা পালটে গেছে ধারাবনীর।

গ্রামের সীমানার বাইরে ধুলোভরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থাকেন রাকেশ। পাশে তাঁর দুই সঙ্গীও দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

রামলখন ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে রোদ ঠেকাতে ঠেকাতে বলেন, 'এটা নিশ্চয়ই ধারাবনী গাঁ?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, চাচাজি।'

'তুমি যে বলেছিলে, পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে গিরিলালের গুণ্ডারা এখানকার সব কিছু শেষ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু গাঁ-টার দিকে তাকিয়ে তা তো মনে হচ্ছে না।'

'কাল কুঁদরী কী বলছিল, মনে আছে?'

'কী বল তো?'

'গিরিবালা ঝা আর ত্রিলোকী সিং সবার ঘর একেবারে নতুন ক'রে বানিয়ে দিয়েছে।'

এবার মনে পড়ে যায় রামলখনের। বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিল বটে।'

রাকেশ বলেন, 'কথাটা আমার মাথায় ছিল কিন্তু এভাবে চেহারা বদলে দেবে, ভাবতে পারি নি।'

ভাগবত মানুষটি খুবই স্বল্পভাষী। নিজে বলার চেয়ে অন্যের কথা শুনতে বেশি পছন্দ করেন। চুপচাপ ধারাবনী সম্পর্কে রাকেশদের মন্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ে। চিন্তিতভাবে বলেন, 'আমাদের কাজটা খুব কঠিন হ'য়ে গেল রাকেশ।'

ভাগবতের ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন রাকেশ। বলেন, 'হ্যাঁ, যেভাবে পয়সা খরচ করেছে গিরিলালরা তাতে ওদের বিরুদ্ধে কেউ সহজে মুখ খুলবে ব'লে মনে হয় না।'

'দেখা যাক। চল. গাঁয়ের ভেতরে তো যাওয়া যাক।'

ধুলোর রাস্তা থেকে নেমে তিনজনে গ্রামের মধ্যে চলে আসেন। দুপুরের আগে আগে এই সময়টায় চারিদিক ঝিম মেরে আছে। লোকজনও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। এধারে ওধারে দু-একটা ঘরের বারান্দায় বুড়োবুড়ি বা কাচ্চাবাচ্চারা বসে আছে। ক্বচিৎ চোখে পড়ে, দু-চারটে বউ ব্যস্তভাবে ঘরের কাজ করছে। তবে শক্তসমর্থ জোয়ান ছোকরাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

একটা মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ উল্টো দিক থেকে আসছিল। রাকেশদের দেখে প্রথমটা চমকে ওঠে, একটুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়, তারপর চাপা গলায় চিৎকার ক'রে দুর্বোধ্য কিছু বলতে বলতে পেছন ফিরে প্রায় দৌড়তে থাকে।

রাকেশের মনে হ'ল, সেবার জঙ্গলে এই মেয়েমানুষটিকে খুব সম্ভব দেখে-ছিলেন। মুখটা খুব চেনা। মেয়েমানুষটাও তাঁকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তাঁকে দেখে আঁতকে উঠে ওভাবে দৌড়ল কেন?

রামলখনরাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'কী ব্যপার বল তো?'

রাকেশ বলেন, 'বুঝতে পারছি না।'

'চল, এগিয়ে দেখা যাক।'

তিনজন ধুলোর পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলেন। কিছুটা যাওয়ার পর চোখে পড়ে, প্রতিটি ঘরের দাওয়ায় বা দরজার কাছে অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে। সবার চোখেমুখে ভয় এবং দুশ্চিন্তার ছাপ। ওদের দেখে মনে হয়, ধারাবনীতে রাকেশরা যে আসবেন, এটা তারা আদৌ ভাবতে পারে নি। তাঁরা যেন এখানে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। ভেতরে ভেতরে রীতিমত দমে যান রাকেশ।

চাপা ভীরু গলায় ধারাবনীর বুড়োবুড়ি এবং অন্য মেয়েমানুষরা নিজেদের মধ্যে

বলাবলি করতে থাকে, 'ম্যাজিস্টর সাব আ গিয়া। কা হোগা অব্ ?'

এদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে ভাগবত বলেন, 'কী ব্যাপার রাকেশ, এরা বোধহয় আমাদের এখানে চাইছে না।'

রাকেশ চিন্তাগ্রস্তের মতো মাথা নাড়েন। বলেন, 'কী করা যায় বলুন তো চাচাজি ?'

ভাগবত বা রামলখনকে এতটুকু বিচলিত দেখায় না। শান্ত ভঙ্গিতে ভাগবত বলেন, 'পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে। রোদে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। কোথাও একটু বসা দরকার।'

হঠাৎ গণপতের কথা মনে পড়ে যায় রাকেশের। এর আগে পরিত্যক্ত ধারাবনীতে গণপতের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটা দুপুর কাটিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ভাগবতদের সঙ্গে ক'রে গণপতের ঘরের সামনে চলে আসেন রাকেশ। বাচ্চা-কাচ্চা এবং বয়স্ক মেয়েপুরুষের একটা দঙ্গল পেছন পেছন এসে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

গণপত রাকেশদের আসার খবরটা আগেই পেয়ে গিয়েছিল। সে এবং তার স্ত্রীকে তাদের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

রাকেশ লক্ষ করেন, গণপতের ঘরের চেহারাও আগাগোড়া বদলে গেছে। যদিও গিরিলালদের ভূমিসেনারা তার পুরনো ঘরটাকে ভেঙে তছনছ ক'রে দেয় নি তবু সেটার চালে নতুন টিন, দেয়ালে নতুন কাঠ লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ গিরি-লালরা নিরপেক্ষভাবে সবাইকে খুশি ক'রে দিয়েছে, আলাদাভাবে কারো সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব দেখায় নি। রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে চিনতে পারছ ?'

রুদ্ধস্বরে গণপৎ উত্তর দেয়, 'জি—'

'তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক জরুরি কথা আছে।'

'জি—'

'কথাবার্তা পরে হবে। রোদে আমরা পুড়ে যাচ্ছি। কোথাও একটু বসতে না পারলে একেবারে মরে যাব।'

দ্বিধাগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে গণপৎ। তারপর এদিক সেদিক দেখে ভয়ার্ত স্বরে কী বলে বোঝা যায় না।

রাকেশ বুঝতে পারছিলেন, তাঁদের নিজের ঘরের দাওয়ায় বসতে দেবার এতটুকু ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই নেই গণপতের। কিন্তু প্রবল শক্তিমান 'ম্যাজিস্টর সাহিব'কে মুখের ওপর না বলার স্পর্ধা তার নেই।

রাকেশ গণপতের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ কোথাও জিরিয়ে নিতে না পারলে তাঁদের পক্ষে এক মুহূর্ত আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না। শরীর যেভাবে টলছে, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবেন।

রাকেশ প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এবার বলেন, 'আধা ঘণ্টার বেশি বসব না। তোমার এখানে বসতে দেবে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গণপৎকে বলতে হয়, 'বৈঠিয়ে হুজৌর।'

রাকেশরা দাওয়ার এককোণে বসে পড়েন। দরজার কাছে গণপৎ এবং তার ঘরবালী মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। যারা পেছন পেছন আসছিল, খানিকটা দূরে তারা থেমে গেছে। রাকেশদের আসার খবর এর মধ্যে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিক থেকে আরো লোকজন আসতে শুরু করেছে। কাছাকাছি কেউ ঘেঁষছে না, অনেকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে তারা রাকেশদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে যত না বিস্ময়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়।

খানিকক্ষণ জিরোবার পর জনতার দিকে ফিরে রাকেশ বলেন, 'তোমরা সবাই তো জঙ্গলে চলে গিয়েছিলে?'

কেউ মুখে কিছু বলে না, তবে অত্যন্ত সতর্কভাবে আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়।

রাকেশ আবার বলেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই জঙ্গলে আমাকে দেখেছ, তাই না?'

জনতা এবারও মুখ বুজে থাকে, তবে যান্ত্রিক ভাবে আগের মতোই মাথা নাড়ে।

রাকেশ ভাগবতদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁদের তোমরা দ্যাখো নি, এঁরা আমার চাচাজি। তোমাদের গাঁ দেখতে এসেছেন।'

জনতার নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না, একইভাবে তারা পলকহীন রাকেশদের লক্ষ করতে থাকে।

ভিড়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গণপৎদের দিকে তাকান রাকেশ। বলেন, 'গণপৎজি, তোমাদের গাঁওয়ে একটা খুব জরুরি কাজে ফের আসতে হ'ল।'

কোন বিশেষ প্রয়োজনে আরো একবার 'ম্যাজিস্টর সাহিবে'র মতো 'সরগনা আদমী'দের এই ধুলোভরা নোংরা নগণ্য অচ্ছুৎদের গাঁয়ে গরমকালের অসহ্য রোদ মাথায় নিয়ে প্রায় পুড়তে পুড়তে আরো একবার আসতে হ'ল, মোটামুটি আবছা-ভাবে তার একটা ইঙ্গিত পেয়ে যায় গণপৎ। তবে সে ব্যাপারে আদৌ কোনো আগ্রহ বোধ করে না, এবং মুখ ফুটে কিছু জানতেও চায় না।

রাকেশ বলেন, 'তোমাদের, মানে এই গাঁয়ের লোকজনের কাছে আমাদের একটা আর্জি আছে।'

অস্পষ্ট জড়ানো গলায় গণপৎ কী উত্তর দেয়, বোঝা যায় না। রাকেশ বলেন,

'আর্জিটা হ'ল এই, তোমাদের গাঁয়ে আমাদের কিছুদিন থাকতে দিতে হবে।'

গণপৎ চমকে ওঠে, 'লেকেন হুজৌর—'

'কী?'

'এখানে আপনাদের মতো বড়ে আদমীরা থাকবেন কী ক'রে? পাকা কোঠি নেই, বিজলি বাতি নেই, বিজলি পাঙ্খা নেই। আরামকা কুছ নেহী। বহুত তখলিফ হোগা আপলোগোনকা।'

এতগুলো অসুবিধার কথা জানানোর পরও রাকেশকে খুব একটা বিচলিত দেখায় না। তিনি বলেন, 'তোমরা এত মানুষ যদি থাকতে পারো, আমাদের কোনো কষ্ট হবে না।'

গণপৎ বলে, 'আমরা আবার মানুষ! জানবারের মতো যেখানে হোক মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারি। কোথায় আমরা আর কোথায় আপনারা! তা ছাড়া—'

'কী?'

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে গণপৎ বলে, 'আমি একা বললে তো হবে না। অন্য গাঁওবালা আদমীরা কী বলে সেটাও জানতে হবে।'

রাকেশ আগেই লক্ষ করেছিলেন, বুড়ো বা অল্প বয়সের ছেলে টেলে ছাড়া কোনো শক্ত সমর্থ পুরুষই গ্রামে নেই। খুব সম্ভব তাদের কথাই বলছে গণপৎ। বলেন, 'অন্য আদমীদের কাউকে তো দেখছি না।'

'ওরা নেই হুজৌর।'

'কোথায় গেছে তারা?'

দ্বিধাগ্রস্তের মতো চুপ ক'রে থাকে গণপৎ। রাকেশের প্রশ্নের উত্তর দেবে কিনা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, 'ওরা সব গিরিলালজির কোঠিতে গেছে।'

রীতিমত কৌতূহল বোধ করেন রাকেশ। সেই সঙ্গে কিছুটা আশঙ্কাও। অবশ্য বাইরে অতিরিক্ত কোনো আগ্রহ দেখান না। খুব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'গিরিলালজি কি ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'হাঁ। গিরিলালজির কোঠিতে ত্রিলোকীজিও থাকবেন।'

'নিশ্চয়ই কিছু দরকার আছে?'

'হাঁ।'

'কী দরকার জানো?'

'নেহী। ওরা ফিরে এলে জানতে পারব।'

'কখন ফিরবে ওরা?'

'হোগা সামতক (সন্ধে নাগাদ)।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাকেশ বলেন, 'সবাই ফিরে আসুক। তখন কথাবার্তা ব'লে থাকার ব্যবস্থাটা ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে।'

গণপৎ উত্তর দেয় না। খুব সম্ভব রাকেশের কথাটা তার মনঃপূত হয় নি। কেননা তা হলে সন্ধে পর্যন্ত তাঁদের থাকতে দিতে হয়।

রাকেশ এবার বলেন, 'তোমাদের লোকজনেরা যতক্ষণ না ফিরছে, আমাদের কোথাও একটু থাকার জায়গা দাও।'

ঢোক গিলে গণপৎ জানায়, এখানে প্রতিটি পরিবার পিছু মোটে একখানা ক'রে ঘর। কারো বাড়তি একটু জায়গা নেই যাতে রাকেশদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

বোঝাই যাচ্ছে, রাকেশরা যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান গণপতের পক্ষে ততই স্বস্তিকর। এই গ্রামে তাঁরা যে এতটা অবাঞ্ছিত, ভাবতে পারেন নি রাকেশ। কাদের জন্য তা হ'লে এমন মূল্যবান সম্মানজনক চাকরি ছেড়ে এতদূর ছুটে এসেছেন? তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই কি তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? ভেতরে ভেতরে এক ধরনের হতাশা এবং অভিমান বোধ করতে থাকেন। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন রাকেশ, তার আগেই ভাগবত দৃঢ় গলায় বলেন, 'গণপৎজি, একটা কথা শুনে রাখো। তোমরা যদি ব্যবস্থা না-ও ক'রো, আমাদের এই গাঁয়ে থাকতে হবে। তেমন হ'লে গাছের তলায় থাকব।'

গণপৎ ভীষণ হকচকিয়ে যায়। হাতজোড় ক'রে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'এ সব কী বলছেন হুজৌর? শুনলেও আমাদের পাপ হয়।'

রামলখন এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় গণপৎকে বলেন, 'তোমাদের গাঁয়ে আনোখি আর ধনুয়ার দুটো ঘর রয়েছে, না?'

হঠাৎ এরকম অভাবনীয় প্রশ্নে অবাক হ'য়ে যায় গণপৎ। বিমূঢ়ের মতো সে বলে, 'হাঁ হুজৌর।'

'শুনেছিলাম সেই ঘরদুটো গিরিলাল আর ত্রিলোকীর পহেলবানেরা ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।'

'হাঁ।'

'সে দুটোর হাল কি সেইরকমই রয়েছে?'

'নেহী। গিরিলালজিরা গাঁওয়ের সবার ঘর নতুন ক'রে বানিয়ে দিয়েছেন। ওদেরটাও সেই সঙ্গে ক'রে দিয়েছেন।'

'শুনেছি আনোখিরা জঙ্গল থেকে ফেরে নি। ওদের ঘরে এখন কারা থাকে?'

'কেউ থাকে না। আনোখিদের ঘর বিলকুল ফাঁকা পড়ে আছে। যখন ওরা ফিরে আসবে তখন থাকবে।'

'ভালই হ'ল, ওদের ঘর দুটো দেখিয়ে দাও। যদ্দিন না ওরা ফিরছে, আমরা ওখানেই থাকব।'

আনোখিদের ফাঁকা ঘরের খবর দিতে গিয়ে এমন বিপদে পড়ে যেতে হবে, ভাবতে পারে নি গণপৎ। দিশেহারার মতো সে বলে, 'লেকেন হুজৌর, একগো বাত—'

রামলখন বলেন, 'বলো।'

'আনোখিরা যদি গুস্‌সা হয়? মতলব, ওদের না জানিয়ে থাকলে—' বলতে বলতে থেমে যায় গণপৎ।

'গুস্‌সা হ'লে আমাদের ওপর হবে। যা বলার আমরা বলব। তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। চল, ওদের ঘর দেখিয়ে দেবে।'

নিরুপায় গণপৎ রাকেশদের সঙ্গে ক'রে ধারাবনী গাঁয়ের উত্তর দিকের শেষ মাথায় পাশাপাশি দু'খানা নতুন ঘরের সামনে নিয়ে এসে বলে, 'এই দোগো ঘর হুজৌর।' ব'লে আর দাঁড়ায় না। সেই ভিড়টা তাদের পেছন পেছন এসেছিল। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে যায় গণপৎ।

তেত্রিশ

ধনুয়ার ঘরের ভেতর ঢুকে নিজের নিজের বিছানা খুলে প্রথমে শতরঞ্জি এবং বালিশ পেতে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নেন রাকেশরা।

রামলখন বালিশে ভর দিয়ে কাত হ'য়ে ছিলেন। তিনি বলেন, 'একটু জল পেলে হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়া যেত। কুয়ো কি তালাও টালাও এখানে আছে কিনা কে জানে।'

রাকেশ বলেন, 'আগের বার যখন এসেছিলাম, গাঁয়ের পুব দিকে দুটো কুয়ো চোখে পড়েছিল।'

ভাগবত বলেন, 'রোদের ভেতর এখন আর বেরিয়ে কাজ নেই। বেলা পড়লে আরেক বার স্নান ক'রে আসা যাবে।'

রামলখন গুছনো দূরদর্শী মানুষ। নানা লটবহরের সঙ্গে কিছু দড়ি-টড়িও নিয়ে

এসেছিলেন। দ্বিতীয় বার জিরোবার পর উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর আড়াআড়ি দড়ি টাঙিয়ে ফেলেন। ঘামে জামা গেঞ্জি এবং ধুতি ভিজে গিয়েছিল। সেগুলো ছেড়ে লুঙ্গি আর হাত-কাটা ফতুয়া পরে নেন, তারপর ভেজা জামা-কাপড় দড়িতে শুকোতে দেন। দেখাদেখি রাকেশ এবং ভাগবতও পরনের কাপড় চোপড় বদলে ফেলেন।

রামলখন বলেন, 'দুপুর পার হ'য়ে গেল। খিদেও পেয়ে গেছে। গিরিলালের বাড়ি থেকে গাঁয়ের পুরুষেরা না ফেরা পর্যন্ত আমাদের কিছুই করার নেই। খাওয়াটা চুকিয়েই ফেলা যাক।'

পদ্মপাতার মোড়ক খুলে ধনুয়াদের দেওয়া রোটি এবং ভাজি খেতে খেতে বিমর্ষ মুখে রাকেশ বলেন, 'ভাগবত চাচা, রামলখন চাচা, আমাদের এখানে আসাটাই বোধ হয় মাটি হ'য়ে গেল। গিরিলালরা গাঁয়ের লোকেদের একেবারে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে।'

রামলখনরা কোনো কারণেই অধৈর্য বা হতাশ হ'য়ে পড়েন না। শান্ত অবিচলিত ভঙ্গিতে ভাগবত বলেন, 'তাই তো দেখছি।'

'পীপলস সাপোর্ট যদি না পাওয়া যায় কিছুই করা যাবে না।'

'ঠিক।'

'গিরিলালদের বিরুদ্ধে ধারাবনীর মানুষ একটা আঙুল তুলবে ব'লে মনে হচ্ছে না। অবশ্য ধনুয়া আনোখি আর কুঁদরীরা রয়েছে। কিন্তু পুরো গাঁয়ের লোককে যদি না পাওয়া যায়, তিনজনের সাপোর্টে বিশেষ কিছু করা অসম্ভব।' বলতে বলতে একটু থামেন রাকেশ, ভাগবতদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ ক'রে ফের শুরু করেন, 'এরা চায়ও না আমরা ধারাবনীতে থাকি।' আসলে ধনুয়াদের সঙ্গে কথা ব'লে তিনি যতটা উদ্দীপ্ত এবং আশান্বিত হয়েছিলেন, গণপৎদের নিরুত্তাপ ব্যবহারে ততটাই দমে গেছেন।

'অত চিন্তা ক'রো না। গাঁয়ের লোকদের গিরিলাল ঝা'র বাড়ি থেকে ফিরতে দাও। তাদের সঙ্গে কথা ব'লে কিছু একটা ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে। একটা কথা মনে রেখো রাকেশ—'

উৎসুক চোখে ভাগবতের দিকে তাকান রাকেশ। জিজ্ঞেস করেন, 'কী ভাগবত চাচা?'

'আমরা যখন এত দূর এসেই গেছি, শেষটা না দেখে কিছুতেই ফিরে যাব না।'

রামলখনও ভাগবতের কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দেন, 'ঠিক বলেছ ভাগবত ভাই। ফেরার প্রশ্নই ওঠে না।'

রামলখনদের দৃঢ়তায় যথেষ্ট ভরসা পান রাকেশ।

গণপৎ জানিয়েছিল, সন্ধে নাগাদ গাঁয়ের শক্ত সমর্থ পুরুষেরা গিরিলালের বাড়ি থেকে ফিরবে। কিন্তু তার ঢের আগেই তারা চলে এল।

গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই রাকেশদের আসার খবরটা তাদের কানে গিয়েছিল। কাজেই কেউ আর নিজেদের ঘরে যায় নি, যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়ে সোজা রাকেশদের কাছে চলে আসে।

এখনও সন্ধে হ'তে অনেক দেরি। দিনের তাপ খানিকটা জুড়িয়ে এলেও চারি-দিকে অজস্র রোদের ছড়াছড়ি।

এত মানুষের গলার আওয়াজে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান রাকেশরা। শুধু গিরিলালের বাড়ি যারা গিয়েছিল তারাই না, যারা গ্রামে পড়ে ছিল সেই সব বুড়োধুড়ো বাচ্চাকাচ্চা এবং মেয়েমানুষরাও ছুটে এসেছে। পুরুষদের বেশির ভাগই মুখচেনা। দু-একজনের নামও রাকেশের মনে আছে। যেমন গন্না আর পারস। এই দু'জন ভিড়ের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে, এদের দু'জনের স্ত্রীকেই গিরিলাল ত্রিলোকীর ভূমিসেনারা ধর্ষণ করেছিল।

রাকেশদের দেখে পুরুষেরা মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'নমস্তে হুজৌর।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে রাকেশ বলেন, 'তোমাদের গাঁয়ে চলে এলাম।'

সবার প্রতিনিধি হিসেবে গন্না বলে, 'হাঁ। গাঁওয়ে পা দিয়েই শুনলাম আপনারা এসেছেন। কুছ জরুরত হ্যায়?'

'হ্যাঁ, অনেক দরকার। গণপৎ বলছিল তোমরা সবাই গিরিলাল ঝা'র কোঠিতে গিয়েছিলে।'

'হাঁ হুজৌর।'

'এতটা রাস্তা গিয়ে রোদের মধ্যে ফিরে এসেছ। নিশ্চয়ই খুব থকে গেছ। ঘরে গিয়ে জিরিয়ে সন্ধের পর এসো। তোমাদের সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

গন্না খানিকটা ইতস্তত ক'রে বলে, 'এখনই বলুন না।'

'না। ঠাণ্ডা মাথায় তোমাদের শুনতে হবে।'

হাজার হোক, স্বয়ং 'ম্যাজিস্টর সাহিব' তো। তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে সাহস হয় না গন্নার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যথেষ্ট উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা নিয়ে তারা যে যার ঘরে ফিরে যায়।

সন্ধের ঠিক পরে পরে গন্নারা আবার ধনুয়ার ঘরের সামনে এসে ভিড় জমায়।

যদিও এখন ভরা পূর্ণিমা এবং সূর্য ডুবতে না ডুবতেই চাঁদির থালার মতো গোলাকার চাঁদটি উঠে এসেছে দিগন্তের তলা থেকে, গলানো রুপোর মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক, তবু গোটা কয়েক মশাল এনে গন্নারা এধারে ওধারে পুঁতে দিয়েছে। তা ছাড়া কেউ কেউ কালি-পড়া লণ্ঠনও নিয়ে এসেছে।

ভাগবত এবং রামলখনের সব দিকে নজর। নতুন জায়গায় গিয়ে কোন অবস্থায় পড়তে হবে, কী পাওয়া যাবে আর কী পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি ভেবে তাঁরা হেরিকেন এবং কিছু কেরোসিনও নিয়ে এসেছিলেন। হেরিকেন দুটো জ্বালিয়েছেন ঠিকই, তবে নিভু নিভু ক'রে ঘরের এক কোণে রেখে দিয়েছেন।

সারাদিন সমস্ত চরাচর পুড়ে খাক হ'য়ে যাবার পর এখন আরামদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে দক্ষিণ দিক থেকে। বিকেলে গন্নারা চলে যাবার পর রাকেশরা পুব দিকের কুয়োর পাড়ে গিয়ে স্নান ক'রে এসেছিলেন। শীতল বাতাসে এখন গা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

গন্না জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের সঙ্গে কী জরুরি কথা আছে হুজৌর?'

রাকেশ বলেন, 'সব বলব। তার আগে অন্য দু-একটা কথা সেরে নেওয়া যাক।'

'হাঁ, কহিয়ে।'

'শুনেছি, গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিং তোমাদের এই ঘরবাড়ি নতুন ক'রে বানিয়ে দিয়েছে।'

গিরিলালদের প্রসঙ্গ টেনে আনায় বিব্রত বোধ করে গন্না। মুখ নামিয়ে আস্তে ক'রে বলে, 'জি। ঝা'জি আউর সিংজিকা বহুত কিরপা।'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, কৃপাই বটে।' তাঁর কণ্ঠস্বরে তীব্র চাপা শ্লেষ লুকনো রয়েছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আজ গিরিলালজিরা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?'

গন্নার পাশ থেকে পারস এবার উত্তর দেয়, 'জমিনে লাঙল নামাতে হবে, কবে থেকে আমরা কাজ শুরু করব, এই নিয়ে বাতচিত হ'ল। সকালে গিয়ে-ছিলাম, দুফারে আমাদের আসতে দিলেন না ঝা'জিরা, ভাত-ডাল-সবজি-দহি আর বুন্দিয়া দিয়ে 'বড়িয়া ভোজন' করিয়ে তবে ছাড়লেন।'

'ও, আচ্ছা। তা কবে থেকে তোমরা ঝা'জিদের জমিনে কাজ শুরু করছ?' রাকেশ পারসের চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্নটা করেন।

পারস বলে, 'ঝা'জিদের ইচ্ছা, দো-এক রোজের ভেতর জমিনে নেমে যাই।'

গন্না বলে, 'ঝা'জিরা বলেছে ভাল মজুরি দেবে। হর আদমীকা—পুরুষ হোক আর আওরতই হোক—দশগো রুপাইয়া নগদ মিলবে। এত্তে পাইসা আগে আমরা পাই নি।'

'খুব ভাল কথা। কিন্তু—'

'কা?'

দূরে পাহাড়ের রেঞ্জের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'বিনোবাজি যখন এসেছিলেন তখন ওখানে কিছু পাথুরে পড়তি জমিন তোমাদের দিয়েছিলেন না ঝা'জিরা?'

পারস বলে, 'হাঁ।'

'সেই জমিনগুলো নিয়েই তো যত গোলমাল হয়েছিল।'

'হাঁ।'

'জমিনগুলো গিরিলালজিরা এবার নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন।'

পারস হকচকিয়ে যায়। কী উত্তর দেবে যখন ভেবে পাচ্ছে না, সেই সময় গন্না দ্রুত বলে ওঠে, 'ওহী জমিন নিয়ে গিরিলালজিদের সঙ্গে আমাদের কথা হয় নি। তব্—'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তবে কী?'

'কিরপা ক'রে গিরিলালজিরা যখন নয়া ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, জমিনও জরুর দিয়ে দেবেন।'

'সে তো ভাল কথা। এত কিছুই যখন ওঁরা করলেন তখন খুনখারাপিটা করালেন কেন? এতগুলো মেয়ের ইজ্জৎই বা নষ্ট হ'ল কেন?'

সমস্ত জমায়েতটা স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকে।

রাকেশ কখনও চড়া গলায়, উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলেন না। অনেক কাল বিচার বিভাগে কাজ করার কারণে তাঁর কণ্ঠস্বর ত্বরাহীন এবং ধীর। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মধ্যে অনেকটা উত্তেজনা যেন চারিয়ে যায়। গলার স্বর বেশ উঁচুতে তুলে বলেন, 'তোমরা কী ধরনের মানুষ গন্না! ষোল সতেরটা লোক খুন হ'ল, এতগুলো মেয়ের সর্বনাশ হ'ল, আর যে-ই গিরিলালরা ঘর বানিয়ে দিলে, বেশি পয়সা কামাইয়ের ব্যবস্থা করল, অমনি সব ভুলে গেলে! নিজেদের মান-ইজ্জতের কথা একবার ভাবলে না!'

রাকেশ ধারাবনীবাসী মানুষগুলির ভেতরকার লুপ্তপ্রায় মর্যাদাবোধ উসকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু গন্নাদের তেতে ওঠার আদৌ কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

হাতজোড় ক'রে, শিরদাঁড়া ঝুঁকিয়ে ঝাপসা কাঁপা গলায় গন্না বলে, 'কা ক'রে হুজোর? হামনিলোগ বহোত গরিব আদমী। মান-ইজ্জতের কথা মনে ক'রে রাখলে খাব কী হুজোর? বালবাচ্চা নিয়ে সিরিফ ভুখা মরে যেতে হবে।'

গন্নাদের অসহায়তা, দারিদ্র্য এবং নিরুপায়তা বুঝতে পারেন রাকেশ। গরীবের চাইতেও গরীব এই মানুষগুলোর মেরুদণ্ডে জোর থাকবে কোত্থেকে? পেটের দানার জন্য যাদের গিরিলালদের করুণার ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয় তাদের পক্ষে আত্মসম্মান বা মর্যাদা বজায় রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কেঁচো বা কৃমিকীটের মতো পিঠ বাঁকিয়ে মুখ বুজে চিরকাল তাদের চলতে হয়। তাদের নারীদের সম্মান বা পুরুষদের খুন হওয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়।

রাকেশ সোসাইটির যে স্তরের মানুষ সেখানে এমন গণহত্যা এবং ধর্ষণ ঘটলে সারা দেশ তোলপাড় হ'য়ে যায়। সেই লেভেল থেকে তিনি সব কিছু দেখছেন। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত মান-সম্ভ্রম অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু যাদের দু বেলা পেট ভ'রে খেয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাদের কাছে ধর্ষণ বা গণহত্যা তেমন কোনো বড় ঘটনাই নয়। জলের দাগের মতো মুহূর্তে এ সব মিলিয়ে যায়।

রাকেশ বলেন, 'তোমরা তো এ কথা বলছ। কিন্তু ধনুয়া এ ব্যাপারে কী বলে তা কি জানো?'

জনতা চুপ ক'রে থাকে।

রাকেশ ফের বলেন, 'তোমাদের এখানে আসার আগে আমরা জঙ্গলে গিয়েছিলাম। পুরো এক রাত সেখানে কাটিয়ে এসেছি।'

সামনের ভিড়টা এবার চমকে ওঠে। গন্না শুধোয়, 'ধনুয়াদের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওদের জন্যেই তো রাতটা জঙ্গলে থেকে যেতে হ'ল। অনেক কথাও হয়েছে ওদের সঙ্গে।' বলতে বলতে থেমে যান রাকেশ, ধারাবনী গ্রামের মানুষজনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে থাকেন। এখানে আসার আগে তাঁরা যে ধনুয়াদের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছেন, এটা তারা ভাবতে পারে নি। বিমূঢ়ের মতো তারা তাকিয়ে থাকে।

রাকেশ বলেন, 'ওরা আমাকে কী বলেছে জানো?'

রুদ্ধস্বরে ভিড়ের ভেতর থেকে একটা আধবুড়ো লোক বলে ওঠে, 'কী হুজোর?'

'গিরিলালদের ওপর বদলা না নেওয়া পর্যন্ত ওরা গাঁয়ে ফিরে আসবে না।'

চারিদিকে হঠাৎ গভীর স্তব্ধতা নেমে আসে। ঝিঁঝিদের বিলাপ বা কামার-

পাখিদের চিৎকারও এখন শোনা যাচ্ছে না। চরাচরের যাবতীয় শব্দ একেবারে থেমে গেছে যেন।

অনেকক্ষণ বাদে গোঙানির মতো আওয়াজ ক'রে গন্না বলে, 'ধনুয়া বহোত তেজী ছোকরা। আনোখি চাচা বুড্ঢা হ'লে কী হবে, জানের পরোয়া করে না। লেকেন হুজৌর, আমাদের সিনা বিলকুল কমজোর। বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করি, পেটের দানা জোটাতেই জান চৌপট হ'য়ে যায়। গিরিলালজিদের মতো বড়ে আদমীর সঙ্গে আমাদের কি লড়াই চলে! ওরা যা-ই করুক, আমাদের মুখ বুজে সইতে হয়। আমরা নালিয়ার গান্ধা পোকা হুজৌর—আদমী নেহী।' বলতে বলতে গন্নার গলা বুজে আসে।

রাকেশ বুঝতে পারেন এই মানুষগুলোর মধ্যে রয়েছে অদম্য গ্লানিবোধ, অসম্মান এবং লাঞ্ছনার জন্য চাপা ক্রোধ, সেই সঙ্গে অসীম হতাশা আর নিরুপায়তা।

পারস বলে, 'গিরিলালজিরা যদি আমাদের নয়া ঘর না বানিয়ে দিত, তবু এখানে ফিরে আসতে হ'ত। গিরিলালজিদের পায়ে ধরে ওঁদের জমিনে কাম নিতে হ'ত।' হতাশার অতল প্রান্ত থেকে তার স্বর যেন উঠে আসতে থাকে।

যারা আগে থেকেই হেরে বসে আছে তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা খুবই দুরূহ ব্যাপার। রাকেশ বলেন, 'সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু এত বড় অন্যায় ক'রে গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের লোকেরা পার পেয়ে যাবে?'

ভিড়ের ভেতর থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সাহস কারো হয় না।

রাকেশ বলেন, ঠিক আছে, এখনই তোমাদের কিছু বলতে হবে না। ভালো ক'রে ভেবে দু-চারদিন পর জানিও।'

গন্না শুধোয়, 'দো-চার রোজ বাদ আপনাদের কোথায় পাব?'

'কেন, এখানেই।'

'আপনারা আমাদের গাঁওয়েই থাকবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। গণপৎদের ও-বেলা বলেই দিয়েছি।'

'লেকেন—'

'কী?'

'ঝা'জি আর সিংজি যদি গুস্‌সা হ'ন?' গন্না ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

রাকেশ বলেন, 'গুস্‌সা হ'লে কী আর করা যাবে। আমরা তো আর তাদের বাড়ি গিয়ে থাকছি না।'

'ঠিক হ্যায়, আপহীকা মর্জি। তবে গিরিলালজিদের খবরটা দিতে হবে।

রাকেশ চমকে ওঠেন, 'আমাদের আসার খবর?'

'হাঁ, হুজৌর। গিরিলালজিরা বলে দিয়েছেন, বাইরে কোনো আদমী গাঁওয়ে এলে ওঁদের যেন জানিয়ে দিই।'

'বেশ তো, জানিয়ে দিও।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গন্নারা একসময় চলে যায়, আর রাকেশরা ঘরের বাইরেই ব'সে থাকেন।

একসময় রাকেশ বলেন, 'এদের কথা শুনে আমার তো কিছুই ভাল মনে হচ্ছে না চাচাজি।'

ভাগবত মৃদু হাসেন। বলেন, 'ভীষণ হতাশ হ'য়ে পড়েছ, দেখছি।'

'তা হয়েছি। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে কিছু করা যাবে না।'

'দেখ রাকেশ, পৃথিবীতে কোনো বড় কাজই খুব সহজে করা যায় না। অনন্ত কাল যা চলে আসছে তা একদিনে বদলে দেওয়া কি এতই সোজা! ধারাবনী গাঁয়ের এই সব লোককে প্রথমে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। সে জন্য যা দরকার তা হ'ল অসীম ধৈর্য।'

রাকেশ পলকহীন ভাগবতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এই বৃদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রামী যা বলেছেন তার সবটুকুই সত্যি। কিন্তু ধারাবনীর মানুষজনের ভেতরে যে ঘুমন্ত বারুদ রয়েছে তা দিয়ে গিরিলালদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটাবার অফুরন্ত ধৈর্য তাঁর নিজের আছে কিনা, সে সম্পর্কে রাকেশেরই যথেষ্ট সংশয় হচ্ছে। এর জন্য হয়ত বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেটা কি শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব?

রামলখন বলেন, 'আমরা যখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নন-কোঅপারেশন শুরু করেছিলাম সেইসময় ক'টা লোক আমাদের সঙ্গে ছিল? সামান্য কয়েকজন। দেশের মানুষের ধারণা ছিল ইংরেজ রাজত্ব চিরকাল টিকে থাকবে। তাদের চামড়ায় একটা আঁচড় কাটার ক্ষমতা কারো নেই। তারপর তো লাখ-লাখ মানুষ ভয় কাটিয়ে ফ্রীডম ফাইটারদের পাশে এসে দাঁড়াল। ভাল কাজ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় না। লক্ষ্যটা অবশ্য ঠিক রাখা চাই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কিভাবে কাজ শুরু করব চাচাজি?'

ভাগবত একটু চিন্তা ক'রে বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই কিছু একটা প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে রেখেছ?'

'আগে পরিষ্কার ক'রে কিছু ভাবি নি। তবে এখন মনে হচ্ছে, নতুন ক'রে

এভিডেন্স যোগাড় করব। ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, সব নিয়ে এসেছি। আপনাদের আগেই বলেছি, যাদের ওপর টরচার করা হয়েছিল তাদের ছবি তুলেছিলাম, ভয়েস রেকর্ড করেছিলাম। কিন্তু গিরিলালরা সে সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে।' কিছুক্ষণ থেমে চিন্তিতভাবে ফের বলেন, 'ভাবছি তো ছবি টবি তুলবো, ভিক্‌টিমাইজডদের ভয়েস টেপে ধরে নেবো, কিন্তু পারব কিনা বুঝতে পারছি না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন ভাগবত, বলেন, 'ঠিকই বলেছ, এখানকার লোক-জনেরা এবার আর মুখ খুলতে রাজী হবে ব'লে মনে হয় না। তবু চেষ্টা করতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আরেকটা কথা—'

'কী চাচাজি?' জিজ্ঞাসু চোখে রাকেশ ভাগবতের দিকে তাকান।

ভাগবত বলেন, 'কাল আমাদের একবার থানায় যেতে হবে। আমরা যে এসেছি, এবং আমাদের ওপর অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা জানিয়ে রাখা দরকার।'

'অ্যাটাকটা হবে ব'লে আপনার মনে হচ্ছে?'

'হোক, না হোক, আগে থেকে জানিয়ে রাখলে থানার ওপর তো বটেই, গিরিলালদের ওপর একটা প্রেসার কনস্টাণ্টলি থেকে যাবে। আসলে ব্যাপার কী জানো, যুদ্ধে যখন আমরা নেমেই পড়েছি, শত্রুপক্ষকে কোনো দিক থেকেই সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। ওরা চাল দেবার আগেই আমাদের এমনভাবে এগুতে হবে যাতে ওরা দিশেহারা হ'য়ে যায়।'

রামলখনও ভাগবতের কথায় সায় দিয়ে বলেন, 'ঠিক কথা। লড়াইতে অফেন্স ইজ দা বেস্ট ডিফেন্স।'

রাকেশের আগে মনে হয়েছিল, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা বুঝিবা শুধু ভাবা-বেগের ঝোঁকেই চলেন। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁদের বাস্তববোধ অত্যন্ত প্রখর। রাকেশ গোড়া থেকেই ভেবে রেখেছিলেন, গিরিলালদের ব্যাপারে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন কিন্তু কী করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। এখন মনে হচ্ছে, ভাগবতরা যা বলেছেন সেটাই সঠিক পদ্ধতি।

রাকেশ বলেন, 'কাল কখন থানায় যাবেন?'

'সকালের দিকেই চলে যাব।'

'থানাটা কোন দিকে চেনো তো?'

'চিনি। হাইওয়ে দিয়ে নওলপুরা যাওয়ার রাস্তায় পড়ে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ভাগবত বলেন, 'থানা থেকে একেবারে এখানকার বাজার টাজার ঘুরে আসতে হবে।'

রাকেশ একটু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন চাচাজি?'

ভাগবতের হ'য়ে রামলখন মজার গলায় এবার যা জবাব দেন তা এইরকম। এখানে কিছুদিন তো সংসার পেতে থাকতে হবে। বায়ুসেবন ক'রে আর দেহধারণ সম্ভব নয়, শূন্য উদরে গিরিলালদের সঙ্গে লড়াই চালানো যাবে না। অতএব বাজার থেকে স্টোভ চাল-ডাল আনাজপাতি ইত্যাদি কিনে আনা দরকার।

এখানেও সেই বাস্তববুদ্ধি। রাকেশ বলেন, 'তা তো বটেই।'

চৌত্রিশ

কুঁদরীরা পদ্মপাতায় মুড়ে যে রোটি আর ভাজি দিয়েছিল তাতে দুপুরের খাওয়া তো হয়েছেই, তারপরও অনেকটাই বেঁচে গেছে। বাকি খাবারে রাত্তিরটা বেশ ভালভাবেই কেটে গেছে।

দূরদর্শী ভাগবতেরা ধারাবনীতে আসার সময় কিছু বিস্কুট, চিড়ে, ছোলা, আখের গুড় এবং ছোট মফস্বল শহরের বেকারিতে তৈরি পাউরুটি নিয়ে এসে-ছিলেন। সকালে গুড় দিয়ে পাউরুটি খেয়ে ধনুয়ার ঘরে শেকল তুলে রাকেশরা যখন বেরিয়ে পড়লেন তখনও ধারাবনী গাঁ ভাল ক'রে জেগে ওঠে নি। যে দু-চারজনের ঘুম ভেঙেছে তাদের কেউ কেউ তাদের ঘরের বারান্দায় ব'সে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙছে, কেউ বা ভ্যারেণ্ডা কি নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজছে।

রাকেশরা বলেন, 'আমরা একটু বেরুচ্ছি। সন্ধে নাগাদ ফিরে আসব। আমাদের মালপত্তর ধনুয়ার ঘরে রইল। তোমরা একটু নজর রেখো।'

কেউ উত্তর দেয় না। দু চোখে ভয় এবং বিস্ময় ফুটিয়ে লোকগুলো রাকেশদের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে শুধু।

গাঁ থেকে বেরিয়ে তিন জন সোজা পশ্চিম দিকের কাচ্চী ধ'রে এগিয়ে চলেন। এই পথটা এঁকে বেঁকে ধনুয়াদের জঙ্গলের পাশ দিয়ে দুধলিগঞ্জ হ'য়ে সোজা হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে।

হাইওয়েতে যখন তিন জন এসে পৌঁছন, দুপুরের সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে

উঠেছে। আরো মাইল দুয়েক তাঁদের হাঁটতে হবে। তার পর এ অঞ্চলের থানা। আরো ঘণ্টাখানেক বাদে রাকেশরা সেখানে চলে আসেন।

পঞ্চাশ-ষাটটা গাঁয়ের মধ্যে এই একটা মাত্র থানা। থানা আর কি, মাঝারি কমপাউণ্ডের ভেতর টালির চালের একটা লাল বাড়ি। মূল থানাটা ওখানেই। পেছন দিকে নানা মাপের টালির চালের আরো কয়েকটা পাকা ঘর। সেগুলো থানাদার, সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবলদের ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স। থানার ভেতর একধারে একটা লক-আপও রয়েছে।

থানাটা ঘিরে ভাঙাচোরা কমপাউণ্ড ওয়াল। সামনের দিকে কাঠের নড়বড়ে গেট। গেট পেরুলেই অনেকটা পাঁশুটে রঙের ফাঁকা ঘাসের জমি। জমিটার একধারে ক'টা অর্জুন আর পিপর গাছ। পিপর গাছের গায়ে গোটা তিনেক হতচ্ছাড়া চেহারার ঘোড়া বাঁধা আছে। আর রয়েছে একটা জিপ। এদিকে দূর গাঁয়ের দিকে সব জায়গায় পাকা রাস্তাঘাট তৈরি হয় নি, তাই ঘোড়ায় চেপে থানাদার আর কনস্টেবলদের চোর-ডাকাতের খোঁজে বেরুতে হয়।

জিপ এবং ঘোড়া টোড়া ছাড়া গাছতলায় গোটাকয়েক দড়ির চৌপায়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। থানার ঢালা বারান্দাতেও দেখা যাচ্ছে আরো ক'টা চৌপায়া। সেখানে বিরাট ঘেরের হাফ প্যাণ্ট এবং গেঞ্জি গায়ে জন দুই কনস্টেবল ডান হাতের তেলোতে কাঁচা তামাকে চুন ডলে ডলে খৈনি বানাচ্ছে। দু'-জনেরই বিপুল চেহারা, জয়ঢাকের মতো বিশাল ভুঁড়ি, ঘাড়ে-গর্দানে চর্বির থাক। মাথায় ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, পেছন দিকে টিকির গোছা।

রাকেশরা কাঠের গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকেন। পুরনো কব্জায় ক্যাঁচ কোঁচ ক'রে আওয়াজ হয়। খৈনি ডলতে ডলতে চোখ তুলে তাকায় কনস্টেবলরা কিন্তু তাদের কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'ওসি'র সঙ্গে দেখা করব। উনি আছেন?

নির্বিকার ভঙ্গিতে একটা কনস্টেবল বলে, 'দু'পহরকা ভোজনকা বাদ আভ্‌ভি নিদমে হ্যায়।'

রাকেশ বললেন, 'কখন ঘুম ভাঙবে?'

'কমসে কম তিন চার ঘণ্টা বাদ।'

ঘড়ি দেখে রাকেশ এবার বলেন, 'এখন একটা বেজে দশ। তিন ঘণ্টা ঘুমোলেও চারটের আগে দেখা হওয়ার আশা নেই। কিন্তু আমরা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আপনারা থানেদারজিকে খবর দিন।'

'হুকুম নেহী।'

'কিসের হুকুম?'

'নিদ তোড়নেকা।'

রাকেশ এমনিতে ধীর স্থির মানুষ, সব ব্যাপারেই তাঁর অসীম সংযম। কিন্তু অসহ্য রোদে লু-বাতাসের ভেতর দিয়ে এতটা রাস্তা পেরিয়ে আসার পর থানা অফিসারের দিবানিদ্রার খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোয়াল শক্ত হ'য়ে উঠেছিল। মস্তিষ্কে প্রবল চাপ টের পান তিনি। মনে হয়, মাথার দু'ধারের শির ছিঁড়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বিচারকের ধৈর্য এবং সংযম তাঁর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে দেয় না।

নিস্পৃহ থাকলেও রাকেশের চেহারা পোশাক ইত্যাদি দেখে কনস্টেবলটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছে তিনি সাধারণ দেহাতী মানুষ নন। সঙ্গের বৃদ্ধ মানুষ দু'টিও যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এ অঞ্চলের গেঁয়ো চাষাভুষো হ'লে থানার ভেতর ঢোকার আগেই ভাগিয়ে দিত তারা। কিন্তু রাকেশদের সেভাবে হাঁকানো সম্ভব না। তবু খুবই নিরাসক্ত স্বরে কনস্টেবলটা বলে, 'এক কাম কীজিয়ে, থোড়া ইধার উধার ঘুমকে বিকালমে আ যাইয়েগা। ওহী টাইম দেখা উখা হোগা।'

রাকেশ বলেন, 'আমাদের এখানে কোথাও যাওয়ার নেই। ওসি'র সঙ্গে কাজ সেরে ফিরে যাব।'

কনস্টেবলটার এতক্ষণে হয়ত করুণাই হয়। বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে সে বলে, 'তবে এক কাজ করুন।' ডানদিকের একটা দরজা দেখিয়ে বলতে থাকে, 'উঁহা বেঞ্চি উঞ্চি হ্যায়। যতক্ষণ না থানেদারজির নিদ ভাঙছে বসে বসে আরাম করুন।'

এতক্ষণ চুপচাপ ভাগবত এবং রামলখন কনস্টেবলের বিচিত্র সংলাপ শুনে যাচ্ছিলেন। তার পরামর্শটি শোনার পর আর তাঁদের পক্ষে মুখ বুজে থাকা সম্ভব হয় না। ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের থানেদার কি বীমার?'

প্রশ্নের ধাঁচ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কনস্টেবল বিমূঢ়ের মতো বলে, 'মতলব?'

'জানতে চাইছি আপনাদের থানেদারজির তবিয়ত ঠিক আছে তো? না কোনো অসুখ বিসুখ করেছে?'

'বিলকুল ঠিক আছে।' রীতিমত অবাকই হ'য়ে যায় কনস্টেবলটি, 'বুখার উখার হবে কেন?'

'অসুখ হয় নি, তবু দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছেন! সরকার থেকে ঘুমোবার জন্তে

নৌকরি দেওয়া হয়েছে ?'

থানার অফিসার-ইন-চার্জ সম্পর্কে এ জাতীয় প্রশ্ন করার স্পর্ধা কারো হ'তে পারে, কনস্টেবলটা তা ভাবতেই পারে না। তার দুই চোখ একেবারে গোলাকার হ'য়ে যায়। প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে যাওয়ার পর প্রচণ্ড রাগে সে যখন ফেটে পড়তে যাবে, সেই সময় ভাগবত বলেন, 'আপনার অফিসারের ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিন, রাকেশ সহায় জরুরি কাজে তাঁর কাছে এসেছেন।'

খেপে উঠতে গিয়েও থেমে যায় কনস্টেবলটা। রাকেশ সহায় নামটা আগে কোথাও শুনে থাকবে সে। গলার ভেতর বিড় বিড় ক'রে বার কয়েক নামটা আওড়ানোর পর আচমকা কিছু মনে পড়ে যায়। স্বয়ংক্রিয় পুতুলের মতো সে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। রাকেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপ ক্যা, ওহী ম্যাজিস্ট্রিট সাহিব ?'

রাকেশ উত্তর দেন না। রামলখন তাঁর বাঁ পাশ থেকে বলেন, 'হ্যাঁ, তিনিই।'

এবার ম্যাজিকের মতো কাজ হ'য়ে যায়। হাতের খৈনি ছুঁড়ে ফেলে পায়ে পা ঠেকিয়ে আনুষ্ঠানিক পুলিশী কায়দায় একটা সেলাম ঠোকে কনস্টেবলটা। প্রতিক্রিয়া মুহূর্তে দু নম্বর কনস্টেবলটির মধ্যেও চারিয়ে যায়। সে-ও নিজের বিশাল শরীরটাকে এই হ্যাঁচকায় টেনে তুলে খৈনি টৈনি ফেলে হুবহু একই পদ্ধতিতে স্যালুট করে।

দুই কনস্টেবলই এবার কপালে হাত ঠেকিয়ে রেখে সবিনয়ে এবং সভয়ে জানায়, তারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে প্রথমে চিনতে পারে নি, কেননা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এজলাসে মোটে একবারই তাঁকে তারা দেখেছিল। তা ছাড়া রাকেশ সহায় যে এই ছোটামোটা নগণ্য পুলিশ চৌকিতে আসতে পারেন, তাদের পক্ষে এটা একেবারেই অভাবনীয়। সুতরাং তাদের অনিচ্ছাকৃত কসুর যেন মাপ ক'রে দেওয়া হয়।

রাকেশ চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, সেটা আর জানানো হয় না। খবরটা যে এখান পর্যন্ত পৌঁছয়নি তা বোঝাই যাচ্ছে। তিনি অবশ্যই সৎ এবং মোরালিস্ট। নৈতিকতার দিক থেকে পদত্যাগের কথাটা গোপন করার জন্য তাঁর মনের মধ্যে খচ খচ করে। কিন্তু অবোধনারায়ণের বেলায় তিনি যা ভেবেছিলেন এবারও সে-ভাবেই ব্যাপারটা দেখেন। প্রথমত, কনস্টেবলরা জানতে চায় নি তিনি এখনও ম্যাজিস্ট্রেট আছেন কিনা। প্রশ্ন যখন করে নি তখন আগ বাড়িয়ে উত্তরই বা দেবেন কেন ? তা ছাড়া কিছু গোপন করলে যদি একটা ভাল কাজ হ'য়ে যায়, ক্ষতি নেই। তবু ভেতরে ভেতরে সূক্ষ্মভাবে অস্বস্তি চলতেই থাকে।

রাকেশ বলেন, 'কবে আপনারা আমার কোর্টে গিয়েছিলেন ?'

প্রথম কনস্টেবল জানায়, ধারাবনীর গণহত্যার অভিযোগে যে আসামীদের ধরা হয়েছিল তাদের কোমরে দড়ি আর হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে তারা তাঁর আদালতে হাজির করেছিল।

রাকেশ মনে করতে পারেন না। বুটপট্টি এবং ধরাচূড়ো-পরা অবস্থায় তিনি এই দুই কনস্টেবলকে দেখে থাকবেন কিন্তু এখনকার এই হাফ-প্যাণ্ট গেঞ্জি-পরা অর্ধ-উলঙ্গ চেহারার সঙ্গে সেটা মেলানো সম্ভব নয়। অবশ্য সেজন্য তাঁর এতটুকু আগ্রহও নেই। গম্ভীর হাকিমি স্বরে তিনি বলেন, 'এখন কি দারোগা সাহেবকে খবর দেওয়া যেতে পারে ?'

'জরুর স্যার। তুরন্ত যাতে হেঁ।'

একজন কনস্টেবল রাকেশদের সঙ্গে ক'রে ডানদিকের বড় ঘরখানায় এনে বসায়। আরেক জন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর দিকে চলে যায়।

বেশিক্ষণ বসতে হয় না, মিনিট দশেকের ভেতর প্রথম কনস্টেবলটির সঙ্গে কোমরের বেল্ট আঁটতে আঁটতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে ওসি পুরন্দর সিং। লোকটা রাজপুত, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কনস্টেবল দুটোর মতো সে শরীরে চর্বির পাহাড় জমিয়ে তোলে নি। এই বয়সেও চেহারা টান টান, চুলের বেশির ভাগটাই কাঁচা।

কাঁচা ঘুম থেকে যে তাকে তুলে আনা হয়েছে সেটা পুরন্দর সিংয়ের মুখ-চোখ দেখেই টের পাওয়া যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দারোগার ইউনিফর্মটি চড়িয়ে ফেলেছে সে।

মোলায়েম বিগলিত হেসে কোমর থেকে শরীরের ওপর দিকটা অনেকখানি বাঁকিয়ে জোড়হাতে পুরন্দর বলে, 'স্যার, আপনি এখানে এসেছেন, এই পুলিশ চৌকিতে আপনার মতো মানুষের পায়ের ধুলো পড়ল, এটা যে কত বড় সৌভাগ্য—'

হাত তুলে পুরন্দর সিংকে থামিয়ে দিতে দিতে রাকেশ বলে, 'ও সব কথা থাক। আমাদের—'

পুরন্দর কিন্তু থামে না, 'মী লর্ড, তবিয়তটা ক'দিন ধ'রে ভাল যাচ্ছে না, তাই দুপহরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জরুর কসুর হ'য়ে গেছে। ক্ষমা ক'রে দিন। সরকারী নৌকর হ'য়ে থানার চার্জে থেকে এটা করা ঠিক হয় নি।'

'আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। আমি পুলিশের হায়ার

অথরিটি নই।'

'লেকিন মী লর্ড, আপনি ম্যাজিস্ট্রেট—'

লোকটা একটু বেশিই বক বক করে। অগত্যা খানিকটা কঠোর স্বরে রাকেশকে বলতে হয়, 'আমরা অনেক দূর থেকে রোদ মাথায় নিয়ে আসছি। কাজের কথাটা শেষ ক'রেই ফিরে যেতে হবে।'

পুরন্দর শশব্যস্তে বলে, 'কাজের কথা পরে হবে স্যার। আগে জিরিয়ে নিন।' তারপরই গলা চড়িয়ে হৈচৈ জুড়ে দেয়, 'এ সমুন্দর ঝা, জলদি ইধর আও—'সেই দুই কনস্টেবলের একজন দৌড়ে এলে বলে, 'তুরন্ত ঠাণ্ডাই আউর প্যাঁড়া-উড়া লাও—'

সমুন্দর যে গতিতে ঢুকেছিল তার তিন গুণ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রাকেশ বলেন, 'কিছু দরকার নেই। আপনি বসুন অফিসার।'

রাকেশের কণ্ঠস্বরে এমন এক কাঠিন্য এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাতে আর কিছু বলতে সাহস হয় না পুরন্দরের। নিজের গদি-মোড়া আরামদায়ক চেয়ারটিতে না ব'সে দূরে একটা বেঞ্চে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ব'সে পড়ে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট যেখানে বেঞ্চে ব'সে আছেন সেখানে তার পক্ষে চেয়ারে বসা খুবই খারাপ দেখাবে। অতটা দুঃসাহস এবং স্পর্ধা পুরন্দরের নেই।

রাকেশ ভাগবতদের দেখিয়ে বলেন, 'আগে এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর আসল কথা বলা যাবে।'

যে কোনো কারণেই হোক স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভাগবত এবং রামলখনের নাম পুরন্দর শুনে থাকবে। সে একেবারে হকচকিয়ে যায়। বলে, 'স্যার, এত বড় বড় মানুষ পুলিশ চৌকিতে এত কষ্ট ক'রে কেন এলেন, বুঝতে পারছি না।'

রাকেশ ধারাবনীতে তাঁদের আসা থেকে শুরু ক'রে থানায় আসার উদ্দেশ্য পর্যন্ত সমস্ত কিছু বলেন, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমাদের এখানে আসতে হয়েছে। আপনার কাছে আগাম একটা ডায়েরি ক'রে যেতে চাই। লিখে নিন।'

অবিশ্বাস্য কোনো নাটকীয় কাহিনী যেন শুনছে পুরন্দর সিং। বিভ্রান্তের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'কিসের ডায়েরি স্যার?'

রাকেশ বলেন, 'আমরা ধারাবনীতে কিছুদিন থাকব। মাসখানেক আগে সেখানে সতেরো আঠারো জন মানুষকে যারা খুন করল, সেই মার্ডারারদের ধরবার জন্যে আমরা অনবরত প্রেসার দিয়ে যাব। এতে নিশ্চয়ই গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিং খুশি হবে না। তারা আমাদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। আগাম

ডায়েরি সেই কারণে। ডায়েরি বুকটা বের করুন।'

রাকেশের কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘাম ছুটে যায় পুরন্দরের। সে কাঁপা গলায় বলে, 'লেকিন স্যার—'

বিপুল কর্তৃত্বে, প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতেই রাকেশ বলেন, 'আপনাকে যা বলছি তা-ই করুন।'

ঢোক গিলে বেজায় ঘামতে ঘামতে পুরন্দর সিং বলে, 'ত্রিলোকীজি গিরিলালজি এই এলাকার অত্যন্ত রেসপেক্টেড পার্সন। তাঁদের সম্বন্ধে ডায়েরি করাটা খুব খারাপ দেখাবে। ওঁরা ডিফেমেসান কেস করতে পারেন।'

'আপনার দামী পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু ডিফেমেসান কেস করলে আমার বিরুদ্ধেই করবে। আপনার নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই।'

পুরন্দর সিং চুপ ক'রে বসে থাকে। এই লোকটির সঙ্গে গিরিলালদের যোগ-সাজশের আভাস রাকেশ আগেই পেয়েছিলেন। কে জানে, গিরিলালরা নিয়মিত তাকে টাকাপয়সা দিয়ে থাকে কিনা, নইলে ডায়েরি লিখতে এত অনিচ্ছা কেন, যেখানে তার কোনোরকম ঝুঁকিই নেই?

রাকেশ পুরন্দরের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলেন, 'আপনি যদি ডায়েরি লিখতে না চান, আমি এস. পি'র কাছে গিয়ে লিখে জমা দিয়ে আসব। তা ছাড়া কোর্ট আর নিউজ পেপারকেও জানিয়ে দেবো। আমাদের প্রোটেকসানের যে প্রয়োজন আছে, এটা নিশ্চয়ই আপনার বোঝা উচিত।'

রীতিমত ভয় পেয়ে যায় পুরন্দর সিং। ডায়েরি বুক এবং ডট পেন বের করতে করতে শিথিল গলায় বলে, 'ঠিক আছে স্যার, আপনি যা ভাল বোঝেন—'

'আমি যে আশঙ্কা করছি, গিরিলালরা আমাদের ক্ষতি করবেন, সেটা না-ও করতে পারেন। তবু নিরাপত্তার জন্যে আগে থেকে ব্যবস্থা ক'রে রাখা খুবই জরুরি। বিশেষ ক'রে ধারাবনীর মতো জায়গায় যেখানে কিছুদিন আগেই ঠাণ্ডা মাথায় অতগুলো লোককে মার্ডার করা হয়েছে, আগুন দিয়ে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—'

ডায়েরি লেখা হ'য়ে গেলে পুরন্দর সিং বলে, 'স্যার, একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'আপনি একটু আগে বললেন, আসল খুনীদের ধরার জন্যে আপনারা ধারাবনীতে এসেছেন। লেকিন—'

'কী?'

'আমরা তো খুনীদের ধ'রে আপনার আদালতে চালান করেছি।'

'যাদের আপনারা ধরেছেন তারা কি সত্যি সত্যিই খুন করেছে?'

পুরন্দর সিং চমকে ওঠে। ঝাপসা শিথিল গলায় বলে, 'হ্যাঁ স্যার। ওদের বিরুদ্ধে অনেক এভিডেন্স আছে।'

রাকেশ বলেন, 'এ সব নিয়ে পরে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। অনেকক্ষণ এসেছি, এবার আমরা যাব। আপনার ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।' বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ান। দেখাদেখি ভাগবতেরাও উঠে পড়েন।

তিন জন অফিস রুমের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকেন। পুরন্দর সিং রুদ্ধশ্বাসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের গেট পর্যন্ত চলে আসে। হাতজোড় ক'রে বলতে থাকে, 'দুপহরে এলেন, আপনাদের কোনো সেবাই করতে পারলাম না।'

'আপনার বিব্রত হবার কারণ নেই। খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন, সে জন্যে ধন্যবাদ। আচ্ছা চলি।' রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান রাকেশ। বলেন, 'আপনাকে একটা ছোট খবর দেবার আছে অফিসার।'

পুলিশ চৌকির বাইরে দৌড়ে চলে আসে পুরন্দর সিং, 'কী খবর স্যার?' তার কণ্ঠস্বরে গভীর আগ্রহ।

'আমি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। এখন এ দেশের একজন সাধারণ মানুষের বেশি আমি আর কিছু নই।'

পুরন্দরের চোখেমুখে একই সঙ্গে বিস্ময় রাগ এবং আরো নানা রকমের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে থাকে। রাকেশ সহায় এভাবে বোকা বানিয়ে যাবেন, এটা সে ভাবতে পারে নি। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যেত লোকটা আর ম্যাজিস্ট্রেট নেই, তাকে এত খাতিরদারি করার কারণই ছিল না। গিরিলালদের বিরুদ্ধে ডায়েরিটাও এত সহজে লেখাতে পারতেন না রাকেশ। অন্তত বারকয়েক তাঁকে ঘোরানো যেত।

পরক্ষণেই অবশ্য পুরন্দরের খেয়াল হয়, রাকেশ ম্যাজিস্ট্রেট না থাকলেও তিনি দেহাতী ঐরু গৈরু ভৈরুদের স্তরের মানুষ নন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে রয়েছে দু'জন বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী। গেঁয়ো চাষাভুষোদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা যায় এঁদের সঙ্গে তা একেবারেই অসম্ভব।

ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি যিনি ছেড়ে দিতে পারেন তাঁর মনের জোর যে যথেষ্ট এটা বোঝা যাচ্ছে। দুই স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছাড়াও তাঁর পেছন আর কে কে

আছেন, তাঁরা কতটা ক্ষমতাবান, সেটা এই মুহূর্তে আঁচ করা সম্ভব নয়। আজকাল সব কিছুর মধ্যে সূক্ষ্ম অদৃশ্য রাজনীতি এমনভাবে, জড়িয়ে গেছে যে চোখকান খুলে হুঁশিয়ার হ'য়ে পা না ফেললে ধ্বংস অনিবার্য। পুরন্দর মনে মনে স্থির ক'রে ফেলে রাকেশের পদত্যাগ এবং ধারাবনীতে এসে ঘাঁটি গাড়ার সঠিক কারণটা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

এদিকে রাকেশ রেজিগনেসানের খবরটা দিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকেন নি। ভাগবতদের সঙ্গে ক'রে ডান দিকে এগিয়ে যান।

বিহার গভর্ণমেণ্ট এই হাইওয়েটার দু'ধারে প্রচুর কড়াইয়া আর পিপর গাছ পুঁতে দিয়েছিল, সেগুলো ডালপালা মেলে মাথার ওপর ছাতা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গরমের এই দুপুরে গনগনে লু-বাতাস চারিদিকে যখন আগুন ছড়িয়ে চলেছে, সেই সময় এই ছায়াচ্ছন্ন হাইওয়ে ধ'রে হাঁটতে ততটা কষ্ট হচ্ছে না।

রাস্তায় লোকজন চোখেই পড়ে না। মাঝে মধ্যে দু-একটা দূর পাল্লার বাস বা ট্রাক ঝড় তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রামলখন বলেন, 'এবার বাজার কি হাটের খোঁজ কর রাকেশ। কেনাকাটা সেরে ফিরে যেতে হবে।'

রাকেশ বলেন, কাউকেই তো দেখছি না, কাকে হাটের কথা জিজ্ঞেব করব? ওসি'র কাছে জেনে এলেই হ'ত।' একটু ভেবে বলেন, 'আপনারা গাছতলায় দাঁড়ান, আমি জেনে আসি।'

রাকেশকে থানায় অবশ্য ফিরতে হয় না, উল্টো দিক থেকে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করতে করতে একটা বয়েল গাড়ি আসছিল। সেটা থামিয়ে রাকেশ গাড়িওলাকে হাট বা বাজারের খোঁজ দিতে বলেন।

গাড়িওলা ছইয়ের তলা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে পেছন দিকটা দেখিয়ে দেয়, 'উহা একগো বাজার হ্যায় সাহিব।'

'কত দূরে?'

'ইহাই, নজদিগ। 'রশি'ভর পায়দল যানা পড়েগা।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

তেলহীন কব্জায় আওয়াজ তুলে বয়েল গাড়ির চাকা ফের গড়াতে গড়াতে এগিয়ে যায়।

বাজার থেকে দিন দশেকের মতো চালডাল আটা তেল মশলা এবং অন্য সব দরকারী জিনিস কিনে রাকেশরা যখন ধারাবনীতে পোঁছুলেন, সন্ধে নামতে শুরু করেছে।

পঁয়ত্রিশ

ছেলেবেলাটা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে কাটেনি রাকেশের। বাপুজি অর্থাৎ রাজেশ্বর দেশের কাজে বেশির ভাগ সময়টাই ইংরেজদের জেলে জেলে কাটাতেন। ক্বচিৎ কখনো ছাড়া পেলে মণিহারির বাড়িতে আসতেন। কিন্তু দু-একমাস যেতে-না-যেতেই ফের বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নতুন কোনো আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তেন। তার নিশ্চিত পরিণতি, আবার জেল।

একমাত্র মায়ের স্কুলের চাকরির টাকায় সংসার কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে চলত। তবে একদিক থেকে বাঁচোয়া, মণিহারিতে মাথা গোঁজার মতো ঠাকুরদার তৈরি বাড়িটা ছিল।

চাকরি পাওয়ার পর অবশ্য অভাব বা অস্বাচ্ছন্দ্য আর ছিল না। যে সব সরকারী কোয়ার্টার বা বাংলোয় রাকেশকে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেখানে বিলাসের উপকরণ না থাকলেও আরামের ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু জঙ্গলে ধনুয়াদের কাছে একটা রাত এবং ধারাবনীতে আরেকটা রাত কাটিয়ে প্রায় বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়েছেন রাকেশ। অভ্যস্ত জীবন থেকে অনেক দূরে এই দেহাতগুলোতে মাথার ওপর ফ্যান নেই, টয়লেট নেই, ইলেকট্রিসিটি এখানে অলীক স্বপ্নের ব্যাপার। ফ্যান-ট্যান না হ'লেও হয়ত চালিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু টয়লেটটা রাকেশের পক্ষে ভীষণ জরুরি। কিন্তু এই ধারাবনীতে তা দুরাশা মাত্র। এখানে চারপাশে আদিগন্ত খোলা মাঠ। কিছু শস্যক্ষেত্র, কিছু রুক্ষ কাঁকুরে পড়তি জমি। তা ছাড়া রয়েছে ঝোপঝাড় এবং জঙ্গল। এগুলোই এখানকার প্রকৃতির বানানো টয়লেট হিসেবে লাগানো হয়ে থাকে আবহমান কাল ধ'রে। সেদিন রগড় করে ভাগবতরা 'ডি-ক্লাসড' হওয়ার কথা বলছিলেন। ভারতবর্ষের আনপড়, গরীবের চাইতেও গরীব সব মানুষের মধ্যে তাদের স্বার্থে কাজ করতে এসেছেন। ঝোপেঝাড়ে টয়লেটের কাজ সারার মধ্যে দিয়েই নিজের আপার মিডল ক্লাস স্তরটিকে ভুলে যাওয়ার প্রক্রিয়া নতুন ক'রে শুরু করতে হবে।

কাল রাতে শুয়ে শুয়ে নানা চিন্তার মধ্যে এই কথাগুলো বহুবার রাকেশের মস্তিষ্কে নাড়া দিয়ে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙতে আজ অনেকটা দেরি হ'য়ে যায়। কাল পুলিশ চৌকি এবং

বাজার ঘুরে ফিরে আসার পর শরীর এমনই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল যে খাওয়া-দাওয়ার পর শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

এমনিতে সূর্যোদয়ের আগেই উঠে পড়েন রাকেশ। কিন্তু আজ চোখ মেলতেই দেখা গেল, ঝলমলে রোদে ঘর ভ'রে গেছে। অর্থাৎ বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে।

শুয়ে শুয়েই ঘরের বাইরে ভাগবত এবং রামলখনের গলা শুনতে পেলেন রাকেশ। তাঁরা কী একটা ব্যাপারে যেন কথা বলছিলেন।

নাঃ, সত্তর-পেরুনো এই মানুষ দু'টির সঙ্গে পারার উপায় নেই। এঁরা যেন হিউম্যান রোবোট। কাল একসঙ্গে তাঁরা পুলিশ চৌকি আর বাজারে গেছেন, ফিরেছেনও একই সঙ্গে। কিন্তু ক্লান্তি ব'লে কোনো কিছুই বোধ হয় তাঁদের শরীরে নেই। যন্ত্রমানবের অভ্রান্ত নিয়মে আজও নিশ্চয়ই ভোরে তাঁরা উঠেছেন এবং অভ্যাসমতো সব কাজ সেরে ফেলেছেন।

দ্রুত উঠে পড়েন রাকেশ। বিছানা-টিছানা একধারে গুটিয়ে রেখে বাইরে আসতে চোখে পড়ে দুই স্বাধীনতা-সংগ্রামী বারান্দায় শতরঞ্জি বিছিয়ে ব'সে ব'সে গল্প করছেন। একধারে নতুন স্টোভে সাঁ সাঁ আওয়াজ তুলে কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। রাকেশ লক্ষ করলেন, এর মধ্যে দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নান-টান সেরে ফেলেছেন ওঁরা।

ভাগবত বলেন, 'ঘুম ভাঙল ?'

রাকেশ লজ্জা পেয়ে যান। বলেন, 'হ্যাঁ, ভীষণ দেরি হ'য়ে গেল।'

'তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে ডাকিনি। কাল এত ঘোরাঘুরি করেছ, অভ্যাস তো নেই। তাই ভাবলাম, যতক্ষণ পারো ঘুমোও। অবশ্য চা হ'য়ে গেলেই তোমাকে ডেকে তুলতাম। মুখ-টুখ ধুয়ে নাও—' ব'লে জলভর্তি চারটে প্লাস্টিকের বালতি দেখিয়ে দেন।

সংশয়ের গলায় রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'জল কোত্থেকে আনলেন চাচাজি ?'

ভাগবত জানান, দূরের সেই বিল থেকে আনা হয়েছে।

দুই বৃদ্ধের ব'য়ে আনা জল দিয়ে মুখ ধোওয়ার কথা ভাবতেই প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করেন রাকেশ। বলেন, 'না না, তা হয় না চাচাজি, আমি বিল থেকে ঘুরে আসছি।'

'সঙ্কোচের কারণ নেই। তুমি বিল থেকে ঘুরে আসতে আসতে চা কি আর খাওয়ার মতো থাকবে ? যাও যাও, মুখ ধুয়ে নাও।'

অগত্যা বিব্রতভাবে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে শেভিং সেট, একটা বালতি, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে বিলের দিকে চলে যান রাকেশ। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে

দেখেন, আনাজ কেটে, চাল ডাল ধুয়ে রান্নার তোড়জোড় করছেন ভাগবতরা। এই ব্যাপারটা একেবারেই মাথায় ঢোকে না রাকেশের, রান্নাবান্নার কিছুই জানেন না তিনি। যত অস্বস্তিই হোক, ভাগবতদের রাঁধা ডাল-ভাত তাঁকে খেতেই হবে।

ভাগবত বলেন, 'রান্নাটা সেরে একবার বেরুতে হবে রাকেশ।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় চাচাজি?'

'গাঁয়ের লোকজনের কাছে।'

ভাগবতের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারেন রাকেশ। ধারাবনীর মানুষজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গিরিলালদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে চাইছেন। রাকেশ জানেন, এটা করতেই হবে। নইলে এই গ্রামে পড়ে থাকার মানে হয় না। তিনি উৎসাহের স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ। রোদ বেশি চড়ার আগে বেরিয়ে পড়লে ভাল হয়।'

ভাগবত বলেন, 'আধঘণ্টার ভেতর রান্না চুকে যাবে। তারপরই বেরুব।'

শেষ পর্যন্ত আজ আর বেরুনো হ'য়ে ওঠে না। ভাত-তরকারি-ডাল, স্টোভ, হাতা, মশলার কৌটো টৌটো ঘরের ভেতর গুছিয়ে রেখে সবে তিনজন বারান্দায় এসেছেন, সেই সময় দূর থেকে একটানা কিসের শব্দ যেন ভেসে আসে। রাকেশরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।

রামলখন চোখ কুঁচকে চিন্তিতভাবে বলেন, 'ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ব'লে মনে হচ্ছে।'

উৎকর্ণ হ'য়ে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করেন বাকি দু'জন। শব্দটা ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। ভাগবত বলেন, 'হুঁ'। 'তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরুতে থাকে।

রামলখন বলেন, 'কী ব্যাপার ভাগবত? ঘোড়ায় চড়ার মতো লোক এ গাঁয়ে তো কেউ নেই।'

'দেখা যাক, একটু অপেক্ষা ক'র না।'

তিনজন ধনুয়ার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পলকহীন উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ধুলোয় ধুলোয় ধারাবনী গ্রামকে ঢেকে দিয়ে এক জোড়া ঘোড়সওয়ার তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

অশ্বক্ষুরধ্বনি থেমে গেছে কিন্তু প্রচণ্ড তেজী দুই ঘোড়া জিভ বের ক'রে হাঁপাতে থাকে। জন্তু দুটোর পিঠে হট্টকট্টা চেহারার প্রবল শক্তিমান দুটো লোক। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তাদের মজবুত চেহারা, গালের মাঝামাঝি

পর্যন্ত চওড়া জুলপি, নাকের তলায় মোমে-মাজা চৌগাঁফা। ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, মাথার পেছন দিকে টিকির গোছ। পরনে ধুতি পাকিয়ে পরা, তার ওপর লাল হাফ শার্ট। দু'জনেরই এক কানে সোনার মাকড়ি, পায়ে ভারী চামড়ার নাগরা। তাদের সমস্ত চেহারায় এবং চোখেমুখে কোথায় যেন খানিকটা লুকনো নিষ্ঠুরতা রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে।

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে লোকদুটো নেমে পড়ে। ধনুয়ার ঘর থেকে সামান্য দূরে একটা পুরনো পরাস গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক উঁচুতে সেটার ডালে এখনও টকটকে লাল অজস্র ফুল। ঘোড়া দুটোকে পরাস গাছের গায়ে বেঁধে দুই ঘোড়সওয়ার আবার রাকেশদের কাছে ফিরে আসে।

রাকেশ ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তবে ভাগবতদের নির্লিপ্ত মুখচোখ দেখে তাঁদের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না।

লোকদু'টো কয়েক পলক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাকেশদের লক্ষ করে। তারপর হাতজোড় ক'রে শান্ত গলায় বলে, 'নমস্তে—'

রাকেশরা প্রতি-নমস্কারের জন্য দুই হাত সামান্য ওপরে তোলেন। তবে মুখে কিছু বলেন না।

একটা লোক এবার সরাসরি রাকেশকে জিজ্ঞেস করে, 'আপ জরুর ম্যাজিস্টর সাহিব হোগা?'

রাকেশ উত্তর না দিয়ে মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন।

লোকটা এবার ভাগবতদের দেখিয়ে ফের প্রশ্ন করে, 'এঁরা তো ভাগবতজি আর রামলখনজি। ইণ্ডিয়ার আজাদীর জন্যে আংরেজদের সাথ বহোত ভারী লড়াই করেছিলেন?'

অর্থাৎ রাকেশদের ব্যাপারে প্রচুর খবর যোগাড় ক'রে এ লোকদুটো এসেছে। উত্তর না দিয়ে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কারা?'

লোকটা বলে, 'আমি নামধারী আর ও হ'ল ঘনিয়া।' ব'লে নিজের সঙ্গীকে দেখিয়ে দেয়।

'তোমরা থাকো কোথায়?'

'এই নজদিগ। পাশের গাঁওতে।'

'আমাদের খবর তোমাদের কে দিল?'

নামধারী কিছুটা বিব্রত বোধ করে। কী জবাব দেবে যখন ভেবে পাচ্ছে না, সেই সময় ঘনিয়া তাকে বাঁচিয়ে দেয়। বলে, 'লোকের মুখে শুনলাম আপনারা

এখানে এসেছেন।'

রাকেশ বলেন, 'এই সব লোকেরা কারা?'

ঘনিয়া অতীব তুখোড়। সে তক্ষুনি বলে, 'ঐ হাটিয়ার লোকজন। ওরা বলাবলি করছিল; কথাটা আমাদের কানে এল। তাই—'

মাত্র একদিন হল তাঁরা এখানে এসেছেন। কাল নৌপুরার বাজারে অবশ্য গিয়েছিলেন কিন্তু হাটুরে দোকানদারদের পক্ষে তাঁদের পরিচয় জানা সম্ভব নয়। তাঁরা কারা সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানতেও চায় নি। তাঁদের দিক থেকেও নিজেদের পরিচয় চাউর ক'রে বেড়ানোর কোনো প্রশ্নই ছিল না। কেনাকাটা সেরে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। ঘনিয়ারা যে ডাহা মিথ্যে বলছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

রাকেশ বলেন, 'এবার আসল কথাটা বল।'

না বোঝার ভান ক'রে ঘনিয়া বলে, 'জি, আপনি কিসের কথা বলছেন?'

'তোমাদের কারা পাঠিয়েছে?'

ঘনিয়া হকচকিয়ে যায়। বলে, 'এ আপনি কী বলছেন ম্যাজিস্টর সাহিব? কারা আবার আমাদের পাঠাবে? খুদ নিজেদের ইচ্ছেতেই চ'লে এলাম।'

রাকেশ ঘনিয়ার চোখ থেকে চোখ সরান নি। এখানে আসার কৈফিয়ৎ হিসেবে সে যা বলে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে গম্ভীর কঠিন স্বরে তিনি ফের আগের প্রশ্নটাই করেন, 'কারা তোমাদের পাঠিয়েছে?

ঘনিয়ার মতো পেশাদার মাসলম্যান বা বন্দুকবাজরা প্রচণ্ড বেপরোয়া, দুনিয়ার কোনো কিছুকে তারা ভয় পায় না। কিন্তু রাকেশের কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেশ থতিয়ে যায় ঘনিয়া। ঢোক গেলে বলে, 'বিশোয়াস করুন ম্যাজিস্টর সাহিব—'

হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে রাকেশ সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন, 'গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিং তোমাদের পাঠায় নি?'

ঘনিয়াকে সায় দিতেই হয়, 'হাঁ। মতলব—'

এবারও তাকে শেষ করতে দেন না রাকেশ। বলেন, 'তোমাদের দুই হুজুরকে গিয়ে খবর দিও, আমরা এখন ধারাবনীতে থেকে যাচ্ছি। যতক্ষণ না এখানকার আসল খুনীদের ধরা না হচ্ছে, এ গাঁ ছেড়ে যাব না।'

'লেকিন ম্যাজিস্টর সাহিব—'

'বল।'

'আপনারা এই গাঁওয়ে থাকেন, ঝা'জি আর সিংজি বিলকুল পসন্দ করবেন না।'

'তোমাদের তারা এ কথা জানাবার জন্যে পাঠিয়েছে ?'

'নহী', নহী' —'

'তবে কী ক'রে বুঝলে পসন্দ করবে না ?'

'ওঁদের কথা শুনে মনে হয়েছে। আপনারা ঝা'জিদের সঙ্গে কথা ব'লে এখানে এলে ভাল করতেন ম্যাজিস্টর সাহিব।'

কথাগুলো সবিনয়ে এবং পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো মুখ ক'রেই বলেছে ঘনিয়া কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা হুঁশিয়ারি লুকনো রয়েছে। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে রাকেশ বলেন, 'এই গাঁ কি তোমার হুজুরদের যে এখানে থাকার জন্যে তাদের হুকুম নিতে হবে ?'

ঘনিয়া জানায় এ অঞ্চলে সেরকম নিয়মই চালু আছে। গিরিলাল এবং ত্রিলোকীর পছন্দ-অপছন্দর ওপর এখানে সমস্ত কিছু নির্ভর করে। আশেপাশের তিরিশ চল্লিশটা গ্রামে তাদের 'রাজ'ই চালু রয়েছে।

রাকেশ চাপা বিদ্রূপের স্বরে বলেন, 'তাই নাকি ? আমাদের জানা ছিল না। না জেনে ভীষণ অন্যায় ক'রে ফেলেছি। যাক, তোমাদের হুজুরদের জানিয়ে দিও তারা পসন্দ না করলেও আমরা এখানে থাকব। এটা স্বাধীন দেশ, কারো খাস তালুক না। বুঝেছ ?'

এতক্ষণ নিজের স্বভাবটাকে একটা খাপের ভেতর যেন আটকে রেখেছিল ঘনিয়া। রাকেশের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই তার চোয়াল শক্ত হ'য়ে ওঠে, ছোট ছোট গোল দুই চোখের তলা থেকে আগুনের তীব্র ঝলক বেরিয়ে আসে। এখন তাকে অত্যন্ত হিংস্র দেখায়। চাপা কর্কশ গলায় ঘনিয়া বলে, 'কাজটা ভাল করলেন না সাহিব।' ব'লে সঙ্গীর দিকে ফেরে, 'চল নামধারিয়া—'

দু'জনে পরাস গাছের তলায় তাদের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যায়।

ঘনিয়া পরিষ্কার হুমকি দিয়েছে। লোকটার স্পর্ধা এবং দুঃসাহসে প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে যান রাকেশ। বোঝাই যাচ্ছে, গিরিলালেরা সহজে তাঁদের ছেড়ে দেবে না। যে উদ্দেশ্যে তাঁরা এখানে এসেছেন তা করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে মারাত্মক বাধা আসবে।

রাকেশ লক্ষ্য করেন, বাঁধন খুলে ঘনিয়ারা দ্রুত ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে পড়ে। লাগাম বাগিয়ে ধ'রে জন্তুদুটোর পাঁজরায় নাগরার ঠোকর দিতেই তারা গ্রামের ভেতরের দিকে চলতে শুরু করে। খানিকটা যাওয়ার পর ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'সাহিব, আমরা খবর পেয়েছি, আপনি আর ম্যাজিস্টর নেই। থানায় গিয়েও এখন আর ফায়দা নেই। হোঁশিয়ার—'

এতক্ষণে ধৈর্য এবং সংযম অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন রাকেশ। টের পান, অসহ্য রাগে তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে আসছে। উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রামলখন এবং ভাগবত তাঁকে থামিয়ে দেন।

রাকেশ খানিকটা শান্ত হ'লেও তাঁর উত্তেজনা পুরোপুরি কাটে না। বলেন, 'লোকদুটোর কী ঔদ্ধত্য! আমাদের শাসিয়ে গেল!'

রামলখন বলেন, 'ওরা ভাড়াটে গুণ্ডা—মাসলম্যান। মনিবের হুকুম তামিল করা ওদের কাজ। ওরা ওদের ডিউটি ক'রে গেছে। উত্তেজিত হ'য়ে ওদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে শক্তিক্ষয় করার মানে হয় না। যুদ্ধের জন্যে অন্য বড় ফ্রন্ট রয়েছে।

মাথার ভেতরটা তখনও উত্তপ্ত হ'য়ে আছে রাকেশের। রামলখন যা বলেছেন তার প্রতিটি অক্ষর যে ঠিক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবু ক্ষোভের গলায় বলেন, 'ওরা আমাদের এভাবে শাসিয়ে যাবে, ভাবতে পারি না।'

রামলখন মৃদু হাসেন, কোনো উত্তর দেন না।

এদিকে ধুলো উড়িয়ে ঘনিয়াদের ঘোড়া দু'টো সামনের এক বাঁক ঘুরে গ্রামের ভেতর চলে যায়। তাদের আর দেখা না গেলেও বেশ কিছুক্ষণ অশ্বক্ষুরের টগবগ ছুটে চলার আওয়াজ গরম বাতাসে ভেসে আসতে থাকে।

রাকেশ বলেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

রামলখন বলেন, 'বেরুবার মুখেই বাধা পড়ে গেল। তা ছাড়া রোদ অনেকটা চড়ে গেছে। লোক দু'টো মেজাজও খারাপ ক'রে দিয়ে গেল। মনে উত্তেজনা নিয়ে কাজের কাজ হয় না। ওবেলা রোদ পড়লে যাওয়া যাবে।'

ভাগবতও সায় দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, সে-ই ভাল।'

রামলখনের কথাটা মনঃপূত হয় রাকেশের। ঘর থেকে শতরঞ্জি বের ক'রে এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিয়ে বলেন, 'এখন আর কোনো কাজ যখন নেই, এখানেই বসা যাক।'

তিনজন বসার পর হঠাৎ কিছু মনে পড়তে রাকেশ বলেন, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না চাচাজি।'

ভাগবত বলেন, 'কী কথা?'

'আমরা যে ধারাবনীতে এসেছি, এই খবরটা এত তাড়াতাড়ি গিরিলালেরা পেয়ে গেল কী ক'রে? অবশ্য পি. ডব্লু. ডি বাংলোর কেয়ারটেকার অবোধনারায়ণ দিতে পারে। তার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু চাচাজি—'

'কী ?'

'অবোধনারায়ণের কাছ থেকে খবর পেলে কালই ওরা আমাদের কাছে ঘনিয়াদের পাঠিয়ে দিত।'

'আমার ধারণা খবরটা থানা থেকেই গেছে। ওসি পুরন্দর সিং নিশ্চয়ই ওদের জানিয়েছে। ঘনিয়া কী ব'লে গেল, খেয়াল করেছ ?'

'কী বলুন তো ?'

'তুমি যখন আর ম্যাজিস্ট্রেট নেই তখন থানায় গিয়ে আর লাভ হবে না। তার মানে আমরা যে পুলিশ চৌকিতে গিয়েছিলাম, সে খবর ওরা পেয়ে গেছে। তা ছাড়া তুমি যে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছ, ওরা জানবে কী ক'রে ? সোর্সটা কোথায়, আশা করি, এবার বুঝতে পারছ।'

উত্তেজিত থাকায় এই কথাটা ভাল ক'রে ভেবে দেখেন নি রাকেশ। কিন্তু এর সম্ভাবনাই বেশি ব'লে মনে হচ্ছে। পুলিশ চৌকিই তাঁদের খবর পাওয়ার সোর্স। অবশ্য অবোধনারায়ণ খবরটা এখনও না পাঠিয়ে থাকলে, নির্ঘাত যে পাঠাবে, সে ব্যাপারে রাকেশ শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত।

রামলখন বলেন, 'পুলিশ, পলিটিসিয়ান আর ল্যাণ্ডলর্ডদের মধ্যে যে গোপন গাঁটবন্ধন রয়েছে সেটা বেশ ধরা যাচ্ছে।'

আগেই তা টের পেয়েছিলেন রাকেশ। নইলে আসল হত্যাকারীদের না ধ'রে অন্য কতকগুলো লোককে চালান করল কেন ? তাঁর বিশ্বাস এরা কোনোভাবেই খুনখারাপির সঙ্গে জড়িত নয়। যথেষ্ট সাক্ষীপ্রমাণ এদের বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে না যেগুলো দিয়ে সাজা দেওয়া যায়। একদিন না একদিন আদালত থেকে এই লোকগুলো ছাড়া পেয়ে যাবে এবং সত্যিকারের খুনীদের চামড়ায় একটা টোকাও পড়বে না। পুলিশ-পলিটিসিয়ান আর ল্যাণ্ডলর্ডের জাঁতাতে এত বড় গণহত্যা একেবারে চাপা পড়ে যাবে। আস্তে মাথা নেড়ে রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ। এখন আমাদের কী করণীয় ?'

'আপাতত নতুন কিছু করার নেই। আগে থেকে যে প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে এখন সেটাই চালিয়ে যাব। তবে যথেষ্ট অ্যালার্ট থাকতে হবে। কোন দিক থেকে, কখন, কি রকম চেহারায় ওদের অ্যাটাকটা আসে, সেটাই এখন লক্ষ্য রাখতে হবে।'

রাকেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আচমকা দূর থেকে মাইকে গমগমে গলা ভেসে আসে। কথাগুলো ঠিক বোঝা যায় না, শুধু গাঁক গাঁক আওয়াজটাই উল্টোপাল্টা তপ্ত বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

ভাগবত এবং রামলখন রীতিমত অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। মানব সভ্যতা থেকে অনেক দূরে উত্তর বিহারের এই সব হতচ্ছাড়া চেহারার গাঁ। ছ ছ'টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কবেই পার হ'য়ে গেছে কিন্তু এখনও বিজলী আসার নাম নেই। এই শতাব্দীতে যে আসবে তারও কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। ভাগবত বলেন, 'ইলেকট্রিসিটি নেই। তা হ'লে মাইক বাজছে কী ক'রে ?'

রাকেশ চকিতে ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। বলেন, 'পোর্টেবেল মাইক, ব্যাটারি দিয়ে চালানো হচ্ছে।'

ভাগবত বলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো। কে মাইক নিয়ে এল ?' তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখায়।

একটু চিন্তা ক'রে রাকেশ বলেন, 'আমার ধারণা ঘনিয়ারা এনেছে। ওরাই খুব সম্ভব গাঁয়ের লোকদের কিছু বোঝাচ্ছে।'

'কী বলছে কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

'আমি গিয়ে ব্যাপারটা দেখা আসব ?'

'এখন গিয়ে দরকার নেই। গাঁয়ের লোকদের কী বলছে, পরে নিশ্চয়ই জেনে নেওয়া যাবে।'

ছত্রিশ

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়েছিলেন রাকেশ। ক্লান্তি এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এত গরমেও বিছানায় গা ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে যায়।

দুপুরে ঘুমনোর কোনোকালেই অভ্যাস নেই ভাগবতদের। তাঁরা বেশ কিছু বই সঙ্গে ক'রে এনেছেন। টিনের বাক্স থেকে বই বের ক'রে দু'জনে তার ভেতর ডুবে গেলেন।

বিকেলে রোদের তাপ যখন পড়তে শুরু করেছে সেই সময় রামলখন রাকেশের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। আর ভাগবত বই বন্ধ ক'রে স্টোভে চা বসিয়ে দেন।

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে ভাগবত বলেন, 'এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

রাকেশ টেপ রেকর্ডার এবং ক্যামেরা চামড়ার একটা সাইড ব্যাগে ঝুলিয়ে নেন।

ধনুয়ার ঘর থেকে নিচের রাস্তায় নেমে হাঁটুভর ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে ওঁরা

কিছুক্ষণের মধ্যে ধারাবনী গাঁয়ের মাঝখানে চলে আসেন। কাল গোড়ার দিকে শক্ত সমর্থ পুরুষদের একজনকেও পাওয়া যায়নি, তারা গিরিলালদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আজ অবশ্য সবাই গ্রামেই রয়েছে। একটা রাস্তায় এসে দেখা গেল দু-একজন নিজের নিজের ঘরের বারান্দায় কি রাস্তায় চৌপায়া পেতে বসে আছে। তবে বেশির ভাগই এখানে ওখানে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে কী এক ব্যাপারে চাপা গলায় আলোচনা করছে। বিষয়টা যে গুরুতর, তাদের মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়।

রাকেশদের দেখামাত্র সবাই হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। তাদের ভাবভঙ্গি তটস্থ। কেউ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। সবাই যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

এদের অনেককেই আগে জঙ্গলে দেখেছেন কিন্তু কারো নাম বিশেষ ভাবে মনে করতে পারলেন না রাকেশ। চারপাশের মানুষজনকে লক্ষ করতে করতে পতিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। পতিয়া ধারাবনীর ধর্ষিতা মেয়েদের একজন। তার একটা ইণ্টারভিউ টেপ করেছিলেন তিনি, ছবিও তুলেছিলেন। পতিয়ার মরদ বা স্বামী গন্নার নামটাও কার কাছে যেন শুনেছিলেন। আনোখি বা ধনুয়া কেউ বসেছিল। নামটা ভুলে যান নি। হঠাৎ তিনি ব'লে ওঠেন 'তোমাদের ভেতর গন্না কে?'

সবাই মুখ বুজে চুপচাপ ভীত পলকহীন চোখে রাকেশদের দিকে তাকিয়ে ছিল। গন্নার নাম বলতেই ডান পাশের জটলাটার মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হ'য়ে যায়। একটা রোগাটে ঢ্যাঙা যুবককে দেখিয়ে একজন বলে, 'এহী সাব।'

রাকেশ নরম গলায় ডাকেন, 'এখানে এস।'

এত লোকজনের ভেতর একমাত্র তার ডাক পড়ায় গন্না এমনই ঘাবড়ে যায় যে কী করবে, কী বলবে, আদৌ রাকেশদের কাছে এগিয়ে যাবে কিনা, ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। সে আশপাশের অন্য গাঁওবালাদের দিকে দিশেহারার মতো তাকাতে থাকে।

রাকেশ ফের বলেন, 'কোনো ভয় নেই। এস—এস—'

দুই হাত জোড় ক'রে দম-আটকানো গলায় গন্না বলে, 'হামনি কুছ নহীঁ জানতা সাব। হামনিকো কুছ কসুর নহীঁ। দুসরা কিসিকো বুলাইয়ে।'

ভাগবত রাকেশের পাশ থেকে খুব সদয় গলায় বলেন, 'সবাইকেই ডাকব, সবার সঙ্গেই কথা বলব। তুমি আগে এস। আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না।'

তবু ভরসা পায় না গন্না। সে একটানা বলে যেতে থাকে, 'হামনি কুছ নহীঁ

জানতা সাব, কুছ নহী জানতা।'

অগত্যা রাকেশরা জটলাটার কাছে এগিয়ে যান।

এদিকে প্রতিটি ঘরের দরজায় এবং জানালায় অনেক মেয়েপুরুষের ভীরু মুখ দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, তবে রাকেশদের কাছে ঘেঁষে নি, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রাকেশ গন্নাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার ঘরবালীর নাম তো পতিয়া।'

সন্ত্রস্ত মুখে গন্না বলে, 'হাঁ সাব।'

'আমরা তার সঙ্গে দেখা করব। আমাদের তোমার ঘরবালীর কাছে নিয়ে চল।' রাকেশ বলেন।

জোরে শ্বাসটানার মতো আওয়াজ ক'রে গন্না বলে, 'উসকী পাশ আপ-লোগেনকা কা জরুরত?'

রাকেশ এবার পতিয়ার ইণ্টারভিউ নেওয়া এবং ছবি তোলার কথা বলেন। সেগুলো কীভাবে গিরিলালেরা নষ্ট ক'রে দিয়েছে সে সব জানিয়ে বলেন, 'আমরা ফের ওর সঙ্গে কথা বলব, ওর ছবি তুলব। বেলা পড়ে আসছে। এরপর আর ছবি তোলা যাবে না। চল—' প্রায় তাড়াই দেন গন্নাকে।

গন্নার ভয় এবং উৎকণ্ঠা আচমকা দশ গুণ বেড়ে যায়। সে প্রবল বেগে মাথা আর হাত নেড়ে বলতে থাকে, 'মাফ কীজিয়ে ম্যাজিস্টর সাব। হামনিলোগ কুছ নহী জানতা—' ব'লেই ভিড় ঠেলে আচমকা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে পালানোর হিড়িক পড়ে যায় যেন। ভিড়টা মুহূর্তে পাতলা হ'য়ে যেতে থাকে। দু-একজন বয়স্ক লোক ছাড়া যুবকেরা সবাই উধাও হ'য়ে গেছে।

একটা আধবুড়ো ক্ষয়াটে চেহারার লোক, পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে আসে। লোকটাকে চেনেন রাকেশরা। কাল গিরিলালদের সঙ্গে দেখা করার পর ধারাবনীতে ফিরে যারা তাঁদের কাছে গিয়েছিল তাদের সকলের প্রতিনিধি হিসেবে এই লোকটিই কথা বলেছিল। সে সসম্ভ্রমে বলে, 'হুজৌর, একটা কথা বলব যদি গুস্‌সা না হয়।'

'না না, রাগ করব কেন? তোমার নামটা কাল জানা হয়নি। আগে নামটা বল, পরে কথা শুনব।'

'হুজৌর আমার নাম জগনাথ।'

'এবার যা বলছিলে বল।'

জগনাথ বলে, 'হুজৌর, আপনারা আমাদের ভালাই করার জন্যে এই গাঁওয়ে এত তখালিফ ক'রে আছেন। লেকেন আমাদের ভালাই খুদ ভগোয়ান রামজিও

করতে পারবে না। বলছিলাম, আর কষ্ট করবেন না, কিরপা ক'রে টৌনে ফিরে যান।'

রাকেশ জগনাথের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন, 'তোমরা সবাই এত ভয় পাচ্ছ কেন? গন্নাকে ওদের ঘরে নিয়ে যেতে বললাম তো সে পালিয়ে গেল। তার দেখাদেখি অন্যেরাও সরে পড়ল।'

'সরকার, কাল আপনাদের তো সব খুলে ব'লে এসেছি। আমাদের ঘাড়ে একটাই শির আছে, দশগো নহী। আমি যা বলতে চাইছি জরুর বুঝতে পারছেন।'

রাকেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। ধারাবনীবাসী এই মানুষগুলির অসহায়তা এবং নিরুপায়তা না বোঝার কোনো কারণই নেই। জগনাথরা বুঝতে পারছে তাঁরা তাদের ভালর জন্য এখানে এসেছেন তবু তারা চায় রাকেশরা যেন এই গাঁ থেকে চলে যান এবং পুরনো স্থিতাবস্থা আগের মতোই বজায় থাকে। কতটা ভয় পেলে এমনটা সম্ভব তা পরিষ্কার টের পাওয়া যায়।

জগনাথ চারিদিক ভাল ক'রে দেখে এবার গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয়, 'হুজৌর, আপনারা আচ্ছা আদমী। একটা কথা বলব, যেন চাউর না হয়। তা হ'লে আমাদের জান খতরা হ'য়ে যাবে।'

'না না, তোমাদের বিপদ হয়, এমন কথা কেন ব'লে বেড়াব!'

'সাব, কাল গিরিলালজিরা হোঁশিয়ারি ক'রে দিয়েছিল, আমরা যেন কারো কাছে এখানকার খুনখারাবির ব্যাপারে মুখ না খুলি। আজ ফির ও দোনো আদমীকে পাঠিয়ে দিল।'

'ঘনিয়া আর নামধারীর কথা বলছ?'

দস্তুরমতো অবাক হ'য়ে যায় জগনাথ। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'আপনারা ওদের চেনেন?'

ঘনিয়াদের নাম যে রাকেশ বললেন, তার কারণ ওবেলা তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের ভেতর চলে এসেছিল। তিনি বলেন, 'আগে চিনতাম না, আজই আলাপ হয়েছে।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা মাইক নিয়ে এসেছিল—না?'

'জোরে কথা বলার মিশিন তো?'

'হ্যাঁ। তা কী ব'লে গেল ওরা?'

'গিরিলালজিরা হোঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিল, ঘনিয়ারা সারা গাঁও ঘুরে দুপাহরে (দুপুরে) সিরিফ ধমকি দিয়ে গেছে। আপনাদের কাছে মুহ্ বিলকুল

বন্ধ্ রাখতে হবে। আরো বলে গেল—' কথাটা শেষ না ক'রে জগনাথ থেমে যায়।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলেছে?'

জগনাথ ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ কী ভাবে, তারপর মাটিতে চোখ রেখে বলে, 'হামনিকা কোঈ কসুর নহীঁ হ্যায়। যো শুনা—' বলতে বলতে থেমে যায়।

রাকেশ তাকে ভরসা দিয়ে কোমল স্বরে বলেন, 'ভয় নেই। যা শুনেছ তাই বল।'

'সাব—সাব—' কুণ্ঠিতভাবে জগনাথ এবার বলে, 'ঘনিয়া বলছিল, আপনি আর ম্যাজিস্টর নেই। গিরিলালজিদের আপনি কিছুই করতে পারবেন না।'

অর্থাৎ ঘনিয়ারা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং যা-ই করুন না কেন সেটাই শেষ কথা, তাঁদের বিরুদ্ধে কারো একটা আঙুল তোলার ক্ষমতা যে নেই, এই ধারণাটা গাঁওবালাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য সারা গ্রামে ঘোড়া ছুটিয়ে মাইকে হুমকি দিয়ে গেছে। একটা ভীতিকর আবহাওয়া তৈরি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মোট কথা গিরিলালেরা চায় না, কোনোভাবেই ধারাবনীর মানুষজনের সঙ্গে রাকেশদের যোগাযোগ ঘটুক। কখনো ঘুষ দিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে, কখনো মাসলম্যান পাঠিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ধমকি দিয়ে তাদের তফাতে রাখার কৌশলটা চমৎকার বের করেছে গিরিলালেরা।

জগনাথ সংশয়ের গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কা সরকার, সচমুচ আপ আভি ম্যাজিস্টর নহীঁ হ্যায়?'

রাকেশ বলেন, 'না। ঘনিয়ারা সত্যি কথাই ব'লে গেছে। তবে তোমরা যদি সঙ্গে থাকো, গিরিলালদের এমন শিক্ষা দিতে পারি, সারা জীবনে ওরা, ভুলবে না।'

জগনাথ আঁতকে ওঠে, 'অ্যাসা মাত কহিয়েগা। কেউ শুনে ফেলবে, আমাদের জীওন খতরা হ'য়ে যাবে।'

রাকেশ তাকে সাহস দেবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আচমকা দৌড়ে ডান দিকের একটা গলিতে উধাও হ'য়ে যায় সে।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন রাকেশ। কিছুক্ষণ পর হতাশ গলায় বলেন, 'যেভাবে গিরিলালেরা স্ট্রাটেজি করেছে, কিছু করা যাবে ব'লে মনে হয় না।'

ভাগবত বলেন, 'হ্যাঁ। ঘনিয়ারা এসে ফিয়ার সাইকোসিসটা তৈরি করতে পেরেছে। তুমি কি ধারণা করেছিলে, এখানে আসামাত্র গাঁয়ের লোকেরা

তোমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে আর তোমরা গিরিলালদের টিট ক'রে ফেলবে ?'

'না, মানে—'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয় রাকেশ। গিরিলালেরা তাদের কেল্লা সাজিয়ে রেখেছে। যদি মনে কর, ওদের এগেনস্টে কিছু করতে পারবে না, ফিরে যাও। আমরা কিন্তু এখানেই থেকে যাচ্ছি।'

রাকেশের মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় যেন। সত্তর বছরের দুই বৃদ্ধ যেখানে গিরিলালদের মতো ধূর্ত এবং শক্তিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেখানে তিনি কিনা মনে মনে হাল ছেড়ে দিতে শুরু করেছেন ! আসল লড়াইয়ের আগেই নিজের এই মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় কিন্তু দুই প্রাচীন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর কাছে ধরা পড়ে গেছে। রাকেশ যথেষ্ট বিব্রত এবং কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েন। বলেন, 'না না, আমার ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কিন্তু কী করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

রামলখন বলেন, 'এখন গাঁয়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা তো বলা যাক।'

রাকেশ বলেন, 'গিয়ে কী লাভ ? শুনলেনই তো ঘনিয়ারা মুখ খুলতে বারণ ক'রে দিয়েছে।'

'ঘনিয়ারা যা খুশি করুক। আমরা আমাদের কাজ করব। আলাদা আলাদা ক'রে সবার কাছেই আমাদের যাওয়া দরকার।'

ভাগবত বলেন, 'দেখা যাক, কতদিন ওরা মুখ বুজে থাকে।'

রাকেশ বুঝতে পারেন, গ্রামের মানুষজনের ওপর অনবরত স্নায়বিক চাপ দিতে চান ভাগবতরা। গিরিলালরা যেভাবে ভয়ের আবহাওয়া তৈরি ক'রে দিয়েছে তা থেকে তাদের বের ক'রে আনার জন্য এই চাপটা একান্ত জরুরি। তিনি বলেন, 'তা হ'লে যাওয়া যাক।'

এরপর তিনজন ধারাবনীর প্রতিটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ যায়। হাজার ডাকাডাকি ক'রেও বেশির ভাগের সাড়া মেলে না। দু-একজন ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'মাফ কীজিয়ে, হামনিলোগ কুছ নহীঁ জানতা।'

ঘোরাঘুরি করতে করতে সন্ধে নেমে যায়। ভাগবত বলেন, 'আজ ফেরা যাক। কাল ফের আসা যাবে।'

ধনুয়ার ঘরে ফিরে এসে প্রথমে হেরিকেন জ্বালিয়ে বারান্দায় রাখেন ভাগবত।

তারপর তিনজন পা ধুয়ে শতরঞ্জি বিছিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব'সে পড়েন।

এখন পূর্ণিমা চলছে। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে দূরে গাছপালার ঘেরের ওধার থেকে চাঁদির থালার মতো গোল চাঁদটি উঠে আসে। আকাশ রুপোর বুটির মতো অগুনতি তারায় ছেয়ে গেছে।

খানিক দূরে ধারাবনী গ্রামের ঘরে ঘরে মিট্টি তেলের ডিবিয়া বা লণ্ঠন একটি দু'টি ক'রে জলে ওঠে। কচিৎ কখনো নারী-পুরুষের আবছা কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে।

সমস্ত চরাচর জুড়ে এখন অগাধ স্তব্ধতা। রাকেশের মনে হয় পরিচিত পৃথিবী থেকে বহুদূরে কোনো এক রহস্যময় অলৌকিক গ্রহে তাঁরা চলে এসেছেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকার পর একসময় ভাগবত ডাকেন, 'রাকেশ—'

রাকেশ দূরে জ্যোৎস্নাধোয়া গাছপালার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'বলুন চাচাজি—'

'আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'কী ?'

'ধারাবনীর লোকজনদের শিরদাঁড়া গিরিলালরা প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। ওদের কাছে যতই আমরা যাই না কেন, কবে যে সাক্ষি দেওয়ার জন্যে ওরা এগিয়ে আসবে তার ঠিক নেই। হয়ত মাসের পর মাস আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তাই—' ব'লে একটু থামেন ভাগবত।

রাকেশ গভীর আগ্রহে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ভাগবত ফের শুরু করেন, 'কিন্তু তা তো আর সম্ভব না। আমাদের আরো নানা দিক থেকে ওদের ওপর প্রেসার দিয়ে যেতে হবে। তবে—'

সংশয়ের গলায় রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তবে কী ?'

'সে জন্যে প্রচুর লোকজন দরকার। তিনটে মানুষ দিয়ে এত বড় কাজ হবে না।'

'কত লোকজন দরকার ?'

'শ'য়ে শ'য়ে। ধারাবনীর লোকগুলো যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াত, কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যেত। কিন্তু তাদের এখন পাচ্ছি কোথায় ? কবে তাদের ভয় কাটবে সেই আশায় তো অনন্ত কাল ব'সে থাকা যায় না। মানুষ আমাদের যোগাড় করতেই হবে।'

রাকেশকে চিন্তিত দেখায়। তিনি বলেন, 'কিভাবে লোক যোগাড় করবেন, সে সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন ভাগবত। বলেন, 'আমাদের ফ্রিডম ফাইটারদের একটা অ্যাসোসিয়েসন আছে। মেইন সেণ্টারটা পাটনায়, তা ছাড়া ধানবাদ, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারন, পুর্ণিয়া, মজঃফরপুর—সব ডিস্ট্রিক্টের টাউনেই ব্রাঞ্চ আছে। এই রকম অ্যাসোসিয়েসন শুধু বিহারেই না, অন্য সব প্রভিন্সেও রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমরা মোটামুটি যোগাযোগ রেখে চলি। এই মুক্তিযোদ্ধাদের দরকার।'

রাকেশ আগ্রহ বোধ করছিলেন। তবে ধারাবনীর হত্যাকারীদের ধরা এবং তাদের শাস্তির ব্যাপারে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সংগঠনের কী ভূমিকা হ'তে পারে, এটাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

ভাগবত থামেননি, 'কালই তোমার বাবুজিকে একটা চিঠি লিখে অ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে বলব। যত জন পুরনো ফ্রিডম ফাইটারকে সম্ভব, তিনি যেন এখানে পাঠিয়ে দেন। আর নিজেও যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসেন। পঞ্চাশ ষাট জন আসতে পারলেও কাজ হবে।'

পুরনো স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এখানে এলে তাঁদের নিয়ে ভাগবতরা কী করতে চান রাকেশ বুঝতে পারছেন না। অবশ্য অনেক আগে এঁদের ব্যাপারে ভাসা ভাসা একটা ছক তৈরি করেছিলেন তিনি, তবে পরে তা নিয়ে আর বিশেষ চিন্তা ভাবনা করেন নি।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'ওঁরা এলে কী করবেন? কোনো পরিকল্পনা করেছেন কি?'

ভাগবত বলেন, 'সব কিছু নির্ভর করছে ওঁদের আসার ওপর। সকলেরই যথেষ্ট বয়েস হ'য়ে গেছে। কতজন বেঁচে আছেন, কতজন সুস্থ, সব খবর জানি না। কাল চিঠি তো লিখি। উত্তর আসুক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

রাকেশ বুঝতে পারেন, নিজের পরিকল্পনা আগে জানাতে চান না ভাগবত। তাঁকে না জানানোর কিছু নেই। তাঁর জন্যই এতদূরে এত অসুবিধা এবং বিপদ মাথায় নিয়ে ছুটে এসেছেন। আসলে যা ভেবেছেন তা যদি শেষ পর্যন্ত না করা যায় তাই আগে থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে কী লাভ? আসলে ভাগবত কাজের মানুষ, লম্বা চওড়া বক্তৃতায় বিশ্বাসী নন। রাকেশ এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

ভাগবত বলেন, 'যতদিন না ফ্রিডম ফাইটারদের অ্যাসোসিয়েসন আর তোমাদের বাবুজির উত্তর আসছে, আমাদের রুটিন চলতে থাকবে।'

সাঁইত্রিশ

আরো দিন চারেক কেটে যায়।

এর মধ্যে রাজেশ্বরকে চিঠি লিখেছেন ভাগবত। যদিও তাঁকে ফ্রিডম ফাইটারদের অ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লেখা হয়েছে তবু ভাগবত নিজেও অ্যাসোসিয়েসনের মেইন সেণ্টার এবং শাখাগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছেন। অবশ্য সব শাখার ঠিকানা তাঁর মনে নেই, সেগুলোর মনে আছে তাদেরই শুধু লিখেছেন।

এই ক'দিনে নিজেদের কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ চালিয়ে গেছেন রাকেশরা। সকলে ঘুম ভাঙার পর স্নান সেরে, রান্নাবান্না চুকিয়ে, চা খেয়ে, বেরিয়ে পড়েছেন, গ্রামের প্রতিটি ঘরে হানা দিয়েছেন। তারপর সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এলে ধনুয়ার ঘরে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বেলা হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের বেরিয়ে পড়া, আবার প্রতিটি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু ধারাবনীবাসীদের কারো মুখ থেকে জরুরি একটি শব্দও বের করা যায় নি। তাদের জবান বিলকুল বন্ধ্।

এর ভেতর চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটে নি। শুধু গ্রামের মানুষগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপটা বজায় রাখার জন্য দুপুরে খাওয়ার জন্য রাকেশরা ফিরে এলে ঘনিয়ারা ঘোড়া দাবড়ে প্রতিদিন ধারাবনীতে ঘুরে ঘুরে হুমকি দিয়ে গেছে, 'হোঁশিয়ার— হোঁশিয়ার—' বলতে দ্বিধা নেই, ঘনিয়ারা সমস্ত গ্রাম জুড়ে ভয়ের আবহাওয়াটা অটুট রাখতে পেরেছে।

এই চার দিনে রাজেশ্বর বা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অ্যাসোসিয়েসন থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া যায় নি। এমনকি দেবারতির উত্তরও আসে নি। অবশ্য ডাক বিভাগের কাজকর্মে যে ঢিলেঢালা গয়ংগচ্ছ ভাব, তাতে রাজেশ্বরদের চিঠি আসার সময় পার হ'য়ে যায় নি কিন্তু দেবারতির কী হ'ল? তাকে তো বেশ কয়েক দিন আগেই চিঠি লেখা হয়েছে! তবে কি সে সেটা পায় নি? এ ব্যাপারে বেশ ক'টা সম্ভাবনা রয়েছে। রাকেশ আগে যা ভেবেছিলেন, এখনও তা নতুন ক'রে মনে পড়ে যায়। হয় দেবারতি কলকাতায় নেই, নতুন কোনো অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে বাইরে কোথাও চলে গেছে। কিংবা ভালো অফার পেয়ে অন্য কাগজে কাজ নিয়েছে। রাকেশ শুনেছেন, সাংবাদিকরা—বিশেষ ক'রে যারা রিপোর্টিং-এর সঙ্গে যুক্ত তারা আকছার এক চাকরি ছাড়ে, আরেক চাকরি ধরে। তেমন কিছু ঘটে থাকলে তাঁর চিঠি দেবারতির পক্ষে পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

আরো একটা ব্যাপার রাকেশকে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। কে বলতে পারে, কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর ধারাবনীর হত্যাকাণ্ডের আর কোনো গুরুত্বই নেই তার কাছে। অথবা এমনও হ'তে পারে, তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। শেষের ভাবনাটার মধ্যে খানিকটা ছেলেমানুষি হয়ত আছে তবু কথাটা মনে হ'লেই বুঝিবা অকারণেই খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন রাকেশ। অথচ দেবারতির সঙ্গে তাঁর ক'দিনেরই আলাপ! একটা কাজের সূত্রে তাঁরা পরস্পরের কাছে এসেছিলেন। এক ধরনের বন্ধুত্বও তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ধারাবনীর হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ধরা এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল দেবারতি আর সাংবাদিক হিসাবে দেবারতির সাহস এবং সততায় রাকেশও অভিভূত। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সীমানা ছড়িয়ে অন্য কোনো ঘনিষ্ঠতার কারণ ঘটে নি তবু দেবারতি প্রায়ই তাঁর ভাবনায় অনেকখানি অস্থিরতা নিয়ে এসেছে ইদানীং।

আজ সন্ধেবেলা গ্রামে ঘুরে এসে রাকেশরা ধনুয়ার ঘরের বারন্দায় ব'সে কথা বলছিলেন।

পূর্ণিমা শেষ হ'য়ে আসছে। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে এখন আর চাঁদ ওঠে না, একটু রাত হ'লে উঠবে। তবে আগের মতো গোলাকার আর নেই সেটা। বিশাল চাঁদির থালা যেন ক্ষইতে শুরু করেছে। জ্যোৎস্নায় আগের উজ্জ্বলতা অনেকটাই মলিন।

এখনও চাঁদ না ওঠায় দূরের গাছপালা, মাঠ এবং আরো দূরের আকাশ ঝাপসা হ'য়ে আছে। ঝোপঝাড়ে জোনাকি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। মাঠের দিক থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। ঝানু কালোয়াতের সঙ্গে বাঘা তবলচি যেভাবে সঙ্গত করে, সেই ভাবে শিয়ালের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কামার পাখিরা গাছের শক্ত বাকলে চোখা ঠোঁট দিয়ে একটানা ঠক ঠক ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে গ্রামের ভেতরে কুকুরের চিৎকারও শোনা যায়।

রাকেশ বলেন, 'ক'দিন হ'য়ে গেল কিন্তু কারো কোনো খবর নেই।' তাঁব কণ্ঠস্বরে খানিকটা নৈরাশ্য মাখানো।

রামলখন মৃদু শব্দ ক'রে হাসেন। বলেন, 'ডোণ্ট বী পেসিমিস্ট।'

রাকেশ বুঝতে পারেন, এই দুই পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁর ভেতরকার আশাবাদকে জাগিয়ে রাখবেনই। বিব্রত-ভাবে তিনি বলেন, 'না না, মানে—'

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দূরে আলোর একটি বিন্দু চোখে পড়ে। সেটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। বোঝা যায়, ওটা একটা লণ্ঠন। চারধার-জোড়া অন্ধকার পর্দার ওপর লণ্ঠনটাকে কেমন যেন অপার্থিব মনে হয়।

রামলখন ভুরুর ওপর হাত রেখে আলোটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে করতে বলেন, 'কেউ আসছে মনে হয়।'

অন্য দু'জন লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আলোর ফোঁটাটা বড় হ'তে হ'তে রাকেশদের কাছে চলে আসে। দু'টি মূর্তিকে এবার স্পষ্ট দেখা যায়। তারা হ'ল আনোখি আর ধনুয়া। আনোখির হাতে লণ্ঠনটা ঝুলছে।

এই মুহূর্তে ধনুয়াদের কথা কেউ ভাবেন নি। রাকেশরা বেশ অবাকই হ'য়ে যান। আসলে এই ক'দিন ধারাবনীর লোকজন, ঘনিয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ধনুয়াদের কথা তেমন ক'রে মনে পড়ে নি।

রামলখন উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আচানক এই রাত্তির বেলায়? কী ব্যাপার?'

ধনুয়া বলে, 'জরুরি কাজে আসতে হ'ল।'

'আগে ব'স। একটু জিরোও, তারপর সব শুনছি।'

লণ্ঠন নামিয়ে রেখে বারান্দার এক ধারে বসে পড়ে আনোখি, তার পাশে ধনুয়া। তাদের খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সারাদিন হাটে কাজ করার পর এখানে ছুটে এসেছে। হয়ত তারা ক্ষুধার্তও।

ভাগবত বলেন, 'চা খাবে?'

ধনুয়ারা জানে চা খাওয়ার কথা বললে ভাগবতদেরই বানিয়ে দিতে হবে। এখানে রসুই করার লোকজন নেই। সঙ্কোচের গলায় দু'জনে জানায়, 'নহী নহী, চায়-পানিকা জরুরত নহী।'

কিন্তু তাদের কথা শোনেন না ভাগবত। নিজে উঠে গিয়ে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দেন। তারই মধ্যে ধনুয়া তার দরকারি কথা বলার জন্য মুখ খুলতে চেয়েছিল কিন্তু ভাগবত তাকে থামিয়ে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর চা এবং চাপাটি ধনুয়াদের দিয়ে ভাগবত বলেন, 'খেতে খেতে তোমাদের কথা বল।'

ধনুয়া এক ঢোক চা খেয়ে বলে, 'মেমসাব আ গয়ী।'

ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'কোন মেমসাহেব?'

'ওহী। কলকাত্তাকা—'

ধনুয়া 'মেমসাব' বলার সঙ্গে সঙ্গে রাকেশ বুঝতে পেরেছিলেন দেবারতি এসেছে। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায়। ধনুয়ার দিকে অনেকটা সরে এসে বলেন, 'কোথায় মেমসাহেব ?' তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রবল আগ্রহ এবং ব্যগ্রতা।

ধনুয়া জানায়, দেবারতিকে জঙ্গলে রেখে রাকেশদের খবর দেওয়ার জন্য এখানে ছুটে এসেছে।

রাকেশ বলেন, 'মেমসাহেব সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে না কেন ?'

ধনুয়া এবার যা বলে তা এইরকম। দেবারতি কলকাতা থেকে পূর্ণিয়া হ'য়ে সোজা দুধলিগঞ্জে চলে আসে। তবে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় না গিয়ে বাস থেকে প্রথমে জঙ্গলে যায়। সে বুঝতে পারছিল না রাকেশ ঠিক কোথায় আছেন। জঙ্গলে তাঁকে না পেলে সে ধারাবনী গাঁয়ে চলে আসত। কিন্তু এখানে আসা যে হয়নি তার কারণ আনোখি, ধনুয়া এবং লছিমা।

দেবারতি জঙ্গলে এসে পৌঁছেছিল সুরয ডোবার ঠিক পরেই, সন্ধের মুখটায়। বাস রাস্তা থেকে সারাটা পথ অসহ্য রোদ আর লু-বাতাসের মধ্যে হেঁটে এসেছে সে। সমস্ত শরীর তার প্রায় ঝলসে গেছে। 'মেমসাব' এমনই ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত যে একটা কদম ফেলার শক্তিও তার অবশিষ্ট নেই। এই অবস্থায় তাকে এখানে আনা সম্ভব না। আজকের রাতটা পুরোপুরি বিশ্রাম নেওয়ার পর কাল সকালে সে এখানে চলে আসবে।

ধনুয়া বলে, 'মেমসাব চলে আসতে চেয়েছিল। আমরা আসতে দিই নি। এলে জরুর বুখার হ'য়ে যেত। তখন মেমসাব বলল, আজ রাতেই তার খবরটা যেন আপনাদের পোঁছে দিই।'

ভাগবত বলেন, 'না আসতে দিয়ে ভালই করেছ। জঙ্গল থেকে ধারাবনী অনেকটা রাস্তা। নতুন ক'রে এতটা হাঁটার ধকল নেওয়া শহুরে মেয়ের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।'

রাকেশ এমনিতে সংযত, চাপা ধরনের মানুষ। কোনো কারণেই তিনি বিগলিত বা অভিভূত হ'য়ে পড়েন না। দুঃখ, শোক, বা আনন্দের প্রকাশ—সব কিছুই তাঁর অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। তবু এই মুহূর্তে তিনি টের পান, বুকের ভেতরটা প্রবল আবেগে তোলপাড় হ'য়ে যাচ্ছে। না, দেবারতি তাঁকে ভুলে যায় নি। কাঁপা গলায় বলেন, 'মেমসাহেবকে কাল সকালে ছেড়ে দিও না। আমি ভোরে তোমাদের ওখানে গিয়ে ওঁকে নিয়ে আসব।'

আনোখি বলে, 'আপনি আবার তখলিফ ক'রে যাবেন কেন ? আমরা গাঁওয়ের

নজদিগ পৌঁছে দিয়ে হাটিয়ায় চলে যাব।'

'দরকার নেই। আমি নিজেই যাব।'

রাকেশের ব্যগ্রতা এবার ভাগবত এবং রামলখনের কানেও ধরা পড়ে। তাঁরা চকিতে তাঁর মুখের দিকে তাকান, তবে কিছু বলেন না।

ধনুয়াও কিছুটা অবাক হয়েছিল। সে বলে, 'ঠিক হ্যায় সাহাব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ধনুয়া প্রশ্ন করে, 'ইঁহাকা কা হালচাল? গাঁওকা আদমীলোগন খুনখারাবিকা বারেমে মুহ্ খুলা?'

ভাগবত এখানকার পরিস্থিতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন।

ধনুয়ার চোয়াল শক্ত হ'য়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে 'শালেরা গাঁওবালাদের ধমকি দিয়ে যাচ্ছে আর ভুচ্চরগুলো তাতেই ভয় পেয়ে গেল!'

শালেরা বলতে ঘনিয়া এবং তার সঙ্গী নামধারী। আর ভূচ্চরগুলো হ'ল ধারাবনীর মানুষজন।

ধনুয়া থামেনি, গলা চড়িয়ে উগ্র ভঙ্গিতে সে ব'লে যায়, 'কায়ের (কাপুরুষ), ডরপোক, কুত্তা কাঁহিকা! আভি হমনি যাতা হ্যায়।' চায়ের গেলাস ঠক ক'রে মাটিতে নামিয়ে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ভাগবত বলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'গাঁওয়ে।'

'কেন?'

'ভেড়ুয়ার পালকে সমঝিয়ে দিয়ে আসি, যারা আমাদের এতগুলো আদমীকে খুন করেছে, এতগুলো আওরতের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে ক'টা পয়সার লালচে তাদের থুক চাটা ঠিক না। ঘনিয়া শালেরা ধমকি দিয়ে গেল আর অমনি চুহা ব'নে গেলাম! বলব, সবাই যেন আপনাদের কথা শোনে, আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।'

এই ইস্পাতের ফলার মতো তেজী মেরুদণ্ডওলা যুবকটির কথা ভাগবত, রামলখন বা ধনুয়া, কেউ এ ক'দিন সেভাবে ভাবেন নি। অথচ একে আর আনোখিকে কাজে লাগানো উচিত ছিল কিন্তু কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তা এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াহুড়ো ক'রে ঝোঁকের মাথায় কিছু করা ঠিক না।

ভাগবত বলেন, 'ব'স ধনুয়া—ব'স ব'সো।' তোমরা সারাদিন হাটিয়ার কাজ করেছ, তারপর এতটা রাস্তা ভেঙে আমাদের কাছে এসেছ। নিশ্চয়ই খুক

ক্লান্ত হ'য়ে আছ। আজ আর গাঁয়ে যেতে হবে না। কী করা হবে না হবে, তোমাদের দু-একদিনের ভেতর জানিয়ে দেবো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফের ব'সে পড়ে ধনুয়া।

রাকেশ এবার বলেন, 'তোমাকে আমাদের খুব দরকার। ভাগবতচাচা যা বলেছেন—দু-একটা দিন শুধু অপেক্ষা ক'র।'

ধনুয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

তারপর চা এবং চাপাটি খেয়ে একসময় তারা চলে যায়। এখন বেশ রাত হয়েছে। গাঢ় অন্ধকারে তাদের হাতের লণ্ঠনটা ক্রমশ ছোট হ'তে হ'তে মিলিয়ে যায়।

আটত্রিশ

অন্য দিন রাকেশের ঘুম ভাঙার আগেই ভাগবত এবং রামলখন উঠে পড়েন। এই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটে।

কাল রাতে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ দেবারতির কথা ভেবেছেন রাকেশ। ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়বেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ভোর হওয়ার অনেক আগেই তাঁকে জাগিয়ে দেয়।

এখনও বাইরে যথেষ্ট অন্ধকার। চাঁদ কখন ডুবে গেছে কে জানে। জ্যোৎস্না না থাকলেও সারা আকাশ তারায় তারায় ছয়লাপ। তবে বহুদূরের নক্ষত্রের আলো পৃথিবী নামে এই গ্রহে-এসে পৌঁছয় না।

ভাগবতরা এখনও ঘুমিয়ে আছেন। পাছে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায় সেই কারণে হেরিকেন বা মোম জ্বালেন না রাকেশ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ট্রাউজার্স, শার্ট, জুতোটুতো বের ক'রে পরে নেন। নিঃশব্দে বাইরে এসে মুখটুখ ধুয়ে রাস্তায় নামেন।

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর রাকেশ যখন জঙ্গলে পৌঁছন, তখনও ভাল ক'রে ভোর হয় নি। তবে অন্ধকার ফিকে হ'তে শুরু করেছে। সূর্যোদয় হ'তে এখনও বেশ খানিকটা দেরি।

আনোখি এবং ধনুয়াদের চালা দু'টো চেনেন রাকেশ। তবে দেবারতি কোন চালাটায় শুয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না।

এত ভোরে কেউ জেগেছে ব'লে মনে হয় না। রাকেশ ভাবেন, এখন আর

ডাকাডাকি ক'রে কারো ঘুম ভাঙাবেন না। মজা নহরের ধারে সেই ঝাঁকড়া পিপর গাছটার তলায় গিয়ে তিনি বসে থাকেন। রোদ যতক্ষণ না উঠছে, অপেক্ষা করবেন।

বেশিক্ষণ অবশ্য ব'সে থাকতে হয় না।

এই মুহূর্তে বনভূমি আশ্চর্য নিঝুম। যে ঝিঁঝিরা সারাক্ষণ অক্লান্ত বিলাপে সমস্ত পরিবেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে তাদেরও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গাছপালার মাথায় পাখিদেরও ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণ নেই। যে কামার-পাখিরা সারারাত কর্কশ গলায় আওয়াজ ক'রে যায় তারাও বুঝিবা ক্লান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে গেছে। চরাচর জোড়া এই অগাধ স্তব্ধতার মধ্যে রাকেশ শুধু একাই জেগে আছেন। বসে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক চিন্তা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলতে থাকে। যার জন্য অন্ধকারে এতদূর ছুটে এসেছেন সেই দেবারতি নয়, গিরিলাল ঝা বা ত্রিলোকী সিং নয়, কিংবা ধারাবনীর গণহত্যার খুনীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদ যোগাড় করার জরুরি ব্যাপারটাও নয়। তাঁর মনে হয়, এই নিদ্রিত বনভূমির ঘুম যদি কোনোদিন না ভাঙে?

এই উদ্ভট ভাবনা বেশিক্ষণ অবশ্য স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখিদের ঘুম ভেঙে যায়। গাছের মাথায় মাথায় তাদের পাখা ঝাপটানোর আওয়াজে এবং চেঁচামেচিতে জঙ্গলের স্তব্ধতা ভেঙে যেতে থাকে। ঝিঁঝিরা আর কামার পাখিরা নতুন উদ্যমে আবার তাদের কনসার্ট শুরু ক'রে দেয়।

এখন দ্রুত অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। পুব দিকের আকাশে ঝাপসা আলো ফুটছে। কতক্ষণ আর, একটু পরেই রোদ উঠে যাবে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান রাকেশ। এবার ধনুয়াদের ডাকা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন হয় না। ডান দিকের চালার ঝাঁপ খোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ কানে আসে। মুখ ফেরাতেই রাকেশের চোখে পড়ে, আনোখি হাই তুলতে তুলতে বাইরে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ পিপর গাছের তলায় রাকেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে এতই অবাক হ'য়ে যায় যে অনেকটা সময় তার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোয় না। যদিও সে জানত আজ সকালে রাকেশ এখানে আসবেন কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাঁকে আশা করেনি।

একসময় আনোখি বলে, 'আপ এত্তে সবেরে সবেরে।'

তার বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না রাকেশর। অল্প হেসে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, চলে এলাম।'

'কখন এসেছেন?'

'এই খানিকক্ষণ আগে।'

'আমাদের ডাকেননি কেন সাহাব?'

রাকেশ হাসেন, 'ভাবছিলাম সকাল হোক। তারপর ডাকব।'

এরপর হৈচৈ বাধিয়ে দেবারতি কুঁদরী এবং ধনুয়াকে জাগিয়ে দেয় আনোখি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে প্রথমে চালা থেকে বেরোয় ধনুয়ারা। তাদের পাশের চালা থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসে দেবারতি। তার চোখেমুখে এখনও ঘুম এবং ক্লান্তি লেগে রয়েছে।

রাকেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'গেল তো ভোরের ঘুমটা ভেঙে! আমার কিন্তু দোষ নেই। আনোখি চেঁচামেচি ক'রে জাগিয়ে দিয়েছে।'

'ভালই করেছে। ভোর ভোর বেরিয়ে পড়াই ভাল।' রাকেশের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে দেবারতি বলে, 'নইলে রোদে ভীষণ কষ্ট হবে। কিন্তু—'

'বলুন।'

আপনি আবার রাত থাকতে উঠে এতদূর ছুটে এলেন কেন? আমিই তো চলে যেতে পারতাম।'

কেন এসেছেন, কোন গভীর ব্যগ্রতায় এবং আবেগের বশে, তা বলা যায় না। বিব্রত মুখে রাকেশ শুধু বলেন, 'এমনিই এলাম। আমি না এলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ধনুয়াদের ছুটতে হ'ত। বেচারারা অতটা রাস্তা গিয়ে আবার হাটে কাজ করতে যাবে! তাই নিজেই এলাম।'

দেবারতি বলে, 'আমি ওদের সঙ্গে নিতাম নাকি? মাঠের ওপর দিয়ে সোজা পথ। লোকজনকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে ঠিক পৌঁছে যেতাম। গাইডের কোনো দরকার ছিল না।'

'তা হয়ত ছিল না। তবু এত বড় ফেমাস পত্রকার। তাকে একটু আদর আপ্যায়ন না করলে কি চলে!' রগড়ের গলায় ব'লে হাসতে থাকেন রাকেশ।

দেবারতিও হেসে ফেলে।

রাকেশ দ্রুত আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে এবার বলেন, 'আর কিন্তু দেরি করা ঠিক হবে না। এখন বেরিয়ে পড়া দরকার। আপনার মালপত্র কোথায়?'

'সব আছে চালার ভেতর। একটু ওয়েট করুন। বাসিমুখে তো আর ছোটা যায় না। মুখটা অন্তত ধুয়ে নিতে দিন।'

রাকেশ লজ্জা পেয়ে যান। বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

দেবারতি কুঁদরীকে সঙ্গে ক'রে দূরে ঘন জঙ্গলের দিকে চলে যায় এবং বেশ

খানিকক্ষণ বাদে যখন ফিরে আসে, তার স্নান-টান হ'য়ে গেছে।

ধন্নুয়ারা কিন্তু তক্ষুনি রাকেশদের ছাড়ে না। কাঠকুটো জ্বালিয়ে চা বানিয়ে খাওয়ায়, তারপর যেতে দেয়।

দেবারতির সঙ্গে মালপত্র খুব একটা বেশি নেই। বড় স্যুটকেশ আর বেডিং। রাকেশ চিঠিতে বিশেষ ক'রে লিখে দিয়েছিলেন, আর কিছু আনুক বা না আনুক, মশারি যেন অতি অবশ্যই নিয়ে আসে। হোল্ড-অলের এক কোণ থেকে মশারির একটা অংশ বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়। অর্থাৎ মশারি আনতে সে ভোলেনি।

ধন্নুয়ারা স্যুটকেশ হোল্ড-অল কাঁধে চাপিয়ে খানিকটা এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, রাকেশ বা দেবারতি কেউ রাজী হয়নি। স্যুটকেশটা ব'য়ে নিয়ে চলেছেন রাকেশ। দেবারতির হাতে হোল্ড-অল।

দেবারতি লবঙ্গলতিকা মার্কা মেয়ে নয়, যথেষ্ট শক্ত ধাতের ঝকঝকে আধুনিক তরুণী। নানা জায়গায়—নর্থ ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার থেকে কাশ্মীর ভ্যালি পর্যন্ত—নানা ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তাকে দৌড়তে হয়। বেশির ভাগ জায়গাতেই লাগেজ বইবার লোক মেলে না, নিজের মালপত্র নিজেকেই কাঁধে চাপিয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

জঙ্গল পেছনে ফেলে দু'জনে অনেকটা পথ চলে এসেছেন। রক্তবর্ণ একটা বলের মতো সূর্য দিগন্তের তলা থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে। পাখিরা কেউ আর গাছের ডালে নিজেদের বাসায় নেই, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে তোলপাড় ক'রে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে চলেছে।

এই সকালবেলায় বাতাস বেশ আরামদায়ক। এখনও রোদে তাত ছড়িয়ে পড়েনি।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রাকেশ বলেন, 'পনেরো-কুড়ি দিন আগে আপনাকে চিঠি লিখেছি। কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম, আর বুঝি এলেনই না।'

রাকেশ যা আন্দাজ করেছিলেন তা-ই। দেবারতি জানায়, মাঝখানে বেশ কয়েক দিন সে কলকাতায় ছিল না, উত্তরপ্রদেশে একটা দাঙ্গার রিপোর্ট করতে গিয়েছিল। পরশু কলকাতায় ফিরে রাকেশের চিঠি পায় এবং কালই সকালের ট্রেন ধরে এখানে চলে আসে।

চোখের কোণ দিয়ে দেবারতিকে লক্ষ্য করতে করতে মজার গলায় রাকেশ বলেন, 'আমি বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

দেবারতি অবাক হ'য়ে যায়। বলে, 'কিসের ভয়?'

'ভাবলাম পত্রকারের হয়ত বিয়ে হ'য়ে গেছে এবং তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছেন।'

স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রাক্তন বিচারকের এই হালকা চালের চাপল্য কয়েক পলক স্তম্ভিত ক'রে রাখে দেবারতিকে। রাকেশের কাছ থেকে এ জাতীয় রসিকতা প্রায় অভাবনীয়। কিছুক্ষণ পর প্রবল উচ্ছ্বাসে নির্জন কাচ্চীকে চমকে দিয়ে সশব্দে হেসে ওঠে সে।

রাকেশ বিব্রত হ'য়ে পড়েন প্রথমটা। তারপর তিনিও হেসে ফেলেন।

হাসির তোড় খানিকটা কমে এলে দেবারতি বলে, 'এরকম একটা ব্যাপার আপনার মাথায় এল কী ক'রে?'

'ব্যাপারটা খুব অ্যাবসার্ড নাকি?' রাকেশ হেসে হেসে বলতে থাকেন, 'পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মেয়ের রোজ বিয়ে হচ্ছে। আপনি বিয়ে ক'রে ফেললে সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা হ'য়ে দাঁড়ায় না।' দেবারতির চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হয় কী?'

দেবারতি কৌতুকের স্বরে বলে, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, বিয়েটা হ'লে আপনি কি আর খবর পেতেন না? ইনভিটেসান কার্ড আপনার কাছে ঠিকই পেঁৗছে যেত। সমঝা?' রাকেশ বিহারের হিন্দীভাষী ব'লে 'সমঝা' কথাটা রগড় ক'রে বলা।

রাকেশও এই স্বরে ব'লে ওঠেন, 'অব সমঝ গিয়া।'

মজার আবহাওয়াটা বেশিক্ষণ বজায় থাকে না।

আরো খানিকক্ষণ যাওয়ার পর দেবারতি বলে, 'আপনার চিঠি পেয়ে মনে হল এখানকার ব্যাপারটা বেশ সীরিয়াস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।'

আস্তে মাথা নাড়েন রাকেশ, 'হ্যাঁ। আপনাকে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখনকার পরিস্থিতি একরকম। এখন সিচুয়েসান অনেক পাল্টে গেছে। এই ক'দিনে নানারকম ঘটনা ঘটেছে। সে সব আপনার জানা দরকার। তাতে পার্সপেকটিভটা বুঝতে সুবিধে হবে।'

'আপনি বলুন।'

রেজিগনেসান দেবার পর থেকে এখন পর্যন্ত খুঁটিনাটি যাবতীয় ঘটনা জানিয়ে রাকেশ বলেন, 'যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে গিরিলালদের সঙ্গে কনফ্রনটেসানটা এড়ানো যাবে না।'

দেবারতি বলে, 'আমারও তাই ধারণা। আচ্ছা ভাগবতজি আর রামলখনজি অন্য ফ্রিডম ফাইটারদের যে চিঠি লিখেছেন, তাঁরা আসবেন ব'লে মনে হয়?'

'আসবেন ব'লেই মনে হয়। এত বড় একটা কাজ, আসা অবশ্যই উচিত। তারপর দেখা যাক।'

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে দেবারতি বলে, 'এখানে আসার আগে আমি একটা কাজ করেছি।'

উৎসুক চোখে তাকান রাকেশ, 'কী কাজ?'

'পাটনার দুটো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কাগজে আমার দুই বন্ধু স্পেশাল করেসপনডেণ্ট। তাদের এখানে আসার জন্যে চিঠি লিখে দিয়েছি। মিডিয়াতে ধারাবনীর ব্যাপারটার বড় ক'রে এক্সপোজার দেওয়া দরকার। বিশেষ ক'রে লোকাল প্রেসগুলোতে। দিল্লি আর বম্বেতেও নানা পেপারে আমার বন্ধুরা আছে। তাদেরও এখানে আসতে লিখব।'

যথেষ্ট উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন রাকেশ। প্রেস মিডিয়াকে গোড়া থেকেই তিনি সঙ্গে পাওয়ার কথা ভেবেছেন। দেবারতি যে যে প্রেস করসপনডেণ্টকে চিঠি লিখেছে এবং আজকালের মধ্যে যাদের লিখবে তাদের কয়েক জনও যদি এসে পড়ে, তাদের রিপোর্ট জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে নিশ্চয়ই তুমুল হৈচৈ বাধিয়ে দেবে। বিধানসভায় এবং লোকসভায় এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তাঁদের সপক্ষে একটা দেশজোড়া জনমত তৈরি হ'য়ে যাবে। গিরিলালদের স্নায়ুর ওপর তার চাপ পড়বে প্রচণ্ড। রাকেশ বলেন, 'খুব ভাল হবে। দেরি নয়, আজই চিঠিগুলো লিখে ফেলবেন।'

'অবশ্যই।' ব'লে কিছু ভেবে দেবারতি ফের শুরু করে, 'আমরা যা করছি সবই কিন্তু বাইরে থেকে।'

তার কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রাকেশ।

রাকেশের মনোভাব বুঝতে পারছিল দেবারতি। সে বলে, 'একটা কথা নিশ্চয়ই মানবেন, যতই ওদের সম্বন্ধে আমাদের সিমপ্যাথি থাক না, আমরা কিন্তু আউটসাইডার। শুনতে খারাপ লাগলেও এটা তো ঠিক, ওদের ক্লাস আর আমাদের ক্লাস আলাদা। আপরাইজটা হওয়া উচিত ওদের ভেতর থেকে।'

'রাইট।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাকেশ। দেবারতি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা অনেকগুণ বেড়ে যায়। মাস মুভমেণ্টের ব্যাপারে তার ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। বাইরে থেকে রাকেশরা প্রেরণা দিতে পারেন, চারিয়ে দিতে পারেন বিপুল উদ্দীপনা, পাশে দাঁড়িয়ে যোগাতে পারেন সাহস কিন্তু আসল অভ্যুত্থানটা ঘটাতে হবে লাঞ্ছিত ধারাবনীবাসীদেরই। নইলে রাকেশদের এত পরিশ্রম, এত আন্তরিকতা এবং আয়োজন পুরোপুরি ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

রাকেশ বলেন, 'আমরা এখানকার লোকজনদের বোঝাবার চেষ্টা করছি কিন্তু ওদের ভয়টা কিছুতেই কাটানো যাচ্ছে না। তবে—'

'তবে কী?'

'আনোখি আর ধনুয়া গিরিলালদের কাছে মাথা নোয়ায়নি। ভাগবতচাচারা ধারাবনীর লোকজনের ভয় কাটানোর জন্য ওদের কাজে লাগাতে চান। ওরা, বিশেষ ক'রে ধনুয়া এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।'

দেবারতিকে উৎসুক দেখায়। সে বলে, 'খুব ভাল কথা। ধনুয়া ফায়ার ব্র্যাণ্ড টাইপের ছেলে। ওকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা দরকার।'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে ওকে কাজে লাগাবেন ভাগবতজিরা বলেছেন?'

'না। এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন।'

ধনুয়াদের বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না দেবারতি। কিছুক্ষণ পর বলে, 'আপনারা তো দিন পাঁচ-ছয়েক এখানে আছেন।'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ। কেন?'

'থানায় গিরিলালদের নামে একটা ডায়েরি করা ছাড়া মনে হয় বেশিদূর এগুতে পারেননি।'

'তা কেন? আমরা এখানে থাকার জন্যে গিরিলালেরা খানিকটা নার্ভাস তো হয়েছেই। এর একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট যে আছে সেটা ভাল ক'রেই টের পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিরকম?'

'আমরা না এলে ওরা রোজ ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে গ্রামের লোকজনদের হুমকি দিয়ে যেত না।'

দেবারতিকে স্বীকার করতেই হয়, 'তা ঠিক।'

একটু চুপচাপ।

তারপর দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'গ্রামের লোকেদের হুমকি দেওয়া ছাড়া ওরা এখন পর্যন্ত আর কি কিছু করেছে?'

রাকেশ বলেন, 'না। তবে চুপচাপ বসে থাকবে ব'লে মনে হয় না। আমাদের দিক থেকে প্রেসার যত বাড়বে, ওরা ততই খেপে উঠবে। মরিয়া হ'য়ে মারাত্মক কিছু ক'রেও বসতে পারে।'

'আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম।'

বেশ অবাক হ'য়ে যান রাকেশ, 'যেমন?'

দেবারতি বুঝিয়ে দেয়। ওরা পলিটিক্স করে। মাথা গরম ক'রে ইললিটারেট ভিলেজারদের খুন করতে পারে কিন্তু মিডিয়ার লোক, ফ্রিডম ফাইটার বা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ওভাবে কিছুতেই হামলা করবে না। বিশেষ ক'রে যখন ধারাবনীর জেনোসাইড নিয়ে চারিদিকে বেশ খানিকটা হৈচৈ হ'য়ে গেছে। এমনকি একজন ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত এই কারণে পদত্যাগ করেছেন। তা ছাড়া আরো একটা দিক ভাববার আছে। যদি শারীরিক ক্ষতি করার মতলব থাকত, সেবার দেবারতিকে বাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে অত আদরযত্ন করত না। টেপ রেকর্ডার এবং ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে তার চরম সর্বনাশ ক'রে ফেলত কিংবা খুন টুন ক'রে কোথাও পুঁতে রাখত।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে দেবারতি বলে, 'অতটা হঠকারিতা করার মতো স্টুপিড ওরা নয়।'

'তা হ'লে আমাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের স্ট্রাটেজি ওরা নিতে পারে ব'লে আপনার ধারণা ?'

দেবারতি এবার জানায় বিহারের ফিউডাল ক্লাসের লোকেরা যারা লাঠি এবং বন্দুকের জোরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে বসেছে তাদের সম্পর্কে খানিকটা অভিজ্ঞতা তার অবশ্যই আছে কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। এখানে কিছুদিন না থাকলে তারা কী ধরনের চাল দিতে পারে আপাতত সেটা বলা মুশকিল।

এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেন না রাকেশ।

একসময় দেবারতিরা ধারাবনী পৌঁছে যায়, এবং সোজা ধনুয়ার ঘরে চলে আসে।

বারান্দায় বসে রান্নাবান্নার তোড়জোড় করছিলেন রামলখন এবং ভাগবত। রাকেশের সঙ্গে দেবারতিকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ান।

ভাগবত রাকেশকে বলেন, 'আমাদের ঘুম ভাঙার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলে, তাই না ?'

রাকেশ হেসে মাথা নাড়েন।

ভাগবত বলেন, 'এবার দেবারতির সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দাও।' ব'লে হাসেন।

পরিচয় করানো হ'লে দেবারতি হাতের হোল্ড-অল নামিয়ে রেখে ঝুঁকে দু'জনকে প্রণাম করে। ভাগবতদের মতো আইডিয়ালিস্ট নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকদের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা।

দেবারতিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভাল লেগে যায় ভাগবতদের। আজকালকার

শিক্ষিত মেয়েদের বেশির ভাগই উদ্ধত, বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। বিশেষ ক'রে যদি এদের কেউ চাকরি বাকরি ক'রে তো কথাই নেই। কিন্তু দেবারতি তাদের থেকে একেবারে আলাদা। এমন বিনয়ী ভদ্র শ্রদ্ধাশীল মেয়ে ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

ভাগবত সস্নেহে বলেন, 'তোমার জন্যে ক'দিন ধ'রে অপেক্ষা করছি বেটা। ব'স, ব'স—'

বারান্দার এক কোণে মাটিতেই বসে পড়ে দেবারতি। বলে, 'এখানকার খবর কী ?'

'রাকেশ তোমাকে কিছু জানায় নি ?'

'জঙ্গল থেকে আসতে আসতে কিছু কিছু বলছিলেন। সেটা—'কথা শেষ না ক'রে থেমে যায় দেবারতি।

রামলখন বলেন, 'সেটা খুবই নৈরাশ্যজনক, তাই তো ?'

দেবারতি অল্প হাসে। বলে, 'হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই।

ভাগবত বলেন, 'রাকেশ প্রায় ভেঙে পড়েছে। ওর ধারণা এখানে বেশিদূর এগুনো যাবে না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের লোকেরা নাকি এখানকার লোকজনদের মধ্যে ফিয়ার সাইকোসিস তৈরি ক'রে দিচ্ছে।'

ভাগবত বলেন, 'হ্যাঁ। ওরা এসে যখন তখন শাসিয়ে যাচ্ছে। এখানকার মানুষজন গরীব, ভীরু। তাদের পক্ষে ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'চাচাজি, আপনারা কিছু ভেবেছেন ?'

'কোন ব্যাপারে ?'

'এই এলাকার লোকজনের কো-অপারেসান না পাওয়া গেলে কী করবেন ?'

রামলখন বলেন, 'দেখ বেটা, এতদূর যখন চলে এসেছি, শেষটা না দেখে কি ফিরে যাব ? ক'টা বন্দুকবাজ, একটা বদ পলিটিসিয়ান আর একটা জমি মালিকের ভয়ে আমরা অন্তত পালিয়ে যাচ্ছি না।'

ভাগবত বলেন, 'ক'বছরই বা আর বাঁচব ! আজাদির পর চারদিকের হালচাল দেখে আমরা ব'সে গিয়েছিলাম। অন্যায়ই করেছিলাম। মৃত্যুর আগে কিছু একটা করতে হবে। ধারাবনীতে এসে যে ভারতকে দেখছি এই ভারতের জন্যে আমরা ইংরেজের জেলে অর্ধেক জীবন নষ্ট ক'রে দিই নি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে দেবারতি বলে, 'যদি ধৃষ্টতা না ভাবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

ভাগবত এবং রামলখন একসঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই করবে বেটা।'

'আপনারা সামান্য ক'টি মানুষ, তার ওপর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আর গিরিলালদের রয়েছে বিরাট ম্যান-পাওয়ার আর মানি-পাওয়ার। এদের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই করা সম্ভব?'

ভাগবত হাসেন, 'দেখা যাক। এখন এসব আলোচনা থাক। এতটা রাস্তা এসেছ, অনেক ধকল গেছে। এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে স্নান খাওয়া সেরে টানা ঘুম লাগাও। বিকেলে কথা হবে।'

রাকেশ বলেন, 'স্নান টানের ব্যাপারে আপনার কিন্তু কষ্ট হবে। এখানে বাথরুম নেই।'

দেবারতি হাসে, 'তা কি আর জানি না? ঝোপঝাড় আছে তো। তার আড়ালে বাথরুমের কাজ সেরে নিতে পারব।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ধনুয়ার ঘরের এক পাশে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিতেই শরীর ঝরঝরে হ'য়ে যায় দেবারতির।

এখন বেলা বেশ হেলে গেছে। রোদের রং বদলে গেলেও তাপ পুরোপুরি জুড়িয়ে যায় নি।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেবারতি দেখতে পায় ভাগবত স্টোভে চা চড়িয়ে দিয়েছেন। আগুনের একটানা সাঁ সাঁ আওয়াজ হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে।

বারান্দায় প্লাস্টিকের বালতিতে জল ছিল। ব্যস্তভাবে মুখ ধুয়ে দেবারতি ব'লে, 'চাচাজি, আমি চা করছি, আপনি ওখানে বসুন—' ব'লে বারান্দার আরেক ধারে যেখানে রাকেশ আর রামলখন ব'সে আছেন সেদিকটা দেখিয়ে দেয়।

ভাগবত সস্নেহে বলেন, 'বেটা, আজকের দিনটা তুমি আরাম কর। কাল থেকে সবাই মিলে আমরা রসুই করব।'

দেবারতি অগত্যা রাকেশদের কাছে গিয়ে বসে।

কিছুক্ষণ পর চা খেতে খেতে দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'আজ আপনাদের কী প্রোগ্রাম?'

রাকেশ বলেন, 'চার দিন ধ'রে আমরা যা করছি, তাই করব।'

'সেটা কী?'

'টেপ রেকর্ডার আর ক্যামেরা নিয়ে গাঁয়ের প্রতিটা ঘরে ঘুরব, যদি কেউ সাক্ষি দিতে রাজী হয় তার স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করব, ছবি তুলব।'

'চার দিন চেষ্টা করলেন। এখনও কেউ স্টেটমেণ্ট দিতে রাজী হচ্ছে না। এরপরও কি এদের কাছ থেকে কোনোরকম কো-অপারেসান পাওয়া সম্ভব হবে ?'

'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার মতো কারণ এখনও ঘটে নি। ধারা-বনীর লোকেদের মন থেকে ভয়টা শুধু কাটাতে হবে। তার জন্যে দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

'আমিও আপনাদের সঙ্গে গ্রামের ভেতর যাব।'

'নিশ্চয়ই।'

একটু ভেবে ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এখানে কতদিন থাকতে পারবে বেটা ?'

দেবারতি বলে, 'সাত দিনের অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে এসেছি।'

চিন্তিতভাবে রামলখন বলেন, 'সাত দিনে কি আমাদের লড়াই শেষ হবে ?'

দেবারতি বলে, 'দরকার হ'লে আরো কয়েক দিন থেকে যেতে পারব। অফিসকে জানিয়ে এসেছি। শুধু একটাই অসুবিধা রয়েছে।'

'কী ?'

'এখান থেকে নিউজ পাঠানো ভীষণ মুশকিল। হয় সাহারসা, নইলে পূর্ণিয়া থেকে ফোনে কি টেলিগ্রামে পাঠাতে হবে। আর কোনো জায়গা থেকে পাঠানো যায় কিনা আমি জানি না। রোজ অত দূরে গিয়ে কী ক'রে যে ফিরে আসব !'

'চিন্তা ক'রো না। একটা কিছু বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে।'

চা খাওয়া হ'লে ক্যামেরা এবং টেপরেকর্ডার নিয়ে চার জন বেরিয়ে পড়েন।

অন্য দিন রাকেশদের দেখামাত্র ধারাবনীর লোকজনেরা হয় ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেয়, কিংবা গাঁ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য দূরে মাঠের দিকে পালিয়ে যায়।

আজও অন্য রকম কিছু ঘটল না। তবে দেবারতিকে দেখে সবাই ঘরে দরজায় খিল দিল না বা পালিয়ে গেল না। অনেকেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। দেবারতি যে আবার এ গাঁয়ে আসতে পারে, এটা তারা ভাবতে পারে নি। তাদের কেউ কেউ, বিশেষ করে মেয়েমানুষদের দু-একজন জিজ্ঞেস করে, 'মেমসাব, আপ !'

দেবারতি হেসে হেসে বলে, 'হ্যাঁ, চলে এলাম। আপনাদের জন্যে আসতে হ'ল।'

মেয়েমানুষরা এরপর চুপ ক'রে থাকে।

দেবারতি ফের বলে, 'সেবার যখন জঙ্গলে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল,

সবাই জানিয়েছিল গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের ভূমিসেনারা কিভাবে জুলুমবাজি ক'রে ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়েছিল আর মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করেছিল। এখন বলছ না কেন ?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে মেয়েমানুষগুলো। তারপর রাকেশদের দেখিয়ে বলে, 'ওহী সাহাব আর বুড্‌ঢা বাবারা সব জানে।'

'তবু তোমাদের মুখ থেকে শুনি।'

'মাত্‌ পুছিয়েগা মেমসাব। আচ্ছা, হামনিলোগ চলতি হ্যায়।' ব'লে উর্ধ্বশ্বাসে মেয়েমানুষগুলো চোখের পলকে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

হতাশভাবে দেবারতি এবার রাকেশের দিকে তাকায়।

রাকেশ বিমর্ষ হাসেন, 'কিরকম মনে হ'ল ? কেস অ্যাবসোলুটলি হোপলেস—ইজ'ন্‌ট ইট ?'

দেবারতি উত্তর দেয় না।

চার জনের দলটি এবার ধারাবনীর ঘরে ঘরে হানা দিতে থাকে। বয়স্ক পুরুষ বা মেয়েরা সঙ্গে না থাকলে ভনভনে মাছির মতো একঝাঁক বাচ্চাকাচ্চা রাকেশদের পেছন পেছন ঘুরতেই থাকে।

দেবারতি সঙ্গে থাকায় খানিকটা সুবিধা হয়। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে রাকেশ, রামলখন বা ভাগবতদের পক্ষে বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে মেয়েদের বাইরে আসার কথা বলা সম্ভব না। তার প্রতিক্রিয়া হবে খুবই খারাপ।

দেবারতি রাস্তা থেকে দাওয়ায় উঠে প্রতিটি ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলে, 'বাইরে এস বহেনজি, দরজা খোল।'

কচিৎ দু-একজন দরজা খোলে। বেশির ভাগই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় বলে, 'মেমসাব, মাফি মাংতা। আমরা কিছু জানি না।'

শুধু একটি বুড়ি চারিদিক ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে চাপা গলায় বলে, 'আপনারা আমাদের গাঁও থেকে চলে যান মেমসাব।'

দেবারতি চমকে ওঠে, 'একথা বলছ কেন বুড়ি মা ? আমরা তো তোমাদের ভালোর জন্যেই এখানে এসেছি।'

'জানি। লেকেন—'

'লেকেন কী ?'

'আপনারা থাকলে আমাদের যতটা ভালাই হবে তার চেয়ে বুরাই হবে অনেক বেশি।'

'এ কথা তোমাদের মনে হ'ল কেন?' প্রশ্নটা ক'রেই দেবারতির মনে হয়, এর

উত্তর তার ভাল করেই জানা আছে। তবু যে করল তার কারণ একটাই। ধারাবনীর প্রতিটি মানুষের মনোভাব সে আলাদা আলাদা জেনে নিতে চায়।

বুড়ি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বলে, 'হামনি যাতী হ্যায় মেমসাব।' ব'লে লম্বা লম্বা এলোমেলো পা ফেলে চলে যায়।

আগের চার দিনের মতো আজও সন্ধে পর্যন্ত ঘোরাঘুরি ক'রেও কাজের কাজ কিছুই হ'ল না। অগত্যা রাকেশরা ধনুয়ার ঘরে ফিরে আসে।

হেরিকেন ধরিয়ে বারান্দায় শতরঞ্জি বিছিয়ে চার জন বসে পড়ে।

রাকেশের হতাশা এবং ক্লান্তি আজ আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে তিনি উদাসীন গলায় বলেন, 'চাচাজি, মানুষের ওপর আপনাদের অফুরন্ত বিশ্বাস। কিন্তু ধারাবনীর লোকজনদের সম্বন্ধে আমাদের বোধহয় আর কিছুই করণীয় নেই।'

রাকেশের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই অনেক দূর থেকে বহু মানুষরে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে। অন্ধকারে জোনাকির মতো কয়েকটা আলোর বিন্দু দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

দেবারতিরা চকিত হ'য়ে আলোর ফুটকিগুলোর দিকে তাকায়। চার জনকেই বেশ চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

রাকেশ বলেন, 'ওরা এ গাঁয়ের লোক মনে হচ্ছে না।'

ভাগবত বলেন, 'দুধলিগঞ্জের দিকের রাস্তা দিয়ে আসছে। কারা হ'তে পারে ?'

দেবারতি বলে, 'গিরিলালদের লোকেরা না তো ?'

'মনে হয় না। ওরা এভাবে আসবে না।'

রামলখন বলেন, 'খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখব নাকি ?'

ভাগবত বলেন, 'আরেকটু অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক।'

ক্রমশ আলোর ফুটকিগুলো কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। দূর থেকে যেগুলোকে জোনাকি মনে হয়েছিল, সেগুলো আসলে লণ্ঠন।

কণ্ঠস্বরও এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'এ ভাগবত ভাই—'

'এ রামলখন ভাই, তোমরা কি এ গাঁয়ে আছ ?'

রামলখন এবং ভাগবত দ্রুত উঠে দাঁড়ান। তাঁদের দেখাদেখি রাকেশ আর দেবারতিও।

ভাগবত গলার স্বর উঁচুতে তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'আপনারা কারা?'

'আমরা ফ্রিডম ফাইটার অ্যাসোসিয়েসনের পাটনা ইউনিট থেকে আসছি!'

বলতে বলতে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দলটা ভাগবতদের কাছাকাছি এসে পড়ে। সবাইকে ভাগবত এবং রামলখন চেনেন। একেবারে সামনে যিনি রয়েছেন তাঁর নাম নরেশ্বর ঝা। প্রায় দৌড়ে গিয়ে নরেশ্বরকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরেন ভাগবত, 'আও, আও ভাই। আমাদের চিঠি তা হ'লে পেয়েছিলে?'

নরেশ্বর বলেন, 'তোমাদের চিঠি পাই নি, তবে রাজেশ্বরজিরটা পেয়েছি। আর পেয়েই তো চলে এলাম।'

রামলখন কাছে এসে নরেশ্বরের একখানা হাত ধ'রে বলেন, 'তোমরা আসতে আমাদের সাহস আর শক্তি বাড়ল।'

নরেশ্বরের সঙ্গে আর যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন জগমোহন, বিষ্ণুহরি, লালচাঁদ, ললিতপ্রসাদ, চান্দেরি রাম ইত্যাদি। সবারই বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ভাগবত এবং রামলখন তাঁদের কাছে গিয়েও একে একে সবাইকে জড়িয়ে ধরেন।

ধনুয়ার ঘরের দাওয়ায় এত লোকের বসার জায়গা হবে না। তাই নিচে পরিষ্কার উঠোনে তিন-চারটি শতরঞ্জি বিছিয়ে দেয় দেবারতি আর রাকেশ।

নরেশ্বররা ভাগবতদের মতোই টিন বা চামড়ার স্যুটকেশ, বেডিং, লণ্ঠন, কেরোসিনের টিন, টর্চ, ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন।

ভাগবত বলেন, 'আগে ব'সে খানিকক্ষণ আরাম কর। অনেকটা রাস্তা হেঁটে জরুর থকে গেছ।'

মালপত্র নামিয়ে রেখে নরেশ্বররা বসে পড়েন।

ভাগবত বলেন, 'তোমরা জিরোও। আমরা তোমাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে আসি।'

নরেশ্বর বলেন, 'আরে ভাই কোঈ জরুরত নেহী। রাতের খাবারটা আমরা সঙ্গে ক'রেই এনেছি। বুঝতে পারছিলাম না, এখানে কখন পৌঁছুতে পারব। আচানক হাজির হ'লে তোমাদের ঝামেলা হ'য়ে যাবে, তাই ভাবলাম কিছু চূড়া-চাপাটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। বৈঠো—বৈঠো—'

নরেশ্বরদের পাশে বসতে বসতে ভাগবত এবং রামলখন বলেন, 'তা ভালোই করেছ। আমাদের খাটুনি বাঁচল। কমসে কম একটু চা তো খাবে। এতদূর থেকে এলে, থোড়েসে মেহেমানদারি করতে দাও।' ব'লে হাসতে থাকেন।

নরেশ্বররা মজার গলায় সমস্বরে ব'লে ওঠেন, 'মঞ্জুর।'

ভাগবত দেবারতির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'বেটা স্টোভ ধরিয়ে চায়ের

বন্দোবস্ত কর। রাকেশ তুমি ওকে হেল্প কর।' ফের নরেশ্বরদের দিকে ঘুরে বলেন, 'অনেক দিন পর দেখা হ'ল, কি বল?'

'হাঁ। লগভগ আট সাল বাদ। পাটনাতে সেই নাইনটিন-এইটিতে অল ইণ্ডিয়া ফ্রিডম ফাইটারদের কনফারেন্স হ'ল। সেবার শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর আজ—'

ললিতপ্রসাদ বলেন, 'মনে পড়ে নন-কোঅপারেসন মুভমেণ্টের সময় পাঁচ সাল একসঙ্গে জেল খাটলাম। সিভিল ডিসওবেডিয়েন্সে পাঁচ সাল। তখন একসঙ্গে দিনরাত থাকা, খাওয়া, ঘুমনো। আজাদির পর জেল থেকে বেরিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম। তারপর থেকে দেখাশোনা একদম বন্ধ।'

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে কুড়ি বাইশটি অসীম সাহসী পুরনো যোদ্ধা কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যান। সেই যুবা বয়সে কী বিপুল উন্মাদনায় তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিভাবে জেলখানার চার দেওয়ালের ভেতর তাঁদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় ক্ষয় হ'য়ে গেছে, স্বাধীনতার পর জীর্ণ অশক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে কিভাবে মুক্তি পেয়েছেন—চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের সেইসব দিনগুলিকে ধারাবনী গাঁয়ের মাটিতে ব'সে এই রাত্রিবেলায় স্বপ্নবৎ মনে হয়। এ সব কোনোদিনই বুঝিবা সত্যি ছিল না, কোনো অলীক কল্পনার মধ্যে যেন ঘটে গেছে।

ভাগবতরা যখন স্মৃতিভারাতুর হ'য়ে পড়েছেন সেই সময় রাকেশ এবং দেবারতি চায়ের কেটলি আর গোটাকয়েক গেলাস নিয়ে আসে। কিন্তু এত মানুষকে দেবার মতো যথেষ্ট গেলাস তাদের নেই।

সমস্যাটা বুঝতে পারছিলেন ভাগবত। নরেশ্বরদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই গেলাস আছে। সেগুলো বের কর ভাই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণ পর চা খেতে খেতে নরেশ্বর বলেন, 'এবার আসল কথায় আসা যাক। রাজেশ্বরজি এমন জরুরি চিঠি লিখে আমাদের এখানে আসতে বললেন কেন?'

ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, তোমাদের কিছু জানান নি রাজেশ্বরজি?'

'না। শুধু লিখেছেন চিঠি পেয়েই যেন ধারাবনীতে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। রাজেশ্বরজি আরো জানিয়েছেন, দেশের যেখানে যত স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন, সবাইকে এখানে আসার জন্য চিঠি লিখেছেন।'

বিষ্ণুহরি বলেন, 'রাজেশ্বরজির মতো রেসপেক্টেড মানুষ যখন চিঠি দিয়েছেন তখন দৌড়ে আসতেই হ'ল। বল, এই বয়েসে এমন জরুরি তলব কেন?'

ভাগবত রাকেশকে কাছে ডেকে নরেশ্বরদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ হ'ল রাজেশ্বরজির ছেলে রাকেশ। এর কাছ থেকে আপনারা শুনে নিন। এখানে যা চলছে তার মূল চরিত্র হ'ল সে। রাকেশ সব কিছু বুঝিয়ে বলবে।'

রাকেশ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে নরেশ্বরদের সামনে এখানকার যাবতীয় সমস্যা সংক্ষেপে জানিয়ে দেন। এমনকি গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিংয়ের মারাত্মক দুষ্কর্ম দেশের মানুষকে জানাতে আর ধারাবনীর আসল হত্যাকারীদের কঠোর সাজার জন্য তিনি যে চাকরি ছেড়ে এই গ্রামে এসে আছেন, সে সব তো বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর এই কাজে ভাগবত আর রামলখন যে শুরু থেকেই সঙ্গে থেকে অনবরত সাহস যুগিয়ে সহযোগিতা ক'রে যাচ্ছেন তা-ও জানিয়ে দেন। দেবারতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমাদের এই সাংবাদিক বন্ধু কিছুদিন আগে এখানে এসে ধারাবনীর বহু ঘটনার বিরাট কভারেজ দিয়েছিলেন। সেটা সারা দেশের নজরে পড়েছিল। কাল উনি আবার এসেছেন। নতুন ক'রে ফের এখানকার রিপোর্ট পাঠাবেন।'

নরেশ্বরদের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল যেন। চান্দেরি রাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'এইরকম আইডিয়ালিস্টদের এখন দরকার। স্বাধীনতার পর আদর্শ, হিউম্যান ভ্যালুজ, এথিকস—এ সব লোকে ভুলে গেছে। মাসল পাওয়ার আর মানি পাওয়ারেরই যুগ এটা। এর মধ্যে রাকেশ আর দেবারতিকে দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত কিছু একেবারে শেষ হ'য়ে যায় নি।'

ভাগবত বলেন, 'রাজেশ্বরজি চাইছেন, আমরা যেখানে যত পুরনো ফ্রিডম ফাইটার আছি, সবাই না আসতে পারলেও যত জন পারি এখানে এসে রাকেশকে সাহায্য করি।'

নতুন যে দলটা এসেছে তাদের চোখ লণ্ঠনের আলোয় জ্বল জ্বল করতে থাকে। উদ্দীপ্ত মুখে নরেশ্বর বলেন, 'জীবনের শেষ মাথায় পৌঁছে এত বড় একটা কাজ পাওয়া গেছে। আমরা রাকেশের সঙ্গে আছি। যতরকম সাহায্য তার দরকার, সব পাবে।'

রামলখন জিজ্ঞেস করেন, 'রাজেশ্বরজি আপনাদের ছাড়াও ফ্রিডম ফাইটারদের অন্য ইউনিটগুলোকেও চিঠি দিয়েছেন। তারা কেউ আসবে ব'লে শুনেছেন।'

'না। তবে রাজেশ্বরজি যখন চিঠি লিখেছেন তখন অনেকেই এসে পড়বে।'

লালচাঁদ বলেন, 'রাজেশ্বরজি জানিয়েছেন, দু-একদিনের মধ্যে তিনিও এখানে আসবেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ললিতপ্রসাদ রাকেশকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা তো এখানে দিন চারেক আছ। গিরিলালদের এগেনস্টে কী ধরনের কাজ শুরু করেছ তা কিন্তু জানাও নি।'

গিরিলাল ত্রিলোকীর ভূমিসেনাদের হত্যা ধর্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে কোন পদ্ধতিতে তাঁরা সাক্ষিপ্রমাণ যোগাড় করছেন, সব জানিয়ে দেন রাকেশ।

ললিতপ্রসাদ বলেন, 'ঠিক রাস্তাতেই তোমরা চলেছ। তবে থানা বা অ্যাড-মিনিস্ট্রেসান কাউকেই ছাড়া ঠিক হবে না।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'এদের সম্বন্ধে কী করতে বলেন?'

'সেটা ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে।'

নরেশ্বর বলেন, 'ধারাবনীর জেনোসাইডের ব্যাপারটা নিয়ে পুরা অ্যাডমিনি-স্ট্রেসানের ভিত নাড়িয়ে দিতে হবে। এ জাতীয় ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা চিরকালের মতো করা দরকার। এইভাবে মানুষ খুন করার জন্যে আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করি নি।'

রাকেশ প্রচণ্ড উৎসাহের গলায় বলেন, 'চাচাজি, আপনি ঠিকই বলেছেন। এটাই সঠিক পদ্ধতি। এতদিন আমরা ছিলাম মোটে তিনজন। দেবারতি সাংবাদিক, তাঁর পক্ষে ইমপার্সিয়াল থাকাই উচিত। তিনজনের পক্ষে বিরাট কিছু করা সম্ভব হ'ত না।'

নরেশ্বর হাসেন, 'আমরা আসায় তোমাদের জনবল বাড়ল, তাই না?'

'হ্যাঁ।' রাকেশও হাসেন।

চান্দেরি রাম বলেন, 'রাজেশ্বরজি যেভাবে চারদিকে চিঠিপত্র পাঠিয়েছেন তাতে তোমার বাহিনী অনেক বেড়ে যাবে।'

রাকেশ বলেন, 'তা হ'লে আমাদের কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যাবে।'

চান্দেরি রামেরা স্বাধীনতার পর এত বড় মাপের একটা কাজ—যার মধ্যে আদর্শবাদ ছাড়া অন্য কিছুই নেই—পেয়ে উদ্দীপনায় টগবগ করছেন। নরেশ্বর বলেন, 'কাল থেকেই শুরু করা যাক, না কি বল?'

বাকি সবারও একই ইচ্ছা। এক মুহূর্তও কেউ নষ্ট করতে চান না, যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব কাজে নেমে পড়তে চান।

ভাগবত বলেন, 'তোমরা যা বলছ সেটাই উচিত কিন্তু অন্য একটা দিক ভেবে দেখা দরকার।'

সবাই উৎসুক চোখে ভাগবতের দিকে তাকান। প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

ভাগবত এবার যা বলেন তা এইরকম। তাঁরা সবাই বাইরে থেকে এসে এখানকার গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চাইছেন। যতই আন্তরিকতা, আগ্রহ এবং আদর্শবাদ থাক না, তাঁরা সন্স অফ দি সয়েল বা এই এলাকার মৃত্তিকার সন্তান নন। সমস্যাটিও তাঁদের নিজস্ব নয়। এই আন্দোলনে ধারাবনী অঞ্চলের লোকজনেরও থাকাটা একান্তভাবে জরুরি। যেমন ক'রেই হোক, তাদেরও এর মধ্যে জড়িয়ে নিতে হবে। নইলে শেষ পর্যন্ত এত উদ্যোগ পুরোপুরি সার্থক হ'তে পারে না।

ভাগবত যা বলেছেন সেটাই সঠিক পদ্ধতি। আন্দোলনের স্বার্থে ধারাবনীর বাসিন্দাদের ভূমিকা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে সবাই একমত। কিন্তু তার ভেতর বিরাট সংশয় থেকে যাচ্ছে।

নরেশ্বর বলেন, 'তোমাদের কাছে এখানকার হালচাল যা শুনলাম তাতে গাঁয়ের লোকজনদের সঙ্গে পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে।'

রামলখন বলেন, 'আশা ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাজটা ভাল ক'রে শুরু করি। তারপর দেখা যাক, কী দাঁড়ায়।'

নরেশ্বর বলেন, 'আরম্ভটা খুব জরুরি। ওটা একবার হ'য়ে গেলে দেখবেন এখানকার মানুষের ভয় অনেকটাই কেটে গেছে।'

রাকেশ হেসে হেসে সবিনয়ে বলেন, 'চাচাজি, আরম্ভটা আমরা করেছি তবে তেমন কিছু না। সে যাক, আপনারা অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে টায়ার্ড হ'য়ে পড়েছেন। আজ রাতটা আরাম করুন, কাল স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা যাবে।'

নরেশ্বর এবং বাকি সবাই একসঙ্গে সায় দিয়ে বলেন, 'সেই ভাল।'

নরেশ্বররাও নিজেদের বিছানা নিয়ে এসেছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর ধনুয়ার ঘরের সামনের উঠোন ঝাঁটপাট দিয়ে সাফ ক'রে শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নেন। কেননা ধনুয়ার ঘরে এতগুলো মানুষের জায়গা হবে না। যাঁরা জীবনের অনেকগুলো বছর ইংরেজের জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পক্ষে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো এমন কী কষ্টের!

নরেশ্বরদের দেখাদেখি রাকেশ রামলখন এবং ভাগবতও উঠোনে তাঁদের পাশাপাশি বিছানা পেতে নেন। তবে ধনুয়ার ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয় দেবারতিকে। একটি মেয়ের পক্ষে এভাবে বাইরে শোওয়াটা অস্বস্তিকর।

ঠিক হয়, এখন থেকে পুরুষেরা রাতটা বাইরে কাটাবে। আর ধনুয়ার ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হবে দেবারতিকে।

উনচল্লিশ

ভাগবতদের মতোই নরেশ্বরদেরও ভোরে ওঠার অভ্যাস। পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই সবার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর কিছুক্ষণ সূর্যস্তবের পর নরেশ্বররা ভাগবতদের সঙ্গে দূরের বিলে স্নান করতে যান।

কলকাতায় থাকলে আটটার আগে বিছানা ছাড়ে না দেবারতি! অনেক রাত ক'রে সে শুতে যায়, ফলে ঘুম ভাঙতেও বেশ দেরি হয়। কিন্তু এখানে সঙ্গগুণে ভোরেই সে জেগে গিয়েছিল। আইডিয়ালিস্ট পুরনো ফ্রিডম-ফাইটারদের সব ভাল কিন্তু তাঁদের একটা ব্যাপার একেবারেই পছন্দ নয় দেবারতির। কেন যে এত তাড়াতাড়ি তাঁরা জেগে ওঠেন! আরেকটু শুয়ে থাকতে কী এমন অসুবিধা! তার ওপর কোরাসে ঐ সূর্যস্তব! এত আওয়াজে কারো পক্ষে কি চোখ বুজে থাকা সম্ভব? অগত্যা দেবারতিকেও অনেক আগেই উঠে পড়তে হয়েছিল।

ভাগবতরা স্নান করতে চলে গেলে দেবারতি মুখটুখ ধুয়ে বারান্দায় ব'সে অপেক্ষা করতে থাকে।

অনেক দূরে পুব দিগন্তে যেখানে কালির ঝাপসা পোঁচের মতো গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সূর্যটা সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে। যে দিকে যতদূর চোখ যায়, মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। ধারাবনী গাঁয়ের এখনও ঘুম ভাঙে নি। চারপাশ শান্ত, জনশূন্য এবং নিস্তব্ধ। নৈঃশব্দ্য ভেঙে মাঝে মাঝে পাখিদের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ কানে আসে। ভাগবতদের মতো ওদেরও ভোরেই ঘুম ভাঙে।

আকাশের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পাতলা সিল্কের মতো যে কুয়াশা সমস্ত চরাচরকে জড়িয়ে ছিল, সেটা আর নেই। ঝকঝকে নীলাকাশ এখন ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। এই সময়টা রোদে তেমন ঝাঁঝ থাকে না। আরামদায়ক ঝিরঝিরে হাওয়া চোরা স্রোতের মতো ব'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ আর! সূর্য গাছপালার লাইনের ওপর আর খানিকটা উঠে এলেই রোদের চেহারা পাল্টাতে শুরু করবে। গনগনে আঁচে মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র, ঝোপঝাড়, গাছগাছালি জ্বলতে শুরু করবে।

কিন্তু দু-এক ঘণ্টা পর আবহাওয়া কিরকম দাঁড়াবে তা নিয়ে আদৌ ভাবছে না দেবারতি। হঠাৎ একটা কথা মাথায় আসায় তার স্নায়ুর ভেতর দিয়ে আচমকা শিহরণ খেলে যায়। এই মুহূর্তে, এমন ঘোর নির্জনতায় গিরিলাল বা ত্রিলোকীর পোষা সেই মারাত্মক খুনীরা যদি হঠাৎ হানা দেয় এবং তাকে তুলে নিয়ে যায়, তাদের কে বাধা দেবে? চিৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে ফেললেও তাকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসবে না। ক্রমশ চিন্তাটা আতঙ্ক হ'য়ে দেবারতির শ্বাস যেন বন্ধ

ক'রে আনে। কিন্তু বেশিক্ষণ না. একসময় দেখা যায় স্নান-টান চুকিয়ে ভাগবতেরা ফিরে আসছেন। সবাই একটা ক'রে প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে গিয়েছিলেন। বালতি ভরে ওরা জল নিয়ে এসেছেন। দেবারতি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, একা একা সে একটি মুহূর্তও এখানে থাকবে না। কাল থেকে ভাগবতদের সঙ্গে সে-ও বিলে যাবে।

ভাগবতরা কাছে চলে আসেন। রাকেশ হালকা গলায় বলেন, 'কখন ঘুম ভাঙল ?'

দেবারতি বলে, 'অনেক ক্ষণ। আপনারা যখন স্নান করতে গেলেন তখন আমি জেগেই আছি। খানিক আগে মুখ-টুখ ধুয়ে আপনাদের জন্য ব'সে আছি।'

এর পর স্টোভ ধরিয়ে চা বসিয়ে দেন ভাগবত। লিকার বানানো হ'লে দুধ চিনি মিশিয়ে কাপে কাপে ঢেলে সবাইকে দেয় দেবারতি।

চা খেতে খেতে নরেশ্বর বলেন. 'এবার তা হ'লে স্ট্রাটেজিটা ঠিক ক'রে ফেলা যাক। যথেষ্ট সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে গিরিলালেরা নিশ্চয়ই প্রচুর এভিডেন্স ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। আর দেরি করলে খুনীদের চুলের ডগাও ছোঁয়া যাবে না।'

এ বিষয়ে সবাই একমত। রাকেশ. দেবারতি, ভাগবত বা রামলখন এই ব্যাপারটা নিয়ে আগেও অনেক ভেবেছেন, প্রচুর আলোচনাও করেছেন কিন্তু খুব বেশি দূর এগুনো যায় নি।

ভাগবত বলেন, 'কাল রাত্তিরে যে কথা হচ্ছিল—স্ট্রাটেজির বিষয়ে তুমি কি কিছু ভেবেছ ?'

নরেশ্বর বলেন, 'হ্যাঁ।'

'বল।'

'ভাবছি, আমরা কয়েক জন গিয়ে থানার সামনে পিকেট শুরু করব। কয়েক জন এ গাঁয়ে থেকে সাক্ষিসাবুদ যোগাড় করার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া আরো একটা বড় রকমের পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে।'

'যেমন ?'

'আরো ফ্রিডম ফাইটার আসুক। দলে ভারী হই। তখন শুনো।' ওটা করতে হ'লে বহু লোকজন দরকার। তা ছাড়া আশা করছি রাজেশ্বরজি দু-একদিনের মধ্যে এখানে আসবেন। তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে।'

রামলখন বলেন, 'ঠিক আছে, তোমার বড় পরিকল্পনাটার কথা রাজেশ্বরজি এলেই না হয় শোনা যাবে। থানার সামনে পিকেট ক'রে কী করতে চাও ?'

নরেশ্বর বলেন, 'প্রেসার দিতে চাই, যাতে আসল আসামীদের অ্যারেস্ট করে।'

'পিকেট করলেই কি অ্যারেস্ট করবে ?'

'একদিন দু'দিনে হয়ত করবে না। দিনের পর দিন পিকেট চালিয়ে গেলে তার একটা রেজাল্ট হ'তে বাধ্য।'

সবাই চুপচাপ কিছুক্ষণ ভেবে নেন। তারপর জগদীশ নামে কাটিহারের এক স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেন, 'থানার সামনে পিকেটটায় কাজ হবে ব'লে মনে হচ্ছে। এটা ভাল সিদ্ধান্ত।'

নরেশ্বর বলেন, 'মনে হচ্ছে, আমরা স্বাধীনতার আগের সেই ফ্রিডম মুভমেন্টের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছি।'

বাকি সবাই বিপুল উৎসাহে নরেশ্বরের কথায় সায় দেন।

রাকেশ নরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'চাচাজি, পিকেটটা কবে থেকে আরম্ভ করতে চান ?'

নরেশ্বর বলেন, 'কবে থেকে মতলব ? আজ থেকে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা জন পনের বেরিয়ে পড়ব।'

খানিক চিন্তা ক'রে রাকেশ বলেন, 'ওখানে আপনারা থাকবেন কোথায় ?'

এমন একটা প্রশ্ন আশা করেন নি নরেশ্বর। রীতিমত অবাকই হ'য়ে যান তিনি। বলেন, 'এখানে আমরা কোথায় আছি ?' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ফের শুরু করেন, 'ঠিক এভাবে, খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকব।' মানুষের, সে যত বড়ো বদমাস আর পাষণ্ডই হোক, তার নার্ভের ওপর অনবরত চাপ দিয়ে গেলে সে একদিন না একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য।'

রাকেশ এবং অন্য সবাই সায় দেন, 'সেটা ঠিক।'

কে কে থানায় পিকেট করতে যাবেন তার একটা তালিকা ক'রে ফেলা হয়। পনের জনের দলটিতে রাকেশ এবং দেবারতিও যাবে। অন্যেরা ভাগবত আর রামলখনের সঙ্গে ধারাবনীতেই থাকবেন। যে ফ্রিডম ফাইটাররা নতুন এসেছেন তাঁরা এখানকার কিছুই জানেন না। একেবারে আনকোরা জায়গায় এঁদের পক্ষে ঘরে ঘরে ঘুরে সাক্ষী-টাক্ষী যোগাড় করতে অসুবিধে হবে। ভাগবত এবং রামলখন ক'দিন ধরে এখানে আছেন। ধারাবনীর মানুষজন তাঁদের চেনে, তাঁরা সঙ্গে থাকলে আর যা-ই হোক নতুন ক'রে ভড়কে যাবে না। অবশ্য চেনা মুখ দেখলেই তারা গিরিলালদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে তার কোনো গ্যারাণ্টি নেই। তবু নিয়মিত চেষ্টাটা চালিয়ে যেতেই হবে।

রাকেশ এবং দেবারতির যাওয়ার কারণ আলাদা। নরেশ্বররা থানা চেনেন না, রাকেশ তাঁদের গাইড হ'য়ে সেখানে যাবেন। অন্যদের সঙ্গে পিকেটও করবেন।

আর দেবারতি যাবে ধারাবনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে নতুন ক'রে যে আন্দোলন শুরু হচ্ছে তার রিপোর্ট করতে।

অবশ্য রাকেশের পক্ষে দিনের পর দিন একটানা থানার সামনে পিকেট করা সম্ভব হবে না। তিনি থানায় দু-একদিন থেকে আবার ধারাবনীতে ফিরে আসবেন। যতদিন না খুনীদের ধরার ব্যবস্থা হচ্ছে, ক'দিন এখানে, ক'দিন ওখানে, এইভাবে থানা এবং ধারাবনীর মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলবেন। কেননা এ অঞ্চলে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনিই। তাঁকে ছাড়া কোনো দিকে কারো পক্ষে বেশি দূর এগুনো সম্ভব নয়। যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এর মধ্যেই এসে পড়েছেন এবং যাঁদের দু-চার দিনের ভেতর আসার সম্ভাবনা তাঁরা সবাই রাকেশের সহযোদ্ধা ও পরামর্শদাতা কিন্তু আসল নেতৃত্বটা তাঁরই।

খাওয়া-দাওয়ার পর যাঁরা থানায় যাবেন, নিজেদের বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নেন। রাকেশ না ফেরা পর্যন্ত ধারাবনীর দায়িত্ব থাকবে ভাগবত এবং রামলখনের ওপর।

রাকেশ বলেন, 'ভাগবতচাচা, রামলখনচাচা, হুঁশিয়ার থাকবেন। গিরিলালের বন্দুকবাজরা ঘোড়ায় চেপে যে কোনো সময় এখানে হানা দিতে পারে।'

ভাগবত রামলখন, দু'জনেই বলেন, 'জানি। ওরাও আমাদের পরিচয় জেনে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক উঁচিয়ে ভয়-টয় দেখাতে পারে, তার বেশি কিছু করতে ওদের সাহস হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

রাকেশ বলেন, 'লোকগুলো ভাল না। তাই—' বলতে বলতে তিনি থেমে যান।

রাকেশের দুশ্চিন্তা এবং সংশয়ের কারণ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না রামলখনদের। ভাগবত তাঁর কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'চিন্তা ক'রো না রাকেশ। আমরা খাস ইংরেজদের অনেক বন্দুক রাইফেল দেখেছি। ক'টা ছিঁচকে ভাড়াটে বদমাসের ভয়ে এই বয়েসে চুহার মতো কুঁকড়ে যাব, সেটা হয় না।'

দ্বিধান্বিতভাবে রাকেশ বলেন, 'মানে—'

'কী?'

'ওদের দিক থেকে প্রোভোকেসান আসতে পারে।'

'বৃটিশ আমলেও যথেষ্ট প্রোভোকেসান আসত। কিভাবে গিরিলাল ত্রিলোকীর লোকেদের মোকাবিলা করতে হবে, আমরা জানি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও।'

একসময় সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে, রাকেশরা বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা নিরস্ত্র যোদ্ধা—একমাত্র হাতিয়ার হ'ল অপরিসীম মনোবল।

রোদ ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যে দলটা জঙ্গলের কাছে চলে আসে।

সবার আগে আগে হাঁটছিলেন রাকেশ আর দেবারতি। পেছনে নরেশ্বররা।

পাশাপাশি হাঁটলেও রাকেশ বা দেবারতি বিশেষ কথা-টথা বলছিল না। জঙ্গলটা দেখে হঠাৎ দেবারতির মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা ঘটে যায়। সে বলে, 'একটা ব্যাপার আপনাদের ভেবে দেখা দরকার।'

রাকেশ উৎসুক চোখে দেবারতির দিকে তাকান। বলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কাল রাত্তিরে আর আজ সকালে আন্দোলনে এখানকার লোকজনের ইনভলভমেণ্টের কথা বলছিলেন না আপনারা?'

'হ্যাঁ। ওটা খুবই জরুরি। কিন্তু আপনাকে তো জানিয়েছি, অনেক চেষ্টা ক'রে আর বুঝিয়ে সুঝিয়েও ধারাবনীর লোকজনদের আমাদের সঙ্গে পাচ্ছি না।'

দেবারতি বলে, 'যাদের পেতে পারতেন তাদের কিন্তু ডাকেন নি।'

'কাদের কথা বলছেন?' বলতে বলতে হঠাৎ দেবারতির ভাবনাটা রাকেশের মধ্যেও চারিয়ে যায়। উদ্দীপ্ত মুখে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই ধনুয়া কুঁদরী আর আনোখির কথা?'

'হ্যাঁ।' দেবারতি আস্তে মাথা নাড়ে।

'এটা আগেই আমাদের মাথায় আসা উচিত ছিল। ওদের মতো সাহসী জেদী লোকেদের ডেকে নিলে ভাল হ'ত। ওরা সঙ্গে থাকলে গাঁয়ের লোকেদের ভয় অনেকটা কেটে যেত। ভাবছি—'

'কী?'

'থানা থেকে ফেরার সময় ধনুয়াদের সঙ্গে ক'রে ধারাবনীতে নিয়ে যাব।'

'গুড আইডিয়া। আরেকটা কথা ভাববেন।'

'কী?'

'যে সব মেয়েদের ওপর টরচার হয়েছে তাদের কেউ এখন আর সাক্ষি দিতে চাইছে না। আমার ধারণা, কুঁদরীকে বললে সে নিশ্চয়ই দেবে।'

রাকেশ বলেন, 'ধনুয়ার স্ত্রী অবশ্যই তার মতো সাহসী। নইলে ওভাবে জঙ্গলে পড়ে থাকত না।'

দেবারতি বলে, 'সমস্ত দিন ধনুয়া আর আনোখি কাছে থাকে না, ভোরে উঠেই হাটে কাজ করতে বেরিয়ে যায়। সেই সন্ধে পর্যন্ত একা একটা মেয়েকে যেভাবে কাটাতে হয়, আমি তো ভাবতে পারি না।'

রাকেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন শুধু, মুখে কিছুই বলেন না।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর দেবারতি বলে, 'আরেকটা ব্যাপারও ভাবছি।'

'কী ?' রাকেশ উৎসুক চোখে দেবারতির দিকে তাকান।

'কুঁদরীর স্টেটমেণ্ট তো আমরা টেপ করে নেবো।'

'হ্যাঁ।'

'সেই টেপ ধারাবনীর মানুষদের যদি শোনানো যায়, মনে হয় কাজ হবে।'

দেবারতির উদ্দেশ্য মুহূর্তে জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে যায়। কুঁদরীর জবানবন্দি শুনলে ভয় ভেঙে যাবে ধারাবনীবাসীদের। আশা করা যায় তাদের মনোবল বাড়বে। তারা হয়ত এরপর সাক্ষি দিতে রাজী হবে।

প্রবল উদ্দীপনায় চোখমুখ ঝকঝক করতে থাকে রাকেশের। বলেন 'দুর্দান্ত ভেবেছেন। কুঁদরীর স্টেটমেণ্ট শোনালে যথেষ্ট কাজ হবে।' একটু থেমে বলেন, 'একটা অনুরোধ করছি।'

'কী ?'

'আরো ভাবুন, আর কী কী করলে আমাদের আন্দোলনটাকে সাকসেসফুল করা যায়।'

দেবারতি একটু লজ্জা পেয়ে যায়। সঙ্কোচের গলায় বলে, 'আন্দোলনের আমি কী-ই বা জানি ! দেশের বড় বড় ফ্রিডম ফাইটাররা এসেছেন, আরো অনেকে আসছেন। তাঁরাই আপনাকে ঠিক পরামর্শ দেবেন। আমার মাথায় হঠাৎ কুঁদরীর ব্যাপারটা এসেছিল, তাই ব'লে ফেললাম।'

রাকেশ বলেন, এই রকম হঠাৎ হঠাৎ মাথায় যা আসবে, বলবেন।'

'ঠিক আছে।' দেবারতি হাসে।

সন্ধের মুখে মুখে দলটা থানায় পৌঁছে যায়।

চল্লিশ

রুরাল ইলেকট্রিফিকেসানের দৌলতে হাই-ওয়ের এই দিকটায় বিজলি এসে গেছে। ফলে থানাতেও এর মধ্যেই আলো জলে উঠেছে। তবে ভোল্টেজ কম হওয়ার কারণে সবগুলো বাতিই খুব নিস্তেজ। বড়ই টিমটিম ক'রে জ্বলছে।

থানার সামনের কাঠের নড়বড়ে গেটটা খোলাই রয়েছে। রাকেশরা সেদিন

যেমন দেখে গিয়েছিলেন, আজকের ছবিটা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। গেটের ওধারে পাঁশুটে ঘাসের জমিটার একধারে পিপর এবং অর্জুন গাছের গায়ে তিন-চারটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। আর দেখা যাচ্ছে একটা জীপ। গাছতলায় চারপায়ায় বসে তিন-চারটে কনস্টেবল হাতের তেলোতে খৈনি ডলতে ডলতে গপসপ করছে। থানার লাল বাড়ির বারান্দায় আরো দুই কনস্টেবল বন্দুক দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে কোনো একটা রগড়ের কথায় বিশাল শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠছে।

রাকেশরা ভেতরে ঢোকেন না। থানা কম্পাউণ্ডের ঠিক বাইরে বিছানা স্যুটকেশ লণ্ঠন-টণ্ঠন নামিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেন। ততক্ষণে অন্ধকার ঘন হ'তে শুরু করেছে। থানার পর ডান দিকে এবড়ো-খেবড়ো কিছু চাষের জমি। তারপর ক'টা দেহাতী গাঁ এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। গাঁগুলো অবশ্য এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে দূরবর্তী আলোর নড়াচড়া দেখে গ্রামগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

থানার বাঁ-ধারে খানিকটা তফাত দিয়ে হাই-ওয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই লং ডিসটান্স রুটের বাস বা ট্রাকের কনভয় গাঁ গাঁ করতে করতে ছুটে যায়। গাড়ি-গুলোর হেড লাইটের আলোয় অ্যাসফাল্টের চকচকে মসৃণ রাস্তাটাকে স্পষ্ট দেখা যায়।

চারপাশের ঝোপঝাড়ে এবং দূরের ফাঁকা মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ছে। একপাল শিয়াল কোথায় যেন মুদারায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জুড়ে দিল। এক দঙ্গল কুকুর কোথায় যেন তক্কে তক্কে ছিল, তক্ষুনি গলা আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে কোরাসে শিয়ালদের ধমকে ওঠে।

রাকেশের সঙ্গে যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এসেছেন তাঁরা হলেন নরেশ্বর, কানহাইয়া লাল, বিষ্ণুহরি, লালচাঁদ, ললিতপ্রসাদ, চান্দেরি রাম, প্রবোধকান্ত ইত্যাদি। নরেশ্বররা এবার ধীরেসুস্থে ক'টা লণ্ঠন জেলে ফেলেন। তারপর সবাই যে-যার বিছানা পেতে নেন।

আরাম ক'রে বিছানায় বসতে বসতে রাকেশের উদ্দেশে নরেশ্বর বলেন, 'আজ রাত্তিরে আমাদের কী প্রোগ্রাম?'

রাকেশ বলেন, 'আজ আমাদের রেস্ট। খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোব। সকালে উঠে ফুল এনার্জি নিয়ে কাজে নামতে হবে।'

'সেই ভাল। এখন এই অন্ধকারে কিছুই করা যাবে না। আশেপাশে তালাও কি নহরটহর নেই? স্নান করতে না পারলে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। ধুলোবালি আর ঘামে গা চটচট করছে।'

ক'দিন আগে রাকেশ যখন এখানে এসেছিলেন, থানার পেছন দিকে, কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা বড় পুকুর তাঁর চোখে পড়েছিল। বলেন, 'তালাও আছে চাচাজি।'

'কোথায় ?'

'কাছেই। সবাই আসুন আমার সঙ্গে।'

লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে নরেশ্বররা রাকেশের সঙ্গে থানার পেছন দিকের পুকুরে গিয়ে স্নান সেরে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসেন। দেবারতি অবশ্য স্নান ক'রে নি, ভাল ক'রে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েছে।

এবার যে-যার খাবার-দাবার বের ক'রে খাওয়া শুরু ক'রে দেন। খাবার জলও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন রাকেশরা। কাজেই ওটা যোগাড় করার সমস্যা নেই।

খেতে খেতে দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'কাল থেকে যে পিকেটিং শুরু হচ্ছে, তাতে কি আপনারা শুধু এখানে বসেই থাকবেন ?'

নরেশ্বর বলেন, 'হ্যাঁ। পিকেটিং তো ঐভাবেই করতে হয়।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'থানায় প্রচুর লোকজন আসে। তাছাড়া হাই-ওয়ে থেকেও এ জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়। লোকে কী ক'রে বুঝবে, কী জন্যে এখানে পিকেটিং হচ্ছে ?'

নরেশ্বর উত্তর দেবার আগেই রাকেশ বলেন, 'তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'কি রকম ?' পনের ষোল জোড়া চোখের নজর রাকেশের মুখের ওপর এসে পড়ে।

রাকেশ জানান, কাল সকালে কাছাকাছি কোনো বাজার থেকে কাগজ কালি ইত্যাদি কিনে এনে পোস্টার লেখা হবে। কাঠ-টাঠ যোগাড় ক'রে কেটেকুটে ফ্রেম বানিয়ে সেইসব পোস্টার হাই-ওয়ে থেকে থানা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দেবেন যাতে সেগুলো সবার নজরে পড়ে। তা ছাড়া চারপাশের গাঁগুলোতে ঘুরে ঘুরে মানুষ-জনকে জানানো হবে, কী উদ্দেশ্যে এখানে পিকেটিং করা হচ্ছে।

পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও তেমন ফাঁক নেই। সবাই মাথা নেড়ে সায় দেন। নরেশ্বর বলেন, 'ভেরি গুড প্ল্যানিং। পিপলস সাপোর্টটা খুব বড় কথা।'

এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী, যাঁর নাম লালচাঁদ বলেন, 'রাকেশ এই এলাকার মানুষজনের কথা তোমাদের কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংদের ওরা ভীষণ ভয় পায়। এদের সাপোর্ট পাওয়া কি সহজ হবে ?'

নরেশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বলেন, 'ঠিকই বলেছেন লালচাঁদ ভাই। সাপোর্ট

হয়ত শুরুতেই পাওয়া যাবে না, তবে লোকে তো বুঝবে গিরিলালরা যা করেছে তার বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট শুরু হয়েছে। আমাদের পিকেট যদি বেশিদিন চলে, একদিন না-এককদিন ওরা পাশে এসে দাঁড়াবে।'

চান্দেরি রাম বলেন, 'সেটা অসম্ভব নয়।'

নরেশ্বর এবার বলেন, 'আনোখি বা ধনুয়াকে আমাদের সঙ্গে এখানে পাওয়া গেলে ভাল হ'ত।'

নরেশ্বরের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছিলেন রাকেশ। যাদের ওপর জুলুম চালানো হয়েছে তাদের কেউ সঙ্গে থাকলে আন্দোলন অনেক জোরালো হয়। এই কারণেই ধনুয়াদের ধারাবনীতে নিয়ে যাবার কথা আগেই দেবারতি এবং তিনি ভেবেছেন। রাকেশ বলেন, 'ওদের একজনকে দু-একদিনের মধ্যে এখানে নিয়ে আসব নরেশ্বরচাচা।'

মশারা চারিদিকে বুঝিবা ওত পেতেই ছিল। নতুন মানুষগুলির খবর পেয়ে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে থাকে।

তবে নরেশ্বররা একেবারে নিরস্ত্র নন। মশাদের ঠেকাবার সরঞ্জাম তাঁরা সঙ্গে এনেছেন। ঝোলা থেকে মশা তাড়াবার ধূপ বের ক'রে তাঁরা জ্বালিয়ে দেন। উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধে মশারা দূরে হটে যায়। তবু এরা হ'ল অতীব নাছোড়বান্দা। কাছাকাছিই যে আছে সেটা তাদের ভনভনানিতে টের পাওয়া যায়। ধূপের ঝাঁঝ একটু কমে এলেই ফের তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নরেশ্বর বলেন, 'এত ধূপ আমাদের সঙ্গে নেই যে বেশি রাত পর্যন্ত জ্বালিয়ে খোলা জায়গায় ব'সে থাকা যাবে। সেটা ওয়েস্টেজ অফ মানি।'

সবাই জানতে চান, 'কী করবেন তা হ'লে?'

'খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে মশারি খাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়া যাক। ঘুম পেলে শুয়ে পড়া যাবে।'

খাওয়া দাওয়া যখন চলছে, সেই সময় হঠাৎ থানার ভেতর থেকে একটা কনস্টেবল বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কোন হ্যায় রে, উঁহা? বাত্তি জ্বলায়া কৌন?'

নরেশ্বর গলার স্বর উঁচুতে তুলে বলেন, 'হামলোগ।'

'হামলোগ কৌন?'

'আমাদের সবাইকে চিনবেন না সিপাইজি। এখানে আমরা নতুন। তবে—'

'তব্ ক্যা?'

'দু-একজনকে হয়ত চিনতে পারেন।'

'যাতে হেঁ—'

ভারী বুটের আওয়াজ তুলে দুই কনস্টেবল থানা কমপাউণ্ডের বাইরে বেরিয়ে আসে। নরেশ্বররা কোন স্তরের মানুষ, দেখামাত্র তারা টের পেয়ে যায়। এত-গুলো বর্ষীয়ান মানুষ হঠাৎ কেন নগণ্য দেহাতী থানার সামনে মালপত্র বিছানা টিছানা নিয়ে এসে জড়ো হয়েছেন, বুঝতে না পেরে তারা এতই অবাক হয় যে খানিকক্ষণ কী বলবে, ভেবে পায় না। তারপর একটা কনস্টেবল জিজ্ঞেস করে, 'আপলোগ কঁহাসে আয়া ?'

নরেশ্বররা জানান, তাঁদের কেউ এসেছেন সাহারসা, কেউ পূর্ণিয়া, কেউ কাটিহার, ইত্যাদি অঞ্চল থেকে।

লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে নরেশ্বররের মুখে। তাঁদের দেখতে দেখতে কনস্টেবলটা বিমূঢ়ের মতো বলে, 'এত এত জায়গা থেকে এসেছেন ! কৌঈ জরুরত হ্যায় ?'

চান্দেরি রাম উত্তর দেন, 'হ্যাঁ। বহুত জরুরত।'

'কী ?'

'আমরা এখানে কয়েক দিন থাকব।'

দুই কনস্টেবলের চোখ একেবারে গোলাকার হ'য়ে যায়। তারা বলে, 'এই ফাঁকা জায়গায় ! আসমানকা নিচে !'

নরেশ্বররা বলেন, 'হ্যাঁ।'

কনস্টেবল দুটো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, আচমকা তারা রাকেশকে চিনে ফেলে। প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে বুটে বুট ঠেকিয়ে সেলাম ঠুকে বলে, 'আপ ম্যাজিস্টর সাহিব ?'

রাকেশ মৃদু হাসেন, 'চিনতে পেরেছেন ?'

'হাঁ, জরুর।'

রাকেশও কনস্টেবলদের চিনে ফেলেছেন। আগে যেদিন এখানে এসেছিলেন, এদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেন, 'সেদিন আপনাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি আর ম্যাজিস্ট্রেট নেই। নৌকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। আমাকে এত খাতির ক'রে সেলাম ঠোকার জরুরত নেই।'

কনস্টেবলরা অত্যন্ত বিনীতভাবে জানায়, ইস্তফা দিলেও রাকেশ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই। তাঁকে সম্মান জানানোটা তাদের কর্তব্য।

যারা প্রতিজ্ঞা করেছে সেলাম ঠুকবেই, তাদের ঠেকানো যাবে কী ক'রে ? রাকেশ সে চেষ্টা না ক'রে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, 'আপনাদের ওসি পুরন্দর সিংজি থানায় নেই ?'

'নেহী'। পরশু মণিহারি গেছেন।'

'কেন ?'

'ওঁর শালীর শাদি—ইসি লিয়ে।'

'কবে ফিরবেন ?'

'কাল।'

'ঠিক আছে, কালই পুরন্দরজির সঙ্গে দেখা হবে।'

কনস্টেবল দুটো তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আর কিছু বলবেন আপনারা ?'

দুই কনস্টেবলই মাথা হেলিয়ে দেয়, অর্থাৎ তাদের কিছু বলার আছে।

রাকেশ বলেন, 'বেশ তো। বলুন না—'

যে কনস্টেবলটি বেশি ঢ্যাঙা সে জানতে চায়, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মতো একজন মহামান্য মানুষ এত কষ্ট ক'রে খোলা মাঠে ধুলোবালির মধ্যে বসে আছেন কেন ?

রাকেশ বলেন, 'দরকার আছে, তাই—'

ঢ্যাঙা কনস্টেবল দ্রুত চারিদিকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বিস্তারা ভি পেতে নিয়েছেন। এখানেই রাত কাটাবেন নাকি ?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে।'

মাথায় খাটো কিন্তু চওড়ায় বিশাল. দ্বিতীয় কনস্টেবলটা বলে, লেকেন হুজৌর, মচ্ছরেরা জান চোপট ক'রে দেবে।'

রাকেশ বলেন, 'চিন্তা করবেন না, আমাদের কাছে মশা তাড়াবার ধূপ রয়েছে। ঐ দেখুন না জ্বালিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া মশারিও নিয়ে এসেছি।'

লম্বা কনস্টেবলটার দুই চোখ চরকির মতো স্বাধীনতা-সংগ্রামী অর্থাৎ নরেশ্বর-দের এবং দেবারতির ওপর ঘুরছিল। খানিক ইতস্তত ক'রে সে নরেশ্বরদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এঁদের তো চিনতে পারলাম না হুজৌর।'

রাকেশ বলেন. 'আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না। পরে এঁদের পরিচয় নিশ্চয়ই জানতে পারবেন। আপনারা আর কষ্ট করবেন না, ভেতরে চলে যান।'

কনস্টেবলরা তবু দাঁড়িয়েই থাকে।

এবার একটু বিরক্ত হ'ন রাকেশ। বলেন, 'কী হ'ল, আপনাদের যেতে বললাম তো।'

লম্বা কনস্টেবলটি হাতজোড় ক'রে বলে, 'হুকুম হো যায় তো, হামনিকা এক আর্জি হ্যায়—'

'কিসের আর্জি ?'

'এই নোংরা গান্ধা জায়গায় রাত কাটাতে আপনাদের বহোত তখলিফ হবে। থানার ভেতর দুটো ফাঁকা বড় ঘর আছে, আপনাদের শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। এখানে আমাদের কোনোরকম অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া থানার ভেতর ক'দিন আর থাকতে দিতে পারবেন ?'

বুঝতে না পেরে ঢ্যাঙা কনস্টেবল জিজ্ঞেস করে, 'মতলব ?'

'মতলব, আমাদের কতদিন এখানে পড়ে থাকতে হবে, তার ঠিক নেই। দু'দিন, চার দিন, দশ দিন, হয়ত বা এক মাসও কাটাতে হ'তে পারে। মোট কথা, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমাদের যাবার উপায় নেই। ততদিন কি আপনারা থানার ভেতর থাকতে দিতে পারবেন ?'

দুই কনস্টেবলই একেবারে হাঁ হ'য়ে যায়। কিছুক্ষণ পর লম্বাটি বলে, 'এতে রোজ আপনারা কি এই মাঠে পড়ে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'বললাম তো দরকার আছে। আপনাদের ও সি ফিরে আসুন। তখনই জানতে পারবেন। এবার ভেতরে যান।'

বিমূঢ়ের মতো রাকেশদের দিকে তাকাতে তাকাতে দুই কনস্টেবল থানার কমপাউণ্ডে ঢুকে যায়।

আরো কিছুক্ষণ পর খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে মশারি খাটিয়ে আলো নিভিয়ে রাকেশরা শুয়ে পড়েন।

একচল্লিশ

রাকেশ যে ক'জন স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে দেখেছেন—তাঁর বাবুজি রাজেশ্বর থেকে ভাগবত রামলখন নরেশ্বর পর্যন্ত—তাঁরা সবাই সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে কাজটি সেরে ফেলেন সেটি হ'ল স্নান। সঙ্গগুণে এই অভ্যাসটি রাকেশের মধ্যেও কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে। সবার ঘুম ভাঙবে আর দেবারতি একা একা বিছানায় পড়ে থাকবে, তা তো আর হয় না। শুধু ফ্রিডম ফাইটারের দল বা রাকেশই না, এ অঞ্চলের তাবত পাখপাখালিরও ঘুম ভাঙে অন্ধকার থাকতে

থাকতে। চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে তারা এমন হই চই চেঁচামেচি জুড়ে দেয় যে কার সাধ্য ঘুমোয়। অগত্যা দেবারতিকেও উঠে পড়তে হয়েছিল।

রাকেশরা বিছানা টিছানা গুছিয়ে রেখে স্নান করতে চলে যান। দেবারতিকেও তাঁরা সঙ্গে যেতে বলেছিলেন কিন্তু এতগুলো পুরুষের সামনে খোলা পুকুরে স্নান করাটা একটি তরুণীর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। সে জানিয়েছে রাকেশরা ফিরে আসার পর যাবে। কারণটা আন্দাজ ক'রে কেউ আর তাকে দ্বিতীয় বার যাবার কথা বলেন নি। নরেশ্বর শুধু বলেছেন, 'তুমি তা হ'লে এখানে বসে মালপত্তর পাহারা দাও।'

রোদ উঠতে এখনও কিছু বাকি। তবে পুব আকাশে আবছা আলোর ছোপ ধরতে শুরু করেছে। চারপাশের গাছপালার মাথায় পাখিরা অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি ক'রে যাচ্ছে।

সবাই নিজের নিজের বিছানা গুছিয়ে রেখে গেলেও দেবারতি তার বিছানাতেই ব'সে অন্যমনস্কর মতো পাখিদের একটানা কিচির-মিচির আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনছিল।

এক সময় স্নান সেরে নরেশ্বররা ফিরে আসেন, সকলের হাতেই জলের বালতি। চারিদিকের গাছের ডালে ডালে বেঁধে ভেজা কাপড় গামছা তোয়ালে ইত্যাদি শুকোতে দেন তাঁরা, তারপর দেবারতিকে স্নান করতে যেতে ব'লে পুব দিকে তাকিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সূর্যস্তব শুরু করেন।

দেবারতি তার ব্যাগ থেকে তোয়ালে, টুথ ব্রাস, পেস্ট এবং সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি বের ক'রে পুকুরের দিকে যেতে যেতে পনেরটি স্বাধীনতা সৈনিকের মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং—'

দেবারতির ফিরে আসতে আসতে রোদ উঠে যায়। এর মধ্যে স্টোভ জ্বালিয়ে চা এবং হালুয়া বানিয়ে ফেলেছেন নরেশ্বররা। সে বিশেষ অবাক হয় না। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নামক এই বিশেষ ভারতীয় প্রজাতিটির ধাত সে ভাল ক'রেই জেনে গেছে। দারুণ ডিসিপ্লিন এবং সময়ানুবর্তিতা এঁদের। যেটুকু করার তা ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ক'রে থাকেন।

নরেশ্বর বলেন, 'তোমার জামাকাপড় শুকোতে দিয়ে চা খেয়ে নাও দেবারতি।'

কাল রাতেই আজকের কর্মসূচি মোটামুটি ঠিক ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এখন চা খেতে খেতে ফের সে ব্যাপারে নতুন ক'রে আলোচনা ক'রে নেওয়া হয়।

প্রথমত চা খেয়েই দেবারতি আর রাকেশ পোস্টারের জন্য রং তুলি কাগজ এবং বাঁশ কিনতে হাটে বা বাজারে—যেটা সামনে পড়ে, চলে যাবেন। সেখান থেকে ফিরে পোস্টারগুলো লেখা হ'লে পিকেটিং-এর ব্যবস্থা ক'রে যদি সময় পাওয়া যায়, হাইওয়ে থেকে বাস ধরে পূর্ণিয়ায় যাবেন। সেখান থেকে দেবারতি তার কাগজ 'মর্নিং সান'-এ এখানকার জেনোসাইড, পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এ ব্যাপারে আন্দোলনে যোগদান এবং থানার সামনে পিকেটিং সম্পর্কে একটা ভাল রিপোর্ট পাঠাবে। কেননা, এ খবরটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, খবরের কাগজে ছাপা অত্যন্ত জরুরি। এরকম একটা গণহত্যার পর কেউ যে পার পেয়ে যেতে পারে না, দেশের মানুষকে তা জানাতেই হবে। রাকেশরা বাজার যাবেন, আর এদিকে নরেশ্বররা রান্নার আয়োজন করবেন। সঙ্গে যে চাল ডাল রয়েছে তা দিয়েই দু-একদিন চলে যাবে, তারপর অবশ্য কেনা কাটা করতে হাটটাতে যেতেই হবে।

চা খেয়ে দেবারতি এবং রাকেশ বেরিয়ে পড়েন। কাগজ, রং ইত্যাদি কিনে ওঁরা যখন থানার সামনে ফিরে আসেন, দুপুর হ'তে বেশি দেরি নেই। সূর্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। এখন আর আকাশের দিকে তাকানো যায় না, মনে হয়, চোখ ঝলসে যাবে। দমকা গরম বাতাস হু-হু ব'য়ে যাচ্ছে পুব থেকে পশ্চিমে, কখনও বা উত্তরে-দক্ষিণে আড়াআড়ি।

কাল রাকেশরা যেখানে রাত কাটিয়েছেন সেই জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকা। চৈত্রের এই ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে খোলা মাঠের মাঝখানে পড়ে থাকা অসম্ভব। বাঁ পাশে প্রচুর ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। নরেশ্বররা গাছগুলোর তলায় সরে এসেছেন। এখানে যে ছায়াটুকু রয়েছে, দুপুরের অসহ্য উত্তাপ থেকে নিজেদের বাঁচানোর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তাই গাছের ডালে ডালে দড়ি দিয়ে মোটা চাদর বেঁধে অনেকটা চাঁদোয়ার মতো খাটিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। তার নিচে ইঁট দিয়ে উনুন বানিয়ে কাঠকুটো জ্বালিয়ে বড়ো বড়ো হাঁড়ি-কড়ায় রান্নাবান্না চলছে।

রাকেশের পরিষ্কার মনে আছে, কাল ধারাবনী থেকে তাঁরা যখন বেরিয়েছিলেন, তাঁদের কারো সঙ্গেই বড় বাসন-কোসন ছিল না। অথচ পনের কুড়িজনের রান্না হবে। ছোট হাঁড়ি-টাড়িতে বার বার রান্না চাপানোতে ভীষণ হুজ্জত। তা ছাড়া সময়ও অনেকটা বাজে নষ্ট হয়। সবার সঙ্গেই স্টোভ রয়েছে। এতগুলো স্টোভ ধরালে প্রচুর কেরোসিন পুড়বে। একসঙ্গে রান্না হ'লে খরচ পরিশ্রম এবং সময় অনেকটাই বাঁচবে।

একটা কথা ভেবে রাকেশ অবাক হচ্ছিলেন, এত বিরাট বিরাট হাঁড়ি ডেকচি

ইত্যাদি কোথায় পেলেন নরেশ্বররা ? জিজ্ঞেস করতে ওঁরা জানালেন, কাল রাতের সেই দুই কনস্টেবল দরবাজা সিং আর লাল্লু মিসির তাঁদের এই সব পেল্লায় 'বর্তন' দিয়েছে। আর শুকনো কাঠকুটো যোগাড় করা হয়েছে চারপাশের গাছগাছালির মরা ডাল ভেঙে।

রাকেশের বিস্ময় আরো বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 'পুলিশরা আজও তা হ'লে এখানে এসেছিল !'

নরেশ্বর বলেন, 'হ্যাঁ, অনেক বার। তোমরা বাজারে চলে গেলে, তার পর থেকেই ওরা এখানে বার বার আসছে। আমাদের সঙ্গে ছোট ছোট হাঁড়ি কড়া দেখে বললে রসুইয়ের অসুবিধে হবে। তাই বড় বর্তন এনে দিলে।'

'পেল কোথায় ? থানায় কি বাসন-কোসনের কারখানা আছে ?'

'আমরাও জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'কী বললে ওরা ?'

'বললে ওগুলো চোরাই মাল। চোরেরা গৈয়া গাড়িতে ক'রে ওগুলো পাচার করার ফিকিরে ছিল। পুলিশ হানা দিতে গাড়ি ফেলে ভেগে যায়। মালগুলো তখন থানায় এনে রাখা হয়। মালিক কে জানা যায় নি, বর্তনগুলোর দাবিদারও কেউ আসে নি। সেই থেকে ওগুলো পড়ে আছে। কনস্টেবলরা বললে, বিলকুল নয়া বর্তন, জিনিস থাকতে কেন খামোকা আমরা কষ্ট করব ! বুঝলে রাকেশ, আমরাই পয়লা এগুলো ব্যবহার করলাম।'

রাকেশ হাসেন। কাপড়ের চাঁদোয়ার তলায় বসতে বসতে বলেন, 'চোরাই জিনিস দিয়ে রসুই হচ্ছে। হজম হ'লে হয় !'

সবাই হাসতে থাকেন। নরেশ্বর বলেন, 'যা বলেছ।'

দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'আমরা, মানে আপনারা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, সেটা আবার জানতে চায় নি ?' সে যে সাংবাদিক, তার যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা উচিত, 'আমরা' বলেই তা টের পেয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ শুধরে 'আপনারা' ক'রে নেয়।

'হুঁ, অনেক বার। তবে আমরা কিছু বলি নি। পিকেটিং শুরু হ'লে তো ওরা জানতে পারবেই।'

রাকেশ বলেন, 'আগে জানলে পুলিশ কিছুতেই বাসন দিয়ে আমাদের সাহায্য করত না।'

'তা যা বলেছ !'

'ওসি পুরন্দর সিং ফেরেন নি ?'

'না। শালীর বিয়ের আনন্দে এখনও মশগুল হয়ে আছেন।'

দুটো বড় প্যাকেট বোঝাই ক'রে পোস্টারের জন্য ভারী মোটা কাগজ আর কাঠের সরু সরু টুকরো নিয়ে এসেছেন রাকেশরা। সেগুলো দেখিয়ে লালচাঁদ বলেন, 'সব পাওয়া গেছে তা হ'লে ?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, চাচাজি।'

লালচাঁদের অসীম উৎসাহ। তিনি বলেন, 'মালপত্র যখন পাওয়া গেছে তখন কাজ শুরু ক'রে দেওয়া যাক।'

নরেশ্বর প্রায় ধমকেই ওঠেন, 'তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান হবে না। ছেলেমেয়ে দুটো রোদে পুড়ে এইমাত্র ফিরে এল। যথেষ্ট সময় আছে। ওরা বিশ্রাম করুক, খাওয়া দাওয়া সারুক। তারপর ওসব হবে।'

লালচাঁদ বিব্রতভাবে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে গরম কালের বেলা হেলে যায়। নরেশ্বরের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা। সূর্য মাথার ওপর আসার আগেই তাঁরা 'দুপহরকা ভোজন' চুকিয়ে ফেলেন। আজ যে সময়ের হেরফেরে অনিয়মটা ঘটল তার কারণ নতুন জায়গায় রান্নাবান্নার তোড়জোড় করতে দেরি হ'য়ে যাওয়া।

খাওয়ার পর চাঁদোয়ার তলায় খানিক ক্ষণ গড়িয়ে নেন সবাই। এঁদের কারোই দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই।

বিশ্রামের পর লাল এবং কালো রংয়ে পোস্টার লেখা শুরু হয় হিন্দি এবং ইংরেজিতে। রাকেশ, নরেশ্বর, চান্দেরি রাম এবং প্রবোধকান্তর হাতের লেখা খুব সুন্দর। লেখার দায়িত্বটা তাঁরাই নেন। স্লোগানগুলো এইরকম।

'অ্যারেস্ট দা মার্ডারারস অফ ধারাবনী।'

'ধারাবনীকা হত্যারাঁকো গ্রিফতার ক'র।'

'পুলিশ গিভিং শেলটার টু দা কালপ্রিটস।'

'পুলিশ অপরাধীয়োঁকো সাহারা দেতা হ্যায়।'

'যব তক অপরাধী পাকড়া না যায়, পিকেটিং চালু রহেগি।'

'পুলিশ আউর পলিটিসিয়ানকা মিলিভগত—'

'বন্ধ্ কর।'

থানেদারকো—'

সাসপেণ্ড কর।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ষাটটা পোস্টার। লেখা হ'য়ে গেলে কাঠের সরু সরু ফালিগুলোতে সে সব আটকে মাটিতে এমন ভাবে পুঁতে দেওয়া হয় যাতে হাইওয়ে থেকে চোখে পড়ে। কয়েকটা আবার থানার দিকে মুখ ক'রেও সাজিয়ে রাখা হয়।

বেলা হেলে যাওয়ায় রোদের তাপ জুড়িয়ে আসছে। রোদে গনগনে ভাবটা আর নেই। তবু চাঁদোয়ার তলা থেকে বাইরে গিয়ে এখনও বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। রোদে যেটুকু ঝাঁঝ অবশিষ্ট আছে তাতে চোখমুখ জ্বালা জ্বালা করতে থাকে। তাই চাঁদোয়ার নিচেই পাশাপাশি ব'সে থাকেন নরেশ্বররা।

একসময় প্রবোধকান্ত বলেন, 'বৃটিশ আমলের সেই আইন অমান্য আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই না নরেশ্বরভাই?'

নরেশ্বর আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, বলেন, 'হ্যাঁ।'

ললিতপ্রসাদ বলেন, 'থানায়, কালেক্টারেট বিল্ডিং, এস. ডি. ও'র অফিস, ডি. এম-এর অফিস, মদের দোকান—এমনি কত জায়গায় যে আমরা পিকেট করেছি! সব স্বপ্ন মনে হয়।'

মনোহরলাল বলেন, 'আইন অমান্যর কথা উঠলে রাজরতনের মুখটা মনে পড়ে যায়। সেদিন পূর্ণিয়ায় কালেক্টরেট অফিসের সামনে পিকেটিং করছি। কোনোরকম উত্তেজনা বা প্রোভোকেসান ছিল না। আচানক পুলিশ লাঠি চালাতে লাগল।'

তাঁর কথার মধ্যেই হঠাৎ নরেশ্বর বলে ওঠেন, 'একটা লাঠি এসে পড়েছিল রাজরতনের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মৌত (মৃত্যু)। তখন কত আর বয়েস ওর। খুব বেশি হ'লে আঠার উনিশ।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

থানার সামনে গাছপালার নিচে গ্রীষ্মের এই পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ গভীর বিষাদ নেমে আসে। শুধু গাছের মাথায় অদৃশ্য ঘুঘুর ক্লান্ত ডাকাডাকি আর হাইওয়ে দিয়ে দূর পাল্লার দু-একটা ট্রাক বা বাসের গাঁ গাঁ ক'রে ছুটে যাওয়া ছাড়া সমস্ত চরাচরে কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

একসময় নরেশ্বর বলেন, 'ছেলেটা খুব ব্রাইট ছিল। যেমন ব্যবহার, তেমনি দেখতে। লেখাপড়াতেও ব্রিলিয়াণ্ট।'

মনোহরলাল বলেন, 'আরেকটা ব্যাপার মনে আছে?'

'কী বল তো?' নরেশ্বর মনোহরলালের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

মনোহরলাল যা উত্তর দেন তা এইরকম।

রাজরতন গভর্নমেণ্ট অফিসারের ছেলে। ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, এটা বাড়ির কেউ চাইত না। এই পথ ছেড়ে দিয়ে যাতে বৃটিশের

বসংবদ প্রজা হ'য়ে নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলে, সে জন্য তার ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু যার চিন্তায় এবং স্বপ্নে পরাধীনতার গ্লানি অহরহ বিদ্ধ করছে, তাকে কি ঠেকিয়ে রাখা যায়? বাড়িঘর, বাবা-মা-ভাই-বোন, সবাইকে ছেড়ে রাজরতন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের মুক্তিযুদ্ধে। সেই বয়সে তার মধ্যে যে সাহস, দৃঢ়তা এবং অক্লেশে সর্বস্ব ত্যাগের যে সংকল্প ছিল, তা প্রায় অভাবনীয়। রাজরতন বেঁচে থাকলে ভারতবর্ষ এক ভয়লেশহীন নিঃস্বার্থ দেশব্রতীকে পেয়ে যেত। নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল তার সহজাত। কিন্তু পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই নিতান্ত অকালে. রাজরতনের মৃত্যু ঘটে। স্বাধীন ভারতবর্ষের কেউ তাকে মনে ক'রে রাখে নি। শুধু মোহনলালদের সে-আমলের ক'জন স্বাধীনতা সৈনিকের স্মৃতিতে এখনও সে কোনোরকমে বেঁচে আছে। এঁদের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

সবার পাঁজরের গভীর তলদেশ থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে গ্রীষ্মের উল্টোপাল্টা হাওয়ায় মিশে যায়।

নরেশ্বর বলেন, 'অসাধারণ ছেলে ছিল রাজরতন। এমন আইডিয়ালিস্ট আমি খুব বেশি দেখিনি।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর স্মৃতিচারণের মধ্যে চলে যান নরেশ্বররা। শুধু রাজরতনই নয়, আরো অসংখ্য অখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগের কথা গভীর আবেগে নতুন ক'রে আলোচনা করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গ পুরনো আদর্শবাদীদের সঙ্গে স্বাধীনতার পরের নতুন প্রজন্মের দেশপ্রেমিকদের কথাও ওঠে।

হঠাৎ একসময় জয়চাঁদ বলে ওঠেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?'

নরেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কী বল তো?'

'স্বাধীন ভারতে থানার সামনে আমরা পিকেট করছি। কোনোদিন কি এটা ভাবতে পেরেছিলে?'

'আরে তাই তো, সত্যিই এটা ভাবি নি। যাক, এক জীবনে স্বাধীন আর পরাধীন ভারতে থানার সামনে বসে আন্দোলন করতে হবে, কে জানত!'

চান্দেরি রাম বলেন, 'স্বাধীনতার নতুন একটা চেহারা চোখের সামনে ফুটে উঠছে।'

বিমর্ষ মুখে নরেশ্বর বলেন, 'এই জন্যেই কি আমরা ইংরেজ আমলে জেল-টেল খেটেছিলাম? রাকেশের বাবুজি রাজেশ্বর ভাইয়ের চিঠিতে যখন ধারাবনীর জেনো-

সাইডের কথা জানতে পারলাম, একেবারে আঁতকে উঠেছিলাম। ভাবলাম এর প্রতিকার হওয়া দরকার। বুড়ো বয়েসে নতুন লড়াইয়ে নামতে হ'ল।'

অল্প হেসে জয়চাঁদ বলেন, 'উই আর বর্ন ফাইটারস। দেশের যা হাল, মৃত্যু পর্যন্ত বোধ হয় যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে।'

নরেশ্বররা নিজেদের কথাবার্তায় মগ্ন হ'য়ে ছিলেন। অন্য কোনো দিকে তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও মানুষজনের অস্পষ্ট চাপা গলা শুনে তাঁরা ডাইনে তাকান। চোখে পড়ে কুড়ি-পঁচিশটি চাষাভুষো ধরনের দেহাতী পনের-বিশ গজ দূরে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কী বলছে। পোস্টারগুলো এবং নরেশ্বররা যে তাদের কৌতূহলের বিষয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

নরেশ্বর হাত নেড়ে দেহাতীদের ডাকতে থাকেন, 'আসুন, আসুন।'

দেহাতীরা আসে না। যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। থানার সামনে এতগুলো মানুষকে পোস্টার নিয়ে বসে থাকতে দেখে তাদের কৌতূহল যতটা, বিস্ময় তার চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া চেহারা পোশাক-আশাক ইত্যাদি বুঝিয়ে দিচ্ছিল, নরেশ্বররা অনেক উঁচু স্তরের মানুষ। তাই দেহাতীদের মধ্যে খানিকটা সংশয়ও রয়েছে।

নরেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে আবার ডাকেন, 'কী হ'ল, আসুন। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করি।'

রাকেশ এবং দেবারতি দেহাতীদের সম্পর্কে নরেশ্বরের আগ্রহের কারণটা আন্দাজ করতে পারছিলেন। তিনি স্থানীয় লোকজনকে এই পিকেটিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চান।

দেহাতীরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে। তারপর আড়ষ্টভাবে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে আসে।

নরেশ্বর যথেষ্ট খাতিরদারি ক'রেই লোকগুলোকে চাঁদোয়ার তলায় বসান। তারপর তাদের কার কী নাম, কে কোথায় থাকে, কে কী করে, ইত্যাদি প্রশ্ন ক'রে ক'রে যে খবরটুকু পাওয়া যায় তা এইরকম। আশেপাশের গাঁগুলোতে তারা থাকে। তারা কেউ দোসাদ, কেউ চামার, কেউ কোয়েরি। অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ। এদের বেশির ভাগেরই নিজস্ব জমিজমা নেই। দু-একজনের সামান্য এক-আধ বিঘে যা আছে তার ফসলে পেট চলে না। তাই অন্যের জমিতে খাটতে হয় কিংবা হাটে মোট বওয়া থেকে শুরু ক'রে নানারকম উঞ্ছবৃত্তি ক'রে তারা পেটের দানা জোটায়।

এই দলটার মুরুব্বি মধ্যবয়সী স্থরযলাল। সে এবার পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আপ-লোগোনকো কভী নহীঁ দেখা। মালুম হোতা ইঁহাকা আদমী নেহীঁ।'

'হ্যাঁ।' সবার হ'য়ে নরেশ্বরই জবাব দেন, 'আমরা এখানে নতুন এসেছি।'

'কঁহাসে আয়া?'

নরেশ্বর জানান, তাঁরা কেউ কোনো একটি জায়গা থেকে আসেন নি। নানা জেলার বিভিন্ন শহর এবং গ্রাম থেকে এসেছেন।

স্থরযলাল কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে যায়। তার মনোভাব বুঝতে পেরে নরেশ্বর বলেন, 'আপনারা হয়ত ভাবছেন, আমরা এতগুলো লোক অচানক এত সব জায়গা থেকে এসে কেন এই থানার সামনে বসে আছি—তাই না?'

স্থরযলাল এবং তার সঙ্গীরা একসঙ্গে মাথা ঝাঁকায়, 'হাঁ।'

'তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।' ব'লে সোজাসুজি স্থরযলালের মুখের দিকে তাকান নরেশ্বর।

স্থরযলাল উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

নরেশ্বর বলেন, 'দু-তিন মাস আগে ধারাবনীতে অনেক লোককে খুন করা হয়েছিল, আপনারা কি জানেন?'

স্থরযলাল এবং তার সঙ্গের লোকেরা চমকে ওঠে। স্থরযলাল ঢোক গিলে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে বলে, 'হাঁ হুজৌর, অ্যায়সা শুনা হ্যায়।'

স্থরযলালের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে নরেশ্বর বলেন, 'কারা এই খুনগুলো করিয়েছে, আপনারা জানেন?'

স্থরযলাল হাতজোড় ক'রে বলে, 'হামলোগন বহোত ভুখা আউর গরীব আদমী। কুছ নেহীঁ জানতা।

তারা যে সমস্তই জানে, বুঝতে অসুবিধা হয় না নরেশ্বরদের।

রাকেশ চুপচাপ সবাইকে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ তিনি বলেন, মানকালাল, হোরিচাঁদ, মনেন্দর, ভোলা, এতোয়ার, পাবন, লছমল, গৈবী আর মহেশ্বর'কে চেনেন?' যে ক'জনের নাম রাকেশ বলেছেন তারা সবাই ধারাবনীর হত্যাকাণ্ডের আসল অপরাধী। পুলিশ এখনও তাদের ধরে নি।

নামগুলো শুনে স্থরযলালদের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরে যায়। প্রবল উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয় তাদের চোখেমুখে।

স্থরযলাল ভীরু গলায় বলে, 'নেহীঁ হুজৌর, ঐরকম কাউকে আমরা চিনি না।'

তারা যে খুব ভাল ক'রেই ঐ মারাত্মক ধর্ষণকারী আর খুনীগুলোকে চেনে তা

টের পাওয়া যায়। ভয়ের আবহাওয়া শুধু যে ধারাবনীর আশেপাশেই নয়, এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

রাকেশ বলেন, 'ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'য়ের নাম কি আপনারা শুনেছেন?'

সুরযলাল আতঙ্ক এবং ভক্তি মেশানো স্বরে বলে, 'দুনিয়ায় সিংজি আউর ঝা'জির নাম শোনে নি কে?'

সুরযলালদের দুনিয়ার আয়তনটা যে খুব বড় নয় এবং সেখানে গিরিলাল এবং ত্রিলোকী যে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মতো, সেটা বোঝা যায়। রাকেশ বলেন, 'আপনাদের নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে আলাপ আছে?'

'দুর থেকে দেখেছি হুজৌর। তাঁদের মতো বড়ে আদমীদের সঙ্গে কি আমাদের মতো মানুষের আলাপ থাকতে পারে।'

'আপনারা কি জানেন ঐ মধ্যে মানকালাল হোরিচাঁদেরা ঝা'জি আর সিংজিদের ভাড়া-করা বন্দুকবাজ? ওরাই ধারাবনীতে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, গুলি চালিয়ে মানুষ খুন করেছে?'

'হামনিলোগ কুছ নেহী জানতা, কুছ নেহী জানতা। অব্ যাতা হ্যায়। নমস্তে—' বলতে বলতে রুদ্ধশ্বাসে উঠে দাঁড়ায় সুরযলাল। দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও।

নরেশ্বর, লালচাঁদ, রাকেশ এবং আরো কেউ কেউ শশব্যস্তে বলেন, 'চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন বসুন। আপনাদের সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে।'

সুরযলালেরা বসে না। শঙ্কিত এবং ভয়ার্ত ভঙ্গিতে বলে, 'কী কথা?'

নরেশ্বর বলেন, 'আপনারা জানতে চাইছিলেন না, আমরা কেন নানা জায়গা থেকে এখানে এসে ব'সে আছি?'

সন্দিগ্ধভাবে সুরযলাল বলে, 'হাঁ।'

'তা হ'লে না জেনেই চলে যাচ্ছেন যে?'

সুরযলাল উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাকেশ এবার পোস্টারগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, 'ওগুলোতে কী লেখা আছে জানেন?'

সুরযলালরা সবাই মাথা নাড়ে। বিপন্ন মুখে তাদের ভেতর থেকে একজন কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'হুজৌর আমরা বিলকুল আনপড়। পড়তে জানি না। কী আছে ওগুলোতে?'

রাকেশ এবার পোস্টারের লেখাগুলো প'ড়ে প'ড়ে শোনান। তারপর কোন উদ্দেশ্যে তাঁরা এখানে এসেছেন সেটা বুঝিয়ে দেন।

স্বরযলালের কণ্ঠনালীর ভেতর দিয়ে ভয়ার্ত গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসে, 'হো ভগোয়ান ! হামনিলোগ চলতা হ্যায় হুজৌর—'

'যাবেন কেন ? কিসের ভয় ?' রাকেশ বলেন, 'আমরা একটা বড় কাজে এখানে এসেছি। আপনারা এখানকার বাসিন্দা। আমাদের পাশে আপনারা না থাকলে কিছুই করা যাবে না। আপনাদের সাহায্য খুব দরকার।'

নরেশ্বর রাকেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বলেন, 'এই ল্যাংগুয়েজে কাজ হবে না ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।' তাঁর বলার ভঙ্গিতে কৌতুক মেশানো।

রাকেশ চকিত হ'য়ে নরেশ্বরের দিকে মুখ ফেরান। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হাতের ইশারায় তাঁকে থামিয়ে নরেশ্বর স্বরযলালদের বলেন, 'আরে ভাই, সিধা বাত শুনো। হত্যারাঁকে ফাঁসিতে লটকাতে হয়—এটাই কানুন তো ?'

স্বরযলালেরা হকচকিয়ে যায়।

নরেশ্বর থামেন নি, 'আমরাও চাইছি ঐ ভূচ্চরের হৌয়া মানকালালদের ফাঁসির ফান্দায় ঝুলিয়ে দিতে। ওরা কাদের খুন করেছে তা তোমরা ভাল ক'রেই জানো। ধারাবনীর ঐ লোকগুলো তোমাদের মতোই ভুখা গরীব। হয়ত কেউ কেউ তোমাদের রিস্তেদারও।'

ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ একজন চাপা ভাঙা গলায় ব'লে ওঠে, 'আমার এক চাচেরা ভাই ধারাবনীতে থাকত। তাকে খতম ক'রে দিয়েছে শালেলোগেরা।'

আরেক জন তক্ষুনি তার মুখে হাত ঠেসে দিয়ে সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'চুপ হো যা ভৈরো, বিলকুল চুপ। উলোগোন শুনেগা তো বহোত মুসিবত হো যায়েগা।'

স্বরযলাল তার সঙ্গীদের তাড়া দিতে দিতে বলে, ইঁহা রহনা ঠিক নেহীঁ হ্যায়। তুরন্ত গাঁওমে চলা আ—'

এ অঞ্চলের মানুষজনের মনে গিরিলালদের বন্দুকবাজ মানকালালদের সম্পর্কে ভয়টা একেবারে চিরস্থায়ী হ'য়ে রয়েছে। স্বরযলালেরা তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবে, রাকেশের কাছে তা নেহাতই দুরাশা মনে হয়। ধারাবনীর ভয়ার্ত বাসিন্দাদের ব্যাপারেও তিনি খুবই হতাশ। স্বরযলালদের সম্পর্কেও তিনি একই রকম নৈরাশ্য বোধ করতে থাকেন। যদিও মানুষের ওপর ভাগবত রামলখন নরেশ্বরদের অগাধ আস্থা তবু রাকেশ সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

নরেশ্বর বলেন, 'আরে ভাই, যাবে কেন ? অত ডর কিসের ?'

স্বরযলাল বলে, 'আপনারা মানকালালদের চেনেন না। ওরা না পারে এমন কাম দুনিয়ায় নেই।' তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে, 'রুখ গিয়া কায় ? কদম বড়াও—'

আর তাদের আটকানো যায়। রাকেশদের চোখের সামনে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে ডান পাশের মাঠে নেমে দূরে দেহাতী গাঁগুলোর দিকে চলে যায়।

নরেশ্বর বলেন, 'ধারাবনীর মতো এখানেও আমাদের দুদিক থেকে কাজ করতে হবে। থানার বিরুদ্ধে লড়াইটা তো আছেই, সুরযলালদের মতো লোকজনের ভয়ও ভাঙাতে হবে।'

রাকেশ বলেন, 'প্রথম কাজটার জন্যে আমরা প্রিপেয়ার্ড হ'য়ে এসেছি কিন্তু দ্বিতীয় কাজটা ভীষণ ডিফিকাল্ট। আমার মনে হয়, কিছুই করা যাবে না।'

গভীর আত্মবিশ্বাসের সুরে নরেশ্বর বলেন, 'পৃথিবীতে কোনো কিছুই ডিফিকাল্ট নয় রাকেশ। কাল থেকে রোজ সকালে আমরা কয়েক জন চারপাশের গাঁগুলোতে ঘুরে ঘুরে মানুষের ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করব। কিছু একটা রেজাল্ট নিশ্চয়ই হ'য়ে যাবে।'

রাকেশ খুব একটা ভরসা পান না। কিছু না ব'লে চুপ ক'রে থাকেন। তাঁদের এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হবে সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান।

বেয়াল্লিশ

সূর্য পশ্চিম আকাশের ওধারে আরো অনেকটা নেমে গেছে। গাছের ছায়া লম্বা হ'তে শুরু করেছে। রোদের ঝাঁঝ অনেকটাই মরে এসেছে। বাতাসে এখন আর দুপুরের গরম ভাপটা নেই।

রাকেশরা আগের মতোই গাছতলায় চাঁদোয়ার তলায় ব'সে আছেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে ধারাবনীর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা চলছে।

এর মধ্যে সুরযলালদের মতো আরো কিছু দেহাতী গভীর কৌতূহলে দূর থেকে রাকেশদের দেখে চ'লে গেছে। রাকেশ নরেশ্বর, লালচাঁদ জয়েন্দ্র—সবাই তাদের ডাকাডাকি করেছেন কিন্তু কেউ কাছে ঘেঁষে নি। ভয়ে ভয়ে তাঁদের দিকে তাকাতে তাকাতে দ্রুত পালিয়ে গেছে।

দেবারতি রাকেশকে বলে, 'আজ ফ্রিডম ফাইটাররা থানার সামনে যে পিকেটিং শুরু করেছেন তার রিপোর্টটা কলকাতায় আমাদের কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কাছাকাছি কোত্থেকে পাঠানো যেতে পারে?'

রাকেশ জানান, 'কাছাকাছি বলতে নৌহরপুর। ওখান থেকে টেলিগ্রামও পাঠাতে পারেন, ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কলকাতায় কথাও বলা যেতে পারে।'

'নৌহরপুর এখান থেকে কতদূর ?'

'মাইল পাঁচ ছয়েক হবে।'

'তাহ'লে তো মুশকিল হ'ল। রোজ ওখানে যাব কী ক'রে? বাসের যা হাল, তাতে চড়াই মুশকিল। তা ছাড়া আমরা সারাক্ষণ এখানে থাকছি না, ধারাবনীতেও থাকতে হবে। ওখান থেকে চার পাঁচ মাইল হেঁটে এলে হাইওয়ে, তারপর বাস ধরে কিংবা হেঁটে গেলে তবে তো নৌহরপুর। গোটা ব্যাপারটাই ভীষণ কষ্টকর আর ঝঞ্ঝাটের।'

রাকেশ চিন্তিতভাবে কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই—ওধার থেকে জয়েন্দ্র বলে ওঠেন, 'কোঈ চিন্তা নেহী, তুমি রিপোর্ট লিখে দিলে আমি সেটা নিয়ে নৌহরপুর চলে যাব।'

রীতিমত অবাক হ'য়েই জয়েন্দ্রর দিকে তাকায় দেবারতি। তাঁর চেহারা যদিও মেদশূন্য, টান টান, তবু বয়সটা তো কম নয়, অন্তত সত্তরের ধারে কাছে হবেই। এই বয়সের একটি মানুষের পক্ষে রোজ এতটা ধকল নেওয়া যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার। সেই কথাটাই সংশয়ের সুরে জয়েন্দ্রকে জানায় দেবারতি।

জয়েন্দ্র হাসেন। বলেন, 'তোমার কি ধারণা, ধারাবনী থেকে পয়দল আমি এতটা যাতায়াত করব!'

'তবে ?'

'একটা সাইকেল ভাড়া নেব। আর সেটা পেলে দশ বিশ মাইল রাস্তা আবার একটা সমস্যা নাকি ?'

একটু আগে দেবারতি খেয়াল করে নি, আজই জয়েন্দ্ররা মালপত্র ঘাড়ে চাপিয়ে এতটা পথ পায়ে হেঁটে চলে এসেছেন। এখন মনে হয়, সাইকেলে তিনি অবলীলায় রোজ দশ বারো মাইল পাড়ি দিতে পারবেন।

জয়েন্দ্র বলেন, 'তোমার রিপোর্ট তৈরি ক'রে ফেল। আমি নৌহরপুরে গিয়ে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই হাইওয়েয় দিকে জীপের আওয়াজ শোনা যায়। গাড়িটা এদিকেই আসছে।

রাকেশরা ঘুরে বসেন।

জীপটা দ্রুত কাছে এগিয়ে এসে থেমে যায়। রুক্ষ কাঁকুরে মাটিতে চাকা ঘষটানোর এমন কর্কশ শব্দ ওঠে যে গাছপালার মাথা থেকে পাখিরা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যায়।

জীপ চালাচ্ছিল একজন কনস্টেবল। তার পাশের সীট থেকে ধরাচুড়ো-পরা

পুরন্দর সিং নেমে হাঁচোরপাঁচোর ক'রে চাঁদোয়ার দিকে দৌড়ে এসে সবাইকে বিমূঢ়ের মতো দেখতে দেখতে আচমকা তার চোখ রাকেশের মুখের ওপর আটকে যায়। রুদ্ধশ্বাসে সে বলে, 'মী লর্ড, আপনি!'

রাকেশও পুরন্দরকে লক্ষ করছিলেন, ধীরে ধীরে বলেন, 'হ্যাঁ আমিই। তবে মী লর্ড আর নেই। আগেই জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, আমি রেজিগনেসান দিয়েছি।'

'সে আপনি যাই করুন, আমার কাছে মী লর্ডই।'

'আপনি যদি তা-ই ভাবেন, আমার কিছু করার নেই।'

অত্যন্ত বিনীত এবং শঙ্কিত ভঙ্গিতে পুরন্দর এবার জিজ্ঞেস করে, 'এখানে মাথার ওপর কাপড়া খাটিয়ে ব'সে আছেন কেন মী লর্ড?'

রাকেশ পোস্টারগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে ব'লেন, 'ওগুলো বোধ হয় এখনও আপনার চোখে পড়ে নি?'

'না, খেয়াল করিনি।' বলতে বলতে পুরন্দরের তার চোখ কোনাকুনি পোস্টারগুলোর দিকে ঘুরে স্থির হ'য়ে যায়। তক্ষুনি সে আঁতকে ওঠে, দুর্বল শিথিল গলায় বলে, 'এসব কেন মী লর্ড?'

'কী আশ্চর্য, পড়েও বুঝতে পারছেন না? আপনাকে সোজা কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই। আসল হত্যারাদের অ্যারেস্ট না করা পর্যন্ত আমরা এখানেই বসে থাকছি।'

শ্বাস আটকে আসে পুরন্দরের। ভয়ানক সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এবার নরেশ্বরদের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'এঁরা কারা?' এঁদের তো চিনতে পারলাম না।'

'আরে তাই তো, আপনার সঙ্গে আলাপই করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি হলেন ফ্রিডম ফাইটার নরেশ্বর মিশ্রী। ইংরেজদের জেলে কম ক'রে বিশ বছর কাটিয়েছেন। ইনি—'

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমক এবং ভয়টা কয়েক গুণ বেড়ে যায় পুরন্দরের। সে বলে, 'মী লর্ড, আমি ছোটামোটা থানেদার। এত বড় বড় আদমীদের এনেছেন, স্রিফ নৌকরিটা চলে যাবে। বালবাচ্চা নিয়ে বিলকুল ভুখা মরে যাব। কৃপা ক'রে গরীবকে প্রাণে মারবেন না। পিকেটিং তুলে নিন।'

পুরন্দরের ভয়ের কতটা মেকি, কতটা অভিনয় তা আঁচ করতে পারা প্রায় অসম্ভব। রাকেশ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুলব। তার আগে আসল মার্ডারারদের অ্যারেস্ট করে সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সেদিনই তো বলেছি, হত্যারাদের ধরা হয়েছে।'

'সেদিনই আপনাকে বলে গেছি. সত্যিকার খুনীদের ধরা হয় নি।'

পুরন্দর প্রায় ককিয়ে ওঠে, 'হয়েছে মী লর্ড। ভগোয়ান বিষুণজি কসম। পাঁচ সাল এই থানায় আছি। আমার সারভিস রেকর্ড বিলকুল ক্লিন, কোনো কালো স্পষ্ট নেই। এখন যদি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার ওপর গুসসা হ'য়ে থানার সামনে পিকেটিং করেন, ফিউচার পুরা চোপট।'

রাকেশ উত্তর দেন না। লোকটার একটানা ঘ্যানঘ্যানানি তাঁর অসহ্য লাগছে।

পুরন্দর কাঁদুনি থামায় না। পিকেটিংটা যে তার প্রচণ্ড ক্ষতি ক'রে দেবে, সেটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ব'লে যায়।

রাকেশের মুখ শক্ত হ'য়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'সিংজি, আমার যা বলার বলেছি। আর কিছু বলার নেই।' একটু থেমে বলেন, 'শুনেছি আপনি আপনার এক আত্মীয়ার শাদিতে গিয়েছিলেন—'

'হাঁ হাঁ, আমার শালীর শাদি। কে বললে আপনাকে?'

'আপনার থানার কনস্টেবলরা। নিশ্চয়ই শালীর শাদির খাটাখাটনিতে টায়ার্ড হ'য়ে আছেন। বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

দ্বিধান্বিতভাবে পুরন্দর বলে, 'লেকিন আপনারা?'

'খুনীরা অ্যারেস্ট না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থেকে যাচ্ছি। দু'দিন হোক, দশ দিন হোক, এক বছর লাগুক—এ জায়গা ছেড়ে নড়ছি না।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

তারপর পুরন্দর কিছুটা সাহস সংগ্রহ ক'রে ফেলে। হাতজোড় ক'রে বিনীত-ভাবেই অবশ্য বলে, 'যদি হুকুম দেন, একটা কথা বলতে চাই।'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আপনাকে আইন দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বহোত ছোটা আদমী। তবু বলতে হচ্ছে—'

রাকেশ ভেতরে ভেতরে সতর্ক হ'য়ে যান। বলেন, 'অনুগ্রহ ক'রে যা বলার বলে ফেলুন। শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত।'

পুরন্দর হকচকিয়ে যায়। শশব্যস্তে বলে, 'হাঁ হাঁ, জরুর। বলছিলাম, পুলিশ চৌকির সামনে এভাবে পিকেটিং করা খুব সম্ভব বেকানুনি। আপনি কী বলেন মী লর্ড?'

পুরন্দর সিং যে অতীব ধুরন্ধর এবং রাকেশকে দিয়েই তাঁদের এই পিকেটিংকে বেআইনি কবুল করিয়ে নিতে চায় সেটা টের পেতে একটি মুহূর্তও লাগে না।

রাকেশ হেসে হেসে বলেন, 'আমার থেকে আপনি কানুন কম বোঝেন না পুরন্দরজি। যদি মনে হয় বেকানুনি করছি, আমাদের অ্যারেস্ট করতে পারেন।'

জিভ কেটে, কানে হাত দিয়ে, চোখ বুজে পুরন্দর বলেন, 'অ্যায়সা মাত কহিয়ে মী লর্ড। শুনলে মহা পাপ হয়।'

সার্কাসের ক্লাউনের মতো কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েই আছে পুরন্দর। রাকেশ বলেন, 'এবার হাতটা নামান—'

'হাঁ, হাঁ—' হাত দুটো দ্রুত নেমে আসে পুরন্দরের।

রাকেশ সরাসরি পুরন্দরের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'আসল খুনীদের ধরতে অসুবিধেটা কোথায় ? কারা আপনাকে বাধা দিচ্ছে ?'

'না না, কে আবার বাধা দেবে ? কেউ না। বিশ্বাস করুন, আমরা আসল হত্যারাদেরই ধরেছি।'

'ঠিক আছে। এবার আপনি যেতে পারেন।'

রাকেশের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু আছে যাতে পুরন্দরকে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে যায়। এ সেই জবরদস্ত কণ্ঠস্বর, ক'দিন আগেই আদালতের ভেতর আসামী থেকে পাবলিক প্রোসিকিউটার পর্যন্ত সবাইকে তটস্থ ক'রে রাখত। পুরন্দর আর দাঁড়ায় না, ধীরে ধীরে জীপে উঠে কনস্টেবলকে থানা কমপাউণ্ডের ভেতরে নিয়ে যেতে বলে।

শালীর বিয়েতে আমোদ-ফুর্তি ক'রে মেজাজ তর হ'য়ে ছিল, এখন দুনিয়ার সমস্ত কিছুই তার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে গেছে।

পুরন্দরের জীপ চলে যাওয়ার পর প্রবোধকান্ত বলেন, 'বহুত ধুরন্ধর আদমী।'

নরেশ্বর বলেন, 'ধুরন্ধর তো বটেই, তবে পুরন্দর সিং সম্পর্কে ওটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। আমার কী মনে হয় জানো ?'

'কী ?'

'লোকটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে। পরিষ্কার বোঝাই যায়, ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'র সঙ্গে ওর গোপন আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে। অবাক হব না, যদি জানতে পারি পুরন্দর ওদের টাকা খায়।'

'রাইট। নইলে খুনীগুলোকে ওভাবে সে শিল্ড করত না।'

'ঝা আর সিংয়ের সঙ্গে গাঁটবন্ধন ক'রে ভালই কাটিয়ে যাচ্ছিল এতদিন। আমরা এসে পড়ায় মারাত্মক ঝামেলায় পড়ে গেছে। ঝা আর সিংয়ের বিরুদ্ধে যাবার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই ওর নাই। আবার খুনীদের না ধরলে আমরাও ছাড়ব না। আমাদের ভয় দেখিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে হাঁকানো যে যাবে না সেটা ও জানে।'

‘তা হ’লে এখন পুরন্দর সিং কী করবে ?’

‘সেটা ওর চিন্তা। এ বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।’

ওধারে জয়েন্দ্র আকাশের দিকে এক পলক তাকিয়ে চঞ্চল হ’য়ে ওঠেন। দ্রুত চোখ নামিয়ে দেবারতিকে তাড়া দেবার ভঙ্গিতে ব’লে ওঠেন, ‘আর দেরি ক’রো না। সন্ধে হ’য়ে আসছে। তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা লিখে ফেল। আমাকে নৌহরপুর গিয়ে ওটা পাঠাবার ব্যবস্থা ক’রে আবার ফিরতে হবে।’

রাকেশ বলেন, ‘আজ আর নৌহরপুর গিয়ে কাজ হবে না চাচাজি। পাঁচটায় ওখানকার পোস্ট অফিস বন্ধ হ’য়ে যায়।’

দেবারতিও জানায়, যত তাড়াতাড়িই করুক, রিপোর্টা লিখতে ঘণ্টাখানেক অন্তত লেগে যাবে। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। কাল সকালে ওটা ভাল ক’রে লিখে পাঠালেই চলবে। তবে কাল জয়েন্দ্রকে নৌহরপুর যেতে হবে না, দেবারতি রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কলকাতায় নিউজ এডিটরের সঙ্গে ফোনে কথা বলা খুব জরুরি। তখনই জানিয়ে দেবে, পরশু থেকে জয়েন্দ্র নৌহরপুরে গিয়ে তার রিপোর্ট পাঠাবেন। এখানে তেমন কিছু ঘটলে জয়েন্দ্র ফোনে নিউজ এডিটরকে জানিয়ে দেবেন।

এই ব্যবস্থাটাই সবার মনঃপূত হয়।

তেতাল্লিশ

রাত্তিরে কোনোরকম গোলমাল বা অশান্তির কারণ ঘটে না। শুধু রাকেশরা যখন বড় চুলহা ধরিয়ে চাপাটি, ভাজি টাজি তৈরি করছেন তখন সেই কনস্টেবল দুটো মাঝে মাঝে থানা কমপাউণ্ডের গেটের ওধার থেকে এসে তাঁদের দেখে যায়।

চাঁদোয়ার তলায় ছ-সাতটা লণ্ঠন জ্বলছে। তেজী আলোয় অনেকটা দূর পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে। কনস্টেবল দুটোকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। পুরন্দর সিং ফিরে আসার পর এমন কিছু ঘটেছে বা সে তাদের এমন কিছু ব’লে থাকতে পারে যাতে ওরা খুবই অস্থির হ’য়ে উঠেছে। অথচ যেচে যখন বাসন-কোসন দিতে এসেছিল, তাদের বিশেষ কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না। যা ছিল তা হ’ল অনন্ত কৌতূহল।

যত বার তাদের দেখা গেছে তত বারই নরেশ্বররা ডাকাডাকি করেছেন কিন্তু ওরা কাছে ঘেঁষে নি, দ্রুত থানার ভেতর অদৃশ্য হ’য়ে গেছে।

জয়েন্দ্র বলেছেন, 'ওরা বোধ হয় আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

অন্য সবাই সায় দিয়েছেন, 'তাই হবে।'

একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে, কাল থানার মূল বাড়িটার বারান্দায় দুটো টিমটিমে বাল্ব ছাড়া আর কোনো আলো ছিল না। আজ কিন্তু যেখানে যত আলো ছিল সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এ অঞ্চলে বিজলির ভোল্টেজ কম তবু গোটা থানাটা আলোয় ভরে আছে।

রান্নাটান্না হ'য়ে গেলে সবাই খেতে বসেন।

নরেশ্বর মজার গলায় বলেন, 'আজ পুরা রাত পুরন্দর সিং থানায় রোশনি জ্বালিয়ে রাখবে, আমাদের ওপর নজরদারির বন্দোবস্তও করবে।'

রাকেশ বলেন 'হ্যাঁ। ওর হয়ত ধারণা, রাতের অন্ধকারে আমরা হয়ত থানায় ঢুকে ঝঞ্ঝাট করব। বেচারা কনস্টেবলগুলোর আজ আর ঘুমের আশা নেই, হোল নাইট চোখ টান ক'রে ব'সে থাকতে হবে।'

ওঁরা যা আন্দাজ করেছিলেন ঠিক তা-ই। খাওয়ার পর রাতে লণ্ঠন-টণ্ঠন নিভিয়ে সবাই মশারি খাটিয়ে কালকের মতো শুয়ে পড়েন। দূরে থানার আলোগুলো জ্বলতেই থাকে।

নরেশ্বরের পাশে বিছানা পেতে শুয়েছিলেন লালচাঁদ। তারপর দেবারতি, জয়েন্দ্র, প্রবোধকান্ত এবং বাকি সবাই।

শোওয়ার পরই ঘুম আসে না। সবাই পরদিনের কর্মসূচি নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলছিলেন। একসময় যখন চোখ বুজে আসে সেই সময় পা টিপে টিপে নিঃশব্দে প্রতিটি বিছানার পাশ দিয়ে ঘুরতে থাকে সেই দুই কনস্টেবল এবং ঝুঁকে ঝুঁকে খুব সম্ভব বুঝতে চায় রাকেশরা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন নরেশ্বরের বিছানার কাছে এসে কোমর বাঁকিয়ে মশারির ওপর ঝুঁকেছে, নরেশ্বর বলে ওঠেন, 'নমস্তে সিপাইজি—'

দুই কনস্টেবল আঁতকে ওঠার মতো ভঙ্গি ক'রে তিন পা পিছিয়ে যায়। তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'আ-আ-প, আ-আ-প—'

নরেশ্বর ধীরে ধীরে উঠে বসেন। বলেন, 'না, এখনও ঘুম আসে নি। আর আধ ঘণ্টা পর এলে দেখতে পেতেন, আমরা কেউ জেগে নেই। আপনাদের বরাত খারাপ। বৈঠিয়ে—'

'ওদিকে সবাই যে যার বিছানায় উঠে বসেছেন। এধার ওধার থেকে রাকেশরা বলতে থাকেন, 'কষ্ট ক'রে যখন এসেছেন, বস্থন—বস্থন—'

'নেহী, নেহী—'

জয়েন্দ্র চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'আরে ভাগতা হ্যায় কিঁউ? ঠহ্‌র যাইয়ে, ঠহ্‌র যাইয়ে—'

কনস্টেবলরা থামে না।

জয়েন্দ্র ফের বলেন, 'আপনাদের ও.সি.'কে বলে দেবেন, ঘাবড়াবার জরুরত নেই। আমরা কেউ বোমা বন্দুক নিয়ে আসি নি। আপনারাও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোতে পারেন। রাত্তিরে থানা অ্যাটাক করার কোনো বাসনাই আমাদের নেই।'

কনস্টেবলরা ফিরেও তাকায় না।

চুয়াল্লিশ

পর দিন সকালে চা-টা খেয়ে রাকেশ এবং দেবারতি নিজের নিজের স্যুটকেশ বিছানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ভোরে উঠেই রিপোর্ট লিখে ফেলেছিল দেবারতি।

হাইওয়ে থেকে বাস ধরে দম-আটকানো ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতে ওরা আধ ঘণ্টার ভেতর নৌহরপুর পৌঁছে যায়। পোস্ট অফিস থেকে লং ডিসট্যান্স লাইনে 'মর্নিং সান'-এর নিউজ এডিটর সমরেশ গাঙ্গুলিকে ধরে ফেলে দেবারতি। সমরেশের সাউথ ক্যালকাটার ফ্ল্যাটে সোজাসুজি ফোন করেছে সে। কেননা এখন ন'টা বেজে সতের। বিকেলের আগে নিউজ এডিটরকে অফিসে পাওয়া যাবে না।

দেবারতি জানে রাত দুটোর আগে সমরেশ অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন না। অত রাতে ফিরে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে শুতে শুতে আরো ঘণ্টাখানেক। তাই ঘুম থেকে উঠতে উঠতে তাই বেশ দেরি হ'য়ে যায়।

দেবারতির সংশয় ছিল সমরেশের ঘুম ভেঙেছে কিনা। যাই হোক, ফোনে তাঁকে পাওয়া গেল, 'হ্যালো, কে—দেবারতি? হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! এত ভোরে তোমার গলা শুনতে পাব, ভাবতে পারি নি। কোত্থেকে বলছ?'

দেবারতি বলে, 'নৌহরপুর।'

'গড-ফোরসেকেন এই জায়গাটা কোথায় দেবারতি? তুমি তো ধারাবনী গিয়েছিলে।'

নৌহরপুর জায়গাটা কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে এখানে সে এসেছে, জানিয়ে দেয় দেবারতি।

'তোমার রিপোর্টের জন্যে রোজ ফার্স্ট পেজে জায়গা রেখে দিচ্ছি। কিছুই

পাঠাচ্ছ না। তোমার খবরও পাচ্ছিলাম না। আমরা ভীষণ ওরিড হ'য়ে পড়েছিলাম। তারপর ওখানকার খবর বল—'

'সমরেশদা, আমি যে রিপোর্টটা পাঠাবার জন্যে লিখে এনেছি সেটা পড়লে সব বুঝতে পারবেন। এখনই টেলিগ্রামে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল পেয়ে যাবেন।'

'না না, কাল পেলে হবে না, আজই চাই। তা হ'লে কালকের কাগজে ছাপতে পারব। কাল পেলে সেই পরশুর আগে ক্যারি করা যাবে না। একটু ধর, টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসি।'

'আচ্ছা—'

কয়েক সেকেণ্ড বাদে ফের সমরেশের গলা ভেসে আসে, 'এবার আস্তে আস্তে পড়ে যাও।'

দেবারতি বুঝতে পারে, টেপ রেকর্ডারটা টেলিফোনের মুখে বসিয়েছে সমরেশ। সে ধীরে ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে রিপোর্টটা পড়ে যায়।

পড়া শেষ হ'লে সমরেশ প্রবল বিস্ময়ে ব'লে ওঠেন, 'ওল্ড ফ্রিডম-ফাইটাররা এভাবে র‍্যালি করতে শুরু করেছেন! এ তো দারুণ ঘটনা! পোস্ট-ইণ্ডিপেনডেন্স পোলিটিসিয়ানদের সঙ্গে প্রি-ইনডিপেনডেন্স পেট্রিয়টদের লড়াই—এ দেখছি স্বাধীন ভারতের নতুন কুরুক্ষেত্র!'

'শুধু তা-ই না, এই কুরুক্ষেত্রে অর্ডিনারি পীপলকেও ইনভলভ করানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

'তুমি রোজ রিপোর্ট আর ফোটো পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। এ এমন এক ঘটনা, হোল ইণ্ডিয়ার জানা দরকার। ছাড়ছি—'

'আচ্ছা—'

'যদি তেমন কিছু ঘটে ইমিডিয়েটলি ফোন ক'রে দিও। আর টাকা পয়সার দরকার হ'লে জানিও।'

'ঠিক আছে সমরেশদা।'

রিপোর্ট পাঠাবার পর দেবারতি রাকেশের সঙ্গে ফের হাইওয়েতে চলে আসেন। সেখান থেকে যাত্রী বোঝাই বাসে দুধলিগঞ্জে। তারপর গনগনে সূর্যকে আকাশে রেখে শুরু হয় হাঁটা।

ওঁরা যখন জঙ্গলের কাছে আসেন, ছায়া ছোট হ'য়ে গেছে, সূর্য উঠে এসেছে খাড়া মাথার ওপর। গরম লু-বাতাস ব'য়ে চলেছে আগুন ছড়াতে ছড়াতে।

হাঁটা তো আছেই, সেই সঙ্গে মালপত্র টানাটানির কারণে ঘামে জামাকাপড় ভিজে সপসপে হ'য়ে গেছে। প্রচণ্ড ধকলে দু'জনেই হাঁপাচ্ছিলেন।

দেবারতি বলে, 'আর হাঁটা যাচ্ছে না। কোথাও বসে কিছুক্ষণ একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হ'ত।'

হঠাৎ রাকেশের খেয়াল হয়, জঙ্গলের ভেতর কুঁদরী রয়েছে। তিনি বলেন, 'চলুন, দুপুরটা ধনুয়াদের ওখানে কাটিয়ে বিকেলে ধারাবনী যাব।'

'আরে তাই তো। গরমে মাথা এত ঝাঁ ঝাঁ করছে যে ওদের কথা মনেই পড়ে নি। চলুন, যাওয়া যাক—'

ধুঁকতে ধুঁকতে কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জনে নহরের ধারে চালাগুলোর সামনে চলে আসেন। স্যুটকেশ আর বেডিং মাটিতে নামিয়ে রাকেশ ডাকতে থাকেন, 'কুঁদরী—কুঁদরী—'।

কুঁদরী বাঁশের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাকেশদের এক পলক দেখেই, বাইরে বেরিয়ে আসে। বলে, 'আপনারা এই দুফারে কোত্থেকে এলেন হুজৌর?'

আগে রাকেশদের সামনে বেরুতে চাইত না কুঁদরী। লজ্জায় গ্লানিতে এবং সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হ'য়ে থাকত। পরে আড়ষ্টতা কেটে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে এঁরা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, এঁদের দিয়ে তাদের ক্ষতির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সে এখন রাকেশদের সামনে অসঙ্কোচে বেরুতে পারে, স্বাভাবিক-ভাবে কথাও বলে।

রাকেশ জানিয়ে দেন, আপাতত তাঁরা কোত্থেকে আসছেন। তবে থানার সামনে পিকেটিং-এর কথাটা আর বলেন না।

কুঁদরী বলে, 'দুফারকা ভোজন নিশ্চয়ই হয় নি?'

'না। তোমাকে একটু কষ্ট দেব। আমাদের সঙ্গে কিছু চাল ডাল আছে। খিচুড়ি টিচুড়ি পাকিয়ে দাও।'

'আভ্‌ভি পাকিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বহোত থকে গেছেন। থোড়েসে জিরিয়ে নাহানা সেরে নিন। তার ভেতর খিচড়ি হ'য়ে যাবে।'

বেডিং-এর ভেতর প্লাস্টিকের ব্যাগে চাল-ডাল রয়েছে। সেগুলো বের ক'রে কুঁদরীর হাতে দিতে দিতে রাকেশ বলেন, 'আনোখি আর ধনুয়া হাটে গেছে, না?'

'জি হুজৌর।'

চাল ডাল নিয়ে নিজের চালার দিকে গিয়ে ইট দিয়ে চুলহা ধরাতে থাকে কুঁদরী।

পলকহীন দেবারতি কুঁদরীকে লক্ষ করছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমরা যখন এসেই পড়েছি, সেই কাজটা ক'রে নিতে পারি।'

'কোন কাজটা বলুন তো ?' উৎসুক চোখে রাকেশ সঙ্গিনীর দিকে তাকান।

'ঠিক করা হ'ল না, কুঁদরীর স্টেটমেণ্ট টেপ ক'রে নিয়ে ধারাবনী গাঁয়ের লোকদের শোনাবেন ? এতে ওদের মর‍্যাল বুস্টিং হবে। হয়ত সাহস ক'রে কেউ কেউ নতুন ক'রে জবানবন্দি দিতে পারে।'

রাকেশ হঠাৎ দারুণ উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন, 'আরে হ্যাঁ, তাই তো। আপনি ঠিক সময়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন। কুঁদরীর স্টেটমেণ্টটা নিতেই হ'বে।'

স্নান এবং খাওয়াদাওয়ার পর ধীরেসুস্থে কুঁদরীয় স্টেটমেণ্ট নতুন ক'রে টেপ ক'রে নেন রাকেশ। একসময় বেলা বেশ হেলে গেলে সুটকেশ বিছানা গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বলেন, 'এবার আমাদের যেতে হবে কুঁদরী।'

কুঁদরী বলে, 'ঠিক হ্যায় হুজৌর।'

'তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ঝাঁপ আটকে দাও।'

'জি—'

'আর ধনুয়া আর আনোখি হাট থেকে ফিরে এলে একবার ধারাবনী পাঠিয়ে দেবে। জরুরি কথা আছে।'

'জি। আজ রাতেই পাঠাব ?'

'না। কাল সকালে গেলেই চলবে। খুব সাবধানে থেকো।'

'জি।'

কুঁদরী তার চালাটার দিকে চলে যায়। দেবারতি আর রাকেশ ধনুয়াদের অস্থায়ী উপনিবেশে তাকে একা রেখে এগিয়ে যান।

রাকেশরা যখন ধারাবনীতে পৌঁছন, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের গায়ে আলতোভাবে আটকে আছে। সেটা যেন লাল টকটকে একটা অলৌকিক গোলক। শেষ বেলার ম্যাড়মেড়ে নিস্তেজ রোদ গাছপালার মাথায় কোনোরকমে লেগে রয়েছে। কিন্তু কতক্ষণ আর, দিনের এই শেষ আলোটুকু মুছে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হালকা ওড়নার মতো অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করবে।

ধনুয়া বা আনোখির ঘরে ভাগবতদের পাওয়া যায় না। দুই ঘরেরই দরজা বাইরে থেকে শেকল তুলে আটকানো রয়েছে।

দাওয়ায় সুটকেশ বিছানা টিছানা নামিয়ে রাকেশরা ব'সে পড়েন।

রাকেশ বলেন, 'কোথায় গেলেন ওঁরা ?'

দেবারতি বলে, 'হয়ত লোকজনকে বোঝাতে গাঁয়ে গেছেন।'

'তা-ই হবে।'

'অনেকটা হেঁটে এসেছি। একটু চা পেলে ভাল হ'ত।'

দেবারতি বলে, 'বসুন, ব্যবস্থা করছি। চাচাজিরা নিশ্চয়ই চা চিনি টিনি গুছিয়ে রেখে গেছেন।' বলতে বলতে সে উঠে পড়ে।

রাকেশ শশব্যস্ত ব'লে ওঠেন, 'আরে না না, আপনি আমাদের মহামান্য অতিথি। চা আমিই করছি।'

'রান্নাটান্নার ব্যাপারে আপনার দৌড় কদ্দূর, নিজের চোখেই দেখেছি। স্টোভ ধরাতে গিয়ে আবার কী বিপদ বাধিয়ে বসবেন! ওটা আমাকেই করতে দিন।'

সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই চা চিনি এবং কৌটোর দুধ পাওয়া যায়। স্টোভ ধরিয়ে সুচারুভাবে চা বানিয়ে একটি কাপ রাকেশকে দিয়ে দেবারতি নিজের কাপটি নিয়ে মুখোমুখি বসে।

রাকেশ আগাগোড়া দেবারতির চা তৈরি করার প্রতিটি মুহূর্ত সাগ্রহে লক্ষ করেছিলেন। বলেন, 'যতই দুর্ধর্ষ পত্রকার হ'ন না, আদতে আপনি কিন্তু একজন ইটার্নাল উম্যান।'

গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়ে দেবারতি সামান্য হাসে, 'কেন, চা ক'রে দিয়েছি বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন?'

'না।' রাকেশও হাসেন, 'যেভাবে যত্ন ক'রে করলেন তা দেখেই মাথায় এসেছে।'

'আই সী। দেখুন, চা আর কফির ব্যাপারে আমার প্রচণ্ড প্যাসন রয়েছে। স্কুলে হায়ার ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই ও দুটো ক'রে আসছি। চা-কফির ব্যাপারে আমার দারুণ সুনাম। তবে যদি মাছের ঝোল কি বাঁধা কপির ঘণ্ট বানাতে বলেন, আমি গেছি।'

চা খেতে খেতে আর এলোমেলো কথা বলতে বলতে একসময় সূর্য ডুবে যায়। মিহি অন্ধকার ফিনফিনে পর্দার মতো চোখের সামনের দৃশ্যমান সমস্ত কিছুকেই মুড়ে দিতে থাকে।

পরিষ্কার মেঘহীন আকাশে এর মধ্যেই দু-একটা ক'রে তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছে। দুপুরের সেই গনগনে লু-বাতাসের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। সব উত্তাপ জুড়িয়ে গিয়ে এখন আরামদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝিরে স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। কোথায় কোন অদৃশ্য পাতাল থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক উঠে আসছে। চারিদিকের ঘোর নির্জনতায় শব্দটাকে এখন অবিশ্বাস্য কিছু মনে হয়।

পাশে চায়ের ফাঁকা কাপ রেখে এখনও দু'জনে বসে আছেন। কিছুক্ষণ আগেও তাঁরা কথা বলছিলেন। এখন একেবারেই চুপচাপ। চারপাশের অসীম

নৈঃশব্দ্য যেন কোনো অজানা পদ্ধতিতে তাঁদের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে গিয়ে চারিয়ে যেতে থাকে।

হঠাৎ একসময় রাকেশ ঘোরের মধ্যে ডাকেন, 'দেবারতি।' এই প্রথম তিনি দেবারতিকে নাম ধ'রে ডাকলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন কাছ থেকে নয়, বহুদূর থেকে বাতাসের অগুণতি স্তরের ভেতর দিয়ে ভেসে আসতে থাকে।

রাকেশের ঘোর বুঝিবা দেবারতির ওপরও ভর করে। দূরে ঝাপসা দিগন্তের দিকে চোখ রেখে সে খুব আস্তে সাড়া দেয়, 'কী বলছ?' নিজের অজান্তে সে রাকেশকে তুমি ব'লে ফেলেছে।

'মনে হয় আমরা পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো নির্জন প্ল্যানেটে চলে এসেছি। আর—'

'আর কী?'

'এই ভাবে আমরা দু'জনে যেন বছরের পর বছর পাশাপাশি ব'সে আছি।'

'হুঁ।' ব'লেই নিঃশব্দে হাসে দেবারতি, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আজ খুব রোমান্টিক মনে হচ্ছে।'

'রোমান্স বাদ দিয়ে মানুষ হয় নাকি? ওটা মানুষের জীবনের একটা খুব দামী প্রোপার্টি।' রাকেশ পরিপূর্ণ চোখে দেবারতির দিকে তাকান।

দেবারতির মুখের হাসিটি ক্রমশ আরো ছড়িয়ে পড়ে। সে কিছু বলে না। শুধু চোখ দু'টি দূর দিগন্ত থেকে নামিয়ে এনে পাশের মুগ্ধ এক যুবকের ওপর স্থির ক'রে রাখে।

রাকেশ এবার বলেন, 'জানো দেবারতি, তুমি আগের বার কলকাতায় চলে যাবার পর অনেক দিন রাত্তিরে তোমার কথা ভেবেছি। কী মনে হয়েছে জানো?'

চোখের কোণ দিয়ে রাকেশকে লক্ষ করতে করতে দেবারতি জিজ্ঞেস করেছে, 'কী?' এই মুহূর্তে তার তাকানো বা গ্রীবাভঙ্গি দেখলে, কিংবা কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হয় না সে একজন অতীব দুর্দান্ত সাংবাদিক, সোসাইটির মারাত্মক সব ঘটনার পেছনে সে অসীম দুঃসাহসে ছুটে বেড়ায়। এই মুহূর্তে চিরকালের কোমল রহস্যময়ী এক নারী যার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে একান্ত অবলীলায় পুরুষের আবেগকে উথল পাথল ক'রে দিতে জানে।

'আমি যে চাকরি ছেড়ে ধারাবনীতে যুদ্ধে নেমেছি, তার পেছনে তোমার বিরাট ইন্সপিরেসান রয়েছে।'

হঠাৎ দেবারতির মাথায় খানিকটা দুষ্টুমিই বুঝি চাপে। সে বলে, 'আমার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে বুঝি চাকরি ছেড়ে এখানকার জেনোসাইড নিয়ে মাথা ঘামাতে না?'

রাকেশ হকচকিয়ে যান, 'না না, তা নয়। তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করব, ডিসিশানটা নিতে হয়ত দেরি হ'ত।'

'এমনও তো হ'তে পারে, হয়ত নিতেই পারতে না ?'

'কী জানি। সেভাবে ভেবে দেখিনি।'

'একটা মেয়ের জন্যে প্রচণ্ড আইডিয়ালিস্ট বনে গেলে !'

রাকেশ বিব্রত মুখে বলেন, 'এভাবে আমাকে নাকাল ক'রে কী লাভ তোমার ? যা সত্যি, তোমার কাছে কনফেস করেছি। আর তুমি কিনা—' কথাটা আর শেষ করেন না তিনি।

দেবারতি চোখ কুঁচকে রাকেশকে দেখতে থাকে। এই জবরদস্ত আদর্শবাদী ম্যাজিস্ট্রেটটির বাইরের দিকে গাম্ভীর্যের মলাট পরানো। কিন্তু আসলে তার মধ্যে এক অতি স্পর্শকাতর অভিমানী বালক রয়েছে। মজার গলায় সে বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার ভেতরকার আইডিয়ালিজমকে আমি উসকে দিয়েছি। কিন্তু—'

'কী ?'

'পরে কোনোদিন হয়ত আপশোস হবে। ভাববে, এই মেয়েটা কোত্থেকে উড়ে এসে আমার ক্ষতি ক'রে দিয়েছে।'

রাকেশ জানান, কোনোদিনই চাকরি ছাড়ার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ হবে না। কেননা আইডিয়ালিজমের বীজটা উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি পেয়েছেন রাজেশ্বরের কাছ থেকে। ধারাবনীর গণহত্যা যেভাবে তাঁকে তোলপাড় ক'রে দিয়েছে তাতে এটাই অর্থাৎ চাকরি ছেড়ে এখানে ছুটে আসাই ছিল একমাত্র নির্ভুল পরিণতি। দেবারতির সঙ্গ এবং নিরুচ্চার প্রেরণা কাজটাকে ত্বরান্বিত করেছে শুধু।

দেবারতি দুই হাত উল্টে ব'লে ওঠে, 'যাক বাবা, কোনোদিন আক্ষেপ হ'লে পুরো দোষটা আমার ঘাড়ে চাপবে না।' তার চোখেমুখে নকল স্বস্তির ভঙ্গি ফুটে ওঠে।

'ঠাট্টা নয় দেবারতি। তোমাকে সঙ্গে পেলে আমি আরো বড়ো ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।'

'তুমি আমার কতটুকু জানো যে আমার সম্বন্ধে মনে মনে এরকম একটা বিশ্বাস তৈরি ক'রে নিয়েছে ?'

'যেটুকু জেনেছি তা-ই যথেষ্ট।' আবেগে রাকেশের কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনাতে থাকে।

দেবারতি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দূরে কাদের গলা শোনা যায়।

অন্ধকার এখনও তেমন ঘন হয় নি, তাই বোঝা যাচ্ছে অনেক মানুষ এদিকেই আসছে। কাছাকাছি আসতে চেনা গেল। ভাগবতরা ফিরে আসছেন।

রাকেশরা উঠে দাঁড়ান।

ভাগবত বলেন, 'আরে তোমরা! কখন ফিরলে?'

রাকেশ বলেন, 'এই কিছুক্ষণ আগে।'

'অন্ধকারে ব'সে আছ, লণ্ঠন জ্বালাও নি?'

ভাগবতকে তো আর বলা যায় না, কিসের ঘোরে তাঁরা এতক্ষণ আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলেন। অন্তহীন নির্জনতায় কখন অন্ধকার নেমেছে, কখন আকাশে তারা ফুটছে, তাঁদের খেয়াল ছিল না। লণ্ঠনের কথা একবারও কারো মনে পড়ে নি।

রাকেশ বলেন, 'এই জ্বালছি চাচাজি—' তিনি ঘরের দিকে পা বাড়ান।

রামলখনরা ভাগবতের পাশ থেকে ব'লে ওঠেন, 'তোমাকে আর অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না। আমরাই জ্বালছি।'

পাঁচ ছ'টা লণ্ঠন জ্বালানো হ'লে ভাগবত বলেন, 'রামলখন এবার একটু চা-পানির ব্যবস্থা হোক।'

রাকেশ বলেন, 'আমরা একটু আগেই চা ক'রে খেয়েছি। আমরা বাদ।' আঙুল বাড়িয়ে দাওয়ায় খালি কাপ দু'টো দেখিয়ে দেন।

'চা হ'ল নির্দোষ পানীয়। আরেক বার খেলে কোনো ক্ষতি হবে না।'

সবার জন্যে চা তৈরি হয়। কাপে চুমুক দিয়ে ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের কালই ফিরে আসার কথা ছিল। এলে না যে? আমরা রাত্তিরে অনেকক্ষণ তোমাদের জন্যে জেগে ব'সে ছিলাম।'

কাল ফিরতে না পারার কারণ জানিয়ে দেন রাকেশ।

প্রবল উৎসাহে ভাগবত বলেন, 'তবে তো ওখানে কাজ খানিকটা এগিয়েছে। যেটা সব চেয়ে জরুরি তা হ'ল পীপলের সাপোর্ট। নরেশ্বরের ওপর আমার ভরসা আছে। ও নিশ্চয়ই থানার চারপাশের গাঁয়ের লোকজনদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পিকেটিংয়ে ইনভল্‌ভ করিয়ে দিতে পারবে।'

রাকেশ বলেন, 'দেখা যাক। তা চাচাজি, আপনারা এখানে কাল আর আজ কী করলেন?'

'গাঁয়ে গিয়ে গিয়ে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। যে রুটিনটা চলছিল সেটাই চালিয়ে গেছি।'

'কাজ হ'ল?'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন ভাগবত। বলেন, 'তবে একটা ভাল লক্ষণ আজ দেখেছি।'

উৎসুকভাবে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'কালও আমাদের দেখলে সবাই দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিত। আজ কিন্তু তাদের অনেকেই পালায় নি, আমাদের কথা মন দিয়ে শুনেছে। অবশ্য—'

'কী?'

'কেউ খুনীদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে এখনও রাজি হয় নি। তবে আমি আশাবাদী। কিছুদিনের ভেতর ওদের ভয় ভাঙবে ব'লেই আমার বিশ্বাস।'

রামলখন ওধার থেকে ব'লে ওঠেন, 'ভাগবত, তুমি শুধু অন্য কথাই ব'লে যাচ্ছ। আসল খবরটা এবার দাও।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় ভাগবতের। শশব্যস্তে তিনি বলেন, 'আরে তাই তো। জানো রাকেশ, আজ দুপুরে একটা দুর্দান্ত কাণ্ড ঘটেছে। আন্দাজ করতে পার?'

রাকেশ কপাল কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করেন। তারপর প্রতিধ্বনির মতো ক'রে বলেন, 'দুর্দান্ত কাণ্ড!' ডাইনে বাঁয়ে আস্তে মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, 'না, বুঝতে পারছি না।'

'গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিং দূত পাঠিয়েছিল।'

রাকেশ এবং দেবারতি চমকে ওঠে। রাকেশ বলেন, 'সে কী! কেন পাঠিয়েছিল?'

'আমরা, মানে পুরনো ফ্রিডম-ফাইটাররা যদি কৃপা ক'রে তাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিই, তাদের জীবন ধন্য হবে।'

'আপনারা যে পুরনো স্বাধীনতা-সংগ্রামী, ওরা জানল কী ক'রে?'

'ওদের খবর দেবার অনেক লোক আছে। আমরা রাজি হ'লে ওরা নিজেরা এসে ফর্মাল ইনভিটেসান দেবে।'

'আপনারা কী বললেন?'

'তোমার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে কী ক'রে কথা দিই? দু-চারদিন পর যোগাযোগ করতে বলেছি।'

'গিরিলালরা জেনে গেছে আপনারা এখানে কী কারণে এসেছেন। তবু এত খাতির ক'রে বাড়িতে ডাকছে কেন? নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে।'

'তা তো বটেই। মতলব ছাড়া ডাকাডাকি করবে কেন?'

'ওরা কি ভয় পেয়েছে ?'

'তা বলতে পারি না। ওদের লোকটাকে তো একথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তবে দুশ্চিন্তায় যে পড়েছে সেটা বোঝা যায়।'

রাকেশ বলেন, 'বাড়িতে ডেকে নিয়ে ওরা কী করতে চায় ? কিছু বুঝতে পারছেন ভাগবতচাচা ?'

ভাগবত বলেন, 'কী ক'রে বলি। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যদি ওরা আবার আসে তখন দেখা যাবে।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভাগবতরা রাতের জন্য রান্নাবান্নার তোড়জোড় শুরু করেন।

পঁয়তাল্লিশ

পরদিন ভোরে সবে রাকেশদের ঘুম ভেঙেছে, কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হ'য়ে আছে, ভাগবতরা সারি সারি দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে, খুব মগ্ন হ'য়ে, চোখ বুজে সূর্যস্তব করছেন, সেইসময় দূর থেকে বহু মানুষের গলা ভেসে আসে।

রাকেশ বা দেবারতি সূর্যবন্দনার লাইনে দাঁড়ায় নি, ধনুয়ার ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে ব'সে আছে। তাদের চোখে এখনও ঘুম জড়িয়ে রয়েছে। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে দু'জনে সামনের দিকে তাকাল। যে কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা পথটা ধারাবনী গাঁ থেকে বেরিয়ে মাঠঘাটের ওপর দিয়ে দুধলিগঞ্জ রেস্ট হাউস এক ধারে রেখে হাই-ওয়েতে গিয়ে মিশেছে, সেটার ওপর দিয়ে এক বিরাট জনতা মাথায় বা কাঁধে মালপত্র চাপিয়ে এদিকেই আসছে।

দলটা সত্তর আশি জনের। এত ভোরে এত লোকজন কোত্থেকে এল কে জানে। নিজেদের অজান্তে দেবারতিরা উঠে দাঁড়ায়। তাদের চোখেমুখে অসীম কৌতূহল।

এদিকে দ্রুত সূর্যস্তব সেরে ভাগবতরাও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। ততক্ষণে দলটা আরো অনেকটা এগিয়ে এসেছে। দূরে থাকার জন্য এতক্ষণ কাউকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, এবার দেখা যায় দলটার একেবারে সামনের দিকে রয়েছেন রাজেশ্বর। পেছনে তাঁরই প্রায় সমবয়সী তাঁর সঙ্গীরা। বোঝাই যায়, এঁরা তাঁর বা ভাগবতদের মতো পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামী।

রাজেশ্বর এককালের সহযোদ্ধাদের এখানে আসার জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

তিনি নিজেও আসবেন ব'লে জানিয়েছিলেন কিন্তু আজই যে এসে পড়বেন, ভাবা যায় নি।

ভাগবতরা একরকম দৌড়েই রাজেশ্বরদের কাছে চলে যান। বলেন, 'আরে রাজ ভাইয়া, এই ভোরবেলা আপনারা কিভাবে এলেন? এ সময় তো কোনো বাসটাস এখানে আসে না।'

রাজেশ্বর জানান, কাল বিকেলেই এখানে তাঁদের পৌঁছুবার কথা ছিল। রাস্তায় বাস বিগড়ে গেল। সারাবার পর আজ শেষ রাতে বাসটা তাঁদের দুধলিগঞ্জে পৌঁছে দেয়। অন্ধকারে রাস্তার ধারে বসে বসে মশা আর গান্ধিপোকার কামড় খাওয়ার মানে হয় না। এদিকটা রাজেশ্বরের আবছা আবছা চেনা ছিল। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে দু-একবার এখানে এসেছেন। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারে সঙ্গীদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

সবার সঙ্গে সঙ্গে দেবারতি এবং রাকেশও এগিয়ে এসেছিলেন। রাজেশ্বর তাদের লক্ষ করেন নি। ভাগবতকে বলেন, 'কী হ'ল ভাগবত, পথেই দাঁড করিয়ে রাখবে নাকি?'

বিব্রতভাবে ভাগবত বলেন, 'এস ভাই, এস—'

ধনুয়া এবং আনোখির ঘরের দিকে যেতে যেতে এবার রাকেশ আর দেবারতির ওপর রাজেশ্বরের চোখ এসে পড়ে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এই মেয়েটিকে তো চিনতে পারলাম না।'

রাকেশ দেবারতির সঙ্গে রাজেশ্বরের পরিচয় করিয়ে দেয়। রাজেশ্বর বলেন, 'মর্নিং সান-এর নাম শুনেছি। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কাগজ। যখন মণিহারি গিয়েছিলি, এই পত্রকারেব কথা কি আমাকে বলেছিলি?

রাকেশ বলেন, 'কী জানি, মনে পড়ছে না।'

'মেয়েরা খবরেব কাগজে কাজ করছে। একা একা দেশের কোণে কোণে রিপোর্টিংয়ের ব্যাপারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে খুব ভাল লাগল।' দেবারতির দিকে ফিরে সস্নেহে বলেন, 'তোমার সঙ্গে পরে ভাল ক'রে আলাপ করতে হবে।'

দেবারতি বলে, 'আপনার কথা এত শুনেছি যে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।'

রাজেশ্বর মজার গলায় বলেন, 'ইচ্ছেটা পূরণ হ'ল, কী বল?' ব'লে স্নিগ্ধ হাসেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে খানিকটা জিরিয়ে স্নানটান সেরে চা খাওয়ার পর রাজেশ্বর বলেন, 'শুধু থানার সামনে পিকেট করলেই চলবে না। আমার কী মনে হয় জানো?'

সবাই রাজেশ্বরকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিলেন। এই মানুষটির মধ্যে এমন প্রবল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে যেখানে তিনি থাকেন সেখানকার সমস্ত কিছু ছাপিয়ে তাঁর দিকেই নজর চলে যায়। নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা খুব সম্ভব তাঁর সহজাত। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ধারাবনীতে এসেছেন। এর মধ্যেই এখানকার কর্তৃত্ব তাঁর মুঠোয় চলে এসেছে। জোর ক'রে তিনি দখল করেন নি, ভাগবতরা স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে সেটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছেন।

সবাই একসঙ্গে জানতে চান, 'কী ?'

রাজেশ্বর বলেন, 'আজ এখানে আসার আগে ক'দিন ধ'রে আমি স্ট্রাটেজি ভেবেছি। আমি জানতাম, পুরনো ফ্রিডম-ফাইটাররা আমার চিঠি পেয়ে সত্যিই যদি ধারাবনীতে চলে আসে, তারা কী ধরনের কাজ করতে পারে। তারা নিশ্চয়ই থানার সামনে সত্যাগ্রহ শুরু করবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেসনকে নাড়া দেবার এটা আমাদের পুরনো স্টাইল। কিন্তু ওতেই হবে না। ধাক্কাটা সব দিক থেকেই দিতে হবে। নইলে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

ভাগবত বলেন, 'কী করতে চাও তুমি ?'

'ডি. এম.-এর আর এস. পি.'র বাংলোর সামনেও পিকেট করতে হবে। গাঁয়ের থানায় পিকেটিং করলে ক'জন আর জানতে পারছে! কিন্তু শহরে গিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের কর্তাদের ঘেরাও করলে তার রেজাল্ট কী হবে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পার।'

শ্রোতাদের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু ব'য়ে যায়। সবাই শিরদাঁড়া টান টান ক'রে বলেন, 'এ তো দুর্দান্ত ব্যাপার। এই পরিকল্পনাটা আমাদের মাথায় আসে নি। আর চিন্তা নেই। কমাণ্ডার-ইন-চিফ এসে গেছে, এবার অল-রাউণ্ড লড়াই শুরু হবে।'

মজার গলায় ভিড়ের ভেতর একজন ব'লে ওঠেন, 'একেবারে ফাইট টু ফিনিশ।'

কারো কোনো কথা বা মন্তব্য যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না রাজেশ্বর। যুদ্ধের ছক সম্বন্ধে তিনি বুঝিয়ে দিতে থাকেন, 'গাঁয়ের মানুষেরা যদিও সংখ্যায় শহুরেদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি তবু তারা সাইলেণ্ট মেজরিটি। শেষ পর্যন্ত হয়ত তাদেব সঙ্গে পাবে কিন্তু তারা এখনও সেভাবে দুনিয়া তোলপাড় ক'রে প্রোটেস্ট করতে শেখে নি। কিন্তু শহরের লোকেদের, বিশেষ করে ইয়াং জেনারেসানকে পাশে যদি পাওয়া যায়, তারা এমন হইচই বাধিয়ে দেবে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেসন তটস্থ হ'য়ে উঠবে।'

একধারে কাছাকাছি ব'সে রাজেশ্বরের কথা শুনছিলেন রাকেশ আর দেবারতি।

দেবারতি নিচু গলায় আস্তে আস্তে রাকেশকে বলে, 'তোমার বাবুজি একজন ন্যাচারাল লীডার।' তার কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় মেশানো।

রাকেশ বলেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের অঞ্চলে যে সত্যাগ্রহ ট্রহ হয়েছিল, বাবুজি ছিলেন তার নেতা। অর্গানাইজ করার ক্ষমতা ওঁর অসাধারণ।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। শুধু চিঠি লিখেই এত জন ফ্রিডম-ফাইটারকে ধারাবনীর মতো অজ গ্রামে টেনে এনেছেন। এককালের সহযোদ্ধারা ভাল না বাসলে বা শ্রদ্ধা না করলে এটা একেবারেই সম্ভব হ'ত না।'

রাকেশ উত্তর দেন না, সামান্য হাসেন শুধু।

ওদিকে রামলখন বলছিলেন, 'ছক তো কারেক্ট হ্যায়। কিন্তু ভেবে দেখেছ কী, এত জায়গায় পিকেট করতে হ'লে কত লোক দরকার? এত মানুষ—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাজেশ্বর বলেন, 'তোমার কি ধারণা, সেটা আমি ভেবে দেখিনি? দু' চারদিনের ভেতর মজঃফরপুর, কাটিহার, আরা, দ্বারভাঙ্গা— এমনি নানা জায়গা থেকে আমাদের আরো অনেক পুরনো বন্ধু এসে পড়বে।' দেবারতিকে দেখিয়ে বলেন, 'একজন পত্রকার আমাদের সঙ্গে আছে। তা ছাড়া এখানে আসার আগে পাটনার আর রাঁচির কয়েকটা নিউজ পেপারে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি, তারা যেন এখানে রিপোর্টার পাঠিয়ে দেয়। এতগুলো কাগজে আমাদের খবর বেরুতে থাকলে তার রি-অ্যাকসান হ'তে বাধ্য।'

রাজেশ্বর আরো যা বলেন তা এইরকম। ডিস্ট্রিক্ট টাউনে পিকেট শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওখানকার কলেজ, স্কুল আর সরকারি অফিসগুলোতে গিয়ে মিটিং ক'রে জনমত তৈরি করতে চেষ্টা করবেন। তেমন জরুরি বুঝলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভাও করবেন। মানুষকে, বিশেষ ক'রে ছাত্র ও যুবকদের যদি সংগঠিত করা যায়, তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। তা ছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলো অর্থাৎ খবরের কাগজকে তো সহযোদ্ধা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছেই।

সবাই গলা মিলিয়ে সায় দেয়, 'চমৎকার আইডিয়া।'

রাজেশ্বর এবার আর কিছু বলেন না।

ভাগবত জিজ্ঞেস করেন, 'আজ আমাদের কী প্রোগ্রাম রাজ ভাই? নতুন কিছু ভেবেছ?'

রাজেশ্বর মাথা নাড়েন, 'না। যা চলছিল তা-ই চলুক। আজ তোমাদের সঙ্গে গাঁয়ে ঘুরে দেখি। কাল থেকে কী করা যায়, ভেবে দেখব।'

'মতলব, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, তা-ই তো?'

'ঠিক তাই।'

রাকেশ ওধার থেকে বলে ওঠেন, 'বাবুজি, কাল আমরা নতুন ক'রে কুঁদরীর একটা স্টেটমেণ্ট টেপ ক'রে নিয়েছি। আজ বিকেলে যখন গাঁয়ে যাব, সেটা সবাইকে শোনাতে চাই।'

রাজেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের স্টেটমেণ্ট ?'

রাকেশ সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। রাজেশ্বর বেশ জোর দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই শোনাতে হবে।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই সাইকেলে ক'রে জয়প্রকাশ এসে হাজির। ঘামে তাঁর জামাকাপড় সপসপে হ'য়ে গেছে। কপালে গলায় এবং ঘাড়ে জমেছে ধুলোর পুরো আস্তর।

সাইকেল থেকে নেমে রাজেশ্বরদের দেখে প্রথমটা অবাক হ'য়ে যান জয়প্রকাশ। তারপরই খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আরে কমাণ্ডার-ইন-চিফ, তুম আ গিয়া !' একরকম দৌড়ে গিয়ে রাজেশ্বরকে জড়িয়ে ধরেন, 'আমাদের তাকত হানড্রেড পারসেণ্ট বেড়ে গেল।'

খানিক দূরে বসে দেবারতি নতুন ক'রে বুঝতে পারে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা রাজেশ্বরকে কী চোখে দেখেন, এবং এঁদের মধ্যে কোন মর্যাদার স্থানটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

রাজেশ্বর জয়প্রকাশকে বলেন, 'শুধু আমিই এসেছি নাকি ? এদেরও দেখ—' তাঁর সঙ্গে যাঁরা আজ এসেছেন, তাঁদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, 'এরাও কিন্তু এসেছে।'

জয়প্রকাশ বুকের ভেতর থেকে রাজেশ্বরকে মুক্ত ক'রে দিয়ে অন্যদের কাছে চলে আসেন। এতদিন বাদে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে পুরনো সহযোদ্ধারা নানা অঞ্চল থেকে এখানে এসেছেন। বহুকাল পর তাঁদের দেখা হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বেয়াল্লিশ বছর আগে। যাঁরা কাছাকাছি এলাকায় থাকেন তাঁরা ছাড়া অন্যদের সঙ্গে কারো বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। অবশ্য মাঝেমধ্যে চিঠিপত্র লেখালিখিটা ছিল। কোনোদিন আর যে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে, কেউ ভাবতে পারেন নি। সবাই বিপুল আবেগে যেন টগবগ করছেন।

জয়প্রকাশ বলেন, 'আরে ভাই, রাজ ভাইয়ের জন্য মৌতের আগে ফের আমাদের দেখা হ'ল।'

ভাগবত বলেন, 'রাজ ভাই আমাদের ডেকেছেন ঠিকই, তবে আমরা যে এখানে এসে জুটেছি সেটা কিন্তু রাকেশের জন্যে।'

জয়প্রকাশ তক্ষুনি ঘাড় হেলিয়ে সায় দেন, 'সে তো বটেই।' বলতে বলতে

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তাঁর। রাজেশ্বরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা রাজ ভাই, তোমাদের মণিহারিতে তো মহেশপ্রসাদজি ছিলেন। বৃটিশ আমলে তিরিশ বছর জেল খেটেছেন। তিনি তো এলেন না!'

রাজেশ্বর জানান, বছর সাতেক আগে মহেশ প্রসাদের দেহান্ত ঘটেছে।

আক্ষেপের স্বরে জয়প্রকাশ বলেন, 'খবর পাই নি। অত বড় মাপের একজন মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বহুত আপসোসকা বাত।'

'হ্যাঁ। উনি বেঁচে থাকলে কবে এখানে চলে আসতেন!'

কথায় কথায় অন্যান্য অঞ্চলের আরো কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধার প্রসঙ্গ ওঠে। জানা যায়, তাঁদের অনেকেই মারা গেছেন, কেউ কেউ বয়সের ভারে এতই অথর্ব হ'য়ে পড়েছেন যে চলাফেরার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। কাজেই তাঁদের পক্ষে ধারাবনীর নতুন লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়া অসম্ভব।

স্বাধীনতার প্রাচীন সৈনিকদের মৃত্যুর খবর যাঁরা জানতেন না তাঁরা বিমর্ষ হ'য়ে পড়েন।

রাজেশ্বর ভাগবত এবং রামলখন কয়েক জনের নাম ক'রে বলেন, 'এঁদের মৌতের খবর তো নিউজ পেপারে বেরিয়েছে। তোমরা দেখ নি?'

প্রায় সকলেই জানান, খবরগুলো তাঁদের চোখে পড়ে নি।

অনেকে প্রস্তাব দেন, এবার থেকে কোনো এলাকায় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কেউ মারা গেলে যেন সেখানকার ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যাসোসিয়েসান অন্য সব ইউনিটে খবর পাঠায়। পুরনো সহযোদ্ধাদের এভাবে নিঃশব্দে, সবার অগোচরে বিদায় নেওয়াটা খুবই বেদনাদায়ক। অন্তত একটা শোকসভার আয়োজন ক'রে এককালের সহযোদ্ধাকে শ্রদ্ধা জানানো যে জরুরি কর্তব্য, এ ব্যাপারে সবাই একমত হ'ন।

রাজেশ্বর মৃত এবং অথর্ব মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ক'রে বলেন, 'এঁদের সঙ্গে পেলে আমাদের শক্তি অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু কী আর করা যাবে! আমরা যারা এখানে এসে পড়েছি তারাই জীবনের শেষ লড়াইটা লড়ে যাই।'

পুরনো স্মৃতি নাড়াচাড়া করতে করতে সবাই ধারাবনীর গণহত্যার ঘটনায় মাঝে মাঝেই ফিরে আসছিলেন। এক ফাঁকে জয়প্রকাশের চোখ দেবারতির ওপর এসে পড়ে। তিনি বলেন, 'এই যে পত্রকারজি, তোমার রিপোর্ট রেডি তো?'

হঠাৎ রাজেশ্বররা এসে পড়ায় টাইপ রাইটার নিয়ে বসতে পারে নি দেবারতি। কুণ্ঠিতভাবে সে বলে, 'আপনি একটু রেস্ট নিন। কুড়ি মিনিটের ভেতর রেডি হ'য়ে যাবে।'

রাজেশ্বর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের রিপোর্ট জয়প্রকাশ ?'

রোজ কলকাতায় দেবারতির প্রতিবেদন পাঠাবার কী ব্যবস্থা হয়েছে, জয়প্রকাশ সংক্ষেপে জানিয়ে দেন।

একটি মানুষ—সত্তরের কাছাকাছি যাঁর বয়স—প্রতিদিন সাইকেলে ক'রে থানার সামনে থেকে ধারাবনীতে এসে দেবারতির রিপোর্ট নিয়ে নৌহরপুর পোস্ট অফিসে গিয়ে কলকাতায় পাঠাবেন—এতে তাঁর শারীরিক ধকল কতটা হ'তে পারে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা বিচলিত নন রাজেশ্বর। বরং তিনি এই ভেবে সন্তুষ্ট হ'ন, রোজকার খবর রোজই কলকাতায় পাঠানো যাবে। বলেন, 'ভেরি গুড অ্যারেঞ্জমেণ্ট।'

ওধারে দেবারতি আর সময় নষ্ট করে না। পোর্টেবল টাইপ-রাইটার বের ক'রে বারান্দায় ব'সে ঝড়ের গতিতে আঙুল চালিয়ে কয়েক মিনিটের ভেতর আড়াই পাতার মতো একটা রিপোর্ট তৈরি ক'রে সেটার মাথায় চমৎকার একটা হেডিং দেয়। তারপর ক্যামেরা এনে রাজেশ্বরদের আলাদা আলাদা ছবি তো তোলেই, সবাইকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটা গ্রুপ ফোটোও নেয়। স্পুলটা ক্যামেরা থেকে অত্যন্ত সতর্কভাবে বের ক'রে কৌটোয় পুরে রিপোর্ট শুদ্ধ সেটা জয়প্রকাশকে দিতে দিতে বলে, 'চাচাজি, নেগেটিভটাও নিয়ে যান। নৌহরপুরে ফটোর দোকান আছে। ওখান থেকে ডেভলাপ করিয়ে যদি কাল নিয়ে আসেন, ক্যাপসান লিখে দেব। কিন্তু—'

'কী ?'

'ছবিগুলো তাড়াতাড়ি কলকাতায় পৌঁছনো দরকার। রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠালে পেতে পেতে তিন চার দিন লেগে যাবে। কী করা যায় বলুন তো ?'

সমস্যার সমাধান ক'রে দেন রাজেশ্বর। তিনি বলেন, নৌহরপুর থেকে আরো কয়েক মাইল গেলে জানকীপুরা। সেখান থেকে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে দু'দিনের মধ্যে কলকাতা বম্বে দিল্লীতে চিঠি পাঠানো যায়। আজকাল পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের যা হাল তাতে সঠিক সময়ে কোথাও কিছু পৌঁছনোর গ্যারাণ্টি নেই। ক্যুরিয়ার সার্ভিসকে দায়িত্ব দেওয়া হ'লে এ ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, সোজা জানকীপুরা গিয়েই রোজ ক্যুরিয়ার সার্ভিসে জয়-প্রকাশ ফটো এবং দেবারতির লেখা পাঠিয়ে দেবে। জানকীপুরাতে ফটোগ্রাফির দোকান আছে, তিন ঘণ্টার মধ্যে নেগেটিভ থেকে প্রিণ্ট বের ক'রে দেয়। কাজেই নৌহরপুরকে আর দরকার নেই। অবশ্য এই ঝাঁ ঝাঁ গরমকালে জয়প্রকাশের ছোটাছুটি এবং ধকলটা একটু বেশি হবে।

জয়প্রকাশ দেবারতির রিপোর্ট আর নেগেটিভের স্পুল হাতে পেয়েই সাইকেলে চড়তে যাচ্ছিলেন কিন্তু তক্ষুনি তাঁকে যেতে দেওয়া হয় নি। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অবশ্য আর আটকানো গেল না। তাঁকে নৌহরপুর ছাড়িয়ে আরো কয়েক মাইল দক্ষিণে জানকীপুরায় যেতে হবে। দেরি হলে ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিস হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে।

তরল আগুনের মতো রোদ মাথায় নিয়ে সাইকেলে চেপে জয়প্রকাশ চলে যান। তারও ঘণ্টা তিনেক বাদে দিনের তাপ জুড়িয়ে এলে রাকেশরা প্রায় দল বেঁধেই ধারাবনী গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়েন। সবার আগে আগে রয়েছেন রাজেশ্বর ভাগবত রামলখন রাকেশ আর দেবারতি।

রাকেশরা শুনেছেন, কাল থেকেই এখানকার আবহাওয়া খানিকটা বদলে গেছে। আগে গাঁয়ে ঢুকলেই ধারাবনীর বাসিন্দারা বেশির ভাগই পালিয়ে যেত কিন্তু আজ তারা কেউ পালায় না। যে যেখানে ছিল—ঘরের দাওয়ায়, পথে অথবা গাছতলায় চৌপায়ার ওপর—সেখানেই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে। রাকেশের সঙ্গে এত লোকজন দেখে তারা অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়েই থাকে। ফিয়ার সাইকোসিস কি কেটে যাচ্ছে?

গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে একেক জায়গায় থেমে রাকেশ গাঁওয়ালাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের গাঁয়ে আজ নতুন নতুন অনেক মানুষ এসেছেন। পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তাঁদের নিয়ে এলাম।' ধারাবনীর মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। সেটা ঘিরেই গোটা গ্রাম। রাকেশ সবাইকে সেখানে চলে আসতে বলেন।

কিছুক্ষণের ভেতর সারা গ্রাম ঘুরে রাকেশরা ফাঁকা জায়গায় চলে আসেন। কিন্তু ধারাবনীর লোকজনেরা প্রথমটা কাছে ঘেঁষে না, দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কিছুটা ভয় এবং কিছুটা কৌতূহল নিয়ে রাকেশদের নতুন সঙ্গীদের লক্ষ করতে থাকে।

রাকেশ তাদের ডাকতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাজেশ্বর সোজা এগিয়ে যান। বলেন, 'আসুন আসুন। অনেক দূর দূর জায়গা থেকে আমরা এখানে এলাম। আসুন আলাপ করি।'

রাজেশ্বরের বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আপন-করা সস্নেহ ব্যাপার রয়েছে যা ধারাবনীবাসীদের নাড়া দিয়ে যায়। তারা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় পরামর্শ করতে থাকে। তবে তারা খুবই দ্বিধাগ্রস্ত, কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

রাজেশ্বর আরো আন্তরিক গলায় ডাকাডাকি করতে থাকেন, 'মেহমান এলে তাদের কাছে আসতে হয়।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের সঙ্গে কথা বলতে কেউ বুঝি বারণ করেছে?'

লোকগুলো হকচকিয়ে যায়। বলে, 'নেহী হুজৌর, অ্যায়সা কোঈ বাত নেহী।'

'ঝুট নায় বোলনা।'

লোকগুলো অস্বস্তিতে প্রায় কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

ভরসা দেবার ভঙ্গিতে রাজেশ্বর বলেন, 'কোনো ভয় নেই। চলে আসুন—'

জনতার মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা চলতেই থাকে। বার বার ডাকাডাকির পর শেষ পর্যন্ত তারা খানিকটা এগিয়ে আসে। সবার প্রতিনিধি হিসেবেই গন্না বলে, 'হুজৌর, আমরা গরীব আনপড় আদমী।'

এই কথাটা আগে এখানকার অনেকের মুখে আরো অনেক বার শোনা গেছে। রাজেশ্বর তাদের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন। বলেন, দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকই গরীব। তাতে অন্যায় কিছু হয় নি। আর লেখাপড়া করায় সুযোগ পায় নি ব'লেই ধারাবনীর মানুষজন আনপড় হ'য়ে আছে। গিরিলাল ঝা আর ত্রিলোকী সিংয়ের মতো লোকেরা পুরুষ পরম্পরায় নানাভাবে তাদের বঞ্চিত ক'রে আসছে, তাই তাদের এই মারাত্মক হাল।

কথাগুলো গন্নাদের মাথায় কতটা ঢোকে, বোঝা যায় না। তবে খোলাখুলি গিরিলাল আর ত্রিলোকীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রায় সিঁটিয়ে যায়। রাজেশ্বরের উৎসাহে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল, এখন রুদ্ধশ্বাসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সবার চোখে মুখে উদ্বেগ এবং শঙ্কা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

রাজেশ্বর ধীরে ধীরে গন্নাদের সন্ত্রস্ত মুখগুলির ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে যান। তারপর বলেন, 'আপনাদের সকলকে একটা কথা পরিষ্কার জানাতে চাই। সেটা কী জানেন?'

কেউ উত্তর দেয় না।

রাজেশ্বর এবার বলেন, 'দুনিয়ার কাউকে, সে যত বড় বন্দুকবালা আর পয়সাবালা হোক, আপনাদের ভয় পেতে হবে না। আপনারা কোনো কসুর করেন নি। উল্টে আপনাদের ওপরই জুলুম চালানো হচ্ছে।'

এবারও সবাই চুপ।

রাজেশ্বর থামেন নি, 'আমরা আপনাদের গাঁয়ে এসেছি। যতদিন না আসল হত্যারাদের পুলিশ ধরছে, তাদের সাজা হচ্ছে, আমরা এখানে থেকে যাচ্ছি না। কোনো বন্দুকবাজ আপনাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

গন্নাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আবার পরস্পর ফিসফিস ক'রে তারা কী পরামর্শ ক'রে নেয়, তবে এবারও রাজেশ্বরকে কিছু বলে না।

গন্নাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে রাজেশ্বর বলেন, 'আপনারা তো গিরিলালদের ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। তাই একটা জিনিস আপনাদের শোনাব। তা হ'লে বুঝবেন ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে নিজের অজান্তেই যেন কেউ ব'লে ওঠে, 'কী শোনাবেন হুজৌর?'

'শুনলেই তা বুঝতে পারবেন। কাছে না এলে কিন্তু শোনা যাবে না। আসুন—'

ভয় এবং দুর্ভাবনা ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলই জোরালো হ'য়ে ওঠে। পায়ে পায়ে সকলে রাজেশ্বরদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।

রাজেশ্বর রাকেশের হাত থেকে টেপ রেকর্ডার নিয়ে চালিয়ে দেন। কুঁদরীর গলা ভেসে ওঠে।

'আমরা জাতে কোয়েরি। শাদির পর থেকে চার সাল আমি ধারাবনী গাঁওয়ে আছি। এখানে আমার সসুরাল। আমার—'

হঠাৎ টেপ বন্ধ ক'রে সবার উদ্দেশে রাজেশ্বর বলেন, 'কার গলা, চিনতে পারছেন?'

অনেকে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কুঁদরীর।'

'এবার শুনুন—'

ফের টেপ রেকর্ডার চলতে শুরু করে। কোন কোন বন্দুকবাজ সেদিন তাদের গাঁয়ে চড়াও হয়েছিল, কারা ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, কারা মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে—এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেছে কুঁদরী। আইনের দিক থেকে অপরাধীদের শাস্তি দেবার পক্ষে এটা অত্যন্ত মূল্যবান স্টেটমেণ্ট। এর আগেও অবশ্য একবার জবানবন্দি দিয়েছিল কুঁদরী এবং ধর্ষিতা কয়েকটি মেয়ে কিন্তু গিরি-লালেরা সে সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

টেপ বন্ধ ক'রে রাজেশ্বর বলেন, 'একটা মেয়ে সাহস ক'রে এসব কথা বলেছে। আর আপনারা ভয় পাচ্ছেন! এখন আপনাদের কী করা উচিত, নিজেরাই ভেবে দেখুন।'

গন্নাদের মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা দেখা দেয়। তারা কী করবে, কী করা তাদের উচিত, সে সম্বন্ধে কিছুতেই মনস্থির ক'রে উঠতে পারছে না।

তাদের মনোভাব আন্দাজ ক'রে নিয়ে রাজেশ্বর বলেন, 'এক্ষুনি কিছু বলতে হবে না। আমরা এখন বেশ কিছুদিন আছি। আপনারা ভেবে চিন্তে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে ঠিক করুন—কী করবেন। যদি ভয়ে মুখ বুজে থাকেন কোনো-

দিন মাথা তুলতে পারবেন না। চিরকাল গিরিলালদের নাগরার তলায় ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, আমরা এখন যাই। কাল ফের দেখা হবে।'

গাঁয়ের কর্মসূচি সেরে ধন্নুয়া আর আনোখির ঘরের সামনে রাকেশরা যখন ফিরে আসেন সন্ধে নেমে গেছে। ধীরে স্থস্থে ছ' সাতটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব'সে পড়েন। আরো কিছুক্ষণ বাদে রাতের রান্নাবান্না শুরু হবে।

দেবারতি রাজেশ্বরকে জিজ্ঞেস করে, 'গাঁয়ের লোকগুলোকে কিরকম মনে হ'ল? এই মেটিরিয়াল দিয়ে কি আপনারা যা চাইছেন তা ঘটানো আদৌ সম্ভব হবে?'

রাজেশ্বর কিছুটা অবাক হ'য়েই জানতে চান, 'আমরা কী ঘটাতে চাইছি দেবারতি?'

দেবারতি বলে, 'সোসাল রেভোলিউসান।'

'রেভোলিউসান বিরাট ব্যাপার। এই বিশাল দেশে দু-চারদিনে বা দু-চার শ লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবে শুরুটা তো কোনো একটা জায়গা থেকে করতেই হয়। তারপর সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধারাবনী না হয় শুরুর মর্যাদাটা পাক।' একটু থেমে বলেন, 'আর মেটিরিয়ালের কথা বলছ? এই অপ্রেসড টারচারড পীপলের চোখ খুললে, তারা অ্যাওয়ার হ'লে তবেই না বিপ্লব সম্ভব। শুধু এটাই দেখার, কিভাবে এদের ব্যবহার করা যায়। সে যাক, তোমার কথা জানতে চাই।'

'আমার কী কথা?'

'এই তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?'

দেবারতি জানায়, বাবা মা ভাই বোন, এই নিয়ে তাদের ফ্যামিলি। বাবা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ক্লাস ওয়ান অফিসার, মা একটা মেয়েদের কলেজে ফিজিক্স পড়ান, ভাই বোনেরা কেউ এম. এস. সি পড়ছে, কেউ বি. এ থার্ড ইয়ার, ইত্যাদি।

রাজেশ্বর বলেন, 'তুমি হঠাৎ জার্নালিজমে এলে যে?'

'এর ভেতর দারুণ একটা থ্রিল আছে। সেটা আমার ভীষণ ভাল লাগে। তা ছাড়া একজন জার্নালিস্টের কমিটমেণ্টের ব্যাপারও থাকে। মনে হয়, আমরা জরুরি ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ক'রে কিছু সোসাল সারভিসও দিচ্ছি।'

'এক শ বার। সোসাইটির নানা গলদের খবর দিয়ে মানুষকে অ্যাওয়ার ক'রে তুলছ, এটা খুব বড় কথা।'

কাছে ব'সে কয়েকজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী পরম আগ্রহে রাজেশ্বরদের কথা

শুনছিলেন। তাঁদের ভেতর থেকে কেউ ব'লে ওঠেন, 'ইয়ে মহান সমাজ সেবা হ্যায়।'

রাজেশ্বর বলেন, 'এই যে তুমি একটি মেয়ে হ'য়ে নানা জায়গায় যাও, এতে বিপদের ঝুঁকি থাকে নিশ্চয়ই?'

দেবারতি হাসে, 'তা তো কিছুটা থাকেই। তবে খারাপ মানুষ যেমন আছে, ভাল মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে তার চেয়ে অনেক বেশি। এদের সাহায্য পাওয়া যায়ই। নইলে এই প্রোফেসানে থাকা একেবারেই সম্ভব হ'ত না।'

'কারেক্ট, কারেক্ট। বদ লোকেরা সংখ্যা বেশি হ'লে ওয়ার্ল্ড নষ্ট হ'য়ে যেত। যাক, মেয়েরা যে আজকাল পত্রকার হচ্ছে, এটা খুব বড় ব্যাপার।'

একসময় রাত আরো খানিকটা বাড়লে স্টোভ ধরিয়ে রান্নাবান্না এবং খাওয়ার পালা চুকিয়ে ফেলা হয়। মশার পল্টন কোথায় যেন ওত পেতে ছিল। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বেরিয়ে এসে রাকেশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অগত্যা দ্রুত মশারি খাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে হয়। কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর বাতি নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়বেন, হঠাৎ একটু দূরে কাদের ভীরু গলা শোনা যায়, 'হুজৌররা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

রাজেশ্বর রাকেশ এবং আরো কয়েকজন প্রাচীন মুক্তিযোদ্ধা সোজা হ'য়ে বসেন। প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কে?'

'জি, আমি গন্না আর সঙ্গে দো-চার গাঁওবালা এসেছে। একঠো বাত হ্যায় হুজৌর—'

এর মধ্যে মশারি থেকে বেরিয়ে কয়েকজন লণ্ঠন জালিয়ে ফেলেন। এত রাতে গন্নাদের দেখে সবাই অবাক। তারা যে এভাবে আসতে পারে, ভাবা যায় নি।

রাজেশ্বর পরম সমাদরে গন্নাদের কাছে ডাকেন, 'আসুন আসুন, এখানে এসে বসুন।'

চারিদিকে সতর্ক চোখে তাকাতে তাকাতে গন্নারা রাজেশ্বরের কাছে এসে মাটিতেই ব'সে পড়ে। তারা যে ভীষণ সন্ত্রস্ত আর চঞ্চল সেটা তাদের মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়। বিকেলে যেমন দেখা গিয়েছিল তার চেয়ে এখন তারা অনেক বেশি শঙ্কিত।

রাজেশ্বর গন্নাদের মুখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন, 'মনে হচ্ছে, আমরা চলে আসার পর কিছু একটা ঘটেছে?'

গন্না চাপা ভয়ার্ত স্বরে কোনোরকমে বলে, 'হাঁ, হুজৌর।'

'বলুন কী হয়েছে ?'

এরপর প্রশ্ন ক'রে ক'রে গন্নার কাছ থেকে যা জানা যায় তা এইরকম। রাজেশ্বররা কুঁদরীর টেপ শুনিয়ে আসার কিছুক্ষণ বাদে গিরিলালদের তিন বন্দুকবাজ এসে হানা দেয়। তারা হুমকি দিয়ে, জানের ভয় দেখিয়ে জেনে নেয়, কুঁদরী নতুন ক'রে খুনী এবং ধর্ষকদের বিরুদ্ধে মারাত্মক জবানবন্দি দিয়েছে। গন্নাদের ধারণা, এর ফলে কুঁদরীর তো বটেই, আনোখি এবং ধনুয়ার জীবনও বিপন্ন হবে। গন্নাদের আশঙ্কা, খতারনাক বন্দুকবাজেরা জঙ্গলে গিয়ে কুঁদরীদের ওপর হামলা চালাবে।

এ দিকটা ভেবে দেখেন নি রাজেশ্বররা। জঙ্গলে অরক্ষিত কুঁদরীর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। রাজেশ্বর বলেন, 'কী করা যায় বল তো ?'

গন্না চিন্তাগ্রস্তের মতো বলে, 'ওহী তো হামনিলোগন সোচতা থা। উসি লিয়ে তুরন্ত আপহিলোগনকে পাস চলা আয়া। লেকেন হুজৌর—'

'কী ?'

'আমরা যে আন্ধেরাতে চুপকে চুপকে আপনাদের কাছে এসেছি, ওরা যেন জানতে না পারে।'

'কারা ? ঐ বন্দুকবালারা ?'

'হ্যাঁ।'

'না না, আমরা জানাবো না।'

'অব চলতা হ্যায়।' গন্না তার সঙ্গীদের নিয়ে উঠে পড়ে। কয়েক পা গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'হুজৌর, কুঁদরীকে লিয়ে জরুর কুছ করনা। না করলে—' বলতে বলতে চুপ ক'রে যায়।

রাজেশ্বর ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ এবং অস্থিরতা বোধ করছিলেন। বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু একটা তো করতেই হবে।'

গন্নারা আর দাঁড়ায় না, দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রাজেশ্বব উঠে দাঁড়িয়ে ভাগবত রামলখন এবং অন্য সবার উদ্দেশে বলেন, 'কী করা যায় বল তো ?'

সঙ্গে সঙ্গে কেউ উত্তর দেয় না। আসলে এত রাতে কী করা উচিত, তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে রামলখন একসময় বলে ওঠেন, 'কাল সকালে কুঁদরীদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। জঙ্গলে থাকা ওদের পক্ষে নিরাপদ নয়।'

এতক্ষণ নিজের বিছানায় চুপচাপ বসে ছিলেন রাকেশ। এবার উঠে দাঁড়িয়ে

বলেন, 'বাবুজি, কালকের জন্যে ব'সে থাকলে চলবে না। এক্ষুনি আমাদের জঙ্গলে গিয়ে ওদের নিয়ে আসতে হবে।'

নগীনদাস এবং আরো কয়েকজনকে বেশ দ্বিধান্বিত দেখায়। অন্ধকারে প্রায়-অচেনা এবড়ো খেবড়ো গেঁয়ো কাচ্চী দিয়ে জঙ্গলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা মনস্থির করতে পারছেন না।

রাকেশ বলেন, 'আজ রাতেই আমাদের যেতে হবে। কেউ না গেলে আমি একাই যাব। আমার ধারণা, আজ রাতেই বন্দুকবাজেরা ওখানে হানা দিতে পারে।' এর কারণও তিনি জানিয়ে দেন, কুঁদরীর স্টেটমেণ্ট টেপে শোনার পর যদি ধারাবনীর অন্য লোকজনেরা ভয় কাটিয়ে ওঠে সেটা হবে গিরিলালদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। সবার বুকে সাহস ফিরে আসার আগেই তারা কুঁদরীদের শেষ ক'রে দিতে চাইবে।

রাজেশ্বর পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। এবার বলেন, 'ঠিক বলেছিস। আর দেরি নয়, এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে তোড়জোড় শুরু হ'য়ে যায়। রাকেশ একা যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে একা ছাড়া হয় না। ভাগবত, রামলখন এবং আরো কুড়ি পঁচিশজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী লণ্ঠন জ্বালিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন।

রাতের অন্ধকারে জনশূন্য নিঝুম মাঠের ওপর দিয়ে এ এক দুর্ধর্ষ অভিযান।

নিঃশব্দে, শ্বাসরুদ্ধের মতো অনেকটা চলার পর ভাগবত বলেন, 'জঙ্গলে গিয়ে কী দেখব, জানি না।'

নগীনদাস বলেন, 'আমাদের আগেই যদি বন্দুকবাজেরা ওখানে হাজির হ'য়ে থাকে—' কথাটা শেষ ক'রেই তিনি থেমে যান।

ইঙ্গিতটা সবাই ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরা শুধু চিন্তাগ্রস্তের মতো মাথা নাড়েন।

স্তব্ধ মাঠের মাঝখানে ফুটিফাটা ধুলো-বোঝাই কাচ্চীর ওপর বিশ পঁচিশ জোড়া পায়ের শব্দ ছাড়া গোটা চরাচরে কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। মাথার ওপর অসীম আকাশের অফুরন্ত নক্ষত্রমালা। কিন্তু নিচে আদিগন্ত প্রান্তরে কয়েকটি দোলায়মান লণ্ঠন বাদে কোথাও আর কোনো আলো চোখে পড়ে না।

একসময় জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েন রাকেশরা। ঝোপঝাড় ঠেলে খানিকটা এগুতেই দূরে নহরের দিকে মশালের আলো দেখা যায়। সেই সঙ্গে অনেক মানুষের বীভৎস হুমকি আর মেয়ে গলায় বুক-ফাটানো চিৎকার।

রাকেশ বলেন, 'নিশ্চয়ই শয়তানেরা এখানে হানা দিয়েছে। দৌড়ন—'

ভাগবতদের বয়স সত্তরের এপারে ওপারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁদের পায়ে পায়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলতে থাকে। ঝোপঝাড় ভেঙে, ঝুলন্ত বুনো লতাপাতার বাধা ছিঁড়ে তাঁরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকেন।

সবার আগে আগে ছুটছেন রাকেশ। তিনি সমানে চিৎকার করতে থাকেন, 'এই—এই—এই—'

তাঁর দেখাদেখি ভাগবতরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'রুখ যা, রুখ যা, রুখ যা—'

খালের ধারে যে তর্জনগর্জন চলছিল, মুহূর্তে তা থেমে যায়। এত রাতে এত লোক এসে তাদের হামলায় ব্যাঘাত ঘটাবে, মশালধারীরা বুঝিবা তা ভাবতে পারে নি। তারা হকচকিয়ে গেছে।

রাকেশরা আরেকটু এগুলেই ওধার থেকে কেউ ভয়ঙ্কর গলায় হুমকে ওঠে, 'এক কদম মাত বঢ়াও। গোলিসে শির চুর চুর হো যায়েগা।'

ভাগবতরা থামেন না। রাকেশ চেঁচিয়ে বলেন, 'আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—এই কথাটা জানিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে পুরানো স্বদেশীরাও রয়েছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে হুমকি থেমে যায়। মশালগুলো হঠাৎ অন্ধকারে জঙ্গলের বিশাল বিশাল গাছপালার ভেতর দিয়ে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ হামলাকারীরা পালিয়ে যাচ্ছে।

রাকেশরা তাদের তাড়া ক'রে যান কিন্তু কাউকেই ধরা যায় না। পাঁচ সাত জনের দলটা চোখের পলকে মশাল ফেলে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অগত্যা সবাই খালের ধারে ফিরে আসেন। লণ্ঠনের আলোয় দেখা যায়, আনোখি এবং ধনুয়া মাটিতে প'ড়ে গোঙাচ্ছে। আনোখির পায়ের গোছ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, তার চোটটা মারাত্মক ধরনের নয়। তার তুলনায় ধনুয়ার জখমটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। তার হাত, ঘাড় এবং ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে। খানিক দূরে ভয়ে আতঙ্কে কাঠ হ'য়ে ব'সে আছে কুঁদরী। তার গায়ে কোনোরকম জখমের দাগটাগ নেই। মনে হয় সে অক্ষতই আছে।

রাকেশদের দেখে কুঁদরী বুক ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে, 'হামনিকা মরদ আউর আনোখিচাচাকো মার দিয়া। দেখিয়ে দেখিয়ে, কিতনি খুন নিকাল যাতী হ্যায়!' বলতে বলতে সে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।

রাকেশ সস্নেহে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'তোমাকে ওরা মারে নি তো?'

'নেহী'। আপলোগন ওদের দেখুন। ওদের জান বাঁচান।'

রাকেশ কিছু বলার বা করার আগেই ভাগবতরা মাটিতে ব'সে পড়ে প্রথমে ধনুয়া আর আনোখিকে ধীরে ধীরে তুলে বসান। দু'জনেরই জ্ঞান আছে। ওদের চোটের জায়গায় ধুতির খুট ছিঁড়ে বাঁধা হ'লে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কারা ধনুয়া?'

ধনুয়া যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বলে, 'ভূচ্চরের ছৌয়া ঐ মানকালাল, ভৌরা, মনেন্দরের দল।'

'এরাই তো সেই খুনীরা?'

'হাঁ, হুজৌর—' আনোখি বলে, 'আপনারা এসে আমাদের জান বাঁচিয়েছেন। না হ'লে ওরা আমাদের খতম ক'রে ফেলত। ভগোয়ান আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'এত রাতে আচানক আপনারা এই জঙ্গলে এলেন যে?'

আসার কারণ সংক্ষেপে জানিয়ে রাকেশ বলেন, এভাবে এখানে অরক্ষিত পড়ে থাকা ধনুয়াদের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। আজই, এখনই তাদের সঙ্গে ক'রে ধারাবনীতে নিয়ে যাবেন। কেননা, বন্দুকবাজরা ফের যে হানা দেবে তা একেবারে অবধারিত। আর রাকেশদের এখন এত কাজ যে সেসব ফেলে জঙ্গলে ধনুয়াদের পাহারা দেওয়া অসম্ভব। গ্রামে ফিরে গেলে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সারাক্ষণ তাদের নজরে রাখতে পারবেন। ওখানে কেউ ধনুয়াদের গায়ে একটা টোকা দিতে সাহস করবে না।

ধনুয়া আর আনোখি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। ধনুয়া বলে, 'হাঁ ম্যাজিস্টর সাব, আজই আমরা আপনাদের সাথ যাব। ভেবেছিলাম, হত্যারাদের সাজা না হওয়া পর্যন্ত গাঁওয়ে ফিরব না, লেকেন তা হ'ল না।' তাকে খুবই বিষণ্ণ দেখায়।

রাকেশ বলেন, 'গাঁয়ে গেলে তোমাদের সাহায্য পাব। তোমরা সঙ্গে থাকলে খুনীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যাবে।'

'ঠিক হ্যায়।'

সেই রাতেই সামান্য যা হাঁড়িকুড়ি, টিনের বাক্স, ময়লা ছেঁড়া-খোঁড়া বিছানা ইত্যাদি ছিল, সব গোছগাছ ক'রে নিয়ে ধনুয়ারা রাকেশদের সঙ্গে ধারাবনী গাঁয়ে ফিরে চলে। অবশ্য চোটের কারণে ঠিকমতো সুস্থভাবে হাঁটার অবস্থায় ধনুয়া আর আনোখি নেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা ক'জন তাদের ধ'রে ধ'রে নিয়ে চলেছে। তাদের মালপত্রের বেশির ভাগটাই ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছেন রামদয়াল, হরকিশোর ইত্যাদি অনেকে। কিছুটা বইছে কুঁদরী।

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে তো?'

আনোখি বলে, 'তা হচ্ছে। তবে আমাদের জন্মে আপনাদের বহোত তখলিফ হ'ল ম্যাজিস্টর সাব।'

'না, তখলিফ আর কী। তোমাদের যে বাঁচানো গেছে, এতেই আমরা খুশি। নইলে সারা জীবন বড় আপসোস থেকে যেত।'

ধনুয়ার চোটটা বেশি হওয়ায় সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাতরাচ্ছিল। বলে, 'ম্যাজিস্টর সাব, বড়ে ঝামেলা হ'য়ে গেল।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের ঝামেলা ধনুয়া?'

'ভূচ্চরেরা যেভাবে মেরেছে তাতে ক' রোজ যে হাটিয়ায় যেতে পারব না, কিষুণজি জানে।'

'আমাদের সঙ্গে দাওয়াই আছে। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে যাবে।'

ধনুয়া চিন্তিতভাবে বলে, 'যতই দাওয়া খাই আর লাগাই, কমসে কম দো-চার রোজ তো লেগে যাবেই।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাকেশ, 'হ্যাঁ, তা লাগবে। ক'টা দিন ঘরে থেকে একটু আরাম ক'র।'

'আপনি আরামের কথা বলছেন ম্যাজিস্টর সাব! হাটিয়ায় না গেলে পেটের দানা জুটবে কোত্থেকে?'

'চিন্তা ক'র না। যে ক'দিন তোমরা পুরোপুরি সুস্থ হ'য়ে না উঠছ, তোমাদের সব ভার আমাদের। তা ছাড়া—'

'কী?'

'সুস্থ হ'লেও তোমাদের আমরা চট ক'রে হাটে যেতে দেবো না। তোমাদের ওপর ওদের প্রচণ্ড রাগ। পথে পেলে হামলা করবে।'

'হাঁ। লেকেন—'

ধনুয়াকে কথা শেষ করতে দেন না রাকেশ। বলেন, 'যতদিন না হত্যারাদের সাজার ব্যবস্থা করতে পারছি, তোমরা আমাদের সঙ্গেই খাবে।'

কৃতজ্ঞ স্বরে ধনুয়া আর আনোখি একসঙ্গে ব'লে ওঠে, 'আপ্‌লোগনকো কিরপা ম্যাজিস্টর সাব।'

প্রায় মাস দুই বাদে মধ্যরাতে ধনুয়া, আনোখি আর কুঁদরী জঙ্গল থেকে ধারাবনী গাঁয়ে ফিরে আসে।

ছেচল্লিশ

আরো দিন তিনেক কেটে যায়।

মারাত্মক জখমের কারণে সেদিন রাতে ধারাবনীতে পৌঁছুবার পর ধুম জর এসে যায় ধনুয়া আর আনোখির।

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে একজন, রামনরেশ তাঁর নাম, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ডাক্তার বলা যেতে পারে তাঁকে। কেননা বহুকাল আগে মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার কিছু আগে 'কুইট ইণ্ডিয়া' মুভমেণ্ট শুরু হ'ল আর পড়াশোনা ছেড়ে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ধরা পড়ে আট বছরের জেল। পুরো মেয়াদ অবশ্য হয় নি। স্বাধীনতার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হ'ল বটে, রামনরেশের আর মেডিক্যাল কলেজে যাওয়া হয় নি। ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও নিজে নানা বই এবং মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনেছেন। চম্পারণ ডিস্ট্রিক্টে গ্রামের দিকে রুগী দেখে তিনি ওষুধও দিয়ে থাকেন।

রামনরেশ দূরদর্শী মানুষ। কখন কী কাজে লাগে, এটা মাথায় রেখে সঙ্গে ক'রে প্রচুর ওষুধ-টোষুধ নিয়ে এসেছিলেন।

রামনরেশের ওষুধে আপাতত অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠেছে আনোখি আর ধনুয়া। জর ছেড়ে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে ঠিকই, তবে আগের মতো ততটা নয়। এ ক'দিন তাদের ঘর থেকে বেরুতে দেওয়া হয় নি।

পুরনো রুটিন অনুযায়ী সব কিছু চলছে। ঠিক হয়েছে, আনোখিরা পুরোপুরি ভাল হ'য়ে উঠলে তাদের সঙ্গে ক'রে রাকেশরা গাঁয়ের ভেতর যাবেন।

ওধারে জয়েন্দ্র রোজ সকালে ঘড়ির কাঁটায় সাতটা নাগাদ এসে দেবারতির রিপোর্ট নিয়ে নৌহরপুর চলে যান। তাঁর কাছে খবর পাওয়া গেছে, থানার সামনে পিকেটিং চলছেই। রোজই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ওখানকার স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা জনমত তৈরি করতে চেষ্টা করছেন। দেহাতীরা তাঁদের কথা শুনছে এবং থানার সামনে পিকেটিংও দেখতে আসছে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তারা ফিরে যাচ্ছে, পিকেটিং-এ তাদের বসানো যাচ্ছে না।

জয়েন্দ্রর কাছ থেকে আরো কিছু জানা যায়। গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিংয়ের লোকেরা রোজই সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের লক্ষ ক'রে যাচ্ছে। ওরা যে গিরিলালদের এজেন্ট প্রথমটা বোঝা যায় নি, ঐ এলাকার চাষাভুষোদের কাছ থেকে পরে জানা গেছে। এ ছাড়া দরকারী যে বিষয়টি জানা গেছে তা এইরকম। থানার ও. সি পুরন্দর সিং সকাল দুপুর বিকেল

সন্ধে এবং রাতেও এসে জোড়হাতে পিকেটিং তুলে নেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করছে। না তুললে নাকি তার সারভিস কেরিয়ার একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে। বদনাম তো হবেই, সে সাসপেণ্ডও হ'য়ে যেতে পারে, এমন কি চাকরি চলে যাওয়াও নাকি অসম্ভব নয়। কিন্তু তার ঘ্যানঘ্যানিতে কেউ কান দেন নি।

এই ক'দিনে নিশ্চয়ই 'মর্নিং সান'-এ দেবারতির রিপোর্ট এবং ছবি বেরিয়েছে কিন্তু তার কপি এত দূরে এই ধারাবনী গাঁয়ে এসে পৌঁছয় নি। এই সব খবরের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে, এখান থেকে জানার উপায় নেই।

আজ সকালে চা এবং কালকের বাসি রুটি খাওয়ার পর রাকেশরা যখন বেরুতে যাবেন, সেই সময় দুটো লোককে দেখা যায়। একজন মধ্যবয়সী, আরেকজনের বয়স তুলনায় কম। দু'জনকেই চেনেন রাকেশ। আগেও এদের দেখেছেন। এরা ত্রিলোকী এবং গিরিলালের এজেন্ট। মধ্যবয়সী ভদ্র চেহারার লোকটি যার পরনে ফিনফিনে কাপড়ের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ে চপ্পল, মাথায় সাদা কাপড়ের টুপি—সে আর সৌখিন অল্পবয়সী যুবকটি সাইকেলে ক'রে ধনুয়ার ঘরের সামনে এসে থামে। নেমে হাতজোড় ক'রে মাথা ঝুঁকিয়ে, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'আপনাদের সকলকে নমস্তে।'

রাকেশরা প্রতি-নমস্কার জানান। রাজেশ্বর বলেন, 'আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

রাকেশ দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ওঁরা ত্রিলোকীজিদের লোক।' জানিয়ে দেন বয়স্কটির নাম ভুনেশ্বরপ্রসাদ এবং যুবকটি হ'ল জগন্নাথলাল।

রাজেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের কাছে আপনাদের কি কিছু দরকার আছে?'

'হাঁ হাঁ।'

'আমরা একটা জরুরি কাজে বেরুচ্ছি। আপনাদের দরকারী কথা থাকলে তাড়াতাড়ি যদি সেরে নেন, ভাল হয়।'

'হাঁ হাঁ, জরুর। লেকেন রাজেশ্বরজি—'

রাজেশ্বর প্রথমটা অবাক, তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আমাকে চেনেন!'

হাত কচলাতে কচলাতে তৈলাক্ত মুখে ভুনেশ্বর বলে, 'পুরা হিন্দুস্থানে কে না চেনে আপনাকে! আপনি এত্তে বড়ে ফ্রিডম ফাইটার!' অন্যদের দিকে ফিরে বলে, 'এঁদেরও আমি চিনি। আপলোক দেশকা সুসন্তান, নেশানকা মহান্ স্বাধীনতা-সংগ্রামী।'

রাজেশ্বরের বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। তিনি বলেন, 'আপনারা আমাদের অনেক খবর রাখেন দেখছি।'

জগন্নাথলাল হাতজোড় ক'রেই ছিল। সে বলে, 'আমরা বহুত ছোটা আদমী, মহান বড়ে আদমীদের খবর না রাখলে কি আমাদের চলে!'

অজানা এই দু'টি মানুষ আড়ালে থেকে তাঁদের সম্পর্কে কত তথ্য যোগাড় করেছে, কে জানে। দেখেশুনে ভুনেশ্বর আর জগন্নাথলালকে তো যথেষ্ট ভদ্র, বিনয়ী এবং শিষ্ট মনে হয়। এটা তাদের মুখোশ কিনা কে জানে। হয়ত এদের পেটের ভেতর কোনো গোপন, কূট মতলব আছে। সতর্কভাবে রাজেশ্বর দু'জনকে দেখতে দেখতে বলেন, 'আমাদের কথা থাক। আপনারা যে কাজে এসেছেন এবার সেটা সেরে ফেলুন।'

'আমাদের কৃপা ক'রে দশ পন্দ্র মিনিট সময় দিতে হবে।'

রাজেশ্বর বুঝতে পারছিলেন, এরা বেশ নাছোড়বান্দা ধরনের, খুব সহজে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে না। তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, আপনারা শুরু ক'রে দিন।'

জগন্নাথলাল বলে, 'একটু বসতে পারলে হ'ত।'

ভেতরে ভেতরে সবাই যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছিলেন কিন্তু মুখের ওপর তা বলা যাচ্ছিল না। রাজেশ্বর বলেন, 'ঠিক আছে, বস্থন—'

জগন্নাথলাল ব'লে, 'আপলোগন পহ্‌লে। রেসপেক্টেড বড়ে আদমীরা দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা কি বসতে পারি?'

অগত্যা ধনুয়ার ঘরের দাওয়ায় বসতেই হয় রাজেশ্বরদের। তারপর সন্তর্পণে তাঁদের সম্মান দেখানোর জন্যই হয়ত আলগোছে, খুব সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে, একধারে বসে ভুনেশ্বর আর জগন্নাথলাল।

ওদিকে খানিক দূরে একটা পিপর গাছের তলায় বসে হাতের তেলোতে খৈনি ডলতে ডলতে ভুনেশ্বরদের দেখছিল আনোখি। দেখতে দেখতে তার মুখচোখে এক ধরনের উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়। নিঃশব্দে উঠে এসে সে রাকেশের কানের ভেতর প্রায় মুখ ঢুকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'ম্যাজিস্টর সাব এ দোনো আদমী আচ্ছা নেহী। জরুর গিরিলালজি আউর ত্রিলোকীজিনে ভেজোয়া হ্যায়।'

রাকেশও সেরকম আন্দাজ করেছিলেন। বলেন, 'তুমি এদের চেনো?'

আনোখি বলে, 'হাঁ। এখানকার সবাই ওদের চেনে। আপনি গিয়ে আপনার বাবুজিকে হোঁশিয়ার ক'রে দিন। জরুর কোনো মতলব নিয়ে ওরা এসেছে।'

অর্থাৎ রাজেশ্বরকে সতর্ক ক'রে দিতে চাইছে আনোখি। সে অক্ষর পরিচয়হীন

আনপড়, কিন্তু বুদ্ধিহীন নয়। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। তার ধারণা, গিরিলালরা ভুনেশ্বরদের পাঠিয়েছে একটি উদ্দেশ্যেই। ওরা রাজেশ্বরদের ফাঁদে ফেলতে চায়, এবং সেটা রাকেশের কাছেও পরিষ্কার।

রাকেশ লক্ষ করেছেন, ভুনেশ্বররা আজ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলে নি। তিনি দ্রুত রাজেশ্বরের কাছে গিয়ে ভুনেশ্বরদের সম্পর্কে তাঁকে সাবধান ক'রে দেন।

ভুনেশ্বর কিছুক্ষণ ধানাই পানাই করে, 'আপনাদের মতো মহান আদমীরা এখানে এত কষ্ট করছেন, আমাদের পক্ষে বহোৎ শরমকা বাত।'

রাকেশ এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার ক'রে দেবার পর স্নায়ু টান টান হ'য়ে গেছে রাজেশ্বরের। তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'কে বললে এখানে আমাদের কষ্ট হচ্ছে?'

এবার ভুনেশ্বর অত্যন্ত বিনীতভাবে ভেঙে ভেঙে বলে, 'কেউ বলে নি। কিন্তু আমাদের তো আঁখ আছে।'

'ধরুন যদি আমাদের কষ্টও হয়, আপনাদের লজ্জা হবে কেন?'

'আমাদের ঠিক নয়। তবে—'

'তবে কী?'

লম্বা ক্লান্তিকর টালবাহানার পর ভুনেশ্বর এবং জগন্নাথলাল এবার কাজের কথায় আসে। রাজেশ্বররা এভাবে ধুলোবালি নোংরা ময়লা এবং মাছি মচ্ছড়ের মধ্যে পড়ে আছেন, তাঁদের ঠিকমতো আরাম এবং 'ভোজন' হচ্ছে না, তাতে ভুনেশ্বররা তো বটেই কিন্তু তার চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছেন এই অঞ্চলের দুই বহুমান্য মানুষ। পরমপূজ্য মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তখলিফে তাঁরা মর্মাহত, লজ্জিত।

রামনরেশ জিজ্ঞেস করেন, 'এই বহুমান্য লোক দু'টি কারা?'

জগন্নাথলাল জিভ বের ক'রে পুরু কালচে ঠোঁট দু'টো চেটে নেয়। তারপর বলে, 'গিরিলালজি আউর ত্রিলোকীজি—'

অর্থাৎ আনোখি এবং রাকেশ যা আন্দাজ করেছিলেন তা-ই। গিরিলালরাই ভুনেশ্বরদের পাঠিয়েছেন। সকলেই মুহূর্তে সতর্ক হ'য়ে যান।

চল্লিশ পঞ্চাশ জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ চারিদিক থেকে ভুনেশ্বরদের ওপর স্থির হ'য়ে আছে। তারা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। ধীরে ধীরে হাসিমুখে রাজেশ্বরদের মুখের ওপর দিয়ে তাকাতে তাকাতে জগন্নাথলাল বলে, 'গিরিলালজিরা আপনাদের একটা হুকুম চান।'

রাজেশ্বরের মুখ কঠোর হ'য়ে ওঠে। তবু নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করেন। বলেন, 'কিসের হুকুম?'

'ওঁরা বিনতি ক'রে ব'লে পাঠিয়েছেন, আপনারা নারাজ না হ'লে এখানে

এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কেন?'

'গিরিলালজিদের কিছু জরুরি কথা আছে।'

'আমারের সঙ্গে তাঁদের কী কথা থাকতে পারে?'

'তা আমি জানি না। যা বলার ওঁরা খুদ এসে বলবেন।'

'ওঁদের আসার দরকার নেই।' রাজেশ্বর বলতে থাকেন, 'এর আগেও ওঁরা আরো কয়েকবার লোক পাঠিয়েছিলেন। বলে দেবেন, আর যেন লোক না পাঠান।'

ভুনেশ্বর এবং জগন্নাথলাল খুবই কাকুতি মিনতি করতে থাকে। করুণা ক'রে, একটি বার যেন গিরিলালজিদের সুযোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু রাজেশ্বররা অনড় থাকেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোনোভাবেই গিরিলালদের সঙ্গে এভাবে দেখা তো করবেনই না, কথাও বলবেন না। চতুর ফন্দিবাজ ঐ সব লোকের ফাঁদে পড়তে তাঁরা একেবারেই রাজী নন।

রাজেশ্বর বলেন, 'একটা খবর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন—'

ভুনেশ্বর জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'আমরা এখানে কী জন্যে এসেছি?' সারাসরি ভুনেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে এবার প্রশ্নটা করেন রাকেশ।

ভুনেশ্বর এবং জগন্নাথলাল প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। আমতা আমতা ক'রে জড়ানো গলায় ভুনেশ্বর বলে, 'নেহী তো—ঠিক নেহী জানতা—'

লোকটা যে নির্জলা মিথ্যে বলছে, বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। রাকেশ বলেন, 'তা হ'লে জেনে রাখুন, আপনাদের মনিবদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছে। সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা হবে না। আচ্ছা, আপনারা এখন যেতে পারেন। আমাদের কাজ আছে। নমস্তে—'

ভুনেশ্বরদের ঠাণ্ডা পলকহীন চোখের তলা থেকে লুকনো আগুনের ঝলকানি বেরিয়ে এসেই পলকে মিলিয়ে যায়। আস্তে আস্তে তারা উঠে দাঁড়ায়। হাতজোড় ক'রে বিনীত ভঙ্গিতেই বলে, 'আচ্ছা, নমস্তে নমস্তে। আমরা চলি। তবে আপনারা গিরিলালজিদের এখানে আসার হুকুমটা দিলেই পারতেন।' একটু থেমে ফের বলে, 'এটা ওঁদের নিজেদের গাঁ, তবু দেখুন কেত্তে বিনতি, মনকা ভাওনা কেত্তে উঁচা, আপনাদের মতো বড়ে আদমীদের কেত্তে সম্মান দিয়া! লেকেন আপনারা তার দাম দিলেন না।'

ভুনেশ্বর বলে, 'কাজটা ভাল হ'ল না। বহোত আপসোসকি বাত।'

ওরা যদিও নিচু গলায় যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েই কথাগুলো বলেছে, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা চাপা শাসানি রয়েছে।

রাকেশের মুখ শক্ত হ'য়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আপনারা কি ধমকি দিচ্ছেন?'

ভুনেশ্বররা শশব্যস্তে হাতজোড় ক'রে, বার বার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানায়, রাকেশদের শাসাবার মতো ধৃষ্টতা বা স্পর্ধা তাদের কোনোটাই নেই। এই তারা নাক ধরছে, এই কান ধরছে, ম্যাজিস্টর সাব এবং মহান স্বাধীন-সংগ্রামীরা যেন গুস্সা না হ'ন।

বিরক্ত গলায় রাকেশ বলেন, 'ঠিক আছে, এখন আপনারা যেতে পারেন।'

জগন্নাথলালরা একরকম দৌড়ে পিপর গাছের তলায় চলে আসে। তারপর সাইকেলে উঠে মুহূর্তে উধাও হ'য়ে যায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

গাঁয়ে বেরুবার মুখে আচমকা ভুনেশ্বররা হানা দেওয়ায় মেজাজ যথেষ্ট খারাপ হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া এখন বেলা বেশ চড়েছে। রোদের ঝাঁঝও বাড়তে শুরু করেছে।

একসময় এক স্বাধীনতা সংগ্রামী জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কি আর গাঁয়ে যাবে রাজভাই?'

রাজেশ্বর দাওয়া থেকে উঠে পড়তে পড়তে গলায় বেশ জোর দিয়েই বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। রোজ দু'বার ক'রে আমাদের যেতেই হবে। গাঁওবালাদের সাহস বাড়তে শুরু করেছে। এখন ঢিলেমি দেওয়া চলবে না।' সবার ভেতরকার ঝিমিয়ে-পড়া উৎসাহটা তিনি উসকে দিতে থাকেন।

কিন্তু গাঁয়ে যাওয়া আজ আর বুঝিবা সম্ভব নয়। নতুন ক'রে আবার বাধা পড়ে।

দূরে দুধলিগঞ্জ যাওয়ার মেঠো রাস্তার দিক থেকে বেজায় শোরগোল ভেসে আসতে থাকে। রাকেশরা চকিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ান। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অজস্র মানুষ এদিকে এগিয়ে আসছে।

রাকেশরা একই সঙ্গে অবাক এবং উৎকণ্ঠিতও। কে যেন জিজ্ঞেস করেন, 'কারা এরা?'

রাকেশ বলেন, 'বুঝতে পারছি না।'

'গিরিলালরা এবার মারদাঙ্গাওলাদের পাঠিয়ে দিল নাকি?'

'মনে হয় না। ভুনেশ্বররা এই সবে গেল। ওরা গিয়ে এখানকার হাল সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবে। তারপর গিরিলালরা যা হোক ডিসিসান নেবে। এখনও

ভুনেশ্বররা গিরিলালদের কাছে পৌঁছুতে পারেনি।'

'তা হ'লে?'

'ওরা এলেই বোঝা যাবে।'

সবাই পলকহীন কাঁচা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আনোখিও তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায়। কুঁদরী আর ধন্নুয়া স্নান করতে গিয়েছিল। এই সময় তারা ফিরে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেড়শ দু'শ জনের একটা দল কাছাকাছি এসে পড়ে। তাদের বেশির ভাগেরই বয়স আঠার থেকে কুড়ি-বাইশের ভেতর। তবে তিন চারজন বয়স্ক লোকও রয়েছে। যুবকদের ঝকঝকে চেহারা। যদিও অনেকটা পথ হেঁটে আসার কারণে তারা খানিকটা ক্লান্ত, মুখে ধুলোবালির পাতলা সর পড়েছে, তবু তাদের বেশ উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছে।

যুবকদের সঙ্গে কিছু নেই, তারা একেবারে ঝাড়া হাত-পা। কিন্তু বয়স্কদের সঙ্গে রয়েছে স্যুটকেশ আর বেডিং। এরা যে গিরিলালদের ভূমিসেনা বা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী নয় সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

রাকেশ ধন্নুয়াকে জিজ্ঞেস করেন, 'এদের চেনো নাকি?'

ধন্নুয়া আস্তে আস্তে মাথা দোলায়, অর্থাৎ চেনে না।

ধন্নুয়ার পাশ থেকে বুড়ো আনোখিও বলে ওঠে, 'নেহী, কভি নেহী দেখা হ্যায় এহী সাহাবলোগনকো।'

পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাকেশ ফের বলেন, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখ।' যদিও তিনি জানেন, এমন উজ্জ্বল চেহারার এতগুলো কৈশোর-পেরুনো সদ্য-যুবক পেশাদার হত্যাকারী হ'তে পারে না।

ভাবার সময় আর পাওয়া গেল না, যুবকেরা আরো কাছে এসে গেছে। তাদের সামনের দিকে যে তিনজন বয়স্ক মানুষ রয়েছে তাদের একজন জিজ্ঞেস করেন, 'দেবারতি সেন এখানে আছেন?'

দেবারতি উত্তর দেওয়ার আগেই রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা?' অর্থাৎ তিনি এদের পরিচয় জানতে চাইছেন।

বয়স্ক লোকটি স্যুটকেশ বেডিং নামিয়ে জানান, তাঁর নাম নকুলেশ যাদব, পাটনার একটা হিন্দি দৈনিকের রোভিং রিপোর্টার। আর অন্য দু'জনও পাটনার সাংবাদিক। পরমেশ দাসও কাজ করেন একটা ইংরেজি ডেইলিতে। তৃতীয় সাংবাদিক রামেশ্বর লালও ইংরেজি কাগজেরই রিপোর্টার।

রাকেশরা যথেষ্ট অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আপনারা

এখানকার খবর পেলেন কোথায় ?'

নকুলেশ বলেন, 'মর্নিং সান'-এ রোজ দেবারতিজির যে রিপোর্ট বেরুচ্ছে, সেগুলো পড়ে। তাঁর লেখা থেকেই জানতে পেরেছি, তিনি এখানেই আছেন।'

এবার দেবারতির সঙ্গে নকুলেশদের পরিচয় করিয়ে দেন রাকেশ।

নকুলেশরা সবিনয়ে বলেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে বড় ভাল লাগছে।'

রামেশ্বর লাল বলেন, 'রিয়ালি উই আর থ্রিলড টু মীট ইউ। আপনার লেখা রিপোর্টগুলো পড়ার পর আমাদের এডিটর আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডিটেলে এমন অবজেকটিভ রিপোর্টিং রিসেন্টলি খুব কমই চোখে পড়েছে।'

নকুলেশ যাদব মানুষটি বেশ মজাদার। হেসে হেসে, দুই হাতের দশটা আঙুল বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচাতে নাচাতে বলেন, 'আপনি তো কামাল ক'রে দিয়েছেন। এদিকে আমাদের এডিটর কী বললেন জানেন ?' প্রশ্নটা ক'রে জবাবের জন্য সবুর না ক'রেই ফের বলতে শুরু করেন, 'বললেন, কলকাতা থেকে এক ডেয়ার ডেভিল লেড়কী এসে এত বড় একটা ইভেন্ট রিপোর্ট করছে আর তোমরা এখানে ব'সে গাই-বকরির ঘাস কাটছ! আভভি স্যুটকেশ উটকেশ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়। ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে এডিটর আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীমতীজি, আপনার জন্যে এই বয়সে আমার হাল বিলকুল 'বুরা' হ'য়ে গেছে।'

নকুলেশের বলার ধরনে এমন এক মালিন্যহীন কৌতুক রয়েছে যা মানুষটিকে নির্ভুল চিনিয়ে দেয়। তা ছাড়া তাঁর হাসিটিও খুবই আপন-করা। দেবারতির মনেই হয় না আজই প্রথম নকুলেশকে দেখছে, নকুলেশ যেন তার বহুকালের চেনা। প্রচুর হাসছিল দেবারতি, তার সঙ্গে অন্যরাও।

দেবারতি হাসতে হাসতে বলে, 'আমার লেখা এত সব কাণ্ড ঘটিয়েছে, জানতাম না তো !'

নকুলেশ ঘাড় অনেকটা হেলিয়ে দিয়ে বলেন, 'ইয়েস ম্যাডাম। আরেকটি কাজ আমরা করেছি।'

'কী ?'

'আপনার রিপোর্টগুলো ট্রানস্লেট করে আমাদের কাগজে ছেপেছি।—না না, ভয় নেই, ফোনে আপনাদের এডিটরের পারমিসান নিয়েছি আর ক্রেডিটটা আমরা নিজেরা নিইনি, আপনার নামেই ওগুলো ছাপা হয়েছে। কপি সঙ্গে ক'রে এনেছি। পড়ে দেখবেন।'

রামেশ্বর এবং পরমেশও জানান, তাঁরাও 'মর্নিং সান'-এর এডিটরের অনুমতি নিয়ে দেবারতির লেখাগুলো ছাপিয়েছেন।

দেবারতি অভিভূত হ'য়ে বলে, 'আপনারা আমাকে যে এতটা মর্যাদা দিয়েছেন সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

রামেশ্বররা এবার বলেন, 'আপনার এডিটরের পারমিসান নিলেও আপনাকে তো ক্যালকাটায় ধরা যায়নি। বুঝতে পারছিলাম না, রিপোর্টগুলো রিপ্রিণ্টের ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি হবে কিনা।'

'আপত্তি! এখানে যা ঘটেছে তা সারা দেশকে জানানো দরকার। রিপ্রিণ্ট ক'রে খুব ভাল করেছেন।'

এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সবাই দেবারতিদের কথা শুনছিলেন। এবার রাজেশ্বর বলে ওঠেন, 'কি দেবারতি, নতুন মেহমানদের এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে?'

দেবারতি লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, 'আই অ্যাম স্যরি। আসুন আপনারা।'

ধনুয়ার বারান্দার দিকে যেতে যেতে পরমেশরা জানান, তাঁরা চাল-ডাল বেঁধে ধারাবনীতে রিপোর্ট করার জন্য এসেছেন। গিরিলালদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, এখানে থেকেই তার পুরো রিপোর্টটা করতে চান।

দেবারতি বলে, 'ফাইন। আমরা জার্নালিস্টরা এতগুলো কাগজে যদি লিখতে থাকি তার একটা ভাল রি-অ্যাকসান হ'তে বাধ্য।'

রামেশ্বর বলেন, 'আমারও তাই ধারণা।'

ধনুয়ার ঘরের দাওয়ায় পাটনার সাংবাদিকদের বসানো হয়। রাকেশরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন। আর এসেছে সেই যুবকেরা।

এতক্ষণ এই যুবকদের কথা কারো খেয়াল ছিল না। এবার দেবারতি রামেশ্বরদের জিজ্ঞেস করেন, 'এরা কি আপনাদের সঙ্গে এসেছে?'

রামেশ্বরদের উত্তর দেবার আগেই যুবকদের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে আসে। বলে, 'না দিদিজি, ওঁদের সঙ্গে আসি নি আমরা। হাইওয়েতে রামেশ্বর-জিদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমাদেরও যা ডেস্টিনেসান, ওঁদেরও তা-ই। তখন একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করলাম।'

দেবারতি বলে, 'তোমাদের তো চিনতে পারলাম না।'

যুবকটি জানায়, তার নাম অমিত মিশ্র। মাইল আষ্টেক দূরে একটা মফস্বল শহরের কলেজে পড়ে। অন্য যুবকদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওরাও আমাদের কলেজের ছাত্র।'

দেবারতি বেশ অবাকই হ'য়ে যায়। বলে, 'কলেজ ছেড়ে হঠাৎ তোমরা

ধারাবনীতে চলে এলে।'

এবার অমিত যা বলে তাতে অভিভূত হ'য়ে যায় দেবারতি। তার রিপোর্ট-গুলোর হিন্দি ট্রানশ্লেসান নকুলেশদের কাগজে পড়ে পড়ে তারা এতই উদ্দীপ্ত হয়েছে যে দল বেঁধে আজ এখানে চলে এসেছে। মাত্র আট মাইল দূরের শহরে তারা থাকে। পোস্ট-ইণ্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট ত্রিলোকীদের সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা আছে। স্বার্থের কারণে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখতে এরা না পারে এমন কাজ নেই। তাদের বিপক্ষে কেউ যাতে গলা চড়াতে না পারে, একটা আঙুল তুলে কেউ যাতে প্রতিবাদ না করে, সে জন্য তাঁরা বেছে বেছে মারাত্মক বন্দুকবাজ জুটিয়ে পুষছে। খুন-খারাপি, বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, এসব তাঁদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। এই ত্রিলোকী গিরিলাল জোটের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে তাতে অরুণদের মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে মুখ বুজে ব'সে থাকা উচিতও না, সম্ভবও না। খুবই উত্তেজিত তারা, এই লড়াইতে সহযোদ্ধা হ'তে চায়।

অমিত সেনসেসানাল আরো একটা খবর দেয়। শুধু তাদের কলেজেই না, দেবারতির রিপোর্টগুলো আশেপাশের বহু স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য লোকজনকেও তোলপাড় ক'রে দিয়েছে। ঐ সব জায়গা থেকেও ছাত্ররা খুব শিগগিরই ধারাবনীতে চলে আসবে।

শুধু দেবারতিই না, রাজেশ্বর রাকেশ থেকে শুরু ক'রে অন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা প্রায় চমকে ওঠেন। চমকের যথেষ্ট কারণও আছে। একালের যুবক যুবতী সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যথেষ্ট ভাল নয়। মারদাঙ্গাওলা হিন্দি সিনেমা, ড্রাগ, চরম বেলেল্লাপনা, মদ, পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি, ইভ-টীজিং ইত্যাদি মিলিয়ে এক অন্ধকার বদ্ধজলায় ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে এরা। 'লস্ট জেনারেসান' ব'লে একটা কথা আছে। সম্ভবত এরাই সেই নষ্ট প্রজন্ম। এদের সামনে আলোকিত কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সততা, আদর্শবাদ, শালীনতা, ইত্যাদি শব্দগুলো এদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা কোনো বহু দূরবর্তী গ্রহের ব্যাপার—তাদের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন।

কিন্তু অমিতরা যা বলছে তাতে তাদের সম্পর্কে এতদিনের ধ্যানধারণা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। তবে কি এখনও পুরোপুরি হতাশ হওয়ার কারণ নেই? এই প্রজন্মের ওপর এখনও আস্থা রাখা যায়? অরুণরা তা হ'লে শেষ হ'য়ে যায়নি?

এবার রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা এত ছেলে একসঙ্গে এখানে এলে কী ক'রে?'

অমিতই জানায়, হাওয়েতে দূর পাল্লার লরি থামিয়ে থামিয়ে হিচ-হাইক করতে করতে তারা বড়ো রাস্তায় এসে নেমেছে। যারা আগে এসেছিল, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। পরে যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে ক'রে ধারাবনীর দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। সে জিজ্ঞেস করে, 'থানার সামনে আপনাদের পিকেটিং-এর কথা কাগজে পড়েছি। তা ছাড়া এই গাঁয়ে এসে অনেকেই আছেন। যা যা করছেন, আমরা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'দেখতে বা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে হ'লে তো তোমাদের এখানে থেকে যেতে হয়। অথচ বাড়তি জামাকাপড় বিছানা-টিছানা কিছুই আনোনি। অথচ এখানে—' রাকেশ বুঝিয়ে বলেন, তাঁরা কিভাবে খোলা আকাশের তলায় মাটিতে বিছানা পেতে রাত কাটান। এত কষ্ট সওয়া কি অমিতদের পক্ষে সম্ভব হবে?

অমিত বলে, 'আমরা আজ শুধু দেখতেই এসেছি। কিছুক্ষণ বাদে চলে যাব। পরে তৈরি হ'য়ে আসব।'

বেলা অনেকটা চড়ে গেছে। রোদের রং দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে সূর্য দ্রুত মাথার ওপর উঠে আসছে।

রাকেশ রাজেশ্বরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'এ বেলা কি আর গাঁয়ে যাওয়া হবে বাবুজি?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছিলেন রাজেশ্বর। বলেন, 'এখন থাক। বিকেলেই বেরুনো যাবে।'

রাকেশ অমিতকে বলেন, 'আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে হ'লে তোমাদের সেই বিকেল পর্যন্ত থাকতে হবে যে।'

অমিত বলে, 'থেকে যাব।'

'বেশ। আমাদের কোনোরকম আপত্তি নেই। তবে দেখছই তো, এখানে আরাম করার মতো কোনো ব্যবস্থাই নেই।' চারিদিকের ঝাঁকড়া গাছপালা দেখিয়ে রাকেশ বলেন, 'ঐ ছায়ায় গিয়ে ব'স। অন্তত মাথাটা বাঁচবে।'

ছেলেরা কথামতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব'সে পড়ে।

এবার রামেশ্বর দেবারতিকে বলেন, 'বহেনজি, আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।'

দেবারতি বলে, 'কষ্টের কী! বলুন না কী করতে হবে?'

'প্রথমে রাকেশজির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। তারপর একে একে ফ্রিডম-ফাইটারদের সঙ্গে।'

'অবশ্যই।'

রাকেশের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর রামেশ্বররা তিন সাংবাদিক প্রায় উচ্ছ্বসিতই হ'য়ে পড়েন। স্বাধীন ভারতে অ্যাডমিনিস্ট্রেসান থেকে পুলিশ, জুডিসিয়ারি প্রায় নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে, অন্তত সাধারণ মানুষজনের সেই রকমই অভিজ্ঞতা। সেখানে রাকেশের মতো একটি মানুষ সম্বন্ধে গর্ব করা যায়। এখনকার বেশির ভাগ ক্ষমতাবান লোকই, যাদের ভাল কিছু করার ক্ষমতা আছে, নিজেদের বিবেক এবং মনুষ্যত্বকে প্রায় বেচে দিয়েছে। অবশিষ্ট যারা, তারা এতই ভীরু যে অন্যায় কিছু দেখলেও চোখমুখ বুজে, কানে হাত চাপা দিয়ে থাকে। দুনিয়া রসাতলে যাক, কিন্তু আমি কিছু দেখব না, কিছু শুনব না, কিছু বলব না, প্রতিবাদের একটি আঙুলও তুলব না। এটাকেই তারা জীবনের সারাৎসার ক'রে বসেছে। রাকেশ যে তাদের থেকে একেবারে আলাদা সেটা প্রমাণিত। আর তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেসান এবং জুডিসিয়ারির ভিতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছেন, পাটনায় ব'সে এটা টের পেয়েছেন রামেশ্বররা। ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাকেশের দুঃসাহসী কাজে তাঁরা শুধু গৌরবই বোধ করেন নি, সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেন—খবরের কাগজ সব রকম সাহায্য তাঁকে দেবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর যে 'ক্রুসেড' তাতে তাঁর পাশে দাঁড়াবে।

কৃতজ্ঞ রাকেশ আলাদা আলাদা ভাবে সবার হাত ধ'রে বলেন, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সঙ্গে থাকলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যাবে।'

এরপর রাজেশ্বর থেকে শুরু ক'রে বাকি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় দেবারতি। রামেশ্বররা সসম্ভ্রমে বলেন, তাঁরা লিজেণ্ডের নায়ক, নমস্য মানুষ। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে রামেশ্বররা কৃতার্থ বোধ করছেন। এ তাঁদের অশেষ সৌভাগ্য।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন বিচিত্র এক আবেগ রামেশ্বরের ওপর ভর করে। দু হাত নেড়ে চিৎকার ক'রে তিনি অমিতদের ডাকতে থাকেন, 'এই ছেলেরা, এখানে এস।'

গাছতলা থেকে অমিতরা উঠে আসে। রামেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'এঁরা কারা জানো?'

অমিতরা বলে, 'হ্যাঁ।'

'ইতিহাসে ইংরেজ আমলে সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স, নন-কোঅপারেসান, ফোর্টি টু'র 'কুইট ইণ্ডিয়া' মুভমেণ্ট—এ সব নিশ্চয়ই পড়েছ?'

অমিত বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিস্ট্রি বইতে পড়েছি। তবে ডিটেল জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।'

রামেশ্বর বলেন, 'এঁরা সেই সব মুভমেণ্ট ক'রে বৃটিশ আমলে বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। আজ যে আমরা পরাধীন নই, তোমরা যে স্বাধীন দেশের মাটিতে জন্মাতে পেরেছ, সব এঁদের জন্যে।'

সসম্ভ্রমে যুবকেরা রাজেশ্বরদের দিকে তাকায়। অমিত বলে, 'আমাদের সৌভাগ্য ওঁদের দেখা পেলাম।'

ভিড়ের ভেতর থেকে অন্য এক যুবক রাজেশ্বরদের উদ্দেশে বলে ওঠে, 'বৃটিশ পীরিয়ডে আপনারা লড়াই করেছেন। আবার ফ্রি ইণ্ডিয়াতেও লড়তে হচ্ছে। দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে নেবেন।'

নতুন প্রজন্ম প্রাচীন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সহযোদ্ধা হ'তে যায়, এতে রাজেশ্বররা নতুন ক'রে আপ্লুত হ'ন। বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে পাওয়া তো আনন্দের ব্যাপার। তোমরা তখন বললে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'যখনই দরকার হবে, আমাদের সঙ্গে তোমাদের নেমে পড়তে হবে।'

স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা দুপুরে যে রান্নাবান্না করেন, তাই ভাগাভাগি ক'রে সবাই খায়। অমিতরা কিছুতেই খাবে না, যতই বলে খেয়ে এসেছে, কেউ তাদের কথায় কান দেন না। একরকম বাধ্য হ'য়েই তাদেরও একটু আধটু খেতে হয়।

তারপর বেলা পড়লে দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী রাজেশ্বররা গাঁয়ের মধ্যে যান। অমিতরাও তাঁদের সঙ্গী হয়। আনোখি আর ধনুয়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে সবার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

অন্য দিনের মতো আজকের দিনটাও পুরোপুরি নিষ্ফলা। ধারাবনীর বাসিন্দারা রাকেশদের কথা গভীর আগ্রহে শুনে যায় ঠিকই কিন্তু খুনীদের ব্যাপারে কেউ মুখ খোলে না।

কুঁদরীর সেই জবানবন্দির টেপও বাজানো হয়। শুধু আজই না, ক'দিন ধরেই ওটা বাজানো হচ্ছে। রাকেশদের কথা গাঁয়ের লোকেদের যত না নাড়া দেয় টেপটা তার চেয়েও অনেক বেশি বিচলিত ক'রে তোলে। তবু হত্যাকারীদের ব্যাপারে ভয় কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

রাকেশরা উত্তেজক কথা ব'লে ধারাবনীবাসীদের সাহস উসকে দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু আসল কাজটি হয় না।

ধনুয়া বা আনোখি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এবার ধনুয়া হাওয়ায় দুই হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার ক'রে ওঠে, 'ডরপোক কুত্তার দল। তোদের

গায়ে মানুষের খুন আছে, না মছলির খুন? তোমাদের ঘরবালী মা-বহেনদের ইজ্জত লুটে নিল ভূচ্চরের ছৌয়ারা আর তোরা কিনা দো-চারগো পাইসার জন্তে তাদেরই পা চাটছিস। থুক তোদের মুখে। থুঃ-থুঃ-থুঃ—' প্রবল ঘৃণায় তার মুখ কুঁচকে যায়। বার বার ধারাবনীবাসীদের দিকে থুতু ছুঁড়তে থাকে ধনুয়া। আর সেই থুতু কয়েকজনের গায়ে গিয়েও পড়ে।

ধনুয়ার মারমুখী চেহারা দেখে গাঁয়ের লোকজন ভীষণ ঘাবড়ে যায়। দু-একজন ভীরু গলায় তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে, 'গুসসা মাত কর ধনুয়া বেটা, গুস্‌সা মাত কর্‌।'

ধনুয়া শান্ত তো হয়ই না, আরো ক্ষেপে যায়। বলে, 'তোমাদের দো রোজ সময় দিলাম। এর ভেতর ঠিক ক'রে নিও, হত্যারাদের সম্বন্ধে মুখ খুলবে কিনা।'

ভয়ে ভয়ে সবাই বলে, 'ঠিক হ্যায়। আমরা নিজেদের ভেতর থোড়া বাতচিত ক'রে নিই।'

ধনুয়া তীক্ষ্ণ চোখে জনতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে রাকেশের উদ্দেশে বলেন, 'চলুন হুজৌর—'

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দলটাকে নিয়ে ফিরে যেতে যেতে রাকেশ নিচু গলায় তাঁর পার্শ্ববর্তিনী অর্থাৎ দেবারতিকে জিজ্ঞেস করেন, 'ধনুয়ার অ্যাপ্রোচ কেমন মনে হ'ল?'

দেবারতি বলে, 'এটাই কারেক্ট অ্যাপ্রোচ। ধনুয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া অন্য কিছু ওদের মাথায় ঢুকবে না।'

রাকেশ বলেন, 'এবার হয়ত কিছু রেজাল্ট পাওয়া যাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ধনুয়া এবং আনোখির ঘরের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ফিরে আসেন সবাই।

অমিতরা অবশ্য বসে না। সূর্য ডুবতে বসেছে দূরে গাছপালার আড়ালে। তারা জানায়, এবার তাদের ফিরে যেতে হবে।

রাজেশ্বর বলেন, 'হ্যাঁ, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

আবার তারা খুব তাড়াতাড়িই ধারাবনীতে আসবে, এই কথাটা আরো একবার জানিয়ে অমিতরা চলে যায়। কয়েক পা সবে তারা গেছে, হঠাৎ রাকেশের মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা পরিকল্পনা এসে যায়। তিনি ব্যস্তভাবে দ্রুত অমিতদের দিকে এগিয়ে যান, 'একটু দাঁড়িয়ে যাও।'

অমিতরা থেমে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবেন?'

'তোমাদের ধারাবনীতে আসার দরকার নেই।'

'তা হ'লে?'

কয়েক পলক চিন্তা ক'রে রাকেশ বলেন, 'যদি সম্ভব হয় পরশু বিকেলের দিকে দুধলিগঞ্জ থানায় আসতে পারবে?'

অমিত এক মুহূর্ত চিন্তা না ক'রেই উত্তর দেয়, 'পারব। ওখানে আমাদের কী করতে হবে?'

'পরশু দিনই জানতে পারবে। আরেকটা কথা, যত ছেলে পার সঙ্গে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা।' অমিতরা আর দাঁড়ায় না, কাচ্চীর ওপর দিয়ে দূরে মাঠের দিকে চলে যায়।

রাকেশরা ধীরে ধীরে ধনুয়ার ঘরের দাওয়ায় ফিরে এলে দেবারতি জিজ্ঞেস করে, 'ওদের থানার সামনে যেতে বললে যে?'

রাকেশের পরিকল্পনটা রাজেশ্বর ধরতে পেরেছিলেন। রাকেশ উত্তর দেওয়ার আগে তিনি বলে ওঠেন, 'ঠিকই করেছে। ওখানে অনেক বেশি লোকজন দরকার।'

সাতচল্লিশ

পরের দিনটাও সন্ধে পর্যন্ত পুরনো রুটিন অনুযায়ী কেটে যায়। নীট ফলাফল আগের মতোই, অর্থাৎ ধারাবনীবাসীরা এখনও মনস্থির ক'রে উঠতে পারেনি।

আজ দু বেলাই রাকেশদের সঙ্গে ধনুয়া আর আনোখি গাঁয়ের ভেতর পদযাত্রায় বেরিয়েছিল। আগের দিনের মতো ধারাবনীর তাবত মেয়ে এবং পুরুষকে তাদের ভীরুতার জন্য অকথ্য গালাগাল দিয়েছে ধনুয়া। দ্বিতীয়বার গাঁয়ে ঘোরার পর সূর্য যখন ডোবার মুখে গাঁয়ের ভেতর থেকে সবাই ফিরে এসেছে। কিন্তু ঘরের দাওয়ার বা সামনের ফাঁকা জায়গায় বসার আগেই দূরে জীপের আওয়াজ পাওয়া যায়।

সবাই অবাক হয়ে উত্তর দিকে তাকান। ঘন গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সত্যিই একটা জীপ দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা এবড়োখেবড়ো কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে টাল খেতে খেতে এগিয়ে আসছে।

জীপে ক'রে কে আসতে পারে? এখানে সবাই আসে পায়ে হেঁটে। শুধু

জয়েন্দ্র সাইকেলে ক'রে সকালের দিকে দেবারতির রিপোর্ট নিতে আসেন। কয়েকদিন আগে গিরিলালদের দুই বন্দুকবাজ ঘোড়ায় ক'রে দুপুরবেলায় ভাগবতদের শাসিয়ে গিয়েছিল, তারপর অবশ্য এখানে আসেনি। আর এসেছিল ভুনেশ্বর আর জগন্নাথলাল। তবে প্রায়ই রাত্রিবেলা ধারাবনী গাঁয়ের ভেতরে গিয়ে ওরা যে হাওয়ায় হাওয়ায় দম-চাপা ভয় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেটা দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে টের পাওয়া যায়।

আরো খানিকটা এগিয়ে এসে জীপ থেমে যায়। সেটা থেকে চারজন লোক নামে। তাদের একজন হ'ল চর্বির আস্ত একটি পাহাড়, পরনে দেহাতী ধরনের ফিনফিনে ধুতি আর কলিদার মলমলের পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা। দ্বিতীয় লোকটির গায়ে সৌখিন সাফারি স্যুট। তাঁরা রাজেশ্বরদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তাঁদের পেছনে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে আসছে অন্য লোক দু'টি। বয়স তিরিশের মধ্যে। তাদের পরনে ঢোলা প্যান্ট আর হাফ শার্ট। দু'জনেরই মাথায় কদম ছাঁট চুল। পুরু ঠোঁট, ভারী চোয়াল, উঁচু হনু আর শক্ত থুতনি, অসমান দাঁতের পাটি বুঝিয়ে দেয় তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুরতা রয়েছে। দু'জনেরই তাকানোর ভঙ্গি উগ্র এবং সতর্ক। প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো রয়েছে। বোঝা যায় তারা সশস্ত্র।

জীপে স্টিয়ারিং ধ'রে ড্রাইভার ব'সে আছে। সে নামে নি। চর্বির পাহাড় এবং সৌখিন লোকটিকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছেন রাকেশ আর দেবারতি— গিরিলাল এবং ত্রিলোকী। আনোখি, ধনুয়া এবং কুঁদরী তো তাঁদের জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে। রাকেশ আর দেবারতির স্নায়ুমণ্ডলে নিজেদের অজান্তেই ঝড় ব'য়ে যেতে থাকে। এত দিন বার বার লোক পাঠিয়েছেন গিরিলালেরা, নিজেরা কখনও আসেননি। আজ ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি, তাঁরা আসবেন। আচমকা এখানে, এইসময় কেন গিরিলালেরা হানা দিলেন, কী তাঁদের উদ্দেশ্য, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন রাকেশরা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

আরো খানিকটা এগিয়ে এসে হাত নেড়ে পেছনের জবরদস্ত চেহারার লোক দু'টিকে থামিয়ে দেন গিরিলালেরা। বোঝা যায়, ওরা তাঁদের পাহারাদার। এখানে এসে কী ধরনের ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, সঠিক আঁচ করতে না পেরে সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে এসেছেন। সাবধানের মার নেই।

গিরিলালেরা রাকেশদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। জোড়হাতে কোমরের ওপর দিকটা সমকোণে বাঁকিয়ে অতীব বশংবদ ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনাদের

সবাইকে প্রণাম, হাজারো প্রণাম—' বলতে বলতে শরীরটাকে ফের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে রাকেশ এবং দেবারতির উদ্দেশে বলেন, 'আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তবিয়ত আচ্ছা তো ?'

রাকেশ বা দেবারতির উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে গিরিলাল এবার রাজেশ্বরদের দিকে ফেরেন। হাতজোড় করাই আছে। মুখে বিগলিত একটি হাসি ফুটিয়ে বলেন, 'পহলে আমাদের পরিচয় দিই। আমরা বহুত ছোটা আদমী। আমি গিরিলাল, এখানে আমার থোড়াকুছ খেতিজমিন আছে। আর ইনি ত্রিলোকীজি, এই এলাকার জনসেবক—এম. এল. এ।'

রাজেশ্বর তীক্ষ্ণ চোখে গিরিলালদের লক্ষ করছিলেন। বলেন, 'আপনাদের নাম আগেই শুনেছি, চোখে দেখার সৌভাগ্য এই হ'ল।'

হঠাৎ প্রবল হিস্টিরিয়ার ঘোরেই যেন গিরিলাল আর ত্রিলোকী হাত এবং মাথা প্রবল বেগে নাড়তে থাকেন। গিরিলাল বলেন, 'সৌভাগ্য আমাদের। আমাদের বহুত 'পুণ', আপনাদের মতো দেশের মহান সন্তানেরা এখানে এসেছেন। এই জায়গা পবিত্র হ'য়ে গেছে।' তাঁর চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর থেকে ভক্তি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরতে থাকে।

ত্রিলোকী বলেন, 'লেকিন আমাদের মনে বড়ে কষ্ট হচ্ছে রাজেশ্বরজি—'

রাজেশ্বর বুঝতে পারেন তাঁদের সম্বন্ধে সব খবর আগেভাগেই যোগাড় করেছেন গিরিলালরা। সবাইকে আলাদা আলাদা ক'রেও চেনেন ওঁরা। খুব সম্ভব খবরের কাগজে দেবারতির রিপোর্টের সঙ্গে তাঁদের যে সব ছবি বেরিয়েছে সেগুলো ওঁরা বার বার দেখে স্মৃতিতে ধ'রে রেখেছেন। নইলে এভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হ'ত না।

রাজেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের কষ্ট ?'

ত্রিলোকী বলেন, 'তার আগে যদি হুকুম করেন ব'সে কথাবার্তা বলতে পারি।'

ত্রিলোকীরা যে অত্যন্ত চতুর এবং অবশ্যই তাঁদের যে কূট অভিসন্ধি রয়েছে সেটা তাঁদের দেখামাত্র টের পাওয়া গিয়েছিল। ওঁদের মতলবটা কী ধরনের এবং কতটা বিপজ্জনক সেটা আঁচ করা যাচ্ছে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুব সতর্কভাবে রাজেশ্বর বলেন, 'বসুন—'

রাজেশ্বররা সবাই বসার পর তবে ত্রিলোকীরা বসেন। গিরিলাল বলেন, 'আপনি একজন লিজেণ্ডারি ফিগার রাজেশ্বরজি। আমি যদিও পরাধীন ইণ্ডিয়ায় জন্মেছি, আপনারা যখন আজাদীর জন্যে লড়ছেন তখন আমি বহুত ছোট, তখনও

কিছু বোঝার সময় হয়নি। বড় হ'য়ে আমার দাদা আর বাবুজির মুখে আপনাদের লড়াইয়ের কথা শুনতাম আর গর্বে বুক ভ'রে উঠত। অ্যায়সা মহান—'

রাজেশ্বর গিরিলালকে শেষ করতে দেন না। হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আমার কথা থাক। আপনারা যে কারণে এসেছেন সেটা বললে খুশি হ'ব।'

এবার ত্রিলোকী মুখ খোলেন। লোকটি কথা বলেন কম, শোনেন বেশি। তাঁর চোখেমুখে চাপা ধূর্ততা।

ত্রিলোকী বলেন, 'আপনারা কখনও তো এখানে আসেন নি। কৃপা ক'রে যখন এসেই পড়েছেন তখন কৃতজ্ঞতা জানাবার একটা সুযোগ দিন।'

'কিসের কৃতজ্ঞতা ?' রাজেশ্বরকে রীতিমত অবাকই দেখায়।

'কান্ট্রির জন্যে এত করেছেন, আপনাদের জন্যে আজাদ ইণ্ডিয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা জন্মাতে পেরেছে, কৃতজ্ঞতা সেই কারণে। এর আগে আপনাদের দর্শনের আশায় ক'বার লোক পাঠিয়েছি, লেকিন আমাদের দুর্ভাগ্য, আপনাদের হুকুম পাইনি। তাই নিজেরাই ভয়ে ভয়ে চলে এলাম। কৃতজ্ঞতা না জানালে আমাদের অপরাধ থেকে যাবে।'

রাজেশ্বর খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন ভেতরে ভেতরে। এমন আশ্চর্য মসৃণ মুখে লোকটা চাটুকারিতা ক'রে চলেছে যে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে তাকে থামানো দরকার। রাজেশ্বর বলেন, 'বেশ, আপনার কৃতজ্ঞতার কথা জানতে পারলাম। এটাই কি আমাদের কাছে আসার কারণ ?'

'আর ছোটামোটা দু-একটা কথা আছে।'

এই ছোটোমোটা কথাগুলোই যে আসল এবং সেই কারণেই গিরিলালদের এখানে আবির্ভাব, সেটা সবাই আঁচ ক'রে নেন। কৃতজ্ঞতার ব্যাপারটা ভণিতা মাত্র। রাজেশ্বর বলেন, 'শোনা যাক আপনার ছোটামোটা কথা। একটু তাড়াতাড়ি শেষ করবেন। আমাদের অন্য জরুরি কাজ আছে।'

এবার গিরিলাল বলেন, 'কষ্ট ক'রে এতদূর যখন এসেছেন, আর চার মাইল আপনাদের যেতে হবে।'

'সেখানে কী ?'

'আমাদের গাঁও বারহৌলি।'

'বারহৌলিতে যাব কেন ?'

গিরিলাল বিনীতভাবে এবার তাঁদের প্রার্থনাটি জানান ঃ পুরনো স্বাধীনতা-সংগ্রামী—যাঁদের অবিচল নিষ্ঠা, আদর্শবাদ ও সর্বস্বত্যাগের বিনিময়ে দেশ

পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছে, ক'টা দিন তাঁদের কাছে পেতে চান ওঁরা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্য সেবা করতে পারলে কৃতার্থ হবেন, ইত্যাদি।

রামদয়াল রাজেশ্বরের ঠিক পাশেই ব'সে ছিলেন। বলেন, 'তার মানে আপনাদের বাড়ি আমাদের নিয়ে যেতে চান?'

ত্রিলোকী বলেন, 'হ্যাঁ। কৃপা ক'রে আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না।'

দেবারতির মাথায় হঠাৎ যেন খানিকটা দুষ্টুমি নেচে যায়। বড়ই ভালমানুষের মতো মুখ ক'রে সে বলে, 'শুধুই কি ওল্ড ফ্রিডম-ফাইটারদের ইনভাইট করছেন?'

ত্রিলোকী এবং গিরিলাল দু'জনেই হকচকিয়ে যান। এরকম একটা প্রশ্নের জন্য তাঁরা তৈরি ছিলেন না। গলা মিলিয়ে একসঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। মোস্ট ওয়েলকাম পত্রকারজি।'

দেবারতি পরমেশদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, 'এখানে আরো তিন পত্রকার রয়েছেন। ইনি হলেন—' পাটনার সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'এঁদের কী হবে?'

'আরে বাঃ, সাচ গ্রেট জার্নালিস্টস! এঁদেরও স্বাগত জানাচ্ছি। এত বড়ে বড়ে আদমীর মেহমানদারি করতে পারলে জীবন ধন্য হবে।'

'গিরিলালজি, ত্রিলোকীজি, আপনারা কিন্তু আরেকজনের সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। সেটা আমাদের পক্ষে ভীষণ এমব্যারাসিং।'

দেবারতির কৌতুক এবং দুষ্টুমি কোন দুর্জ্ঞেয় জটিল রাস্তায় চলেছে, ধরতে না পেরে শশব্যস্তে গিরিলালেরা ব'লে ওঠেন, 'কার সম্বন্ধে বলুন তো?'

দেবারতির নিরীহ মুখে সামান্য একটি ভাঁজও পড়ে না। অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই সে রাকেশকে দেখিয়ে বলে, 'এই এক্স ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের। ব্যাপারটা কী জানেন, আমরা যে এখানে এসে জড়ো হয়েছি সেটা তো এঁর জন্যেই। এঁকে বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে—'

ত্রিলোকী বলেন, 'বহুত তাজ্জবকা বাত। আপনি কী ক'রে ভাবলেন, অনারেবল রাকেশজিকে আমরা ইনভাইট করব না! সবাই স্বাগত, এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম—'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু—'

'আবার কী?'

'তারপরেও কিছু কথা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।'

রাজেশ্বররা বেশ একটু অবাকই হয়েছিলেন। তাঁরা গভীর বিস্ময়ে পলকহীন

দেবারতিকে লক্ষ করতে থাকেন। তবে রাকেশ খুব সম্ভব তার মনোভাব কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। ফুটিফাটা মজাদার হাসি ফুটিয়ে, ভুরু ঈষৎ কুঁচকে তিনি দেবারতিকে দেখতে থাকেন।

দেবারতি গিরিলাল আর ত্রিলোকী ছাড়া আর কারো দিকে তাকায় না। সে বলে, 'একটা মুশকিল যে হ'য়ে গেছে ত্রিলোকীজি, গিরিলালজি—'

ত্রিলোকীরা জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের মুশকিল?'

'আপনারা যে পারপাসে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছেন, সেটা সাকসেসফুল হবে না। এতগুলো লোককে ক'দিন দামী দামী খাবার খাওয়াবেন, আরামে রাখবেন, যত রকম ভাবে পারেন এণ্টারটেন করবেন। অকারণে কতগুলো টাকা নষ্ট হবে, অথচ আপনাদের প্ল্যান একেবারে ভেস্তে যাবে।'

ত্রিলোকী এবং গিরিলাল দু'জনেরই চোয়াল শক্ত হ'য়ে ওঠে। চোখের ভেতর থেকে আগুনের ফুলকির মতো কিছু একটা বেরুতে না বেরুতেই মিলিয়ে যায়। ত্রিলোকী উচ্চকিত ভঙ্গিতে বলেন, 'কিসের প্ল্যান শ্রীমতীজি? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' চোখে মুখে ক্ষণস্থায়ী যে পরিবর্তনটা দেখা দিয়েছিল, কণ্ঠস্বরে তার এতটুকু ছাপ পড়েনি।

দেবারতি বলে, 'প্ল্যানটা ভেরি সিম্পল। বাড়িতে পেয়ে সেবারের মতো ক্যামেরা থেকে ফিল্ম বের ক'রে নষ্ট করবেন আর টেপ মুছে দেবেন। সে সুযোগ এবার আর পাচ্ছেন না।' গলার স্বরে কোনোরকম নাটকীয়তা বা উত্তেজনা নেই দেবারতির। মুখের একটি রেখাও তার স্থানচ্যুত হয় না। এখানকার কোনো কিছুর সঙ্গে তার যেন কোনো সম্পর্ক নেই, এমন নিরাসক্তভাবে সে ব'লে যায়, 'তেমন কোনো সুযোগই আপনাদের দেওয়া হবে না। ইন ফ্যাক্ট এবার যে ছবি আমরা তুলেছি তার অনেকগুলো ক'রে প্রিণ্ট করিয়েছি। টেপও করা হয়েছে বেশ ক'টা করে। দু-একটা খোয়া গেলেও বাকিগুলো থেকে যাবে।'

ত্রিলোকী এবং গিরিলালকে খুবই দুঃখিত দেখায়। কাঁচুমাচু মুখে ত্রিলোকী বলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে বড় কষ্ট পেলাম বহেনজি। আমাদের তরফ থেকে একটা ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। সেটা আপনি মনে ক'রে রেখেছেন। লেকিন পাস্ট ইজ পাস্ট। উই ক্যান বী গুড ফ্রেণ্ডস।'

দেবারতি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন রাজেশ্বররা। ত্রিলোকীদের উদ্দেশে বলেন, 'অবশ্যই পারেন। কিন্তু তার আগে একটা কথার জবাব দিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্য।' ত্রিলোকী এবং গিরিলাল তটস্থ হওয়ার ভঙ্গিতে একসঙ্গে বলে ওঠেন।

'আমরা এখানে আর থানার সামনে ক'দিন ধরে পিকেট করছি, এটা নিশ্চয়ই আপনাদের লোকের কাছে খবর পেয়েছেন?' রাজেশ্বর বলেন।

এমন একটা প্রশ্ন খুব সম্ভব অভাবনীয়ই ছিল। ত্রিলোকী এবং গিরিলাল খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কী উত্তর দেবেন ভাবতে সময় লাগে। কিছুক্ষণ বাদে ত্রিলোকী বলেন, 'নেহী নেহী, ঠিক অ্যায়সা নেহী। মতলব ওরা বলছিল, আপনারা এসেছেন—'

'কেন এসেছি?' সোজাসুজি ত্রিলোকীর চোখের দিকে তাকান রাজেশ্বর।

ত্রিলোকীরা উত্তর দেন না।

রাজেশ্বর এবার বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তেই পারে। লেকিন এক শর্ত হ্যায়। যে খুনীদের ধরার জন্যে আমরা এখানে এসেছি, সেটা আগে হ'য়ে যাক। আপনারা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করুন। তা হ'লেই আপনারা যা চান তা-ই হবে।'

গিরিলাল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রাজেশ্বর ফের শুরু করেন, 'আপনারা হয়তো বলবেন এখানকার পুলিশ খুনীদের ধরেছে, কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি তারা আসল হত্যাকারী নয়।'

গিরিলাল এবং ত্রিলোকীর মুখচোখ থেকে বশংবদ দীনতা ধীরে ধীরে স'রে গিয়ে সমস্ত চেহারাটাই পাল্টে যায়। তাঁদের চোয়াল শক্ত হ'য়ে ওঠে। পলকহীন অনেকক্ষণ রাজেশ্বরদের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। তারপর ত্রিলোকী বলেন, 'আমরা আপনাদের সম্মান জানাতে এসেছিলাম। লেকিন আপনারা অন্য ব্যাপার নিয়ে এলেন। বহুত আপসোসকা বাত। আচ্ছা চলি। নমস্তে—' দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে গিরিলালকে সঙ্গে ক'রে দূরে গিয়ে জীপে ওঠেন। তাঁদের দুই পাহারাদারও পেছন পেছন গিয়ে উঠে পড়ে। একটু পর গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে গাছপালার আড়ালে উধাও হ'য়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রাজেশ্বর বলেন, 'লোকদুটোর সাহস দেখে অবাক হ'য়ে গেছি। নিজেরা যে এভাবে এসে হাজির হবে ভাবতে পারি নি।'

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ভেতর থেকে একজন ব'লে ওঠেন, 'এক হিসেবে ওরা এসে ভালই হয়েছে। এরপর আমাদের কাছে লোকও পাঠাবে না, নিজেরা এসে বিরক্তও করবে না।'

রাকেশ এবার মুখ খোলেন, 'চাচাজি, আপনি যা বলছেন তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? তোষামোদের রাস্তায় যখন কাজ হ'ল না তখন নিশ্চয়ই ওরা আমাদের বিপাকে ফেলার জন্য অন্য পথ ধরবে।'

'কি রকম?'

'ওরা কী টাইপের লোক তা তো জানেনই। নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্যে যত রকমের নোংরামি করা সম্ভব, ওরা করবে। আমাদের হুঁশিয়ার থাকা দরকার।'

রাজেশ্বর এতক্ষণ কিছু ভাবছিলেন। তাঁর কপালে গভীর রেখায় ভাঁজ পড়েছে। আস্তে আস্তে তিনি এবার বলেন, 'আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

রাকেশ বাবার মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকান।

রাজেশ্বর বলেন, 'ওরা নতুন কিছু করার আগে আমাদের দিক থেকে আরো প্রেসার দিতে হবে। শুধু এই গাঁয়ে বা থানার সামনে ব'সে থাকলেই চলবে না। আরো অ্যাগ্রেসিভ কিছু করা দরকার।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী ধরনের অ্যাগ্রেসিভ? এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ বাবুজি?'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে দেন রাজেশ্বর।

কেউ কোনো প্রশ্ন করেন না। শুধু স্থির চোখে রাজেশ্বরকে লক্ষ করতে থাকেন। তাঁদের তাকানোর মধ্যে কৌতূহল তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে মিশে আছে চাপা উত্তেজনা।

রাজেশ্বর সবার উদ্দেশে বলেন, 'ব্যাপারটা নতুন কিছু না। রাকেশ এই ছকটা আগেই ভেবেছিল। সেটা এখন কাজে লাগাতে হবে। আর দেরি করা উচিত হবে না।' ভবিষ্যৎ কর্মসূচি পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেন তিনি। কাল থেকেই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গিয়ে ডি. এম এবং এস. পি'র অফিসের সামনে বসে অবস্থান, সত্যাগ্রহ এবং স্ট্রিট কর্ণার মীটিং শুরু করতে হবে। পুলিশ এবং প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করতে না পারলে কারো কানে জল ঢুকবে না। আসলে সব দিক থেকেই ঝাঁকানিটা খুব জরুরি। ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গিয়ে কারা ডি. এম-এর আর কারা এস. পি'র অফিসের সামনে আন্দোলন করবে তারও একটা তালিকা তৈরি ক'রে ফেলা হয়।

আটচল্লিশ

রাকেশ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিয়ে আজ সকালে ডিস্ট্রিক্ট টাউনে চলে যাবেন। তাঁরা পিকেটিং শুরু করবেন ডি. এম.-এর অফিসের সামনে। জনেশ্বর তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন। হীরালালজিও আরো কয়েকজনকে নিয়ে ওখানেই যাবেন। এস. পি'র অফিসের সামনে পিকেটিং করার দায়িত্ব তাঁদের। ওদের সঙ্গে দু'জন সাংবাদিকও যাবেন—পরমেশ আর দেবারতি।

ভোর হ'তে না হ'তেই রাকেশরা স্নানটান সেরে চা এবং বাসি রুটি খেয়ে নিজের নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিয়েছেন। রোদ চড়ার আগেই তাঁদের বেরিয়ে পড়তে হবে। ডিস্ট্রিক্ট টাউন এখান থেকে কম ক'রে সত্তর আশি মাইল। টানা মাঠ পেরিয়ে হাইওয়েতে গিয়ে বাস ধরতে হবে। পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর বারোটা একটার আগে নয়।

ওঁরা বেরুতে যাবেন, সাইকেলের চাকায় ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ তুলে রোজকার নিয়মে জয়েন্দ্র এসে হাজির। সাইকেলটা খানিক দূরে একটা পিপর গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে রাকেশদের কাছে গিয়ে বেশ অবাকই হ'য়ে যান। বলেন, 'একি, তোমরা এই সকালবেলা মিছিল ক'রে চললে কোথায় ?'

আগের রাত্তিরে যে নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেটা জয়েন্দ্রকে জানানো সম্ভব হয় নি। কেননা তিনি আসেন সকালের দিকে।

কোথায় কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, সেটা জানিয়ে রাকেশ বলেন, 'নতুন স্ট্র্যাটেজি না নিয়ে উপায় ছিল না।'

'ভেরি ভেরি গুড ডিসিসান। লেকিন এই স্ট্র্যাটেজি আরো আগে নিলে ভাল হ'ত।'

'এ কথা বলছেন ?'

'কাল রাতে আমাদের ওপর অ্যাটাক হয়েছিল।'

সবাই চমকে ওঠেন। রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'অ্যাটাক মানে ? কারা করল ?'

জয়েন্দ্র বলেন, 'অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। তবে কারা করতে পারে, বুঝতেই পারছ।'

এবার নানা দিক থেকে সবাই উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করতে থাকেন। উত্তরে জয়েন্দ্র যা বলেন তা এইরকম। কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তাঁরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। মাঝরাতে ঘন অন্ধকারে ঝিঁঝির বিলাপ ছাড়া যখন আর কোনো শব্দ নেই, সেই সময় ঘুমন্ত জয়েন্দ্রদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বড় বড় ইট আর পাথরের টুকরো পড়তে থাকে। সকলে ধড়মড় ক'রে উঠে আলোটালো জ্বালাতেই অন্ধকারে

আবছা মূর্তির মতো অনেকগুলো লোককে হাইওয়ের দিকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। হই চই করতে করতে তাদের তাড়া ক'রে যান জয়েন্দ্ররা। কিন্তু কাউকেই ধরা যায় নি।

রাজেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কারো চোট টোট লাগে নি তো?' তাঁর গলায় এবং চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠা।

'হ্যাঁ। জয়পালজির মাথা ফেটে গেছে। আর মহাদেওজি চোট পেয়েছেন পায়ে। মহাদেওজির চোটটা বেশি না, তবে জয়পালজিকে আজ সকালে নৌহরপুরের হেল্‌থ সেণ্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাথায় শেলাই করতে হবে।'

'আজই ফিরে আসছেন তো ওঁরা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সামতক জরুর ফিরবেন। মহাদেওজি যেতেই চাইছিলেন না, আমরা জোর জবরদস্তি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ভাল করেছেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাকেশ বলেন, 'গিরিলালরা শেষ পর্যন্ত নোংরামিই শুরু ক'রে দিল! আমাদের এখন থেকে আরো হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

জয়েন্দ্র জানান, আজ রাত থেকে তাঁরা কেউ আর একসঙ্গে ঘুমোবেন না। পালা ক'রে রাত জাগবেন। কেননা, গিরিলালদের ফিরিয়ে দেওয়ার পর ওরা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। নানা দিক থেকে এবার তারা আক্রমণ করতে থাকবে। গিরিলালরা যে টাইপের লোক তাতে রাকেশ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ঠেকাবার জন্য যতটা নিচে নামা সম্ভব ওরা নামবে।

রাকেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। বলেন, 'ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা চাচাজি—'

'বল।'

'এ রকম একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল, থানায় জানানো হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। কাল রাতেই জানিয়েছি। দু-তিনটে কনস্টেবল বন্দুক ঘাড়ে ক'রে হাইওয়ের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে খোঁজাখুজিও করেছে কিন্তু কাউকে ধরতে পারে নি।'

'ডায়েরি করেছেন?'

'হ্যাঁ। তবে—'

'কী?'

'ওতে লাভ কিছুই হবে না। পুলিশ আর বদমাসদের মধ্যে যেখানে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং সেখানে কেউ কোনোদিন ধরা পড়বে, এমন আশা করি না।'

রাকেশ উত্তর দেন না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন শুধু।

জয়েন্দ্র সকালে এসে বেশিক্ষণ বসেন না। মিনিট পনের কুড়ি জিরিয়ে, দেবারতির রিপোর্টটা নিয়ে সাইকেলে উঠে পড়েন। আজও তার হেরফের হ'ল না। খানিক পরে হাত বাড়িয়ে দেবারতিকে বলেন, 'তোমার লেখাটা দাও বেটা।'

দেবারতি আজ আর কিছু লিখে রাখে নি। কেননা, লেখার মতো তেমন কোনো ঘটনা ধারাবনীতে ঘটে নি। যদিও গিরিলাল এবং ত্রিলোকী নিজের থেকে এসেছিলেন, কিছু কথাবার্তাও ব'লে গেছেন কিন্তু তা নিয়ে খবরের কাগজের 'স্টোরি' হয় না। তা ছাড়া অন্যান্য যা কিছু ঘটেছে সবই রুটিন ব্যাপার।

দেবারতি বলে, 'আজ পাঠাবার মতো কিছু নেই। শুধু শুধু কষ্ট ক'রে আপনাকে এতটা আসতে হ'ল।'

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে এবড়ো খেবড়ো মাঠের ওপর মাইল চার-পাঁচেক সাইকেল চালানোর ধকল প্রায় তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দেন জয়েন্দ্র। বলেন, 'ও কিছু না। কিন্তু একটা প্রবলেম হ'ল যে বেটা—'

'কিসের প্রবলেম?'

'তোমরা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে চললে। কাল থেকে তোমার খবর পাঠাবার কী ব্যবস্থা হবে?'

দেবারতি জানায়, জয়েন্দ্রর আর রিপোর্ট যোগাড় করার জন্য ধারাবনীতে আসার দরকার নেই। কেননা ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে সে নিজেই নিউজ ডেসপাচ করতে পারবে।

মজার গলায় জয়েন্দ্র বলেন, 'আমার নৌকরিটা গেল!'

দেবারতি একই সুরে বলে ওঠে, 'বিনা মাইনের নৌকরি।'

'যা বলেছ!'

আধ ঘণ্টা বাদে রাকেশরা বেরিয়ে পড়েন। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জনের একটি বিশাল দল। জয়েন্দ্র সাইকেল ঠেলে ঠেলে ওঁদের পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন।

হীরালাল বলেন, 'বাহন থাকতে তুমি কষ্ট করছ কেন? সাইকেলে উঠে পড়।'

জয়েন্দ্র কুণ্ঠিত মুখে বলেন, 'তোমরা পায়দল যাবে আর আমি সাইকেলে চড়ে আরামসে চলে যাব—খুব খারাপ দেখায়।'

'তা হ'লে আর কী করা! রোদে বেগুন পোড়া হ'তে হ'তে চল।'

সাংবাদিক পরমেশ অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন, 'একটা ব্যাপার কি আপনারা ভেবে দেখেছেন?'

সবাই মুখ ফিরিয়ে পরমেশের দিকে তাকান, 'কী ব্যাপার?'

'আপনাদের একটা গ্রুপ থাকছে ধারাবনীতে, একটা গ্রুপ থানার সামনে, আর দু'টো গ্রুপ ডিস্ট্রিক্ট টাউনে। ধারাবনী থেকে থানার ডিসটান্স বেশি না, সাইকেলে বিশ পঁচিশ মিনিটে পৌঁছুনো যায়। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট টাউন এখান থেকে সত্তর আশি মাইল। চার জায়গায় কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে অন্যেরা জানবেন কী ক'রে? নিজেদের মধ্যে কো-অর্ডিনেশান আর যোগাযোগ থাকাটা কিন্তু খুব জরুরি।'

বিষয়টা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে সকলে একমত হ'য়ে যান।

পরমেশ জিজ্ঞেস করেন, 'হয়ত এমার্জেন্সি এমন কিছু ঘটতে পারে, আমার ধারণা ঘটবেই—আর তেমন হ'লে সঙ্গে সঙ্গে কোনো ডিসিসান নিতে হ'তে পারে। তখন? আই মীন, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে না পারলে তো কিছুই করা যাবে না।'

'রাইট, রাইট।'

'তাই বলছিলাম নিজেদের ভেতর কনট্যাক্টটা কিভাবে রাখবেন?'

এ যোগাযোগের ব্যাপারটা আগে কেউ ভেবে দেখেন নি। সবাইকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত দেখায়।

জয়েন্দ্র বলেন, 'কোই সমস্যা নেহী। আমার সাইকেল আছে। রোজ না পারলেও একদিন পর পর ধারাবনী আর ডিস্ট্রিক্ট টাউনে টহল দিতে পারব।'

হীরালাল প্রায় ধমকে ওঠেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে জয়েন্দ্র? বয়েসটা কত হ'ল?'

মনে মনে কিছুক্ষণ হিসেব ক'রে জয়েন্দ্র রগড়ের গলায় বলেন, 'বার্থ ডেট মিলিয়ে ধরলে সত্তর সাল আট মাহিনা। তবে শরীরে আর মনে এখনও যা তাগদ রয়েছে তাতে মনে হয় চাল্লিশ সাল পুরা হয় নি।'

'আমার তো নিজেকে বিশ বছরের জোয়ান মনে হয়। লেকিন ভুলে যেও না, আসল বয়েসটাকে যতই গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই না, সেটা ঘাড়ের ওপর চেপে ব'সেই আছে। সত্তর বছরের এক বুড্ঢা কিনা এই গরমে দিনে কমসে কম দেড়শ মাইল সাইকেল চালাবে! মাথা থেকে ও সব চিন্তা বের ক'রে দাও। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া ভাই। লেকিন প্রবলেমকা সমাধান ক্যায়সে হোগা ?'

গোটা দলটার ডান ধারে ছিলেন রাকেশ। কিছু ভাবছিলেন তিনি। এবার বলেন, 'চিন্তা করবেন না চাচাজি, সমাধানের ব্যবস্থা একটা হ'য়ে যাবে।'

হীরালাল জিজ্ঞেস করেন, 'কিভাবে ?'

রাকেশ বলেন, 'ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গিয়ে আমার চেনা একটা গ্যারেজ থেকে জীপ ভাড়া ক'রে ফেলব। সেটা তিন জায়গায় ঘুরে ঘুরে খবর দেয়া নেয়া করবে। কি, এই অ্যারেঞ্জমেণ্টটা ভাল হবে না ?'

'তা তো হবে কিন্তু একটা গাড়ি ভাড়া নেওয়া, তার তেলের দাম, ড্রাইভারের মজুরি—সব মিলিয়ে বেশ খরচ। এত টাকা—' স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত দিয়ে থেমে যান হীরালাল।

রাকেশ এবার ব'লে ওঠেন, 'ড্রাইভারের মজুরিটা বাদ দিয়ে খরচের হিসেব করতে পারেন।

বেশ অবাক হ'য়েই হীরালাল জিজ্ঞেস করেন, 'মতলব ?'

রাকেশ বলেন, 'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। আর ড্রাইভিংটা করতে ভালও লাগে। ওটা আমার প্যাসানই বলতে পারেন।'

হীরালাল বলেন, 'যাক, খরচ খানিকটা কমল কিন্তু তারপরও তো—'

রাকেশ হীরালালকে শেষ করতে দেন না। তার আগেই বলেন, 'ব্যাঙ্কে আমার হাজার কয়েক টাকা জমেছে। জীপের ভাড়ায় আর পেট্রোলে কত আর খরচ হবে! এ নিয়ে ভাববেন না চাচাজি।'

'নৌকরি ছেড়ে দিলে। জমানো যা দু-চার পয়সা ছিল তাও এভাবে খরচ ক'রে ফেলবে!'

তাঁর জন্য এই প্রাচীন মানুষটির দুশ্চিন্তা যে যথেষ্টই আন্তরিক, সেটা খুব ভাল লাগে রাকেশের। তিনি বলেন, 'চাচাজি, একটা বড় কাজে আমরা নেমেছি। এর জন্যে যদি কিছু খরচ হয় তো হবে। এখন টাকাপয়সার হিসেব নিয়ে বসলে কি চলে ? কাজটা শেষ করাই আসল ব্যাপার।'

হীরালাল আর কিছু বলেন না।

সূর্য আকাশের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। তার তেজ এখন অনেকটা বেড়েছে। কিছুক্ষণ আগে ঝিরঝিরে বাতাস ছিল বেশ আরামদায়ক। ক্রমশ হাওয়া গরম হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে। রোদের যা চেহারা তাতে ঘণ্টাখানেকের ভেতর লু বইতে শুরু করবে।

উনপঞ্চাশ

হাইওয়েতে এসে জয়েন্দ্র আর দাঁড়ান না। এতক্ষণ সবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলেন। এবার সাইকেলে উঠে থানার দিকে চলে যান।

মিনিট পনের অপেক্ষা করার পর দূর পাল্লার বাস আসে। কিন্তু এত ভিড় যে এক বাসে রাকেশদের সকলের জায়গা হয় না। কোনোরকমে বিশ বাইশ জন ঠেলাঠেলি ক'রে উঠতে পারেন। অন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকেন। রাকেশরা জানিয়ে দেন, তাঁরা জেলা শহরে পৌঁছে বাস গুমটিতে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

এই রাস্তায় কয়েক মিনিট পর পর লং ডিসটান্স রুটের বাসের যাতায়াত। সব বাসই ডিস্ট্রিক্ট টাউন ছুঁয়ে আরো দক্ষিণে চলে যায়। কাজেই এক বাসে না হ'লেও বাকিরা ভাগে ভাগে আসতে পারবেন।

প্রথম বাসটায় উঠেছিলেন রাকেশরা। ডিস্ট্রিক্ট টাউনে পৌঁছে তাঁরা বাস গুমটিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। আধ ঘণ্টার ভেতর আরো দুই বাসে বাকি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চলে আসেন।

বিহারের মফঃস্বল শহর যেমন হয়, এই ডিস্ট্রিক্ট টাউনটা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। চওড়া চওড়া গোটকয়েক পীচের রাস্তা বাদ দিলে বাকি সব রাস্তাই কাঁচা, সেগুলোর ওপর কিছু খোয়া ছড়ানো। প্রতিটি রাস্তার দু'ধারেই ছিরিছাঁদহীন বেঢপ বাড়িঘর। বেশির ভাগই টালি বা টিনের চালা। ফাঁকে ফাঁকে আচমকা ঝকঝকে চেহারার দোতলা বা তেতলা বাড়ি। এছাড়া রয়েছে তিন চার ফুট চওড়া কাঁচা নর্দমায় দুর্গন্ধওলা থকথকে স্রোত, তার ওপর দিনের বেলাতেই কয়েক কোটি মশা ভনভন করতে থাকে। আর আছে অগুণতি ধর্মের ষাঁড়, পঞ্চাশ হাত দূরে দূরে রামসীতা বা বজরঙ্গবলীর মন্দির, গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি, অজস্র সাইকেল রিকশা, টাঙ্গা, অটো, কিছু জীপ আর প্রাইভেট কার, ট্রাক, ইত্যাদি।

রাস্তায় সারাক্ষণ দশ ফুট উঁচু পর্যন্ত ধুলো উড়তে থাকে। আর আছে গোটা চারেক সিনেমা হল, আর লাউডস্পিকারের দোকান। এই দোকানগুলোতে দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত একাগ্র নিষ্ঠায় মাইকে হিন্দি ছবির গান বাজানো হয়।

এই শহরের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হেলথ সেণ্টার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

শহরের অন্য একটা দিকও রয়েছে। সেটা তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন। সেখানে ডি. এম, এস. পি ইত্যাদি বড় বড় সরকারি কর্তাদের অফিস, বাংলো, আদালত

ইত্যাদি। সেটাই এই শহরের সবচেয়ে দামী এবং জমজমাট এলাকা। জেলার বহু মানুষকেই রোজ এখানে ধরনা দিতে হয়।

মিউনিসিপ্যালিটি একটা অবশ্যই আছে এ শহরে। তার অস্তিত্ব দু বছর পর পর আচমকা টের পাওয়া যায়। কেননা পুরো চব্বিশটি মাস কাটার পর দ্বিবার্ষিক শ্রাদ্ধের মতো এখানকার পৌর নিগমের নির্বাচন আসে। তখন রাতারাতি রাস্তায় পীচ এবং পাথরকুচি পড়ে, কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে দুটো রোড রোলার বেরিয়ে আসে। দু বছর যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক আউটের পর রাস্তার আলোগুলো হঠাৎ কোনো যাদুতে টিম টিম ক'রে জ্বলতে থাকে। হেলথ সেণ্টার, হাসপাতাল প্রাইমারি স্কুলের হতচ্ছাড়া চেহারার বাড়িগুলোতে চুনকাম শুরু হ'য়ে যায়, কাঁচা নর্দমাগুলোতে মশা-মারা তেল ছড়ানো হয়। ক্যণ্ডিডেটদের চুনাও-সেনারা মাইকে স্লোগান দিতে দিতে গলায় রক্ত তুলে ফেলে।

কিন্তু এখন চুনাও-এর মরশুম নয়। তবু ধুলো, মশা, দুর্গন্ধ, ভাঙাচোরা পথ, বাড়িঘরের নোংরা দেওয়াল, চিৎকার, হই চই ইত্যাদি ব্যাপারে নরক একেবারে গুলজার হ'য়ে আছে।

সন্ধে হ'য়ে আসছিল।

এই গরমকালে সূর্যোদয় যত তাড়াতাড়ি হয়, সূর্যাস্ত ঠিক ততটাই বিলম্বিত। পশ্চিম আকাশের গায়ে হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মতো এখনও মলিন একটু রক্তাভা লেগে রয়েছে।

বাস গুমটিতে প্রচুর লোকজন। অনবরত উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে একের পর এক বাস এসে থামছে। এবং কিছু যাত্রী নামিয়ে কিছু তুলে কয়েক মিনিট পর পর চলে যাচ্ছে।

রাকেশরা একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হীরালাল জিজ্ঞেস করেন, 'রাকেশ, এবার আমাদের করণীয় কী? কোন দিকে যেতে হবে?'

রাকেশের কাছে এই ডিস্ট্রিক্ট টাউন নিজের কররেখার মতোই পরিচিত। অজস্র বার কাজের খাতিরে তাঁকে এখানে আসতে হয়েছে। এই শহরের গলিঘুঁজি, রাস্তাঘাট, মন্দির মঠ, অফিস আদালত, সব তাঁর মুখস্থ। এখানে ডিস্ট্রিক্ট জজ হেমবতীনন্দন আছেন, তাঁর পরিচিত এস. পি জগমোহন শাস্ত্রী আছেন। ডি. এমও তাঁর অচেনা নন। হেমবতীনন্দনকে বাদ দিলে এস. পি'র আর ডি. এম-এর বাংলো বা অফিসের সামনে তাঁরা দিবারাত্রি ব'সে থেকে আন্দোলন করবেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত নেমে যাবে। আজ ক্লান্ত শরীরে কিছু করার দরকার নেই। যা করার কাল সকালে শুরু করা যাবে। এই কথাটাই জানিয়ে দেন রাকেশ।

হীরালাল বলেন, 'সেটা ঠিক আছে। কিন্তু রাতটা তো কোথাও কাটাতে হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে রাকেশ বলেন, 'এখানে ধর্মশালা আছে। আমরা একটা রাতের জন্যে সেখানে শেলটার নিতে পারি।'

জনেশ্বর বলেন, 'ফের সকালে উঠে সেই ছোটাছুটি করতে হবে। তার চেয়ে বরং ডি. এম-এর অফিসের সামনে গিয়ে সবাই খেয়ে দেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়ি। কাল থেকে ওখানেই তো আন্দোলন করতে হবে।'

প্রবোধকান্ত বলেন, 'এস. পি'র অফিসের সামনেও তো পিকেট করার প্রোগ্রাম আছে। তার কী হবে?'

রাকেশ জানান, ডি. এম-এর অফিস থেকে এস. পি'র অফিস খুব কাছেই, হু'শ গজের মধ্যে। যাঁদের ওখানে অ্যাজিটেসন করার কথা তাঁদের পক্ষে সকালে চলে যেতে অসুবিধা হবে না। অল্প দূরত্বে থেকে দুটো দল আন্দোলন চালাতে পারবেন।

সকলেই এতে সায় দেন, 'সেই ভাল।'

বাস গুমটি থেকে ডি. এম-এর অফিসের দূরত্ব মাইল দেড়েক। রাকেশরা যখন সেখানে পৌঁছন, সন্ধে নেমে গেছে। অঞ্চলটা এখন প্রায় ফাঁকাই। কিছুক্ষণ আগে এখানকার সব অফিস আর আদালত ছুটি হ'য়ে গেছে। এটা রেসি-ডেন্সিয়াল এরীয়া নয়। ফলে কাজকর্ম চুকে যাওয়ার পর লোকজনের এখানে পড়ে থাকার গরজ নেই। শুধু নানা অফিসের দারোয়ান বা ক্লাস ফোর স্টাফের সামান্য কিছু এমপ্লয়ী অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। অফিসের হাতার মধ্যেই তাদের কোয়ার্টার। এরা ছাড়া আর আছে কিছু দোকানপাট—কোনোটা পান বিড়ির, কোনোটা খাবারদাবারের। দু-একটা হোটেলও রয়েছে। দিনের বেলা দোকান বা হোটেলগুলোতে ভনভনে মাছের মতো ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু সন্ধের পর সেখানে কচিৎ দু-একটি খদ্দের চোখে পড়ে। সারাদিন একটানা হই চই-এর পর গোটা এলাকাটা জুড়ে এখন ঢিলেঢালা আলস্য। পাড়াটা যেন ঝিমুচ্ছে।

ডি. এম-এর অফিসে তালা পড়ে গেছে অনেক আগেই। গেটের সামনে দুই

বন্দুকধারী দারোয়ান টুলের ওপর বসে হাতের চেটোতে খৈনি ডলতে ডলতে 'গপসপ' করছিল।

সামনের রাস্তায়, কী আশ্চর্য, কাছাকাছি মিউনিসিপ্যাল ইলেকসান না থাকা সত্ত্বেও টিমটিম ক'রে আলো জ্বলছিল। খুব সম্ভব ডি. এম, এস. পি বা ডিস্ট্রিক জজের সম্মানার্থেই কিংবা তাঁদের ভয়ে।

রাস্তার ওধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর একটি পার্ক। সবুজ ঘাস ছাড়াও সেখানে দুষ্প্রাপ্য কিছু গাছ আর ফুলের বাগানও রয়েছে। এমন একটা ধুলোয়-ভরা নোংরা শহরে এরকম পরিচ্ছন্ন পার্ক ভাবাই যায় না। আর কেউ না জানলেও রাকেশ জানেন ডি. এম রাজেন্দ্র বাজপেয়ী প্রকৃতিপ্রেমিক, ফুলফল গাছপালার প্রতি তাঁর গভীর মমতা। যখন এই শহরের চারিদিকের শ্যামলিমা ধ্বংস ক'রে বাড়িঘর উঠছে, তার মাঝখানে এরকম একটি পার্ক যে টিকে থাকতে পেরেছে তার কারণ রাজেন্দ্রজি। মালী থাকলেও কখনও কখনও সময় পেলে তিনি নিজের হাতে পার্কটির পরিচর্যা ক'রে থাকেন।

রাকেশরা পার্কের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিলেন। হই হই ক'রে ডি. এম-এর অফিসের সেই আর্মড গার্ড দু'টো দৌড়ে আসে। বলে, 'উহাঁ ঘুসনা মানা হ্যায়।'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন ?'

'ডি. এম সাব গুস্‌সা হোগা।'

অনেকটা পথ হাঁটা এবং সত্তর পঁচাত্তর মাইল ভিড়ের বাসে গাদাগাদি ক'রে আসার ধকলে অনেকেরই এখন মেজাজ ঠিক নেই। একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী জানতে চান, পার্কটা ডি. এম-এর নিজস্ব সম্পত্তি কিনা।

পাহারাদার দু'জনের এ জাতীয় মন্তব্যে মেজাজ চড়ে যেতে পারত। চড়ে নি যে, তার কারণ তারা ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তারা শুধু জানায়, পরম যত্নে গড়ে তোলা পার্কটির ক্ষতি হ'লে ডি. এম শুধু অসন্তুষ্টই হবেন, এমন কি এই কারণে তাদের নৌকরির হাল খারাপ হ'য়ে যাবে।

রাত কাটালে পার্কের ঘাস অবশ্যই নষ্ট হবে। তা ছাড়া একটা রাত হ'লেও না হয় কথা ছিল, ক'দিন এখানে আন্দোলন করতে হবে কে জানে। ঐ স্বাধীনতা-সংগ্রামীটি পাহারাদারদের অসহায়তার কথা বুঝতে পারেন। তিনি আর এ বিষয়ে কিছু বলেন না।

জনেশ্বর বলেন, 'দারোয়ানজিরা ঘাবড়াবেন না। আমরা পার্কে ঢুকছি না।' পার্ক আর ডি. এম অফিসের মধ্যবর্তী রাস্তাটা বেশ চওড়া। পার্কের ধার ঘেঁষে খানিকটা দখল করলেও গাড়িটাড়ি চলাচলে কোনোরকম অসুবিধা হওয়ার কথা

নয়। জনেশ্বর পার্কের দিকটা দেখিয়ে বলেন, 'আমরা এখানেই তা হ'লে ঘাঁটি গাড়ি—না কি বল?'

সবাই প্রায় সমস্বরে ব'লে ওঠেন, 'পথই ভাল।'

রাকেশরা যে যার মালপত্র নামিয়ে তার ওপর ব'সে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেন। এর মধ্যেই কথাবার্তা চলতে থাকে।

পরমেশ বলেন, 'একটু স্নান ক'রে নিতে পারলে ভাল লাগত। ধুলোয় বালিতে আর ঘামে গা চটপট করছে।'

সেই দুই পাহারাদার এক ধারে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে রাতের আগন্তুকদের দেখছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার অর্থাৎ খৈনি ডলাটি পর্যন্ত তারা এই মুহূর্তে স্থগিত রেখেছে, কিংবা সেটার কথা হয়ত মনেও নেই। জনেশ্বর তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'দারোয়ানজি, কাছাকাছি কোনো তালাও আছে?'

পাহারাদাররা জানায়, তালাও অবশ্যই আছে, তবে সেটা খুব 'নজদিগ' নয়, সামনের রাস্তা ধ'রে দক্ষিণে কমসে কম দু 'রশি' হাঁটতে হবে। তবে যে সুখবরটি পাওয়া যায় তা হ'ল সেই তালাওতে এখানকার সব থেকে বড় জমিমালিক মনমোহন সিং পুরুষ এবং জেনানাদের স্নানের জন্য আলাদা আলাদা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন।

কয়েকজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী একসঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'চমৎকার। চল সবাই, নাহানা চুকিয়ে আসি।'

বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতূহলও বোধ করছিল দুই পাহারাদার। এই আগন্তুকেরা যে খুব সামান্য মানুষ নন সেটা তাঁদের চালচলন, চেহারা এবং কথাবার্তা শুনে টের পাওয়া গেছে।

এক পাহারাদার প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল জনেশ্বরদের। সে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'হুকুম হো যায় তো এক বাত কহুঙ্গা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না।'

'আমাদের অফিসের পেছনে এক টিউকল হ্যায়, বাথরুম ভি হ্যায়। নাহানা করনা চাহে তো উঁহা যা সাকতা। আইয়ে—'

সকলেই খুব খুশি। অন্তত স্নানের জন্য ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে দু 'রশি' ক'রে চার 'রশি' পথ কাউকে তালাওতে যেতে হবে না। অযাচিত এই সাহায্যের জন্য তাঁরা পাহারাদারটিকে কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবেন, হঠাৎ রাকেশ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের কি ডি. এম অফিসের ভেতর নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?'

পাহারাদারেরা হকচকিয়ে যায়, 'এ কথা বলছেন যে?'

'আমরা কেন এখানে এসেছি, আপনারা জানেন?'

'নেহী।'

একটু চুপচাপ।

তারপর এক পাহারাদার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, 'কেন এসেছেন?'

রাকেশ বলেন, 'সেটা এখন বলা যাবে না। ডি. এম সাহেবকেই কাল জানাব। আর—'

'আর কী?'

'আমরা তালাও থেকেই 'নাহানা' সেরে আসছি। আপনাদের অফিসে নিয়ে গেলে সেই খবর যদি জানাজানি হ'য়ে যায়, আপনাদের পক্ষে সেটা ভাল হবে না।'

দ্বিতীয় পাহারাদারটি এবার হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ ক'রে বলে, 'তবে কৃপা ক'রে ভেতরে যাবেন না।'

জনেশ্বর বলেন, 'আপনারা আর কষ্ট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই পাহারাদার রাস্তা পেরিয়ে ওধারে তাদের অফিসে ফিরে গিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার তাদের চোখে মুখে বিস্ময় এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গে সঙ্গে অজানা ভয়ও ফুটে বেরোয়। কী উদ্দেশ্যে এতগুলো মানুষ আচমকা এখানে এসে হাজির হয়েছেন, সঠিক বুঝতে না পেরে তারা খুবই উৎকণ্ঠিত।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর পালা ক'রে রাকেশরা দু 'রশি' দূরের তালাও থেকে স্নান সেরে আসেন। আজ আর কারো রান্নাবান্না চড়াবার মতো উদ্যম বা ইচ্ছা ছিল না। ঠিক হয়, আজ রাতের খাওয়াটা হোটেলেই সারবেন।

স্নান যেভাবে করা হয়েছিল সেই পদ্ধতিতেই এক দল খেতে যান, আরেক দল মালপত্র পাহারা দিতে থাকেন। আগের দলটা ফিরে এলে পরের দলটা খেয়ে আসেন।

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে।

রাস্তার খানিকটা অংশ সাফ সুতরো ক'রে রাকেশরা বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে নেন। ওঁরা যখন শুয়ে পড়তে যাবেন, ডি. এম অফিসের সেই আর্মড গার্ড দু'টো রাস্তার ওপার থেকে একরকম দৌড়ে চলে আসে। রাকেশরা লক্ষ করেন নি, কয়েক ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে বরাবর তাঁদের ওপর লক্ষ রেখে যাচ্ছিল তারা।

একজন গার্ড বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এ কী, আপলোগন এই সড়কের ওপর শুয়ে পড়ছেন যে!'

ঠিক এইভাবেই সেদিন থানার সেই কনস্টেবল দুটোও একই প্রশ্ন করেছিল। রাকেশ সামান্য হেসে রহস্যের গলায় বলেন, 'এখানে ছাড়া আমাদের এতগুলো লোকের আর তো কোথাও শোওয়ার জায়গা নেই।'

গার্ডটার চোখ গোল হ'য়ে যায়। রাকেশের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না সে বা আর সঙ্গী। বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, 'মতলব?'

'সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না? আমরা বাহারকা আদমী। এখানে আমাদের কারো বাড়িঘর নেই। তা হ'লে থাকব কোথায়?'

সমস্ত ব্যাপারটা আরো জট পাকিয়ে যায়। দ্বিতীয় গার্ডটি এবার বলে, 'লেকেন ইহা—' কথাটা শেষ না ক'রেই সে থেমে যায়।

গার্ডটার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন রাকেশ। এই শহরে এত ভাল ভাল জায়গা—হোটেল, ধরমশালা, সরকারি গেস্ট হাউস, ইত্যাদি থাকতে এই সব 'সরগনা আদমী' কেন পথের ধুলোবালি এবং আবর্জনার মধ্যে বিছানা পেতে শোওয়ার তোড়জোড় করছেন, তাদের কাছে এ এক বিপুল রহস্য। তাকে প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখার জন্যই হয়ত রাকেশ বলেন, 'একটা তো রাত। সকালেই জানতে পারবেন কেন আমরা এখানে এসেছি। খুব ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা, নমস্তে—'

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না দুই গার্ডের। চিন্তাগ্রস্তের মতো পেছন ফিরে বার বার তাকাতে তাকাতে তারা রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলে যায়। আর যাই হোক, সারা রাত তাদের ঘুমের দফা রফা হ'য়ে গেল।

ভোর হ'তে না হ'তেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হ'য়ে যায়। স্নান, সূর্যস্তব, চা খাওয়া ইত্যাদি সেরে একটা দল সোজা এস. পি'র অফিসের সামনে এসে ব'সে পড়ে। পোস্টার প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি লেখার জন্য সঙ্গে ক'রে কাগজ রং তুলি আঠা ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছিল।

বেলা আটটার মধ্যে দুই জায়গাতেই পোস্টার টোস্টার লেখা হ'য়ে যায়।

এস. পি'র অফিসের সামনে সত্যাগ্রহের নেতৃত্বে রয়েছেন হীরালালজি। ডি. এম অফিসের সামনে নেতা হচ্ছেন জনেশ্বর আর দু জায়গাতেই ছোটাছুটি ক'রে যোগাযোগ রাখছেন রাকেশ, দেবারতি এবং পাটনার সাংবাদিক পরমেশ।

দশটায় এখানকার অফিস আদালত খুলবে। তার অনেক আগেই আন্দোলনের

ব্যবস্থা ক'রে ফেলে দেবারতিকে সঙ্গে নিয়ে জীপের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন রাকেশ। এই ডিস্ট্রিক্ট টাউনের একটা গ্যারাজের মালিক তাঁর অনেকদিনের চেনা। কিন্তু গ্যারাজটা এত সকালে খুলেছে কিনা কে জানে। না খুললেও ওটার মালিক পাশেই থাকে। তাকে ডেকে জীপের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যাবে।

আদালত টোলার উল্টো দিকে শহরের অন্য মাথায় দীপচাঁদ জৈনের গ্যারাজ 'জৈন মোটর ওয়ার্কস'। দূরত্ব কম নয়, মাইল দুই পথ, একটা টাঙ্গা ডেকে সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ন'টা বেজে যায়। ততক্ষণে অবশ্য গ্যারাজ খুলে গেছে।

মালিক দীপচাঁদজি তাঁর অফিসটা সাবেক চালের সঙ্গে নতুন কেতা মিশিয়ে সাজিয়ে নিয়েছেন। তাঁর নিজের বসার জন্য ঘরের আধাআধি জুড়ে পুরু গদি, তাকিয়া, ক্যাশ বাক্স। পেছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি স্টীলের আলমারি কিন্তু মহামান্য 'ক্লায়েন্ট'দের জন্য ফরাসের সামনে বেশ কয়েকটা গদি-আঁটা চেয়ার।

এই মুহূর্তে দীপচাঁদজি তাঁর গদিতে বিপুল শরীর দুই তাকিয়ায় এলিয়ে দিয়ে কাত হ'য়ে আছেন। এখনও গ্যারাজে তেমন ব্যস্ততা শুরু হয় নি।

ঘরের বাইরে চওড়া প্যাসেজের ওধারে টিনের শেডের তলায় কারখানা। মেকানিকরা তেলকালি-মাথা নীল প্যান্ট গায়ে চড়িয়ে নানা ধরনের প্রাইভেট কার, ট্রাক থেকে শুরু ক'রে অটো টটো সারাচ্ছে। হাতুড়ির ঠুকঠাক আওয়াজের সঙ্গে বিচিত্র টাইপের হর্নের শব্দ মিশে একটানা দুর্দান্ত এক অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে।

রাকেশ এবং দেবারতিকে দেখে টানা হ্যাঁচড়া ক'রে দীপচাঁদ শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু। তাতে ঘুমের আমেজ লেগে আছে।

ভাং ছাড়া এমনিতে কোনো নেশা নেই দীপচাঁদজির। এই ব্যাপারটায় তাঁর বেশ প্যাসানই রয়েছে। কাল রাত্তিরে ভাংয়ের মাত্রাটা একটু বেশিই চড়ে গিয়েছিল খুব সম্ভব। তার রেশ এখনও থেকেই গেছে।

হাতজোড় ক'রে দীপচাঁদজি বলেন, 'কা সৌভাগ, আইয়ে আইয়ে ম্যাজিস্টর সাব।' দীপচাঁদের আদি বাড়ি রাজস্থানে। কিন্তু তিন পুরুষ ধ'রে বিহারেই আছেন। দেশের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক নেই। চালচলন, পোশাক আশাকে একেবারে বিহারীই ব'নে গেছেন। এমন কি দেহাতী টানে এখানকার ভাষাও ব'লে থাকেন।

দীপচাঁদ আপ্যায়নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েন, 'বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। কেত্তে রোজ বাদ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল গরীবখানায়।'

রাকেশদের চেয়ারে বসিয়ে দীপচাঁদজি নিচে গদিতে বসেন। তারপর হাতজোড় অবস্থাতেই বলেন, 'হুকুম কীজিয়ে—'

রাকেশ দেবারতির সঙ্গে দীপচাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনাকে

প্রথমেই জানিয়ে দিই, আমি আর ম্যাজিস্ট্রেট নেই। নৌকরিতে ইস্তফা দিয়েছি।'

দীপচাঁদের চোখেমুখে কোনোরকম ভাবান্তর দেখা যায় না। তিনি জানান, এরকম একটা গুঞ্জন তাঁর কানেও এসেছে। তবে রাকেশ নৌকরিতে থাকুন বা না থাকুন, তাঁর কাছে এতে কোনো ফারকত নেই। রাকেশ দীপচাঁদের কাছে চিরকাল ম্যাজিস্ট্রেট সাবই থেকে যাবেন।

রাকেশ মৃদু হাসেন। বলেন, 'আমার একটা উপকার করতে হবে দীপচাঁদজি—'

'উপকার কী বলছেন, হুকুম করুন—'

দীপচাঁদ লোকটা চিরকালই বিনয়ের অবতার। দশ বছর আগে এঁর সঙ্গে রাকেশের আলাপ কিন্তু স্বভাবটা এতটুকু বদলায় নি। তাঁর চালচলন, কথাবার্তার ধরন, সবই সেই দশ বছর আগের মতোই। রাকেশ বলেন, 'কয়েক দিনের জন্যে আমি একটা জীপ চাই। কত ভাড়া দিতে হবে বলুন—'

'কেরায়া উরায়ার কথা পরে হবে। আসেন আমার সাথ—'

রাকেশকে সঙ্গে ক'রে গ্যারাজের ভেতর নিয়ে যান দীপচাঁদ। একধারে গোটা চার পাঁচেক জীপ দাঁড়িয়ে আছে। বলেন, 'যেটা ইচ্ছা পসন্দ ক'রে নিন।'

রাকেশ একটা জীপ বেছে বলেন, 'এটা হ'লেই চলবে।'

দীপচাঁদ একজন মেকানিককে ডেকে বলেন, 'এ শত্রুঘন, ওহী জীপ গাড়ি বাহারকা সড়ক পর লে যা।'

'জি—' হুকুমমতো শত্রুঘন বা শত্রুঘ্ন জীপটাকে গ্যারাজের বাইরের রাস্তায় নিয়ে রাখে।

দীপচাঁদ বিনীতভাবে রাকেশকে বলেন, 'লে যাইয়ে ম্যাজিস্টর সাব।'

রাকেশের মন খুঁতখুঁত করছিল। তিনি বলেন, 'কিছু অ্যাডভান্স অন্তত রাখুন দীপচাঁদজি—'

'পিছা দেখা যায় গা। এখন নিয়ে তো যান।'

অগত্যা দেবারতিকে নিয়ে জীপে উঠে পড়েন রাকেশ এবং সোজা ডি. এম-এর অফিসের সামনে চলে আসেন।

এদিকে জনেশ্বররা চারিদিক পোস্টারে ছয়লাপ ক'রে মাথার ওপর পুরু কাপড়ের চাঁদোয়া খাটিয়ে জোরদার আন্দোলনের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছেন। দু'শ গজ দূরত্বে এস. পি'র অফিস। সেখানেও একই দৃশ্য।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে অফিস আদালত খুলে যাবে। এর ভেতরেই চারিদিক থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। তারা জনেশ্বর বা হীরালালদের কাছে

এসে থমকে দাঁড়ায়। এমন দৃশ্য তারা হয়ত এখানে আগে আর কখনও দেখে নি। তারপর পোস্টারগুলো পড়ে চমকে ওঠে কিন্তু চলে যায় না, সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে জনেশ্বরদের লক্ষ করতে থাকে, আন্দাজ করে নাটকীয় এবং চাঞ্চল্যকর কিছু একটা ঘটবে।

রাকেশ জীপটা ডি. এম অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে নেমে আসেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দেবারতিও।

জনেশ্বর বলেন, 'জীপ তা হ'লে একটা যোগাড় করতে পেরেছ?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ, চাচাজি।'

'ভালই হ'ল।'

রাকেশ একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, 'এদিকের কোনো খবর আছে চাচাজি?'

'না। এখনও খবর হওয়ার সময় হয় নি। ডি. এম'কে আসতে দাও, তারপর তো খবর হবে।'

রাকেশ এবার এস. পি'র অফিসের সামনে থেকে ঘুরে আসেন। পাটনার সাংবাদিক পরমেশ জনেশ্বরদের কাছে ব'সে আছেন, হীরালালদের কাছে কেউ নেই। পরমেশ দু জায়গাতেই কাজ চালিয়ে নেবেন। দেবারতি যতক্ষণ ডিস্ট্রিক্ট টাউনে থাকবে, সে-ও আন্দোলনের দুই কেন্দ্রে ঘুরে খবর যোগাড় করবে।

দুই জায়গাতেই এখন কৌতূহলী মানুষজনের ভিড় বেড়ে চলেছে। তবে দূর থেকে তারা জনেশ্বরদের লক্ষ করছে, কাছে ঘেঁষছে না।

আরো কিছুক্ষণ বাদে একটা ধবধবে সাদা মোটর ডি. এম অফিসের সামনে এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন ডিস্ট্রিক্ট জজ হেমবতীনন্দন। গভীর বিস্ময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেখতে দেখতে হঠাৎ জটলার ভেতর রাকেশের ওপর তাঁর চোখ এসে পড়ে। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন তিনি। তার মধ্যে রাকেশ উঠে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলেন, 'ভাল আছেন স্যার?'

হেমবতী বলেন, 'আমি ভালই আছি। কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত ধারাবনীর সেই কেসটা নিয়ে রাস্তাতেই নামলে!'

'এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল বলুন?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে হেমবতী জনেশ্বরদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সেই ফ্রিডম ফাইটাররা—'

রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এঁদের চেনেন?'

'খবরের কাগজে ছবি দেখেছি। সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম হ'ল।'

'যদি বলেন তো এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

'আজ থাক। দশটা বাজতে চলল। একটু পরেই এজলাস বসবে। আচ্ছা চলি। পরে দেখা হবে।' হেমবতী তাঁর গাড়িতে উঠে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা স্টার্ট দিয়ে চলে যায়।

রাকেশ বুঝতে পারছিলেন, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন তাঁদের সঙ্গে জেলা জজের আলাপ করার হয়ত অসুবিধা রয়েছে।

আরো খানিকটা সময় কেটে যায়। লোকের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। অফিস আদালত এতক্ষণে খুলে গেছে। তবে এস. পি বা ডি. এম কেউ এসে পৌঁছন নি।

আন্দোলনকারীদের পোস্টারগুলো দেখে জনতার মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু হ'য়ে যায়।

'ত্রিলোকী সিং বড়ে হারামজাদ হ্যায়।'

'গিরিলাল ভি।'

'ওহী দোনো বন্দুকবাজ পালতা হ্যায়।'

'কোঈ এক অংলি উঠায়গা তো বন্দুকবাজ কুত্তেলোগ গোলিসে জানসে মার দেগা।'

'ওহী বদমাসলোগ দো মাহিনা আগে বহোতসে আদমীকো খতম কর চুকা।'

'শালে এম্লে বনা! জনতাকা নেতা! থুঃ থুঃ থুঃ—'

জনপ্রতিনিধি ত্রিলোকী সিং এবং গিরিলাল ঝা সম্পর্কে ঐ লোকগুলোর মনোভাব কী জাতীয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না। ধারাবনী গাঁয়ের মানুষজন বা থানার চারপাশের দেহাতীদের মতো এরা সাইলেণ্ট মেজোরিটি নয়। এরা শিক্ষিত বা আধা-শিক্ষিত শহরের লোক। অজ গাঁয়ের মতো ফিয়ার সাইকোসিস তাদের ভেতর কাজ করে না। যা তারা ভাবে, চিৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে বলতে পারে।

ওধারে জনেশ্বররা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন।

রাকেশ বলেন, 'চাচাজি, আমাদের স্ট্রেন্‌থ বাড়াতে হবে। প্রচুর লোকজন দরকার। আমার মনে হয়, আর দেরি না ক'রে সেই প্রোগ্রামটা শুরু ক'রে দেওয়া যাক।'

'তুমি নিশ্চয়ই স্ট্রিট কর্নার মীটিং আর কলেজে কলেজে গিয়ে ছেলেমেয়েদের দলে টানার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'বেলা আরেকটু চড়ুক। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওটা শুরু করা যাবে।'

'আচ্ছা।'

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে ডি. এম-এর গাড়ি আন্দোলনের জায়গায় এসে থমকে যায়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেট রাজেন্দ্র বাজপেয়ী অবশ্য গাড়ি থেকে নামেন না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিস্ময় এবং সংশয়ের দৃষ্টিতে প্রাচীন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দলটাকে দেখেন। রাকেশকে তিনি অনেক দিন ধরেই চেনেন। কয়েক পলক তাঁকেও লক্ষ করেন। তারপর ড্রাইভারকে গাড়িটা তাঁর অফিসের ভেতর নিয়ে যেতে বলেন।

রাজেন্দ্র বাজপেয়ীর গাড়ি চলে যাওয়ার পর রাকেশ বলেন, 'ডি. এম এসে গেছেন। আমার মনে হয়, এবার আমাদের ডাক পড়বে।'

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বেশির ভাগই এক ধরনের টান টান উত্তেজনা বোধ করছিলেন। জনেশ্বর বলেন, 'দেখা যাক।'

রামাশ্রয় কোনো কারণেই উত্তেজিত বা বিচলিত হ'ন না। সর্বক্ষণই তিনি শান্ত, স্থির এবং অচঞ্চল। বলেন, 'ডি. এম যখন ইচ্ছে ডাকবেন কিন্তু দুপুরের ভোজনের কী হবে?'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে সবাই ঠিক ক'রে নেন, কাল রাতের মতো আজও রান্নাবান্নার ঝামেলা করা হবে না। দুপুর এবং রাতের খাওয়া দাওয়া হোটেলেই সারা হবে।

একসময় এস. পি'র অফিসের সামনে থেকে এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী লোকপতি এসে খবর দিয়ে যান এস. পি ও তাঁর অফিসে চলে এসেছেন।

আরো ঘণ্টা দেড় দুই কেটে যায় কিন্তু এস. পি বা ডি. এম, কারো কাছ থেকেই তলব আসে না। এর মধ্যে একজন দু'জন ক'রে সবাই হোটেল থেকে খেয়ে এসেছেন।

এদিকে উৎসুক জনতার ভিড়ও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশ পঁচিশ গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তারা নানারকম মন্তব্য ক'রে যাচ্ছে। মাস দুই আগে ধারাবনীর জেনোসাইড তাদের স্মৃতিতে ফিকে হ'য়ে গিয়েছিল। এই আন্দোলন ফের তার ভয়াবহতা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অন্তত লোকগুলোর কথা শুনে তা-ই মনে হয়। হত্যাকারীরা এবং এই গণহত্যার ছক যারা করেছে তারা সাজা পাক, এটা এই লোকগুলো আন্তরিকভাবেই চাইছে।

দুপুর পেরিয়ে গেলেও রোদে এখনও মারাত্মক ঝাঁঝ। বাতাস গরম ভাপ ছড়াতে ছড়াতে এই জেলা শহরের ওপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে।

ডি. এম-এর অফিসের উঁচু টাওয়ারের মাথায় ঢাউস গোল ঘড়ি আটকানো। সেদিকে তাকিয়ে জনেশ্বর বলেন, 'আড়াইটা বাজতে চলল। এবার লোকাল কলেজগুলোতে যাওয়া যাক।'

এই মুহূর্তে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কথা রাকেশের মাথায় ছিল না। তিনি ব্যস্তভাবে বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন চাচাজি—'

জনেশ্বর বলেন, 'তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। এখানে তোমার থাকা দরকার।' কারণ হিসেবে তিনি জানান, ডি. এম, বা এস. পির কাছ থেকে যে কোনো সময় ডাক আসতে পারে। ওঁরা দু'জনেই রাকেশকে চেনেন। সে জন্য তাঁর এখানে থাকাটা বিশেষ জরুরি।

রাকেশ বলেন, 'কিন্তু কলেজগুলোতে—' কথা শেষ না ক'রেই হঠাৎ তিনি থেমে যান।

রাকেশের মনোভাব টের পাচ্ছিলেন জনেশ্বর। হেসে হেসে বলেন, 'আমার ওপর ভরসা রাখতে পার বেটা। কলেজের ছেলেমেয়েদের ঠিক যোগাড় ক'রে নিয়ে আসতে পারব। অর্গানাইজার হিসেবে আমি খুব খারাপ না। তোমার বাবুজিকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, একসময়—'

রাকেশ খুব লজ্জা পেয়ে যান। হাতজোড় ক'রে কুণ্ঠিতভাবে বলেন, 'ক্ষমা করুন চাচাজি, আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে। আপনি কলেজে যান, আমি এখানেই থাকছি।'

'ঠিক হ্যায় বেটা—' সস্নেহে হেসে উঠে পড়েন জনেশ্বর। তিনি একাই নন, আরো পাঁচজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। তারপর সামনে যারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের জিজ্ঞেস ক'রে কলেজগুলোর হদিশ জেনে নিয়ে শহরের ভেতর দিকে চলে যান।

জনতার ভিড়, তাদের কৌতূহল, উত্তেজনা এবং নানারকম মন্তব্য ছাড়া বিকেল পর্যন্ত তেমন চমকপ্রদ কিছুই ঘটে না। চাঁদোয়ার তলায় প্রায় বেয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপে রাকেশদের শরীর শুধু ঝলসে যেতে থাকে।

বেলা যখন অনেকটা হেলে গেছে, সূর্য নেমে গেছে দিগন্তের কাছাকাছি, রোদের দাহ জুড়িয়ে আসছে, সেই সময় দূরে বহু মানুষের চিৎকার শোনা যায়। প্রথমটা কথাগুলো ঠিক পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না, পরে বোঝা যায় ওগুলো স্লোগান।

'পুলিশ পলিটিসিয়ান মিলিভগত—'

'মুর্দাবাদ—'

'ধুধলিগঞ্জ থানেকা ও. সিকো—'

'সাসপেণ্ড কর—'

'ধারাবনী হত্যারাঁকো—'

'অ্যারেস্ট কর—'

'ত্রিলোকী সিং—'

'মুর্দাবাদ।'

'গিরিলাল ঝা—'

'মুর্দাবাদ—'

রাকেশরা দেখতে পান সাত আটশ যুবক যুবতী, সকলেই কলেজের ছাত্রছাত্রী—মিছিল ক'রে এগিয়ে আসছে। তাদের সামনে রয়েছেন জনেশ্বর এবং সেই পাঁচ মুক্তিসংগ্রামী। জনেশ্বর যে একজন বড় মাপের সংগঠক, সেটা দু তিন ঘণ্টার ভেতর প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন।

ছাত্রছাত্রীদের দু ভাগে ভাগ ক'রে জনেশ্বর আধাআধি পাঠিয়ে দেন এস. পি'র অফিসের সামনে। বাকি অর্ধেক ডি. এম-এর অফিসের সামনে তাদের সতেজ তারুণ্যে সমানে স্লোগান দিতে থাকে। হত্যাকারীদের শাস্তি চাই, পুলিশ এবং পলিটিসিয়ানদের গোপন গাঁটবন্ধন নিপাত যাক, ইত্যাদি তাদের দাবী। অর্থাৎ রাকেশরা যা চাইছেন সেটা নতুন প্রজন্মের এই ছেলেমেয়েদের বিপুল নাড়া দিয়েছে।

এই তরুণ তরুণীরা রাকেশদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা যেন চারিয়ে দিয়েছিল। নিজেদের অজান্তে তাঁরাও উঠে দাঁড়ান।

রাকেশের পাশেই ছিলেন দুই পত্রকার—দেবারতি আর পরমেশ।

দেবারতি রাকেশের কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলে, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?'

রাকেশ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'আমাদের নতুন জেনারেসান ভাল কিছু নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত।'

পরমেশ বলেন, 'সেটা তো ধারাবনীতেই আমরা দেখে এসেছি। নিউজ-পেপারের রিপোর্ট পড়ে ওখানেও মফস্বল শহর থেকে কলেজের ছেলেরা দৌড়ে গিয়েছিল।'

দেবারতির খেয়াল ছিল না। উৎসুকভাবে সে বলে, 'কারেক্ট। আজ তো তাদের থানার সামনে যাওয়ার কথা। আমার বিশ্বাস চলেও গেছে এতক্ষণে।'

'এই আন্দোলন তা হ'লে নিউ জেনারেসানের সাপোর্ট পেয়ে নতুন ডাইমেনসান পেতে চলেছে।'

'অবশ্যই। আরো একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই মার্ক করেছেন।'

'কী?'

'স্বাধীনতার পর চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরে আমাদের নেতারা ইয়াংগার জেনারেসানের কাছে কোনোরকম বিশুদ্ধ ইডিওলজি রাখতে পারে নি। দে আর ভোট মার্চেণ্টস। যেভাবেই হোক ভোট যোগাড় ক'র। ঘুষ দিয়ে, রঙিন প্রতি-শ্রুতির টোপ সামনে রেখে বা বন্দুকের নল তাক ক'রে ভোটটি বাগিয়ে শুধু ক্ষমতা দখল করা। এ ছাড়া আর কিছুই এরা জানে না, বোঝে না।'

মজার গলায় দেবারতি বলে, 'বলছেন পলিটিকস ইজ আ ড্যাম গুড বিজসেন?'

পরমেশ কণ্ঠস্বরে অনেকটা জোর দিয়ে বলেন, 'দ্যাটস দা কারেক্ট সেনটেন্স। বিগ বিজনেসই বলুন আর ইণ্ডাস্ট্রিই বলুন পলিটিকসের জবাব নেই। একবার যদি জিতে এসেম্বলি বা পার্লামেণ্টে যেতে পারেন, আই থিংক—'

'আপনি যা বোঝাতে চাইছেন সেটা দেশের সাত বছরের বাচ্চাটাও বোধহয় আজকাল বোঝে। ব্যাপারটা কী জানেন—'

'বলুন—'

'এই ছেলেমেয়েদের দেখে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। ইণ্ডিয়ার পাস্ট আর ফিউচার জেনারেসানের সঙ্গে প্রেজেণ্ট কোরাপ্ট জেনারেসেনের লড়াই।'

'পাস্ট অ্যাণ্ড ফিউচার ভার্সাস প্রেজেণ্ট—তাই না?'

ছেলেমেয়েরা সমানে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আসলে সমস্ত আন্দোলনটা মুহূর্তে বয়স্কদের কাছ থেকে অনেকখানিই তরুণদের হাতে চলে গেছে। শুধু তা-ই না, যারা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল তাদের ভেতর থেকেও কেউ কেউ স্লোগান দিতে থাকে। আন্দোলন যে একটা অতীব উত্তেজক আর সংক্রামক ব্যাপার এবং কিভাবে সেটা চারপাশের মানুষজনের মধ্যে চারিয়ে যায় সেটা আগে থেকে বোঝা মুশকিল।

এই হইচই এবং স্লোগানের মধ্যে হঠাৎ কাল রাতের সেই আর্মড গার্ড দুটো ডি. এম অফিস থেকে রাস্তা পেরিয়ে রাকেশদের দিকে ছুটে আসে। তাদের রীতিমত উৎকণ্ঠিত এবং ব্যতিব্যস্ত দেখাচ্ছে। তারা শুধোয়, 'রাকেশ সাব কৌন হ্যায়?'

রাকেশ এগিয়ে এসে বলেন, 'আমি। কেন?'

'ডি. এম সাব আপকো সেলাম দিয়া।'

'আমাকে একলা ?'

'হাঁ সাব।'

'একলা আমি যাব না। গেলে সবাই যাব।'

এ কথার উত্তর জানা নেই দুই আর্মড গার্ডের। দ্বিধান্বিতভাবে তারা বলে, 'লেকেন—'

রাকেশ বলেন, 'ডি. এম সাহেবকে জিজ্ঞেস ক'রে আসুন, আমরা সবাই যাব কিনা ?'

আর্মড গার্ডরা দৌড়ে ডি. এম অফিসে ঢুকে যায়। মিনিট দশেক বাদে ফিরে এসে জানায়, এত আন্দোলনকারীকে বসতে দেওয়ার মতো জায়গা ডি. এম. সাহেবের কামরায় নেই। এতজনের প্রতিনিধি হিসেবে মোট পাঁচজনকে ভেতরে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন ডি. এম।

নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা ক'রে রাকেশরা স্থির করেন, পাঁচ জনই যাবেন। রাকেশ ছাড়া আর যাঁরা দলে থাকবেন তাঁরা হলেন জনেশ্বর, রামাশ্রয়, রামদয়াল আর অখিলনাথ।

দেবারতি ওধার থেকে ব'লে ওঠে, 'পত্রকারদেরও তো ডি. এম-এর মীটিংয়ে থাকা উচিত। আমি সঙ্গে যেতে চাই।'

পরমেশও দেবারতিকে সায় দিয়ে বলেন, 'অফ কোর্স, এই মীটিং-এ আমরাও থাকব।'

রাকেশ সাংবাদিকদের সঙ্গে নেওয়ার কথা বলতে ভীষণ বিব্রত বোধ করে আর্মড গার্ডেরা। বলেন, 'হুকুম নেহী—'

দেবারতি এবার তার সাংবাদিকসুলভ তৎপরতা দেখিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, সঙ্গে তো যাই। ডি. এম সাহেবের কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। যদি হুকুম দেন, ভেতরে ঢুকব, নইলে ফিরে আসব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর্মড গার্ডরা বলে, 'তব্ চলিয়ে—'

ডি. এম-এর কামরাটা বেশ বড় মাপের। আগাগোড়া মেঝেটা জুট কার্পেটে মোড়া। মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে গ্লাস-টপ টেবল। ডি. এম-এর জন্য পুরু গদি-মোড়া রিভলভিং চেয়ার। ভিজিটরদের জন্যও সামনের দিকে সারি সারি চেয়ার। টেবলে বেশ কিছু ফাইল, পেন স্ট্যাণ্ড, তিন চারটে নানা রঙের টেলিফোন। দেয়াল ঘেঁষে সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে নানা ধরনের বই। জানালায় এয়ার-কুলার ছাড়াও সীলিং থেকে গোটা চারেক ঝকঝকে নতুন মডেলের ফ্যান ঝুলছে।

রাকেশরা আমর্ড গার্ডদের সঙ্গে ডি. এম অফিসে এসে তাঁর কামরায় ঢুকে পড়েন। দেবারতিরা বাইরের প্যাসেজে অপেক্ষা করতে থাকে।

ডি. এম রাজেন্দ্র বাজপেয়ী তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে ছিলেন। বাহান্ন তিপান্নর মতো বয়স। জবরদস্ত রাশভারী চেহারা। ঘন জোড়া ভুরু, ব্যাক-ব্রাশ-করা কাঁচা-পাকা চুল, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ঠোঁটের নিচে মোমে-মাজা পাকানো গোঁফ। পরনে বাদামী রংয়ের সাফারি। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় মানুষটি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

রাকেশদের দেখে তিনি উঠে দাঁড়ান। হাতজোড় ক'রে বলেন, 'আসুন আসুন—'

প্রতি-নমস্কার জানান রাকেশরা।

রাজেন্দ্র বলেন, 'অনুগ্রহ ক'রে বসুন।'

রাকেশ সবিনয়ে বলেন, 'তার আগে আমার একটা আর্জি আছে স্যার—'

'অবশ্যই। বলুন—'

রাজেন্দ্র বাজপেয়ী গম্ভীর প্রতাপশালী অফিসার হ'লেও বেশ ভদ্র, তাঁর ব্যবহার এবং সৌজন্যে কোনোরকম ত্রুটি নেই। রাকেশ বলেন, 'আমাদের সঙ্গে দু'জন সাংবাদিক এসেছেন, বাইরে ওয়েট করছেন। আপনার অনুমতি পেলে তাঁরা ভেতরে আসতে পারেন।'

রাজেন্দ্র সামান্য হাসেন, 'তার মানে আমরা যা আলোচনা করব সেটা যাতে প্রেস মীডিয়াতে বেরিয়ে যায় তার ব্যবস্থা ক'রেই এসেছেন?'

ডি. এম-এর কথার মধ্যে স্পষ্ট একটা খোঁচা আছে। রাকেশ উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ডি. এম ফের বলেন, 'প্রেসে তো রোজ বেরুচ্ছেই। আই ডোণ্ট মাইণ্ড। পত্রকারেরা থাকলে আমার আপত্তি নেই।' তিনি নিজে বাইরে গিয়ে দেবারতিদের ডেকে নিয়ে আসেন।

সবাই বসার পর রাজেন্দ্র জনেশ্বরদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁদের ছবি আমি দেখেছি, সকলেই আমাদের নমস্য। তা রাকেশ সাহেব, আমি খবর পেয়েছি আপনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, রাস্তায় আন্দোলন করতে নেমেছেন, কিন্তু এই বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় মানুষগুলোকে টানা হ্যাঁচড়া করে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?'

জনেশ্বর বলেন, 'রাকেশ আমাদের টানাটানি ক'রে আনে নি। আমরা নিজেদের ইচ্ছেয় ছুটে এসেছি। এটা আমাদের ডিউটি ব'লেই মনে করি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাজেন্দ্র বলেন, 'কাল আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকে জানানো হয়েছে আপনারা ক'দিন ধরে ধারাবনী আর দুধলিগঞ্জ থানার সামনে অ্যাজিটেসান করছেন। আজ শুরু করেছেন আমার আর এস. পি সাহেবের অফিসের সামনে। আন্দোলনের রীয়াল কারণটা কী?'

রাকেশ বলেন, 'আপনি নিউজ পেপার রিপোর্ট নিশ্চয়ই দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আমাদের পোস্টারগুলোও চোখে পড়েছে?'

'পড়েছে।'

'এ সবের মধ্যেই কারণগুলো রয়েছে।'

রাজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন না। কারণগুলো যে তাঁরা যথেষ্টই জানা সে সম্পর্কে সংশয় নেই। তবু প্রশ্নগুলো যে করলেন সেটা আন্দোলনকারীদের বাজিয়ে দেখার জন্য। খানিক চিন্তা ক'রে রাজেন্দ্র বলেন, 'তার মানে আপনাদের ধারণায় ধারাবনীর সত্যিকারের মার্ডারারদের ধরা হয় নি, এই তো?'

রাকেশ বলেন, 'হ্যাঁ।'

'আপনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইচ্ছা করলেই খুনীদের ধরার ব্যবস্থা করতে পারতেন। যতদূর জানি কেসটা আপনার কোর্টেই ছিল।'

'স্যার, একজন সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে খুনের মামলা চালানো সম্ভব নয়। আমাকে সেসানস কোর্টে কেসটা পাঠাতে হ'ত।'

'তাতে অসুবিধে কী ছিল?'

'জেনেশুনে নির্দোষ ক'টা লোককে সেসানস কোর্টে পাঠাতে আমার বিবেক সায় দেয় নি।'

'ইউ সীম টু বী আ কনসায়েনসাস পার্সন। ফাইন। এই কারণেই চাকরি ছেড়ে আসল মার্ডারারদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন?'

'একজাক্টলি তাই।'

রামাশ্রয় বলেন, 'সত্যিকারের মানুষের কাজই করেছে রাকেশ। তা ছাড়া জুডিসিয়ারির মর্যাদা যাতে রক্ষা পায় সে জন্যে কতবড় স্যাক্রিফাইস করেছে সেটাও ভেবে দেখুন।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাজেন্দ্র।

বাইরের রাস্তায় স্লোগানের আওয়াজ তুমুল হ'য়ে উঠেছে।

রাজেন্দ্র বলেন, 'এত চিৎকার কিসের?'

'কলেজের ছেলেরা স্লোগান দিচ্ছে।' অখিলনাথ জানান।

বেশ অবাক হয়েই রাজেন্দ্র জিজ্ঞেস করেন, 'ওরাও কি আপনাদের সঙ্গে জুটে গেছে?'

'হ্যাঁ। অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে ক্লাস ছেড়ে চলে এসেছে ওরা।'

পলকে ব্যাপারটা বুঝে নেন রাজেন্দ্র। বলেন, 'আপনারা তা হ'লে মাস মুভমেণ্ট শুরু ক'রে দিলেন?'

রাকেশ বলেন, 'মাস মুভমেণ্ট আর হ'ল কোথায় স্যার? কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী আর কিছু ফ্রিডম ফাইটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুনীদের ধরা না হ'লে সব মানুষের কাছে গিয়ে আমাদের গোটা ব্যাপারটা জানাতে হবে। আমার ধারণা, পীপলস সাপোর্ট নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।'

হালকা গলায় রাজেন্দ্র বলেন, 'হাকিম থেকে একেবারে পলিটিক্যাল লীডার ব'নে গেলেন?' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বরে পুরনো গাম্ভীর্য ফিরে আসে, 'আপনি কি জানেন, যেখানে দাঁড়িয়ে কলেজের ছেলেরা স্লোগান দিচ্ছে ওখানে হানড্রেড ফোরটি ফোর জারি করা আছে। বেআইনি অ্যাসেম্বলির জন্যে সবাইকে অ্যারেস্ট করা যায়।'

জনেশ্বর বলেন, 'আমরা তার জন্য তৈরি হ'য়েই এসেছি ডি.এম সাহেব। বৃটিশ আমলের জেলখানা আমাদের দেখা আছে। মৃত্যুর আগে আপনাদেরটা না হয় দেখে যাব। একটা বড় রকমের অভিজ্ঞতা তো হবে।'

রাজেন্দ্রকে এই প্রথম বিব্রত হ'তে দেখা যায়। তিনি বলেন, 'ও সব পরে ভাবা যাবে।' রাকেশের দিকে ফিরে বলেন, 'আপনাদের পোস্টারে লেখা আছে 'পুলিশ-পলিটিসিয়ান মিলিভগত— এই ব্যাপারটা কী?'

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই জনেশ্বর প্রায় ক্ষেপে ওঠেন, 'ডি.এম সাহেব, আপনি কি সরল দেবশিশু?'

সবাই হকচকিয়ে যায়। জনেশ্বর এমনিতে যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং শান্ত মানুষ। তিনি যে এমন উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতে পারেন, এ প্রায় অভাবনীয়। জবরদস্ত এক ডি. এম'কে এভাবে কেউ মুখের ওপর বলতে পারে, শুনেও বিশ্বাস হয় না।

রাজেন্দ্র বাজপেয়ীর প্রাথমিক বিস্ময়টা এই জাতীয়। তিনি একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে যান। তাঁর গলা থেকে একটি শব্দ বেরুবার আগে জনেশ্বর আবার ব'লে ওঠেন, 'আমি ঝোঁকের মাথায় কথাটা কিন্তু বলি নি ডি. এম সাহেব। ইচ্ছা করলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, জেল জরিমানা ফাঁসি—সব কিছুর জন্যে আমি তৈরি আছি। আপনি খুব অবাক হ'য়ে গেছেন দেখতে পাচ্ছি। কেন কথাটা বলেছি, এক্সপ্লেন করতে দিন।'

রাজেন্দ্র উত্তর না দিয়ে পলকহীন জনেশ্বরকে দেখতে থাকেন। এই সব পুরনো মুক্তিযোদ্ধারা কোন ধাতুতে তৈরি, সে সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে। ডি. এম বিনীতভাবে বলেন, 'আপনারা দেশের সব চেয়ে রেসপেক্টড, সব চেয়ে অনারেবল পার্সনস। তবু একটা কথা নিশ্চয়ই মানবেন, কানুন ব'লে একটা ব্যাপার আছে ?'

জনেশ্বর হেসে ফেলেন, 'আপনার ইঙ্গিতটা বোধ হয় ধরতে পেরেছি। আমি আপনাকে বে-কানুনি কাজ করতে বলছি না। আগেই তো বলেছি আমাদের কাজ ইললীগাল মনে হ'লে আপনি যা খুশি করতে পারেন।'

ডি. এম'ও হাসেন, 'আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে কনফ্রনটেসানের কথা একেবারেই বলি নি জনেশ্বরজি।'

'তা বলবেন কেন ? আপনি ভদ্রলোক, তার ওপর একজন বুদ্ধিমান অ্যাড-মিনিস্ট্রেটর। তবে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে কনফ্রনটেসানটা হবেই, যদি না সত্যিকারের হত্যারাদের অ্যারেস্ট করা হয়। আর—' বক্তব্য শেষ না ক'রে হঠাৎ থেমে যান জনেশ্বর।

তাঁর কথায় গূঢ় কোনো ইঙ্গিত ছিল। রাজেন্দ্র বাজপেয়ী ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড টান টান ক'রে বসেন।

রাকেশ কিন্তু জনেশ্বরের ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, 'চাচাজি হয়ত বোঝাতে চাইছেন, আসল মার্ডারারদের যারা পেট্রন তাদেরও কোনোমতেই ছাড়া চলবে না।'

রাজেন্দ্র আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'ওটা আমি যে বুঝি নি তা নয়। কিন্তু একটা সমস্যার কথা কি ভেবে দেখেছেন ?'

'বলুন কোন সমস্যা ?'

'প্রথমত খুনী হিসেবে যাদের নাম বলেছেন তাদের ধরা খুব সহজ নয়। তাদের এগেনস্টে কংক্রীট এভিডেন্স তো চাই।'

রাকেশ বলেন, 'এভিডেন্স যোগাড় করা হয়েছিল কিন্তু গিরিলাল ঝা'য়েরা সে সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে।'

খানিক চিন্তা ক'রে রাজেন্দ্র বলেন, 'খবরের কাগজে এ রকম একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম বটে। রাকেশজি, এক্স-ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বলছি না, একজন ল-ইয়ার হিসেবে কোর্টে কি আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন ?'

রাকেশ বিব্রত বোধ করেন। রাজেন্দ্র যা বলেছেন তা প্রমাণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া ঘটনাটা দেড় দু মাস আগের। ত্রিলোকী সিং বা গিরিলাল ঝা ফিল্ম নষ্ট করা আর টেপ মুছে দেওয়া ছাড়া আপত্তিকর কিছুই করেন

নি, বরং যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সাক্ষি প্রমাণ যোগাড়ের চেষ্টা করছি। একটি ধর্ষিতা মেয়ের স্টেটমেণ্ট রেকর্ডও ক'রে ফেলেছি। আশা করি যাদের ওপর টরচার করা হয়েছে তারা আবার মুখ খুলতে শুরু করবে।'

রাজেন্দ্রর চোখে মুখে ঔৎসুক্য ফুটে ওঠে। তিনি যখন এই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ধারাবনীর জেনোসাইডেব যাবতীয় খবর নিশ্চয়ই রাখেন। তিনি বলেন, 'কিভাবে পেলেন ?'

রাকেশ বলেন, 'তা হ'লে স্যার গিরিলালরা আমাদের প্রথম দিকের এভিডেন্স নষ্ট করার পর যা যা ঘটেছে, আপনাকে একটু কষ্ট ক'রে শুনতে হবে।'

একটু চুপ ক'রে থাকেন ডি. এম। তারপর বলেন, 'পুলিশের সূত্রে কিছু ইনফরমেসান আমি পেয়েছি, তবু আপনি বলুন।'

মণিহারি থেকে ফিরে দ্বিতীয় পর্যায়ে সাক্ষি-প্রমাণের সন্ধানে বেরিয়ে নিজের যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সব জানিয়ে দেন রাকেশ। ভয়ের যে দম-আটকানো বাতাবরণ তিনি লক্ষ করেছেন তাতে কেউ হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে গলা থেকে একটি টুঁ শব্দ বের করতে রাজী নয় ; একমাত্র কুঁদরীই অদম্য সাহসে মুখ খুলেছে।

রাজেন্দ্র বলেন, 'আপনাদের কি মনে হয়, বাকি সবাই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে রাজী হবে।'

'আপনাকে তো বললাম স্যার, সেই চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি। মনে হয়, ওদের ভয় ভেঙে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

রাজেন্দ্রর মুখে এবং তাকানোর ভঙ্গিতে টেনসানের ছাপ পড়ে। তিনি বলেন, 'তা হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা, আই মীন—আপনাদের দাবীটা নতুন ক'রে ভাবতে হবে। অবশ্য—'

জনেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'অবশ্য কী ?'

কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান রাজেন্দ্র। সতর্ক ভঙ্গিতে দেবারতি এবং পরমেশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় ক'রে বলেন, 'ক্ষমা করবেন, আমি রাকেশজিদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে গোপনে আলোচনা করতে চাই। অনুগ্রহ ক'রে আপনারা যদি কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে যান—'

'নিশ্চয়ই—, 'দেবারতি এবং পরমেশ উঠে বাইরে বেরিয়ে যান।

অনেকটা কৌতূহল এবং কিছুটা বিস্ময় নিয়ে রাকেশরা রাজেন্দ্রকে লক্ষ করতে থাকেন।

রাজেন্দ্র ভেতরে ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নেন। তারপর খুব স্বাভাবিক-

ভাবে শুরু করেন, 'আমি এখন আপনাদের যা বলব, আশা করি তা গোপন থাকবে। অন্তত পত্রকাররা জানুন, সেটা আমি চাই না। আমার বিশ্বাস আপনাদের মতো শ্রদ্ধেয় মানুষেরা আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।'

জনেশ্বর বলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারেন। আমাদের দিক থেকে বিশ্বাসভঙ্গের কারণ ঘটবে না।'

'অনেক ধন্যবাদ।' রাজেন্দ্র বলেন, 'আপনাদের লিস্ট অনুযায়ী মার্ডারারদের হয়ত ধরা যায়। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আপনাদের কথামতো ত্রিলোকীজিদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়া খুব সহজ নয়। বুঝতেই পারছেন উনি একজন এম. এল. এ—পীপলস রিপ্রেজেণ্টেটিভ। শুধু তা-ই না, উনি রুলিং পার্টির এম. এল. এ।'

জনেশ্বর বলেন, 'রুলিং পার্টির লোক হ'লে যা খুশি তাই ক'রে পার পাওয়া যায়—না?'

রাজেন্দ্র খুবই ঠাণ্ডা মাথার প্রশাসক—ধীর স্থির এবং অচঞ্চল। কোনো কারণেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না তাঁর। মুখে অবিচলিত হাসি ফুটিয়ে বলেন, 'সমস্ত ব্যাপারটা আপনারা তো জানেন।'

রামাশ্রয় কিছুটা অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ, এবং স্পষ্টভাষীও। তিনি টেবিলের ওপর দিয়ে রাজেন্দ্রর দিকে ঝুঁকে বলেন, 'আপনি কিন্তু কোনো পার্টির ক্রীতদাস নন ডি. এম সাহেব।' ত্রিলোকী সিংয়ের রাজনৈতিক দলটির নাম ক'রে বলেন, 'ওদের পার্টি কি আপনাকে নৌকরি দিয়েছে?'

রাজেন্দ্র রামাশ্রয়ের মারমুখী চেহারা দেখে একেবারে হকচকিয়ে যান। বলেন, 'না না, তা দেবে কেন?'

রামাশ্রয়ের উষ্মা বা উত্তেজনা কাটে নি। তিনি গলার স্বর উঁচুতে তুলে বলেন, ইউ আর এ পাবলিক সারভেণ্ট, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি, মিনিস্টার, লীডার, এম. এল. এ বা এম. পি'র খুদ নৌকর নন।'

'জানি রামাশ্রয়জি, জানি—'

ডি. এম'কে শেষ করতে দেন না রামাশ্রয়। কণ্ঠস্বর আরো চড়িয়ে দেন, 'এক পার্টি চুনাওতে জিতে গভর্নমেণ্ট বানাবে, পরের চুনাওতে হয়ত অন্য পার্টির সরকার হবে। এক মন্ত্রী আজ আছে, কাল সে থাকবে না। কিন্তু আপনি তো অ্যাড-মিনিস্ট্রেসানের পার্মানেণ্ট মেম্বার। যতদিন আপনার নৌকরি আছে, কেউ আপনার গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না। তবে ভয়টা কিসের ডি. এম সাহেব?'

রাজেন্দ্র বাজপেয়ীকে ভয়ানক বিব্রত দেখায়। রামাশ্রয় যা বলেছেন তার প্রতিটি বর্ণ সত্যি। তিনি বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবু—' হঠাৎ তিনি চুপ ক'রে যান।

রামাশ্রয় বলার ভঙ্গিতে বিদ্রূপের ছোঁয়া মিশিয়ে বলেন, 'পলিটিক্যাল ইণ্টারভেনসান অ্যাডমিনিস্ট্রেসানে ভ্রষ্টাচার ঢুকিয়ে দিয়েছে। কী বলেন?'

রাজেন্দ্র বলেন, 'নো কমেণ্ট। তবে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, অ্যাড-মিনিস্ট্রেসানের স্যাংটিটি যাতে বজায় থাকে, সেদিকে আমি নজর রাখতে চেষ্টা করি।'

জনেশ্বর এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বলেন, 'ডি. এম সাহেব, আমরা যখন লড়াইতে নেমেছি, ত্রিলোকী আর গিরিলালের শেষ না দেখে ছাড়ছি না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জনেশ্বর ফের শুরু করেন। গিরিলাল এবং ত্রিলোকী দু'জনেই মারাত্মক অন্যায় করেছে। গিরিলাল ট্রাডিসানাল ফিউডাল সিস্টেমের প্রতিনিধি, তাদের ক্লাসের পক্ষে এ জাতীয় দুষ্কর্ম অসম্ভব নয়। জমি দখলে রাখার জন্য খুন-খারাপি ধর্ষণ আগুন, এসব তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। জমিন্দারি অ্যাবলিসানের পরও বিহারের এই অঞ্চলে ফিউডালিজম এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে। তার অপরাধ যতটা, তার একশ গুণ বেশি অপরাধ ত্রিলোকীর। সে এম. এল. এ, জনগণের রিপ্রেজেণ্টেটিভ। কী ক'রে এরা সাধারণ মানুষের ভোটে বিধানমণ্ডলে যেতে পারে, ভাবা যায় না। ইণ্ডিয়ান ডেমোক্রাসির ভাবমূরতে চুনকালি লেগে যাচ্ছে।

জনেশ্বর বলতে থাকেন, 'ডি. এম সাহেব, পলিটিকসের মতো এত বড় একটা পাওয়ারফুল ওয়েপন এদের মতো লোকের হাতে পুরোটা চলে গেলে ভারত-বর্ষের আর কোনো আশাই নেই। ত্রিলোকী সিংকে আমরা ছেড়ে দেবো না। ওর পলিটিক্যাল কেরীয়ার আমরা ধ্বংস ক'রে দেবোই। এই জাতীয় লোকের আসল চেহারা এক্সপোজ ক'রে দিতেই হবে। আপনি কী বলেন?' সোজাসুজি রাজেন্দ্র বাজপেয়ীর মুখের দিকে তাকান জনেশ্বর।

রাকেশ পলকহীন জনেশ্বরকে লক্ষ করছিলেন। মনে পড়ছে, প্রায় এই রকম কথাই একদিন তিনি ডিস্ট্রিক্ট জজ হেমবতীনন্দনকেও বলেছিলেন।

রাজেন্দ্র বাজপেয়ী নড়ে চড়ে বসেন। সবিনয়ে বলেন, 'এ সব রাজনৈতিক ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমার কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। আপনারা যা ভাল বুঝবেন তা-ই করবেন। দ্যাটস অ্যাবসোলুটলি ইওর কনসিডারেসন। তবে ল

অ্যাণ্ড অর্ডারের দিকটা আমাকে দেখতে হবে। আশা করি, এ ব্যাপারে আপনারা দয়া ক'রে অ্যাডমিনিস্ট্রেসানের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।'

জনেশ্বর বলেন, 'অর্থাৎ কিনা পলিটিক্যাল লীডাররা যদি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়, তাদের পার্টি যদি গভর্নমেণ্টে থাকে তাহ'লে যা খুশি করতে পারে। কিন্তু তার প্রোটেস্ট করলে সেটা ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম হ'য়ে যাবে আর তখন আপনি কানুনমাফিক স্টেপ নেবেন—এই তো বোঝাতে চাইছেন?'

রাজেন্দ্রের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। একজন দুর্ধর্ষ প্রতাপশালী ডি. এম-এর মুখের ওপর এ জাতীয় কথা বলার ধৃষ্টতা এবং বুকের পাটা কারো থাকতে পাবে, তেমন অভিজ্ঞতা খুব সম্ভব আগে হয় নি রাজেন্দ্র বাজপেয়ীর। সাধারণ ঐরু গৈরুর দল হ'লে তাদের সঙ্গে দেখাই করতেন না তিনি। কিন্তু দেশের শ্রদ্ধেয় প্রাচীন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং একজন সৎ সাহসী আইডিয়ালিস্ট প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে কোনো কঠোর সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হ'লে দশ বার ভাবতে হয়। তার ওপর এঁদের সঙ্গে রয়েছে জবরদস্ত পত্রকারেরা। সামান্য এদিক সেদিক হ'য়ে গেলে তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। তিনি হাতজোড় ক'রে শুধু বলেন, 'আমার যা বলার ব'লে দিয়েছি।'

জনেশ্বর বলেন, 'আমাদের বক্তব্যও আশা করি আপনার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। আবারও বলছি, আপনি কানুনের ফ্রেম ওয়ার্কের মধ্যেই কাজ করবেন। আমাদের সম্পর্কে কোনোরকম অনুগ্রহ দেখাবেন না। আচ্ছা উঠি।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

জনেশ্বরের দেখাদেখি বাকি সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। আনুষ্ঠানিক 'নমস্তে'—জানিয়ে সবাই বেরিয়ে আসেন। ডি. এম সৌজন্যবশত দরজা পর্যন্ত জনেশ্বরদের এগিয়ে দেন। তাঁর চোখেমুখে এবং কপালে ভয়ানক দুশ্চিন্তা এবং টেনসানের গভীর রেখা ফুটে উঠেছে। মনে হয় কেউ যেন এলোপাথাড়ি ছুরি টেনে দাগ ক'রে দিয়েছে। তাঁর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কেরীয়ারে এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ত-বা আর কখনও হ'তে হয় নি। সারভিস কেরীয়ারকে অক্ষত রেখে কোন পদ্ধতিতে তিনি মসৃণভাবে বেরিয়ে আসবেন, সেটাই বুঝিবা ঠিক ক'রে উঠতে পারছেন না।

বাইরের লম্বা প্যাসেজে দেবারতিরা দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দৌড়ে আসে। উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত? আমরা চলে আসার পর ডি. এম কী বললেন?'

জনেশ্বর জানান, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁদের ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছে,

সেটার অমর্যাদা করা যাবে না। দু তরফের কথোপকথন গোপন রাখতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পত্রকারেরা এমনিতে নাছোড়বান্দা ধরনের হ'য়ে থাকে। তাদের হাত থেকে এক কথায় নিস্তার পাওয়া খুবই দুরূহ। গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে দেবারতি এবং পরমেশ বলতে থাকেন, 'ডিটেলে জানতে চাই না, যদি সামান্য একটু হিন্টস দেন—'

'উপায় নেই, আমাদের মুখ বন্ধ। তবে—'

'কী?'

'একটা কথা বলতে পারি। যা আলোচনা হয়েছে তা ছাপা হ'লে এখনকার অ্যাডমিনিস্ট্রেসানের একটা পরিষ্কার চেহারা ফুটে উঠত।'

'পীপলস ইন্টারেস্টে এটা কিন্তু আপনাদের জানানো উচিত।' দেবারতিরা একরকম জোরই করতে থাকে।

জনেশ্বর হাসেন, 'কথা দিয়েছি। বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারব না। এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নয়।'

পরমেশ বলেন, 'ওল্ড ভ্যালুজের লোকেদের ক্লাসটাই আলাদা। এখনকার পলিটিসিয়ানরা হ'লে এতবার বলতে হ'ত নাকি? ডি. এম-এর ঘর থেকে বেরিয়ে গলগল ক'রে গলার নলিয়া দিয়ে সব বের ক'রে দিত।'

জনেশ্বর হাসতে থাকেন।

কথায় কথায় ওঁরা ডি. এম অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওধারে পিকেটিং-এর জায়গায় চলে আসেন। কলেজের সেই ছেলেমেয়েরা সমানে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল। হাত তুলে তাদের থামিয়ে দেন জনেশ্বর।

সব চেয়ে ঝকমকে, সব চেয়ে জঙ্গী যে যুবকটি সবার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্লোগান দিচ্ছিল তাকে গোটা দলটার নেতাই বলা যেতে পারে। সে জনেশ্বরদের কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'আমার নাম শেখর। দীপনারায়ণ জুবিলী কলেজের স্টুডেণ্ট ইউনিয়নের আমি সেক্রেটারি।' নিজের পরিচয় দেওয়ার পর জানতে চায়, যে উদ্দেশ্যে ডি. এম-এর সঙ্গে জনেশ্বররা এতক্ষণ আলোচনা করলেন তার কোনো সুরাহা হয়েছে কিনা। অর্থাৎ ধারাবনীর হত্যাকারীদের ধরা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক গড-ফাদারদের শাস্তির কোনো বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে কিনা।

জনেশ্বর স্পষ্ট ক'রে বলেন, 'না।'

শেখর এবং যে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা ডি. এম-এর কামরায় না গিয়ে এখানেই ব'সে ছিলেন তাঁরা একসঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'তা হ'লে?'

এবার রাকেশ বলেন, 'তা হ'লে আর কী। লড়াইতে নেমে তো আর এখন পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের অ্যাজিটেসান আরো জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে যুবক, অফিসকর্মী আর কলেজের ছেলেমেয়েদের আরো বেশি ক'রে সঙ্গে চাই। সেভাবে আন্দোলন করতে পারলে আমরা সাকসেসফুল হবই।'

শেখর জানায়, এত বড় উদ্দেশ্যকে তারা ব্যর্থ হ'তে দেবে না। আজ খুব অল্প সময় পাওয়া গেছে, তাই বেশি ছেলেমেয়ে যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। কাল থেকে এখানকার শুধু তিনটে কলেজেরই না, যত স্কুল আছে তার ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসবে তারা।

রাকেশ বলেন, 'কিন্তু একটা সমস্যাও যে আছে ভাই।'

'কী?'

'এখানে হানড্রেড ফোরটি ফোর রয়েছে। পাঁচ জনের বেশি লোক জড়ো হ'লে অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা।'

শেখর বলে, 'উই ডোণ্ট কেয়ার।'

রাকেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, একটা কনস্টেবল হাতে রাইফেল ঝুলিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট হাঁকিয়ে বলে, 'ম্যাজিস্টর সাব, এস. পি সাবনে আপকো সেলাম দিয়া।'

দু শ' গজ দূরত্বে এস. পি'র অফিসের সামনে যে আরেক দল স্বাধীনতা-সংগ্রামী পিকেটিং করছেন, এই মুহূর্তে সেটা সম্পর্কে খেয়াল ছিল না কারো। আচমকা তলব আসায় বেশ হকচকিয়ে যান রাকেশ। বলেন, 'আমাকে ডাকছেন?'

'হাঁ, ম্যাজিস্টর সাব।'

কনেস্টবলটা যে তাঁকে চেনে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু তাকে আগে কখনও দেখেছেন কিনা, মনে করতে পারেন না রাকেশ, যদিও এস. পি তাঁর যথেষ্ট পরিচিত, এবং শুভাকাঙ্ক্ষীও বলা যেতে পারে, তবু জিজ্ঞেস করেন, 'কেন ডাকছেন, আপনি জানেন?'

কনস্টেবলটা মাথা ঝাঁকায় 'নেহী'।'

'ঠিক হ্যায়।' রাকেশ দেবারতি এবং পরমেশদের দিকে ফিরে বলেন, 'আপনারাও চলুন—'

কনস্টেবলটা শশব্যস্তে বলে, 'নেহী' সাব, আপনাকে একেলা যেতে বলেছেন এস. পি.সাব। অন্য কারো যাওয়ার হুকুম নেহী'।'

ঠিক হ্যায়, চলিয়ে।'

এস. পি'র অফিসের সামনে নেতৃত্বে ছিলেন হীরালাল। ওখানকার স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা জানতেন আন্দোলন নিয়ে ডি. এম-এর সঙ্গে রাকেশদের মীটিং হয়েছে এবং এস. পি রাকেশকে একা ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাকেশ ওখানে যেতেই সবাই তাঁকে ঘিরে ধরেন। আগ্রহে উত্তেজনায় চোখ-মুখ ঝকমক করছে তাঁদের। হীরালাল জিজ্ঞেস করেন, 'ডি. এম-এর সঙ্গে কী কথাবার্তা হ'ল ?'

এস. পি'র সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে যথেষ্ট তাড়া রয়েছে রাকেশের। তিনি এ বিষয়ে হীরালালদের জনেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কনস্টেবলটা অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে যথেষ্ট বিনীতভাবেই এবং সসম্ভ্রমে তাড়া লাগাতে থাকে, 'চলিয়ে ম্যাজিস্টর সাব।'

হীরালালের উদ্দেশে রাকেশ বলেন, 'আর দাঁড়াতে পারছি না চাচাজি। দেখছেন তো কেমন ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলছে।' এস. পি'র অফিসের দিকে পা বাড়িয়ে দেন তিনি।

'এস. পি সাহেবের সঙ্গে কী কথা হয় জানিও।'

'অবশ্যই।'

কনস্টেবলটা ছায়ার মতো গায়ের সঙ্গে জুড়ে থেকে থেকে রাকেশকে এস. পি'র কামরায় পৌঁছে দেয়।

এস. পি জগমোহন শাস্ত্রী প্রচুর খাতির ক'রেই রাকেশকে বসান, উৎকৃষ্ট চা বিস্কুট আনিয়ে আপ্যায়ন করেন। তারপর হেসে হেসে বলেন, 'আপনার মতো আইডিয়ালিস্ট আর এক কথার মানুষ জুডিসিয়ারিতে আর কেউ আছেন কিনা, অন্তত আমার জানা নেই।'

জগমোহন কী বলতে চাইছেন তা খুবই স্পষ্ট। তবু রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কি রকম ?'

'শুনেছিলাম নৌকরিটা ছেড়ে দেবেন। ভাবিনি ছাড়বেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেজিগনেসানটা দিয়েই ছাড়লেন। মনের কতটা স্ট্রেন্থ থাকলে এটা করা সম্ভব, বুঝতে পারছি।' এস. পি এক নাগাড়ে বলে যান, 'আমি কিন্তু কিছুতেই নৌকরি ছাড়তে পারতাম না।'

এইসব ধানাই-পানাইয়ে রাকেশ একেবারেই গলেন না। এগুলো যে নেহাতই অসার চাটুকারিতা বা ভণিতা এবং আসল বক্তব্যটা যে এখনই তাঁর

মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে, তার জন্য স্নায়ু টান টান ক'রে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এস. পি হঠাৎ গলার স্বর কিঞ্চিৎ খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তারপর ডি. এম সাহেবের সঙ্গে কী কথা হ'ল?'

রাকেশ চমকান না। রাজেন্দ্র বাজপেয়ীর সঙ্গে তাঁদের যে দীর্ঘ মীটিং হয়েছে, এটা দুশ' ফিট দূরত্বে ব'সে এস. পি'র পক্ষে জানাটা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়, বরং যথেষ্টই স্বাভাবিক। সাধারণ অনুমান শক্তির জোরে রাকেশ বলেন, 'কী কথা হয়েছে, আপনি তো সবই জানেন।'

মুখে মেকী বিস্ময় ফুটিয়ে জগামাহন বলেন, 'আমি কী ক'রে জানব? আমি কি আপনাদের সঙ্গে মীটিং করতে বসেছিলাম?'

রাকেশ মজার গলায় বলেন, 'আপনার টেবলে তিন তিনটে ফোন দেখছি। আশা করি, সব ক'টাই ডেড হ'য়ে যায় নি।'

সমস্ত শরীর দুলিয়ে হেসে ওঠেন এস. পি। বলেন, 'আপনার সেন্স অফ হিউমার রীয়ালি বহুত উঁচা স্তরের। সে যাক, আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

রাকেশ সতর্ক হ'য়ে যান, 'অবশ্যই। বলুন—'

'অ্যাজ আ ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েল উইশার বলছি। ইসকা বীচমে অফিসিয়াল কুছ নেহী স্যার—' আন্তরিকভাবেই বলতে চেষ্টা করেন এস. পি। অন্তত তাঁর মুখ দেখে এবং কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়।

'বলুন না—'রাকেশকে এবার খানিকটা অসহিষ্ণু দেখায়।

'ত্রিলোকীজিদের সঙ্গে ব্যাপারটা কি কোনোভাবেই মিটিয়ে নেওয়া যায় না?'

রাকেশের মুখ শক্ত হ'য়ে ওঠে। জগমোহন সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব খারাপ নয়। যতদূর তিনি জানেন, ভদ্রলোক ঘুষ খান না, পান-সিগারেট ছাড়া অন্য কোনোরকম নেশা নেই। আই. পি. এস হ'য়েও ঘোর সংসারী গৃহপালিত জীব, তবে শিরদাঁড়ার জোরটা কিঞ্চিৎ কম। কোনো একসময়, সেই যৌবনে, চরিত্রে হয়ত খানিকটা দৃঢ়তা ছিল কিন্তু দেশকালের চেহারা আমূল বদলে গেছে। ডি. এম-এর যা সমস্যা, এঁরও হুবহু তা-ই। রুলিং পার্টির ইনফ্লুয়েন্সিয়াল নেতা, মন্ত্রী বা এম. এল. এ'রা সমস্ত ব্যাপারে এমনই নাক গলাচ্ছে যে পুলিশ বা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেসানের পবিত্রতা বা মর্যাদা বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। মুশকিলটা হচ্ছে এ-ই, একই রাজনৈতিক দলের গভর্নমেণ্ট বরাবর থাকছে না। আজ যদি এই পার্টি সরকার বানায়, পাঁচ বছর বাদে ভোটে তাদের বিরুদ্ধ পার্টি

ক্ষমতায় এসে যায়। আজ যাদের অ্যাজিটেসানে টিয়ার গ্যাস বা গুলি চালাতে হয়, পাঁচ বছর পর তাদেরই হয়ত পায়ে পা ঠুকে স্যালুট হাঁকাতে হয়। এদের মর্জিমাফিক না চললে কেরিয়ারের সর্বনাশ। চাকরি হয়ত যাবে না, কিন্তু এমন জায়গায় বদলি ক'রে দেওয়া হ'ল যেটা খুবই অসম্মানজনক। এখনকার মন্ত্রী-টন্ত্রীদের অসাধ্য কিছু নেই। আকছার বশংবদ জুনিয়ার কাউকে মাথার ওপর চড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেটা মৃত্যুর মতোই মর্মান্তিক। কাজেই এখানকার ডি. এম বা এস. পি'রা সরকার বা রুলিং পার্টির কাউকেই চটাতে চান না। নিরাপদে চাকরি বাঁচিয়ে যাওয়াই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য দু-একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

রাকেশ বলেন, 'এই অনুরোধটা ছাড়া খুব সম্ভব আপনার আর কিছু বলার নেই, তাই না?'

জগমোহন হকচকিয়ে যান, 'না, মতলব—'

'দেখুন এস. পি সাহেব, গিরিলালদের সঙ্গে কোনো আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ে আসতে হ'লে অনেক আগেই আসতে পারতাম। চাকরিটা আমি অকারণে ছেড়ে দিই নি। আচ্ছা উঠি। নমস্তে—'

এস. পি বিমূঢ়ের মতো হাতজোড় ক'রে বুকের কাছে এনে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান।

রাকেশ দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ডি. এম আমাদের জানিয়েছেন, এখানে হানড্রেড ফোরটি ফোর জারি করা আছে। ইচ্ছা করলে আপনারা আমাদের অ্যারেস্ট করতে পারেন।' ব'লে আর দাঁড়ান না, বাইরে বেরিয়ে যান।

পঞ্চাশ

পরদিন সাড়ে দশটা বাজতে না বাজতেই শেখর ডিস্ট্রিক্ট টাউনের সবগুলো স্কুল আর কলেজ থেকে হাজার দেড়েক ছেলেমেয়ে এনে এস. পি আর ডি. এম-এর অফিসের সামনে হাজির ক'রে দিল। ছেলেটার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। খুবই ভাল সংগঠক সে। আজ কিন্তু দৃশ্যটা অন্য দিক থেকেও পাল্টে গেছে। যে সব লোকেরা এই অফিস এবং আদালত পাড়ায় আসে তাদের

সকলেই আজ আর উদাসীন দর্শক হ'য়ে দুরে দাঁড়িয়ে নেই। অনেকেই ছাত্রছাত্রী এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেছে। ধারাবনীর আসল হত্যাকারীদের ধরতে হবে। পুলিশ-পলিটিসিয়ান 'মিলিভগত' খতম কর, ইত্যাদি। অর্থাৎ এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ইনভলভমেণ্ট শুরু হ'য়ে গেছে। ঠিক এটাই চাইছিলেন রাকেশরা।

হানড্রেড ফোরটি ফোর জারি থাকা সত্ত্বেও এখনও কাউকে অ্যারেস্ট করা হয় নি। অ্যাডমিনিস্ট্রেসান এতজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে হয়ত দ্বিধান্বিত। তার ওপর রয়েছে পত্রকারেরা। জনেশ্বর বা শেখরদের গায়ে হাত পড়লে মুহূর্তে তা সারা দেশ জেনে যাবে। এর প্রতিক্রিয়া হবে সাঙ্ঘাতিক। সেই কারণে এই আন্দোলন সম্পর্কে কেউ কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

এস. পি এবং ডি. এম তাঁদের অফিসে আজ আগে আগেই চলে এসেছেন কিন্তু রাকেশদের কারো ডাক পড়ে নি।

রাকেশ অবশ্য আগেই ঠিক ক'রে রেখেছেন, আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একবার দুধলিগঞ্জ থানায় যাবেন, সেখান থেকে ধারাবনী হ'য়ে রাতে এখানে ফিরে আসবেন। ঐ দুটো জায়গায় গত চব্বিশ ঘণ্টায় কী ঘটেছে, কে জানে। তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম, তবু জোর দিয়ে বলা যায় না। ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা'কে বিশ্বাস নেই।

জীপটা পাওয়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে। তিন জায়গায় যোগাযোগ রাখতে বাস-টাসের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না।

ঠিক হয়েছে দেবারতি রাকেশের সঙ্গে থানা এবং ধারাবনীতে যাবে।

সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে হেলে পড়লে দু'জনে বেরিয়ে পড়েন। চওড়া মসৃণ হাইওয়ে দিয়ে ঘণ্টা দুইয়ের ভেতর ওঁরা থানার সামনে পৌঁছে যান। এখানে আগের মতোই পিকেটিং চলছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা চাঁদোয়ার তলায় বসে আছেন। তবে আজ আন্দোলনটা অনেক বেশি জোরালো। অমিত মফস্বল শহরের প্রচুর ছাত্র এনে জড়ো করেছে। তারা মাঝে মাঝে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল, আগে যে দেহতীরা ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীদের দেখেছে এবং ডাকলে দৌড়ে পালিয়ে গেছে, আজ তাদের কেউ কেউ ছাত্র এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এখানেও সেই একই দৃশ্য। ঘোর সংস্কারের মতো ত্রিলোকীদের সম্পর্কে যে ভীতি সাধারণ মানুষের রক্তে মিশে আছে তা ভাঙতে শুরু করেছে।

খবর নিয়ে জানা গেল, ও. সি পুরন্দর সিং এর মধ্যে কম করে পনের কুড়ি বার এসে জয়েন্দ্রদের কাছে কাকুতিমিনতি ক'রে গেছে। বালবাচ্চা নিয়ে সে ঘর করে। নৌকরিটা চলে গেলে সে একেবারে মারা পড়ে যাবে। কৃপা ক'রে মুক্তিযোদ্ধারা যেন আন্দোলন বন্ধ ক'রে নেন। দেহাতীদের ভয় ভাঙা আর কলেজ ছাত্রদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া—এগুলো খুবই ভাল লক্ষণ।

এখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিনটা যখন বিকেল এবং সন্ধের মাঝখানে আটকে আছে সেই সময় রাকেশ দেবারতিকে নিয়ে আবার জীপে ওঠেন। এখান থেকে সোজা ধারাবনী।

এবার রাস্তা ভাল নয়। মাঠের ওপর দিয়ে কাঁচা এবড়ো খেবড়ো পথ চলে গেছে। কাজেই জীপে ইচ্ছামতো স্পীড তোলা যাচ্ছে না। সতর্কভাবে গর্তটর্ত বাঁচিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন রাকেশ। তাঁর পাশে দেবারতি।

সূর্য অলৌকিক লাল বলের মতো দিগন্তের গায়ে আটকে আছে। গাছ-পালার মাথায় ছড়িয়ে আছে শেষ বেলার নরম আলো। বাতাস সারাদিন উত্তাপ ছড়ানোর পর এখন দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উড়ে চলেছে ধবধবে সাদা বকের সারি।

সন্ধের আগে আগে এই সময়টা প্রকৃতির ওপর অপার্থিব কিছু যেন ভর ক'রে বসে। মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিল দেবারতি। তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় যে দুর্ধর্ষ আন্দোলন চলছে এবং তার খবরাখবর নিতে অ্যাজিটেসানের এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বেজায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, এই মুহূর্তে তা আর মনে নেই তার। প্রকৃতি রাকেশকেও গভীরভাবে টানছিল কিন্তু অন্য দিকে তাকানোর উপায় নেই, তাঁর চোখ শুধু সামনের অমসৃণ উঁচু নিচু রাস্তায় আটকানো। তবে বিকেলের আলো, সূর্যাস্তের আগের আকাশ, গাছপালা, বকের সারি—সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া তৈরি করছিল। একসময় গলার ভেতর থেকে খুব কোমল স্বরে রাকেশ ডেকে ওঠেন, 'দেবারতি—'

দেবারতি চমকায় না। খুব সম্ভব, নিজের অজান্তে, ভেতরে ভেতরে এই ডাকটার জন্য সে উন্মুখ হ'য়েই ছিল। আকাশে চোখ রেখে সাড়া দেয়, 'বল—'

'ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আর থানার সামনে আজ যা দেখলাম তাতে আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে আমি বেশ আশাবাদী। তোমার কী মনে হয়?'

'অপ্টিমিস্ট না হওয়ার কারণ নেই। যেভাবে স্টুডেন্টরা আর কমন পীপল পার্টিসিপেট করছে—'

'দু জায়গার অবস্থাই বেশ ভাল। এমন পপুলার রেসপন্স পাওয়া যাবে ভাবা যায় নি। এখন ধারাবনীতে গিয়ে দেখা যাক, ওখানকার হাল কী দাঁড়িয়েছে।'

দেবারতি এবার যে উত্তরটা দেয় তা এই রকম। জনগণ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এখান থেকে হাজার মাইল তফাতে যে মানুষটি থাকে তার সঙ্গে এখানকার মানুষের হয়ত কোনো যোগাযোগ নেই, কেউ কাউকে চোখে দেখে নি পর্যন্ত কিন্তু বিশেষ কোনো ইস্যুতে, বিশেষ কোনো ঘটনায় তাদের চিন্তা বা প্রতিক্রিয়া একই রকম। একই রকম তারা ভাবে, একইভাবে সেই অনুযায়ী কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলে। দেবারতির ধারণা, থানার সামনে বা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে পীপল যা করেছে ধারাবনীতে তার উল্টো কিছু হবে না! অর্থাৎ অন্য দুই জায়গাতে যা ঘটেছে, ধারাবনীতেও তা-ই ঘটবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাকেশ ফের ডাকেন, 'দেবারতি—'

রাকেশের কণ্ঠস্বরে মৃদু দোলা, নাকি কাঁপুনির মতো কিছু ছিল, সেটা দেবারতির কানে ধরা পড়ে যায়। সে যেন বুঝতে পারে, আন্দোলন সম্পর্কে একটু আগে রাকেশ যা বলেছেন সেটাই সব নয়, এবার আসল কথাটা তিনি বলবেন। মুখ না ফিরিয়ে আধফোটা গলায় দেবারতি বলে, 'উ—'

'একটা কথা ক'দিন ধরেই ভাবছি—'

'কী?'

'কাল হোক, পরশু হোক বা এক সপ্তাহ বাদেই হোক, এই অ্যাজিটেসান তো শেষ হ'য়ে যাবে।'

'সেটাই স্বাভাবিক। চিরকাল এই আন্দোলন চলতে পারে না। কোনো এক দল হারে, অন্য দল জেতে কিংবা একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হ'য়ে যায়। আমার বিশ্বাস, এই অ্যাজিটেসানে তোমরা জিতছ।'

'হার-জিতের কথা আমি বলছি না।'

'তবে?'

'আন্দোলন শেষ হ'লেই তো তুমি চলে যাবে।'

গ্রীবা সামান্য হেলিয়ে, ঠোঁটের প্রান্তে হাসির সামান্য আভা ফুটিয়ে চোখের কোণ দিয়ে রাকেশকে লক্ষ করতে করতে দেবারতি বলে, 'তা তো যেতেই হবে।' এই মুহূর্তে তার দিকে তাকালে কে বলবে সে এক দুর্দান্ত মড্ তরুণী এবং জবরদস্ত পত্রকার। বরং তার ভেতর থেকে এই দ্বিতীয়বার সেই চিরকালের নারীটি বেরিয়ে এসেছে।

রাকেশ বলেন, 'তুমি চলে গেলে—' এই পর্যন্ত ব'লে হঠাৎ থেমে যান।

গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস ক'রেই দেবারতি বলে, 'আমি চলে গেলে কী হবে?'

'তুমি যদি ভরসা দাও বলি—'

'আমি বিব্রত হই, এমন কিছু বলবে নাকি?'

'শোনার পর সেটা তুমি বুঝবে।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তার ভান করে দেবারতি। তারপর বলে, 'আচ্ছা ব'লে তো ফেল।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলেন না রাকেশ। তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হয়, মনস্থির ক'রে উঠতে পারছেন না। খানিক দ্বিধার পর শেষ পর্যন্ত যেন মরিয়া হ'য়েই ব'লে ফেলেন, 'একসঙ্গে কাজ ক'রে ক'রে একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, চিরদিন এভাবেই চলবে। তুমি চলে গেলে জীবনের একটা বড় দিক একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যাবে।'

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—' মজার গলায় দেবারতি বলতে থাকে, 'এখনও তোমাদের লড়াই শেষ হয় নি। পরে ও সব ভেবো।'

'পরে তোমাকে পাচ্ছি কোথায়?' গাড়ির স্পীড় কমিয়ে ধীরে ধীয়ে চোখ ফিরিয়ে তাকান রাকেশ।

ঠিক এইরকম কিছু বেশ স্পষ্ট ক'রেই ধারাবনীতে এক নির্জন সন্ধ্যায় বলেছিলেন রাকেশ। আস্তে আস্তে দেবারতির মুখ থেকে হালকা মজার ভাবটা কেটে যেতে থাকে। গাঢ় গলায় সে বলে, 'তুমি যা বলতে চাও, বুঝতে পারছি। আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।'

রাকেশ কয়েক পলক গভীর চোখে দেবারতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটি কথাও আর না ব'লে ফের সামনের রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে জীপে স্পীড তোলেন।

একসময় ওরা ধারাবনীতে পৌঁছে যান।

দেবারতির ধারণা অনুযায়ী এখানেও জেলা শহর এবং থানার মতো সব কিছুই ঠিক ঠিক মিলে গেছে। রাজেশ্বর ছিলেন ধারাবনীর যাবতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, গাঁয়ের মানুষের ভয় ভাঙতে শুরু করেছে। কুঁদরী তো আগেই জবানবন্দি দিয়েছিল। সে ছাড়াও আরো পাঁচটি ধর্ষিতা মেয়ে তাদের লাঞ্ছনার কথা বলেছে এবং তা রেকর্ডও ক'রে নেওয়া হয়েছে। কয়েকজন

গাঁওবালা জানিয়ে দিয়েছে, তারাও জবানবন্দি দেবে এবং আদালতে সাক্ষি দিতেও প্রস্তুত।

আর একটা ব্যাপার, এর ভেতর ত্রিলোকী বা গিরিলালের বন্দুকবাজ ঘোড় সওয়ারেরা দিনে বা রাতে কোনো সময়েই এসে ধারাবনীর গাঁওবালাদের শাসানি দিয়ে যায় নি। গাঁয়ের ধারে কাছে তাদের দেখা যাচ্ছে না। লোকজনের ভয় যে ভাঙছে তার একটা বড় কারণও খুব সম্ভব তা-ই।

রাজেশ্বর আরো জানান, তিনি খবর পেয়েছেন, শুধু বিহার নয়, বাইরে থেকেও কিছু পুরনো স্বাধীনতা-সংগ্রামী আন্দোলনে যোগ দিতে দু-একদিনের ভেতর ধারাবনীতে আসছেন। অর্থাৎ লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে তাতে আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত হওয়া যায়।

ঘণ্টা দুই ধারাবনীতে কাটিয়ে রাকেশরা যখন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে ফিরে আসেন, বেশ রাত হ'য়ে গেছে।

একান্ন

আরো তিনটে দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে প্রায় স্থিতাবস্থাই চলছে তিন জায়গায়। কাউকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয় নি। তবে আরো অনেক ছাত্রছাত্রী, যুবক আর নানা অফিসের এমপ্লয়ী ডি. এম আর এস. পি'র অফিস এবং থানার সামনে রোজ এসে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর বিহারের বাইরের অন্য সব স্টেট থেকেও অগুণতি স্বাধীনতা-সংগ্রামী ধারাবনীতে এবং থানার সামনে এসে ব'সে গেছেন। আরো বেশ কিছু খবরের কাগজ থেকে পত্রকারেরা চলে এসেছেন।

এ ক'দিন তিন জায়গায় যোগাযোগ রাখার জন্য রাকেশ আর দেবারতি কতবার যে ছোটাছুটি করেছে তার হিসেব নেই।

সেই প্রথম দিনটি ছাড়া ডি. এম বা এস. পি'র কাছ থেকে আর ডাক আসে নি। সমস্ত আবহাওয়াটা উত্তেজনায় টান টান হ'য়ে আছে।

ডি. এম এবং এস. পি'র অফিসের সামনে আজ আন্দোলনের চতুর্থ দিন।

সকাল দুপুর রাত, উর্ধ্বশ্বাসে ক'দিন প্রচণ্ড ছোটাছুটির কারণে রাকেশ আর দেবারতি ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে ছিল। আজ আর তারা দুধলিগঞ্জ কি ধারাবনীতে যায় নি। ডি. এম অফিসের সামনে চাঁদোয়ার নিচে অন্য সবার সঙ্গে ব'সে আছে।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়ে দিনটা থম ধ'রে আছে।

একটানা স্লোগান দেওয়ার পর ছাত্রছাত্রী এবং অন্য সকলে খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। বেলা আরেকটু পড়লে ফের নতুন উদ্যমে স্লোগান শুরু হ'য়ে যাবে।

হঠাৎ দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসে। রাকেশরা চকিত হ'য়ে এধারে ওধারে তাকাতে থাকেন কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না।

আরো কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায়, বেশ বড় সড় একটা মিছিল ডিস্ট্রিক্ট টাউনের বড় সড়ক ধ'রে এদিকেই আসছে। মিছিলে অনেকগুলো প্ল্যাকার্ডও চোখে পড়ছে, তবে সেগুলোতে কী লেখা আছে, এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, যেমন বোঝা যাচ্ছে না স্লোগানের একটি বর্ণও।

কারা এই মিছিল বের করতে পারে? ইদানীং নানা কারণে আকছার বিক্ষোভ আর আন্দোলন চলছে, আর তা শুরু হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে মিছিল বেরিয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে 'রাস্তা রোকো', 'ঘেরাও', 'গণ অবস্থান' ইত্যাদি তো রয়েছেই। এই মিছিল সম্ভবত সেই জাতেরই কিছু হবে।

কিন্তু মিছিলটা আরো কাছে আসতে রাকেশরা সবাই ভীষণ চমকে ওঠেন। তাঁরা পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ডে যা লিখে রেখেছেন, প্রায় হুবহু তাই লেখা রয়েছে মিছিলের প্ল্যাকার্ডগুলোতে। 'ধারাবনীর হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং উপযুক্ত সাজা চাই,' 'পুলিশ এবং প্রশাসনের গাফিলতি চলবে না', 'পুলিশ-অপরাধী মিলিভগত, নিপাত যাক,' ইত্যাদি। সব চেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হ'ল মিছিলটার একেবারে সামনে রয়েছেন স্বয়ং ত্রিলোকী সিং আর গিরিলাল ঝা। তাঁদের সঙ্গে আর যারা রয়েছে কস্মিনকালেও তাদের মুখ দেখেন নি রাকেশরা। কোত্থেকে এদের জোটানো হয়েছে, কে জানে।

এমন একটা দৃশ্য প্রায় অভাবনীয়। রাকেশ এবং অন্য সবাই একেবারে হতভম্ব ব'নে যায়।

রাকেশদের বেমালুম অগ্রাহ্য ক'রে ডি. এম অফিসের দিকে মুখ ক'রে কিছুক্ষণ উত্তেজক স্লোগান দিতে থাকেন গিরিলালেরা। তারপর গ্রীষ্মের আবহাওয়াকে আরো উত্তপ্ত ক'রে গিরিলাল ত্রিলোকী হঠাৎ ডি. এম-এর অফিসে ঢুকে যান।

রাকেশদের হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। একসময় তিনি

জিজ্ঞেস করেন, 'ব্যাপারটা কী দাঁড়াল জনেশ্বর চাচা? গিরিলাল আর ত্রিলোকী মিছিল ক'রে এসে মার্ডারারদের ধরার জন্যে প্রেসার দিচ্ছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না। ওদের মোটিভটা কী?'

জনেশ্বর ত্রিলোকীদের চাতুরিটা ধরে ফেলেছিলেন। বলেন, 'কিছুই আন্দাজ করতে পারছ না?'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাকেশ।

'লোক দু'টো মারাত্মক ধুরন্ধর। আমি শুধু ভাবছি কিরকম ধূর্ত একটা চাল দিল ওরা!'

'কিসের চাল?'

জনেশ্বর বলেন, 'আরে বেটা, যখন ওরা বুঝল ফ্রীডম ফাইটার, স্টুডেন্টস ছাড়া আরো অনেকে খুনীদের ধরার জন্যে চাপ দিচ্ছে, জনমত ক্রমশ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তখন আঁচ ক'রে নিল হত্যাকারীদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না, তাই ন্যায়ের ঝাণ্ডা উড়িয়ে তারাও মানকালালদের ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়ল।'

'কিন্তু—' বিভ্রান্তের মতো বলেন রাকেশ।

'তুমি ভাবছ, মানকালালরা ওদের প্রাইভেট আর্মি?'

'হ্যাঁ। নিজেদের বন্দুকবাজদের এভাবে ক্ষতি করবে?'

'নিশ্চয়ই করবে। নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্যে ওরা সব কিছু করতে পারে। ফিউচারে আবার চুনাওতে নামতে হবে না? এম. এল. এ, এম. পি কি মিনিস্টার হওয়ার খোয়াব ক'টা থার্ড ক্লাস খুনীর জন্যে ওরা নষ্ট করবে? মানকালালরা তো মার্সেনারি, জরুরত পড়লে ওরা নিজেদের ভাইকেও হাসতে হাসতে ফাঁসির রশিতে চড়িয়ে দিতে পারে। যে ভাবেই হোক, পলিটিক্যাল পাওয়ার হাতে রাখা চাই।'

'কিন্তু কোর্টে কেস উঠলে মানকালালরা তো জানাবে তারা গিরিলালদের ভাড়াটে খুনী। ধারাবনীর জেনোসাইডের পেছনে গিরিলালেরা আছে।'

'ওরা তা বলতেই পারে।'

জনেশ্বর বলেন, 'তুমি ক'দিন আগেও তো ম্যাজিস্ট্রেট ছিলে। এর ভেতরই আইন কানুন ভুলে গেলে! মানকালালরা নিজেদের বাঁচানোর জন্যে যা খুশি বলতে পারে কিন্তু আদালতে তা তো প্রমাণ করতে হবে। তোমার কি ধারণা, সই-সাবুদ ক'রে সাক্ষী রেখে গিরিলালরা মানকালালদের খুন করতে পাঠিয়েছিল?'

রাকেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকেন। বলেন, 'একালের ভিলেনদের

সহজে শেষ করা যায় না। কিন্তু এত বড় ক্রাইম ক'রে পার পেয়ে যাবে, তা কিছুতেই হ'তে দেওয়া যায় না।'

'ঠিক বাত—'

'তার মানে যুদ্ধটা শেষ হ'ল না। ইটস আ কনটিনিউয়াস প্রসেস। ওটা চলতে থাকবে।'

'আমার তো সেইরকম ধারণা। কোরাপ্ট বজ্জাতদের উৎখাত না করা পর্যন্ত তোমার আমার কারো থামা চলতে পারে না।'

এই সময় ত্রিলোকী এবং গিরিলাল উদ্ভাসিত মুখে বেরিয়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে চলে আসেন। নিচু গলায় তাদের ভেতর কী আলোচনা হয়, দূর থেকে রাকেশরা বুঝতে পারেন না।

কয়েক মিনিট পর 'গিরিলালজি, ত্রিলোকীজি—অমর রহে, অমর রহে—' ক'রে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে মিছিল চলে যায়।

আর স্তম্ভিত হ'য়ে রাকেশরা শুধু তাকিয়ে থাকেন।

বাহান্ন

দু'দিন পর মানকালালরা সাতজন খুন, ধর্ষণ এবং ঘরে আগুন লাগানো ইত্যাদি অগুণতি অভিযোগে ধরা পড়ে যায়।

গিরিলাল ত্রিলোকীর লোকেরা তাদের নামে সেদিন মিছিলে 'অমর রহে, অমর রহে—' ক'রে যতই জয়ধ্বনি দিক না, তারাই যে ধারাবনীর ভয়াবহ ট্র্যাজেডির নাটের গুরু সেটা কারো বুঝতে বাকি নেই। কবে আদালতে কেস শুরু হবে, হত্যা ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ মানকালালদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করা যাবে কিনা, তাদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে মিছিল বের করলেও মানকালালদের সঙ্গে গিরিলালদের গোপন কোনো বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে কিনা, এবং সেটা কী ধরনের, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গিরিলালদের গায়ে আঁচড়টি না লাগায় সবাই ভয়ানক ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। তবে ধারাবনীর লোকজনেরা ফের বেশ ভয় পেয়ে গেছে। নতুন ক'রে গিরিলালদের আক্রোশ এবং ক্রোধ কিভাবে কখন তাদের ওপর এসে পড়বে, কিভাবে তারা নতুন ক'রে প্রতিহিংসা নেবে, সেটা কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।

এদিকে রাকেশরা জেলা শহর এবং থানার সামনে থেকে আন্দোলন তুলে নিয়ে ধারাবনীতে চলে এসেছেন। একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীও এখন পর্যন্ত ফিরে যান নি। তবে কলেজের ছাত্রছাত্রী, যুবক এবং অফিসকর্মীরা বা দুধলিগঞ্জ থানার চারপাশের দেহাতীরা কেউ ধারাবনীতে আসে নি।

আচমকা নাটকীয়ভাবে বদলে-যাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে রাকেশরা নিজেদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা করেছেন। গিরিলালদের বিরুদ্ধে আপাতত কিছুই করা যাচ্ছে না। ভারতীয় গণতন্ত্রে কোনো ভ্রষ্টাচারী জনপ্রতিনিধিকে খারিজ ক'রে দেওয়া খুব সহজ নয়। সে জন্য সকলেরই খুব আপসোস। কিন্তু কিছু একটা করা উচিত, এবং তা করতেই হবে। সেই কারণে আজ ধারাবনী গাঁয়ের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গায় বিকেলে মীটিং ডেকেছেন জনেশ্বর।

বিকেল হ'তে না হ'তেই ধারাবনীর লোকজনেরা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা তো বটেই, মফস্বল টাউন থেকে অমিতের সঙ্গে বেশ কিছু ছাত্রও চলে আসে।

আজকের মূল বক্তা জনেশ্বর। সবাই উৎসুক চোখে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

জনেশ্বর একসময় শুরু করেন, 'ভাই সব, আপনারা জানেন হত্যাকারীরা ধরা পড়েছে কিন্তু তাদের পেছনে যারা আছে তাদের কিছুই করা যায় নি। এর জন্ত যা দরকার তা হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা।' খুব সহজ ক'রে তিনি বুঝিয়ে দেন, ত্রিলোকীদের মতো মানুষকে কোনোমতেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব না কিন্তু বিধানমণ্ডলের বিধায়ক পদ থেকে খারিজ করাও যাচ্ছে না। তাই আগামী চুনাওতে তাকে যেভাবে হোক হারাতেই হবে। পুলিশের একাংশ, বড় জমিমালিক আর পলিটিসিয়ানের গোপন গাঁটবন্ধন যেভাবেই হোক চুরমার ক'রে দিতে হবে। স্থানীয় মানুষজনের ভেতর থেকেই তাদের প্রতিনিধির বিধান-মণ্ডলে যাওয়া উচিত। কিন্তু একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেরিয়ে যায়, স্বাধীনতার বেয়াল্লিশ বছর পরও বেশির ভাগ গাঁয়ের মানুষই আনপড় অক্ষর-পরিচয়হীন হ'য়ে আছে। জননেতা হ'তে হ'লে, বিধানমণ্ডলে যেতে হ'লে উপযুক্ত শিক্ষার দরকার। তাই আগামী চুনাওতে রাকেশকে আপনাদের প্রতিনিধি ক'রে নিন। সে ধারাবনীর মানুষজনের জন্ত কতটা স্বার্থত্যাগ করেছে তা আপনারা জানেন।

শ্রোতাদের একেবারে সামনের সারিতে বসে ছিল ধনুয়া। প্রবলবেগে মাথা নেড়ে উদ্দীপ্ত মুখে সে পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাততালি

দিতে থাকে। আর সেটা যেন পলকে সংক্রামিত হ'য়ে যায় বিপুল জনতার মধ্যে।

হাততালির তোড় কিছুটা কমে এলে জনেশ্বর আবার বলতে থাকেন, 'গিরিলাল-দের বিশ্বাস নেই। যে কোনো সময় আবার তারা নতুন বন্দুকবাজ পাঠিয়ে আপনাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। তাই আমরা ক'জন পুরনো স্বাধীনতা-সংগ্রামী—ভাগবত, রামলখন, আমি, জয়েন্দ্র আর প্রবোধকান্ত এখানেই থেকে যাব। রাকেশ মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকবে। কেননা, চুনাওতে লড়তে হ'লে তাকে নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে। তাই সব সময় এখানে পড়ে থাকা সম্ভব না। একটা কথা মনে রাখবেন, দেশের দায়িত্ব সাচ্চা মানুষদের হাতে থাকা দরকার, শিয়ার গিধের হাতে দেশকে তুলে দেওয়া যায় না।'

জনেশ্বররা ক'জন ছাড়া বাকি স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা পরদিন সকালেই যে যাঁর শহরে বা গ্রামে ফিরে যান। যাওয়ার আগে জানিয়ে দেন, যখনই ডাক পড়বে, তৎক্ষণাৎ চলে আসবেন।

দেবারতিও আজ চলে যাবে। বিকেলে জীপে ক'রে তাকে পূর্ণিয়ায় নিয়ে যান রাকেশ।

ট্রেনে উঠে জানালার ধারে সীটে বসে দেবারতি। বাইরে প্ল্যাটফর্মে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকেন রাকেশ। চারপাশে যাত্রীদের ব্যস্ততা, কুলিদের ছোটাছুটি। ঠিক এইভাবেই মাস দুয়েক আগে আরেক বার দেবারতিকে তুলে দিতে এসেছিলেন রাকেশ। কিন্তু সেই দিনটার সঙ্গে আজকের তফাত অনেকটাই।

ভিড়, হট্টগোল—কোনো ব্যাপারেই লক্ষ নেই দু'জনের। নিজেদের মধ্যেই তাঁরা হয়ত-বা মগ্ন হ'য়ে আছেন।

গাড়ি ছাড়ার মুখে রাকেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আমার সেই আর্জিটার কী হ'ল? বলেছিলে পরে ভাববে।' তাঁর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে অসীম আকুলতা।

দেবারতি পলকহীন রাকেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে সে এবার চোখ নামিয়ে নেয়।

রাকেশ আগের স্বরেই ফের বলেন, 'বিরাট একটা দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি। তুমি পাশে থাকলে সাহস পাব।'

দেবারতি খুব নিচু গলায় বলে, 'আমি সব সময় তোমার পাশে আছি। যখন ডাকবে তখনই চলে আসব।'

দেবারতি নিজের অজান্তেই, বুঝিবা কোনো ঘোরের মধ্যে রাকেশের হাতের ওপর নিজের হাতটি রাখে।

একসময় গার্ডের হুইসিল শোনা যায়। ট্রেনের দীর্ঘ শরীর ধীরে ধীরে স্টেশন ছাড়িয়ে দূরে চলে যেতে থাকে। ততক্ষণে দু'জনের হাত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে দেবারতি। ফাঁকা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন রাকেশ।